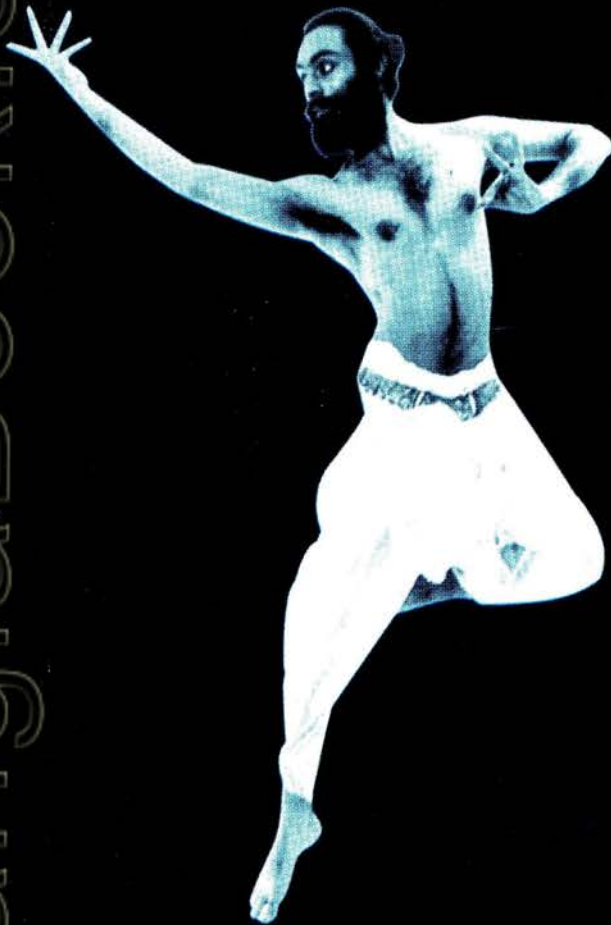


খুশবন্ত সিং এ হিন্দি অব দ্য শিখ্‌স

দ্বিতীয় খণ্ড
১৮৩৯-২০০৪



অনুবাদ । জাকির শামীম

প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৬৩ সালে। শিখদের নিয়ে সবচেয়ে সমন্বিত এবং বিশ্বাসযোগ্য বই এটি। নতুন সংস্করণে-জাতীয় জীবনে শিখ সম্প্রদায়ের মূল স্রোতে ফিরে এই বিবরণ হালনাগাদ করা হয়েছে। খুশবন্ত সিং তাঁর নিজস্ব চিরচেনা ধারণা সহজভাবে লিখেছেন। যাতে সাধারণ পাঠক বুঝতে পারেন শিখ ধর্মের উৎপত্তি বিকাশ ও তার পরিনতি। পুরানো দলিলপত্র ঘেটে বইটি লেখা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমাজ, ধর্ম এবং রাজনীতিতে শিখদের বিশ্বাসের যে কাঠামো ছিল সে-বিষয়টি দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮৩৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। মূল পারসিক, গুরুমুখি এবং ইংরেজির ওপর ভিত্তি করে লেখক শিখতত্ত্বের প্রসার এবং সংকলিত পবিত্রলিপিকেও চিহ্নিত করেছেন।

শিখদের শান্তিবাদ থেকে জঙ্গীবাদে রূপান্তরের দলকে বলা হয় ‘খালাস’ এবং এই দলটির নেতা গুরু গোবিন্দ সিং -এর জীবনকাহিনীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে, আছে শিখদের সাথে মোঘল এবং আফগানদের সম্পর্কের কথা।

শিখদের যে চিন্তা চেতনা-তারমূলে রয়েছে গুরুবাদ। এক্ষেত্রে গুরুর দেওয়া নির্দেশ শিরোধার্য। এই শিখ ধর্মের সাথে সৃষ্টিবাদের অনেক মিল রয়েছে। তাদের চিন্তা চেতনা, ধর্মের অনুশীলন সবই গুরু বা মুর্শিদকেন্দ্রিক। অনেকটা বৈষ্ণবধর্মের আচার-আচারণ।



‘সহায়ক হিসেবে অপরিহার্য ... শিখদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক
অবস্থা বোঝার জন্য .. এটি শিখদের ইতিহাসের প্রতি
সহানুভূতিশীল ও নির্মহ পরিবেশনা ।’

- টাইমস অব ইন্ডিয়া

‘সিং আপাত কঠিন ইতিহাসকে সহজ করে তুলেছেন ।’

- সানডে মেইল ।

এ হিন্দি অব শিখ্‌স

অনুবাদ
জাকির শামীম

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নামদা

প্রকাশক

রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল
নালন্দা ৬৯ প্যারীদাস রোড
ঢাকা-১১০০।

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারি ২০১১

©

প্রকাশক

মুদ্রণ

শামীম প্রিন্টিং প্রেস

৩/১ কবিরাজ গলি লেন

পাটুয়াটুলী ঢাকা

বর্ণবিন্যাস

লিস্তা ডিজাইন ভিউ

বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রচ্ছদ

বিপ্লব দেব

মূল্য

৪৫০.০০

First Edition
Cover Design
Publisher

February 2011

Biplob Dev

Redayanur Rahman Jewel

Nalonda, 69 Payridas Road

Banglabazar, Dhaka-1100.

Publisher

©

Price

450.00

ISBN

978-984-8844-15-1

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

শিখ সাম্রাজ্যের পতন /১১

১. রনজিত সিং-এর মৃত্যুতে পাঞ্জাব /১২

মহারানী চান্দ কৌর এবং মহারাজা শের সিং /২০

ডোগরাদের অধীনে পাঞ্জাব /৩১

মহারানী জিনদান এবং দালিপ সিংহ /৩৭

২. প্রথম ব্রিটিশ-শিখ যুদ্ধ /৪১

ব্রিটিশদের প্রস্তুতি /৪১

শিখদের অপ্রস্তুত অবস্থা /৪৩

মাডকির যুদ্ধ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৪৫ /৪৭

ফিরোজ শহরের যুদ্ধ, ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৫ /৪৭

বাড্ডোওয়াল, ২১ জানুয়ারি ১৮৪৬ /৪৯

সাব্রাওন, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৬ /৫০

৩. ব্রিটিশদের অধীনে পাঞ্জাব /৫৩

লাহোরের চুক্তিসমূহ, ৯ এবং ১১ মার্চ ১৮৪৬ /৫৪

ভৈরোয়ালের চুক্তি, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৪৬ /৫৭

৪. ইংরেজ-শিখের দ্বিতীয় যুদ্ধ /৬২

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ, ১৩ জানুয়ারি ১৮৪৯ /৭১

গুজরাটের যুদ্ধ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ /৭২

দ্বিতীয় পর্ব

পাঞ্জাবে ব্রিটিশ ক্ষমতার দৃঢ়করণ /৭৭

৫. পাঞ্জাব অধিকার করা /৭৮

পাঞ্জাবকে সৈন্যমুক্তকরণ /৮০

নিয়ন্ত্রণ বোর্ড /৮১

বোর্ডের কার্যক্রম /৮২

বোর্ডের ভাঙ্গন /৮৭

৬. শিখ এবং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ /৮৯

বিদ্রোহের কারণ /৮৯

যখন পাঞ্জাব বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু /৯১

সিপাহীদের নিরস্ত্রকরণ এবং পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দমন /৯৩

ব্রিটিশ সেনাদলে শিখদের প্রবেশন /১০০

প্রশাসনিক পরিবর্তন- ভারত ও পাঞ্জাবে /১০৩

৭. ক্রেসক্যাট ই ফ্লুয়িস /১০৪

তৃতীয় পর্ব

সামাজিক এবং ধর্মীয় পুনর্গঠন /

৮. ধর্মীয় কার্যকলাপ /১১০

নিরাকারীগণ /১১১

বিসের রাধা স্বামীগণ /১১১

নামধারী অথবা কুকা চলাচল /১১৩

৯. সিং সভা ও সামাজিক পুনর্গঠন /১১৫

পেছনের ঘটনা : খ্রিস্টান ও হিন্দু মিশনারী কার্যক্রম /১২১

অমৃতসর ও লাহোরের সিং সভা /১২৫

চতুর্থ পর্ব

রাজনৈতিক আন্দোলন, মার্কসবাদী, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা /১৩৩

১০. গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা এবং বিক্ষুব্ধ কৃষক সমাজ /১৩৪

পাঞ্জাব কৃষকদের উন্নয়ন এবং ঋণসমস্যা /১৩৪

জমি বিচ্ছিন্নতাকরণ আইন ১৯৯০ /১৩৬

কৃষক সংগ্রাম ১৯০৭ /১৩৭

১১. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া /১৪০

যুদ্ধে শিখদের অবদান (১৯১৪-১৮) /১৪০

যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা /১৪০

পাঞ্জাবে মার্শাল ল' /১৪৩

১২. কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেটসে শিখদের অভিভাষণ /১৪৫

গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা /১৪৮

কমাগাতা মারু /১৫০

পাঞ্জাবে বিদ্রোহ /১৫২

সিঙ্গাপুরে জাগরণ /১৫৪

গদরে জার্মানদের অংশগ্রহণ /১৫৫

১৩. গুরুদুয়ারা পুনর্স্থাপন আকালি বিদ্রোহীদের পুনরুত্থান /১৫৯

গুরুদুয়ারা / ১৫৯

দ্য কি এ্যাফেয়ার /১৬৩

গুরুর বাগান /১৬৪

বাকবর আকালি চরমপন্থী /১৬৫

জাইটো /১৬৭

শিখ গুরুদুয়ারা আইন /১৬৮

১৪. সংবিধান পরিবর্তন এবং শিখ /১৭১

মিন্টো-মর্লে পুনর্গঠন, ১৯০৯ /১৭২

লক্ষ্মী : মন্টেগু-ক্রেমসফোর্ড পুনর্গঠন এবং ভারত সরকার আইন ১৯১৯ /১৭২

গোল টেবিল বৈঠক এবং ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ /১৭৪

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক /১৭৫

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক /১৭৬

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক /১৭৬

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক /১৭৭

ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ /১৭৭

দেশ বিভাগের রাজনীতি : স্বাধীনতা এবং শিখ মাতৃভূমির দাবি /১৭৭

পঞ্চম পর্ব

১৫. শিখ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ /১৮১

যুদ্ধকালীন সময়ে ভারত রাজনীতি /১৮১

এশিয়ার যুদ্ধে শিখদের দৃষ্টিভঙ্গি : ভারতের জাতীয় সৈন্যদল /১৮৩

ক্রিপস মিশন মার্চ-এপ্রিল ১৯৪২ /১৮৬

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি /১৮৮

১৬. ভারতবিভাগের প্রস্তাবনা /১৮৯

সাধারণ নির্চান ১৯৪৫ /১৯০

ক্যাবিনে মিশন /

১৭. সামাজিক সংঘাত ও সংস্কার /১৯৩

সূচনা /১৯৩

ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এবং পরবর্তী /১৯৫

পাঞ্জাবের সামাজিক সংঘাত /১৯৬

প্রস্থান এবং পূর্ব পাঞ্জাব পুনর্গঠন /২০২

১৮. তাদের নিজস্ব রাজ্য /২০৬

১৯. সমৃদ্ধি ও ধর্মীয় মৌলবাদ /২১৯

সবুজ বিপ্লব /২২১

জারনাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালা /২২৫

২০. আনন্দপুর সাহেব সংকল্প এবং অন্যান্য আকালি দাবিসমূহ /২৩৬

২১. সর্বনাশা ভুল /২৪৬

২২. বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক গোপন হত্যা এবং তারপর /২৬৫

২৩. নির্বাচন এবং সেই অনুসারে /২৭৫

১৯৮৫-এর নির্বাচন /২৮১

নদীর পানি /২৮৩

সম্মতিচুক্তির অকার্যকারতা /২৮৫

২৪. বৈদেশিক যোগাযোগ ও খালিস্তান /২৮৯

সারকথা /২৯৩

উপসংহার /২৯৬

সারসংক্ষেপ /৩১৭

প্রথম পর্ব

শিখ সাম্রাজ্যের পতন

‘এই লাল রং দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে?’ মহারাজ রনজিত সিং ভারতের মানচিত্র দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ‘মাননীয় মহারাজ? মানচিত্রকর উত্তর করলেন, ‘লাল দাগ দিয়ে ব্রিটিশদের আয়ত্তাধীন এলাকা বোঝানো হয়েছে।’ মহারাজ তাঁর এক চোখ দিয়ে মানচিত্রে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন এবং দেখলেন পুরো হিন্দুস্তানই পাঞ্জাব ব্যতীত লাল কালিতে রঙিন। তিনি তাঁর সভাসদদের দিকে ফিরলেন এবং মন্তব্য করলেন—‘এক রোজ সাব লাল হো যায়েগা’—একদিন সব লাল হয়ে যাবে।

মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে মাত্র দশ বছর লেগেছিল।

রনজিত সিংয়ের উত্তরাধিকারীরা নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্য ছিল না; তাদের সার্বক্ষণিক মূল চিন্তা ছিল—নিজেদের মধ্যে মারামারি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাধ্যমে সিংহাসন সুনিশ্চিত করা। দরবার বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। বিষাক্ত মদের পেয়ালা, গুপ্ত খঞ্জর এবং কার্বাইন তাদের রাজকীয় রক্তের ঘণ্টাধারী রাজাল; উচ্ছৃঙ্খল জনতা রাস্তায় একে-অপরকে জবাই করতে লাগল। পাঞ্জাবিদের মনোবল ভেঙে গেল এবং তারা ছত্রভঙ্গ হলো। ডোগরা হিন্দুরা শিখদের সঙ্গে শক্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো; আর মুসলমানেরা একই অবস্থায় রইল। প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। আর্মিদের সংখ্যা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, রাজ্যের রাজস্ববিভাগ তা চালাতে পারত না; পরে তারা বিদ্রোহ করেছিল এবং পরিণামে রাজ্যের কার্যকলাপের দায়িত্বভার তুলে নিয়েছিল। ইংরেজরা, যারা রনজিত সিংয়ের মৃত্যুর পর বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে পূর্বেই অবগত ছিল তারা তাদের দল নিয়ে দূরবারের সীমান্তে রওনা হয় এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে। ১৮৪৫ সালের শরতকালে তারা পাঞ্জাবে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি নেয়। তারা শিখদের চুক্তিবদ্ধ করে পরাজিত করে, জুলুমদার দোআব অধিকার করে এবং জম্মু ও কাশ্মীর গুলাব সিং ডোগরাকে প্রদান করে।

তিন বছর পর ইংরেজরা সুলতানের প্রদেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ক্ষুদ্র বিদ্রোহ করে এবং পুরো রাজ্য অধিকার করার জন্য এর সদ্ব্যবহার করে। যেমনটি রনজিত সিং তার দিব্যচোখে দেখেছেন, ১৮৪৯ সালের বসন্তকাল নাগাদ প্রায় পুরো ভারতের মানচিত্রটাই লাল হয়ে গিয়েছে।

১. রনজিত সিং-এর মৃত্যুতে পাঞ্জাব

রনজিত সিং, পাঞ্জাবের মহারাজা, ২৭ জুন, ১৮৩৯ সালের বিকেলে মৃত্যুবরণ করেন। যে চল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছেন, তিনি শিখদের বিভিন্ন দলকে এক করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং নানামতে বিশ্বাসী ও অনুগতদের একত্র করে একটি জাতি গড়েছেন; এবং তিনি দেশকে শক্তিশালী এবং উন্নতিশীল করেছেন। গুরু নানকের বিশেষ উদ্দেশ্যে হিন্দু এবং মুসলিমদের একত্রে করা এবং গুরু গোবিন্দ সিং-এর একটি যুদ্ধের মতো ভ্রাতৃত্ব প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। পাঞ্জাব তখন বিদেশি সৈন্যদের সাথে সার্বভৌম ক্ষমতা রক্ষার জন্য প্রতিযোগিতার যুদ্ধক্ষেত্র ছিল না; অপরদিকে এটা শুধু ভারতীয় সর্বশক্তিই হয়ে উঠেনি বরং এশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য হয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পাঠান এবং আফগান কর্তৃক শাসিত হওয়ার পর, পাঞ্জাবিরা তাদের উলটো ভূমিকা পালন করে পাঠান রাজ্য পর্যন্ত তাদের রাজত্ব বিস্তারের এবং কাবুলের সিংহাসনের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ভাগ্য নির্ধারণের মাধ্যমে। তারা তিব্বতে চীনদের উপশহর জয় করে এবং ব্রিটিশদের প্রসারণক্ষমতা পশ্চিমেই বন্ধ করে। কখনও আক্রমণকারীরা পাঞ্জাবে পা দেয়ার সাহস করেনি। কচি গম পায়ে মাড়ায়নি অথবা কৃষক সম্প্রদায় শস্য জমা করার পরে লুণ্ঠন করেনি। বড় সড়কগুলো নিরাপদ ছিল; একদা মধ্য এশিয়া এবং হিন্দুস্তানের মাফেলা তাদের পণ্যসামগ্রী পাঞ্জাবের বাজারে বিনিময় করত। এসব শুধুমাত্র পাঞ্জাবের লোকদের দ্বারা সম্ভবপর হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে উঠে আসা একজন মানুষের নেতৃত্বের জন্য।

রনজিত সিং ছিলেন বিরাট বটবৃক্ষের ন্যায়, যা তার ছায়া পুরো পাঞ্জাবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন; এবং বটের ন্যায় তিনি তার নিচের মাটিকে এমনরূপে আশ্রয় দিয়েছিলেন যাতে আগাছা ছাড়া আর কিছুই জন্মাতে না পারে। ফলস্বরূপ, যখন তিনি মারা গেলেন তখন তাঁর সাথে পথ মিলিয়ে চলার জন্য এবং দেশকে তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নেয়ার মতো কোনো উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল না। এটা তাদের জন্য প্রয়োজ্য যারা রনজিত সিংয়ের কাছের মানুষ ছিল তার পরিবারের সদস্যরা এবং প্রিয় সভাসদেরা যাদের জন্য তিনি কৃত্রিমতাবিহীন অখ্যাতি থেকে শক্তি পেয়েছেন, সততার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ পেয়েছেন তা তাদের কল্পনারও বাইরে।

রনজিত সিং সাত ছেলে রেখে গিয়েছেন। যদিও তারা বিভিন্ন নারীর ঔরসে জন্ম নিয়েছেন। তাদের আবেগই তাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের নির্ধারক, তারা ভ্রাতৃত্বসুলভের চেয়ে ভ্রাতৃত্বহন্তারক। সবচেয়ে বড়, খারাক সিং যার ভবিষ্যৎ মহারাজা পদে অভিষিক্ত হওয়ার কথা তিনি পাঞ্জাবে শাসন করার জন্য কম

উপযুক্ত।^১ তিনি ছিলেন অলস, সহজেই নীতিভ্রষ্ট এবং তার কীর্তিমান পূর্বসূরীর জনপ্রিয়তা তার ছিল না। খারাক সিং এই বিরক্তিকর প্রশাসন ব্যবস্থা অন্য কারও হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, বিশেষতঃ তার প্রিয় চেত সিং বাজওয়াকে; যিনি তার স্ত্রী-সম্পর্কে পরিচিত। খারাক সিং-এর ছেলে নও নিহাল সিং অন্য মাটিতে তৈরি ছিল : উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উদ্যোগী এবং মনোরম চারিত্রিক দৃঢ়তার অধিকারী।

রনজিত সিং-এর দ্বিতীয় পুত্র শের সিংহও উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং আদরনীয় ছিলেন। তিনি দাবি করেন তিনি রনজিত সিং-এর প্রথম স্ত্রীর ঔরসজাত। খারাক সিং তর্ক করে তাকে ভুল প্রমাণিত করেন এবং দাবি করেন তিনিই খারাক সিং। শুধুমাত্র তার পিতার আইনসংগত পুত্র, অন্যান্যদের—শের সিং, তারা সিং, কাশ্মীরা সিং, পেশোয়ারা সিং, মুলতানা সিং, দালিপ সিংহ—পিতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

মন্ত্রিসভা এবং দরবারের গণ্যমান্যগণও রাজপুত্রদের মতো বিভক্ত হয়ে পড়েন। মূলতঃ রনজিত সিং-এর মৃত্যুর পর দুটি দলের উদ্ভব হয়। এর মাঝে প্রভাবশালী ছিল ডোগরাগণ, তিন ভাইয়ের সমন্বয়—গুলাব সিং, ধিয়ান সিং এবং সুচেত সিং। ধিয়ান সিংয়ের ছেলে হিরা সিং, যে-কিনা বিগত মহারাজের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। যদিও ভাইয়েরা তাদের উদ্দেশ্যে একমত ছিল না; একজন অথবা পরিবারের অপর সদস্যরা লাহোরে শাসন করত যখন গুলাব সিং জন্মকে প্রায় একটি স্বাধীন ডোগরা রাজত্ব হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করছিল।

ডোগরাদের বিপরীতে ছিল তিন পরিবার সমন্বিত উচ্চবংশীয় শিখ—মূলতঃ সন্ধ্যাওয়ালিয়া, আন্তারিওয়ালাস এবং মজিথিয়াস। তারপর, ডোগরা ছিল হিন্দু এবং উচ্চবংশীয় শিখ, ছিল খালসা, তাদের ভিন্নতা দেখা যায় সাম্প্রদায়িকতা—ডোগরা বনাম শিখ দেখে।

এদের মাঝে কিছু স্বার্থান্বেষী লোক ছিল যারা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দলে যোগ দেয়নি এবং বিশ্বস্ততা এবং সততার সাথে দরবারের সেবা করতে লাগল। তাদের মাঝে অসাধারণ ছিল ফকির ভাইয়েরা মূলতঃ সবচেয়ে বড় আজিজউদ্দিন, যিনি বৈদেশিক ব্যাপারে উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন এবং কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ, দীনানাথ ছিলেন প্রশাসনের আর্থিক ব্যাপারে জড়িত।

ক্ষমতার হুড়াহুড়িতে সৈন্যদের জনপ্রিয়তা চূড়ান্ত হয়েছিল : প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৈন্যদের সাথে জেতার জন্য বিশাল উপটোকনের প্রস্তাব এবং তাদের দেশাত্মবোধের চেতনা, বিশৃঙ্খলতার বীজ রোপিত হয়েছিল মহারাজ রনজিত সিং-এর নিজের হাতেই যখন তিনি সৈন্যদলকে আরও বিস্তৃত এবং আধুনিক করেছিলেন ১৮২২ সালে। তার সকল বিজয় তখনই সংঘটিত হয়েছিল। পাশাপাশি মিলিটারি প্রচারণা না লাভজনক হয়েছিল

১. 'জড়বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার পাশাপাশি সে একজন নিকৃষ্ট আফিমখোর ছিল তার পিতার চেয়ে', লিখেছেন—জে.এম. হনিবাজার, রাজচিকিৎসক, *থার্টি ফাইভ ইয়ারস ইন দ্য ইস্ট*, পৃষ্ঠা-১০১।

আর না যুদ্ধে লুণ্ঠিত দ্রব্য দিয়ে তার ব্যয়ভার বহন করা গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, সৈন্যরা তাদের ভাতা পায়নি কিছু জায়গায় দুই বছর ধরে তারা বিনাবেতনে ছিল। রনজিত সিং-এর মৃত্যুর পর যখন বেসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং প্রাদেশিক সরকার ধীরগতিতে চলছিল তখন সৈন্যরাই ব্যয় পরিশোধ করেছিল। সৈন্যরা জনসাধারণকে লুণ্ঠ করত এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য উচ্চমূল্যে নিলামে বিক্রি করত। তারা তাদের উপরোক্ত কর্মকর্তাদের অমান্য করতে শুরু করলো। (উচ্চপদের কর্মকর্তাদের নিজস্ব আয় ছিল এবং আর্থিক সুবিধা ছিল)। যেসব কর্মকর্তা এই ব্যবস্থাকে ঠিক করার চেষ্টা করেছিল তারা নির্যাতিত হয়েছিল এবং তাদের হত্যা করাও হয়েছিল। মানুষজন নির্বাচন করত 'প্যানসেস' অথবা বড়দের সেবাদানের ক্ষেত্রে সমঝোতার জন্য। তারা কারও অনুমতি ছাড়া পারিবারিক অনুষ্ঠানে অথবা ভ্রাতৃগণ একসাথে ফসল একত্রিত করার জন্য অর্থ দান করত। সৈন্যগণের এমন বিদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ডে দুর্ভাগ্য বয়ে আনল এবং বৈদেশিক কর্মকর্তারা চিন্তিত হয়ে পড়ল। অনেক দূরবার ছেড়ে চলে গেলেন, বিশেষত তারাই যারা তাদের অর্থকড়ি এবং গহনা ভারতে রেখেছিল এবং তারা এই তথ্যটি ব্রিটিশদের দিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনি।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নড়বড়ে অবস্থার সাথে সাথে প্রাদেশিক গভর্নররাও স্বাধীন শাসক হবার চিন্তা করতে থাকেন। গুলাব সিং ডোগরা তার রাজ্য দূরবার পর্যন্ত প্রসারিত করেন। মুসলিম সম্প্রদায় মূলত ইউসুফ জাইস হাজারি এবং বেলুচিস যা খেলুম এবং ইন্দুসের মাঝামাঝি অবস্থিত সেখান থেকে পিছু হটতে শুরু করে। এভাবে দূরবারের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ব্রিটিশরা ভিতরে ঢোকার জন্য পরিণত চিন্তাভাবনা করে। আফগানিস্তানের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে তারা সরাসরি পাঞ্জাবে ঢুকতে নিবারণিত করে নিজেদের। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি আফগানিস্তানের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, তারা তাদের পররাষ্ট্রনীতি বিস্তৃত করতে শুরু করে।

মহারাজ খারাক সিং এবং রাজপুত্র নও নিহাল সিং যখন মহারাজ রনজিত সিং-এর দেহ রাজমহলের শয়নকক্ষের মেঝেতে শব-দাহের জন্য অপেক্ষারত ছিল তখন তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সভাসদদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হলো।^২ মহারাজ খারাক সিং তাদের ভয় প্রশমিত করলেন এই বলে যে, তাদের 'জাগিরস' স্পর্শ করা হবে না। কিন্তু তার সাথে তার ভাই শের সিং-এর^৩ সম্পর্কও কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না।

২. প্রধান সভাসদেদরা রাজপ্রাসাদে একত্রিত হয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করে 'কুমার খারাক সিং বাহাদুর এবং কুমার নও নিহাল সিং বাহাদুর-এর রাজত্ব অধিকার করা নিয়ে কোনো গোপনীয়তা করা হবে না।' শবদাহের পরদিন রাজপ্রাসাদে আসলে তারা আবার উত্তরাধিকারী নিয়ে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, 'তাদেরকে আনুষ্ঠানিক বাণী দিয়ে সান্ত্বনা দেয়া হয় যে, মৃত মহারাজ তাদের জন্যই প্রার্থিত বস্তু রেখেছেন।' *পাঞ্জাব আখবার*, ২৭ এবং ২৮ জুন ১৮৩৯।

৩. শের সিং ব্রিটিশদের কাছে যান এবং তার প্রধান দাবি সিংহাসনের আর্জি জানান। তিনি লর্ড অকল্যান্ড দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হন। *গভর্নমেন্ট টু ক্লার্ক*, ১২ জুলাই ১৮৩৯। শের সিংকে তার মরণাপন্ন পিতার বিছানার পাশ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় কারণ তিনি ভেবেছিলেন খারাক সিং তাকে আইনত জব্দ করার এই সুযোগ নিবেন। (*পাঞ্জাব আখবার*, ২৬ জুন, ১৮৩৯)

শের সিং বৈষয়িক কাজের শেষদিনে লাহোরে এসেছিলেন এবং রাজপরিবারের মধ্যে যেন তখন সম্পর্কের সুর ফিরে এসেছিল।^৪ খারাক সিং তার পিতার আসনে নতুন মহারাজ হলেন পাঞ্জাবের এবং ধিয়ান সিংকে প্রধানমন্ত্রী করা হলো। দুরবারের ঐকমত বেশিদিন টেকেনি। নও নিহাল সিং পদত্যাগ করেন এবং লাহরে গিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।^৫ ধিয়ান সিং বিবেচনাহীন নও নিহাল সিং-কে ধ্বংস হওয়া থেকে বিরত রাখেন।^৬ এমনকি তিনি প্রধান সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে রাজপুত্রের বিশেষাধিকার মেনে নেন এবং প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালনের সম্মতি জানান।^৭ কিন্তু চেত সিং বাজওয়া মহারাজ খারাক সিংকে বোঝান যে, জবরদখলের বিশেষ অধিকারে সম্মত হওয়া ঠিক হবে না, মহারাজ তার ছেলেদের এবং ডোগরা প্রধানমন্ত্রীর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। এটা সর্বজনবিদিত যে, পাঞ্জাবের সংসদের চেত সিং বাজওয়া মহারাজের কাঁধের উপর বন্দুক রেখে গুলি চালাতো যাদেরকে সে পছন্দ করে না তাদের উপর।

কিছু সময়ের জন্য সিংহাসনের পেছনের শক্তি বাজওয়া ছিল। শক্তিমান হওয়ার পরে ডোগরাদের সাথে সে উদ্ধতপূর্ণ এবং কটু আচরণ করত। ধিয়ান সিং ও তার ছেলেকে রাজসভায় নিষিদ্ধ করা হলো। গুলাব সিংকে জম্মু ফেরত পাঠানো হলো। নও নিহাল সিং বিরক্তির সাথে রাজধানী ত্যাগ করেন এবং উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে আফগানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নেন।^৮

মন্ত্রীদের মধ্যে মতানৈক্য প্রকাশ্য ঘটনায় পরিণত হলো এবং অবিশ্বাস্য ঘটনা এই ঘটনার সুযোগ নিল। রাজপুত্র নও নিহাল সিং এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলেন।

যখন তিনি তার পিতার মৃত্যু সম্পর্কে অবগত হন তখন তিনি বাটীলাতে রাজ্য তৈরি করেন এবং দুরবারে বার্তা পাঠান যে, তিনি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশ নেবেন না যতক্ষণ না তাকে শ্রেষ্ঠার না করার নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে।

৪. আইবিদ, ১৫ এবং ১৬ জুলাই ১৮৩৯। শের সিং তার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। জর্জ ক্লার্ককে দৌরী সাব্যস্ত করে জানান, ‘অনেক তরবারি তার তরবারিকোষ হতে বের হয়ে আসার সময় হয়েছে।’ এস.সি. ২৪এ, ৬-১১-১৮৩৯।
৫. ‘নও নিহাল সিং তার সকল সর্দারদের মহারাজা খারাক সিং-এর সাফল্য এবং তার নিজের মোজারি/মন্ত্রীত্ব নিশ্চিত করার জন্য কাগজে সই করতে বলেন...তিনি সকল সর্দারদের নির্দেশ দেন তার পিতার তিলক অনুষ্ঠানের সম্মান করতে যতদিন না তিনি লাহোরে ফিরে আসেন, এবং বিগত মহারাজের ফেলে যাওয়া ধনসম্পত্তি, ঘোড়া যা তার, তা যেন দেখে শুনে রাখেন।’ আইবিদ, ১৯ জুলাই ১৮৩৯।
৬. ইবিদ, ২১ জুলাই ১৮৩৯।
৭. সীমান্তে রাজকুমার নও নিহালের উপস্থিতি তার দলের মধ্যে আনন্দ বইয়ে দিল। তার পৌছানোর পরে কর্নেল শাইখ বাসাওয়ানের নেতৃত্বে খাইবার রাস্তায় তাদের অবরোধ করা হল, আলি মসজিদ দখল হল এবং কাবুলে ব্রিটিশদের অধীনে যোগদান করলো। লর্ড অকল্যান্ড বুঝতে পারলেন যে, দুরবার তার নৈতিক বাধ্যতায় ট্রাইপারটিট ট্রিটির অধীনে (এস জি ১৮, ১১-৯-১৮৩৯), নও নিহাল সিং-এর ব্যবহারে খুব সন্তুষ্ট ছিলেন (এস জি ১১৬, ১৬-১০-১৮৩৯) এবং দুরবারের অন্যান্য অফিসারদের মূলতঃ কর্নেল শাইখ বাসাওয়ান, যার কাছে তার বীরত্বের সাক্ষ্যস্বরূপ তলোয়ার প্রেরণ করেন। পিসি ১১৭, ৯-১০-১৮৩৯

তিনি ১৮৩৯ সালের আগস্টে লাহোরে পৌছান এবং মহারাজকে জানান সকলের সম্মতিক্রমে বাজওয়াকে বরখাস্ত করা উচিত। মহারাজ এই পরামর্শটি শুধু গ্রাহ্যই করেনি বরঞ্চ বাজওয়াকে নতুন জাগিরের প্রধান মনোনীত করেন।^৮ রাজপুত্র এটা জনাব ক্লার্ককে জানান,^৯ যিনি লাহোরে ব্যবসা ও শোক প্রকাশের জন্য ছিলেন এবং আশ্বস্ত করেন ব্রিটিশরা সমস্যা করবে না, পুরোপুরি শাসকের মতো কাজ করে।^{১০} অক্টোবর ১৮৩৯-এ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বিশজন মানুষের একটি দল রাজকুমার নও নিহাল সিং-এর নেতৃত্বে এবং তিন ডোগরা ভাইয়েরা মহারাজের নিজস্ব বাসস্থানে তাদের নিয়ে যায়— দ্য খোয়াব গাঁ অথবা স্বপ্নপুরী— দুর্ভাগা চেত সিং বাজওয়াকে তার গুপ্ত জায়গা থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে আনে খারাক সিং-এর উপস্থিতিতে। ধীয়ান সিং ডোগরা তার নিজের হাতে বাজওয়াকে অস্ত্রে আঘাত করেন^{১১} এবং সেই সময় চিৎকার করে বলতে থাকেন, ‘এটা মহারাজা রনজিত সিং-এর স্মৃতিস্বরূপ নিয়ে যাও।’

মহারাজা খারাক সিং তার দুঃসাহসী ছেলেকে ধৈর্যের সাথে সামলেছিলেন। নও নিহাল সিং দুর্গের প্রাসাদে ছিলেন এবং নামকাওয়াস্তে পাঞ্জাবের মহারাজা হয়েছিলেন।^{১২} পিতার প্রতি তার আচরণ সন্তানোচিত না হয়ে অব্যবহার্য মতো ছিল।^{১৩} তিনি তার পিতার বিশেষাধিকারের আনুষ্ঠানিকতা করেন যখন তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যোগ দেন। তিনি মন্ত্রী, প্রাদেশিক সরকার এবং জেনারেলদের জানান যে তিনি নিজেই দক্ষতার সাথে পাঞ্জাব শাসন করবেন, তারা রনজিত সিং এবং উৎসাহহীন খারাক সিং-এর হস্তক্ষেপ না করার অনুরোধ করে পড়েছিল। রাজপুত্রের কঠোর আইন জারি হওয়াতে তারা অসহ্য বোধ করছিল। কিন্তু রাজপুত্র তার সভাসদদের উপর চাপিয়ে দিয়ে ব্রিটিশদের সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয়েছিল এবং আফগানিস্তানে ব্রিটিশদের দলকে পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার অনুমতি

৮. পাঞ্জাব আখবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯।

৯. জর্জ রাসেল ক্লার্ক, লুধিয়ানার একজন রাজনীতিবিদকে চেত সিং বাজওয়ার মৃতস্থান দেখতে বলা হয়। তিনি লিখেছেন, ‘এটা তাদের পরিকল্পনায় ছিল গুলি করে হত্যা বা তলোয়ার দ্বারা হত্যা; তারা আমার সাথে পরামর্শ করে এবং আমি জোরালো প্রতিবাদ এসবের বিরুদ্ধে জানাই মহারাজকে এবং হতভাগ্যদের ঘটনা জানাই... বাজওয়া থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে আহত করা দূরবারের জন্য অসম্মানজনক। এসসি ২৪-এ, ৬-১১-১৮৩৯।

১০. মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে কর্নেল গার্ডনারের কাছ থেকে জানা যায় যিনি ঘটনার সাক্ষী। মেমোরিস অব আলেকজান্ডার গার্ডনার, হিউ পিয়ার্স দ্বারা সম্পাদিত, পি.পি.বি ১২-২২।

চেত সিং-এর সম্পত্তি (৫০-৬০ লাখ রুপির মাঝে) হিসাব করা হলো বাজওয়ার প্রধান সমর্থনকারী, মিসর বেলি রাম এবং তার ভ্রাতৃত্বগণকে শ্রেফতার করা হল এবং তাদের প্রায় ৭০ লাখ রুপির সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এসসি ২৪বি, ৬-১১-১৮৩৯।

১১. এসসি ৫২, ১-৬-১৮৪০।

১২. পরবর্তীতে নও নিহাল সিং তার পিতার কাছ থেকে বাজওয়াকে খুনের জন্য পরিত্রাণের চেষ্টা করে। খারাক সিং-এর ক্ষমতা কমে যাওয়ার জন্য তার দিনদিন অসহ্যবোধ হতে থাকে, ভাবে, ‘আমি বোকা নই।’ তিনি লাহোর থেকে পালাবার চেষ্টা করেন কিন্তু রাজপুত্র এবং ধীয়ান সিং ডোগরা তাকে শ্রেফতার করে লাহোরে নিয়ে আসেন। এসসি ২৩২, ১৮, ৫-১৮৪০।

প্রদান করেছিলেন।^{১৩} কয়েক মাসের মধ্যেই পাঞ্জাব বুঝতে পারল রনজিত সিং-এর তেজস্বিতা আবার নতুন করে গুরু হলো তার পৌত্র নও নিহাল সিং-এর মাধ্যমে।

নও নিহাল সিং-এর বিপদ এসেছিল ডোগরাদের থেকে। ১৮৪০ সালের মে মাসে জেনারেল জোরাওয়ার সিং ডোগরা ইসকার্দু থেকে জানান যে, জনতার ভালোবাসা নেই তাদের শাসকের প্রতি, আহমেদ শাহ, তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবং আহমেদ শাহের পুত্র মোহাম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে ইসকার্দুকে শক্তিশালী করেন।^{১৪} নও নিহাল সিং যিনি পারিপার্শ্বিক বিজয় পেয়েছিলেন। তিনি তিব্বতে ডোগরাদের রাজত্ব চাননি, এবং তিনি আদেশ করেন আহমেদ শাহকে পুনর্বহাল করবেন যদি তিনি লাহোরে যান এই শর্তে। জোরাওয়ার সিং তার ঠিক উপরের কর্তা গুলাব সিংহ-এর শরণাপন্ন হলেন এবং দু'জনে মিলে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা ছাড়া কীভাবে রাজপুত্রের আদেশ অমান্য করা যায় তার পরিকল্পনা করেন।

রাজপুত্র উপলব্ধি করতে পারেন যে, ডোগরাগণ তার জন্যে অসুবিধাজনকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাদের সম্পদের বেশিরভাগ আসে লবণের খনি থেকে, যাতে তারা টাকা কামানোর খেলা খেলে। রাজপুত্র এই টাকা কামানোর খেলা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন যাতে জনসাধারণ সুলভমূল্যে লবণ পায়।^{১৫} তিনি এই রাস্তায় কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগে গুলাব সিং ডোগরা তার পার্শ্ববর্তী মন্দির রাজাকে প্ররোচিত করে দুরবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য। নও নিহাল সিং দু'জন কর্মকর্তাকে আদেশ দেন যারা ডোগরার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল, অজিত সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়া এবং ভেনচুরাকে মন্দিকে বাধ্য করার জন্য। এই আদেশ সুসম্পন্ন করা হয়েছিল এবং দুরবার দল মন্দি রাজাকে মন্দির হিসেবে অমৃতসরে আনা হয়েছিল। ভেনচুরা পাহাড়ে পুলিশ খাঁড়ি স্থাপন করেন। নও নিহাল সিং-এর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি সংকীর্ণমনা রাজাদের প্রচলিত স্বৈরাচারমূলক গুচ্ছ আদায় প্রথা বিলোপ করেন এবং শিশু ও নারীদের কেনাবেচা বন্ধ করেন— যা গরিব পাহাড়ী

১৩. ২০-১১-১৮৩৯-এর এসসি ৪০ ব্রিটিশ সরকার লাহোরের এসব চালাকি পছন্দ করেনি ১৮০৯ (অ্যাপেনডিক্স ৬, খণ্ড ১) এবং দুরবারের কাবুল যাওয়ার পথে পাঞ্জাবে স্থির করার জন্য জোর দেয়। নও নিহাল বুঝতে পারেন তার ব্রিটিশদের নিয়ে ভাবনায় ভুল ছিল। তিনি আমির দোস্ত মোহাম্মদের সাথে খোলামেলা আলোচনায় বসতে চান। তিনি আরও নির্দেশ দেন কাসুর সুরক্ষিত করার জন্য যাতে ব্রিটিশরা ঢুকতে না পারে ফিরোজপুর হতে; যা অনেক সুরক্ষিত ছিল। ব্রিটিশদের আপত্তি সত্ত্বেও গুরুখা জেনারেল মাতব্বর সিংকে লাহোরে অবস্থান করতে বলা হল।

দুরবারও কর্নেল ওয়েডের উপর ক্ষিপ্ত ছিল, যিনি নও নিহালকে লাহোরের স্থানীয় সরকার হিসেবে আপত্তি জানিয়েছিলেন। এই খবর স্যার জন কিনকে জানানো হয় যিনি কাবুল হতে ফেরত আসা ব্রিটিশ দলের দলনেতা ছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে, যখন কর্নেল লাহোর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মহারাজা খারাক সিং-এর সাথে তাকে দেখা করতে দেয়া হয়নি। গভর্নর জেনারেল বুঝতে পারেন যে দুরবার কর্নেল ওয়েড-এর উপর খুশি না এবং ১৮৪০ সালের এপ্রিলে ক্লার্ককে দায়িত্ব দেন।

১৪. পাঞ্জাব আখবার, ৮ মে, ১৮৪০।

১৫. ইবিদ, ২০ মে, ১৮৪০।

লোকদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার ছিল। ভেনচুরার প্রচারণার কারণে পাহাড়ীলোকেরা কিছু সময়ের জন্য বিরত ছিল। গ্রীষ্মের সময় ১৮৪০ সালে লাহোরের দুর্গের কামানগুলো তোপধ্বনিতে ব্যস্ত ছিল পাঞ্জাবিদের জয়ের সম্মান দিতে ডোগরী সমর্থনকারী পাহাড়ীদের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশদের সাথে সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল, আফগানদের তেমন ব্যাপার ছিল না। গ্রামের দিকটা শান্তিপূর্ণ ছিল। জনগণ ভাবতে শুরু করে অতীতের গৌরবময় দিন আবার ফিরে এলো। কিন্তু গ্রীষ্মের এই বিজয় যেন মৃত্যুর আগে নিভু আগুনের জ্বলে ওঠা।

উপরস্থান হতেই পচন ধরল এবং রাজনীতি সবজায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। মহারাজ খারাক সিং যিনি চরমভাবে অলসতায় ডুবে ছিলেন, বেশি করে পান করতে শুরু করেন এবং বেশি পরিমাণে আফিম নিতে থাকেন যতদিন না তিনি জড়বুদ্ধিতায় পরিণত হন। ৫ নভেম্বর ১৮৪০ সালের সকালে তিনি আমাশয় এবং ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হন। তার অস্ত্রোপেক্ষিক্রিয়ায় তার দুই স্ত্রী চিতায় 'সতী' হতে চান। তারা নও নিহাল সিং এবং ধিয়ান সিং ডোগরাকে মৃত মহারাজের বুকে হাত রাখতে বলেন এবং প্রতিজ্ঞা করতে বলেন যে, তারা আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততার সাথে রাজ্যের সেবা করবে।

ভাগ্য অন্য কিছু লিখে রেখেছিল। নও নিহাল সিং মহারাজের শরীর এবং তার সঙ্গীদের আগুনের কাছে সমর্পণ করলো। শোকাক্ত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ শেষ করলো এবং প্রাসাদে ফিরে যেতে উদ্যোগ নিল। তিনি যখন ফটক রাস্তার নিচ দিয়ে দুর্গে যাচ্ছিলেন তখন ধনুকাকৃতির খিলান খসে পড়ে এবং পুরু পাথর এবং লোহার তৈরি খণ্ড তার মাথায় ভেঙ্গে পড়ে। গুলাব সিং ডোগরার একজন ছেলে ঘটনাস্থলেই মারা যান। অনেকের সাথে ধিয়ান সিং ডোগরা এবং দেওয়ান দিনা নাথ আহত হন। নও নিহাল সিং-এর মাথার খুলি ভেঙে যায়।^{১৬}

১৬. অনেক ইংরেজ লেখক, কানিংহাম, গার্ডনার (যিনি চাক্ষুষ সাক্ষী বলে দাবি করেন), স্টিনবাক এবং কারমাইকেল স্মিথ তাদের মতামতে বলেন যে, খিলানের রাস্তা ধিয়ান সিং ডোগরা কর্তৃক আবিষ্কৃত। এটা শিখ ইতিহাসবিদ প্রেম সিং এবং ডঃ গন্দা সিং-এর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল যারা শিখদের পতনের কারণ হিসেবে ডোগরা-হিন্দুদের ষড়যন্ত্র আছে বলে তাদের দায়ী করেন। এই তত্ত্ব সমর্থন করার জন্য স্বল্প প্রমাণাদি ছিল, কারণ আলোচ্যমতে ধিয়ান সিং নিজেই ভুক্তভোগী এবং তিনি তার ভাতিজাকে হারান। গুজব সত্ত্বেও, গুলাব সিং কখনও উদাম সিং-এর মৃত্যুর কারণ হিসেবে তার ভাইকে দায়ী করেননি। হাগেরিয়ান ডাক্তার হনিবার্জার যিনি তখন লাহোরে ছিলেন এবং রাজপুত্র এবং মন্ত্রীর চিকিৎসা করেছিলেন, তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত যে খিলানের পতনটা আকস্মিক (দেখুন হনিবার্জার পিপি. ১০২-৫) তিনি মোহনলাল সুরির সমর্থন লাভ করেন উমদাত-উৎ-তাওয়ারিখ-এ IV, ৭০-১।

লাহোরের বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য :

'এই দিনে-(৫ নভেম্বর) আনুমানিক সকাল ৯টায় মহারাজা খারাক সিং মৃত্যুবরণ করেন। তার শবদেহে আগুন দেয়া হয় রানী ইসার কুউর, সর্দার মঙ্গল সিং-এর বোন এবং তিনজন দাসী কর্তৃক। এরপরে, যখন কুমার নও নিহাল সিং রাজপ্রাসাদের ফটকের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন একটি কাঠের খণ্ড হঠাৎ করেই তার মাথার উপর পড়ে এবং মিয়া উদাম সিং-এর উপরও। পরেরজন ততক্ষণেই মারা যান কিন্তু কুমার নও নিহাল সিং তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকলেন।' এসসি ১১৬, ৭-১২-১৮৪০।

ধিয়ান সিং ডোগরা অজ্ঞান অবস্থায় নও নিহাল সিংকে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন এবং তার ক্ষীণ সন্দেহ ছিল যে তার জীবন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, তিনি রটিয়ে দিলেন যে, রাজপুত্র সুস্থ হওয়ার পথে আছেন। যখন নও নিহাল সিং মারা গেলেন^{১৭} কয়েক ঘণ্টা পরে, প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিলেন যে তার মৃত্যুর খবর বিজয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখবেন। সভার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করার পর তিনি রাজপুত্র শের সিং-কে লাহোরে তৎক্ষণাৎ আসার আমন্ত্রণ জানান। শের সিং যে সবচেয়ে উপযুক্ত সিংহাসনে বসার জন্য এই নিয়ে কারও মধ্যে সন্দেহ ছিল না; তিনি সৈন্য, সভাসদদের কাছে জনপ্রিয় ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন; এবং ইংরেজ, যাদের মতামত দূরবারের বিষয়ে প্রয়োজনীয়, তারাও তার ব্যাপারে সমর্থন করলো।

ধিয়ান সিং ডোগরার পরিকল্পনা তার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা নষ্ট হয়ে গেল সভাসদে, যিনি খারাক সিং-এর বিধবাকে চান্দ কৌর^{১৮} সাহায্য করবেন বলে ঠিক করেন এবং এই কথা তাকে এবং তার সন্ত্যাওয়ালিয়া পুরুষ আত্মীয় স্বজনকে জানান এবং লাহোরে তক্ষুনি আসতে বলেন। ধিয়ান সিং ডোগরা চান্দ কৌরের কিছুটা সম্মতি আদায়ের চেষ্টার জন্য উন্মাদের মতো হয়ে যান তার ষড়যন্ত্রকারীরা কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলার আগে, তিনি অস্থায়ীভাবে তাকে সম্মানিত রানীর পদে শের সিং-এর সাথে আফসার কালান (প্রধান উপদেষ্টা) হিসেবে রাজি করাতে সম্মত হন।

তিনি একজন ব্রিটিশ সদস্যকে ডেকে তার সভাসদদের সম্মুখে জিজ্ঞেস করলেন যে তার সরকারকে ব্যবস্থার ব্যাপারে বলতে ‘পুরো খালসা’^{১৯} সর্বসম্মত এবং মতৈক্যে আছে।^{২০} এই সাক্ষাতের কয়েকঘণ্টা পরে রাজপুত্র শের সিং লাহোরে পৌঁছান। সবাইকে নও নিহাল সিং-এর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করা হলো এবং শের সিং-এর

ব্রিটিশ সদস্য, ক্লার্ক তার ৭ নভেম্বর ১৮৪০-এর প্রতিবেদনে লেখেন এবং একটি স্মারকলিপি দুই বছর পরে লেখেন, যাতে জেনারেল ভেনচুরাকে সমর্থন করা হয়েছে যে এটা দুর্ঘটনা ছিল।

এই বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ ছিল না। খারাক সিং দিনের শুরুতে মারা যান এবং শবদাহ এর কয়েকঘণ্টা পরেই করা হয় এমন জায়গায় যেখানে জনগণের কাছাকাছি। এটা অনেকের কাছেই অবশ্যসম্মত যে দিনের আলোয় এমন অদ্ভুত যন্ত্র তৈরি সক্ষম যে সাড়া পেলে খিলান পড়ে যায়।

এই ব্যাপারটা ড. জি.এল. চোপড়া সামলান এবং পেপারে শিরোনাম হল ‘কুমার নও নিহাল সিং-এর মৃত্যু’ প্রকাশিত হয় ইন্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল রেকর্ড কমিশন দ্বারা, খণ্ড ১৮, ১৯৪২, পিপি ২৯-৩৩, ড. চোপড়া ফটকের পতন যে দুর্ঘটনা তা তুলে ধরেন।

১৭. গার্ডনার, একজন অবিশ্বাস্য সাক্ষী, বলেন যে নও নিহাল সিংকে যখন প্রাসাদে আনা হয় তখন শুধুমাত্র কিছু পরিমাণ রক্ত তার কান থেকে বের হচ্ছিল, যখন কিছুক্ষণ পর কর্নেল তাকে আবার দেখলেন তখন কক্ষের মেঝেতে রক্ত ভর্তি ছিল। তিনি ধারণা করেন যে, ধিয়ান সিং-এর গোলাম কর্তৃক রাজপুত্রকে চূর্ণ করার জন্য বারবার আঘাত করা হয়েছিল, এর মধ্যে দু’জনের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড বেশি জ্ঞানার জন্য; আর বাকি দু’জন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গেল এবং একজনের কাছ থেকে আর কখনও কিছু শোনা গেল না। *মেমোরিজ অব আলেকজান্ডার গার্ডনার*, পৃষ্ঠা ২২৫।

১৮. চান্দ কৌর ছিল জাইমাল সিং-এর মেয়ে, কানহাইয়া সিলে। তিনি ১৮২১ সালে খারাক সিংকে বিয়ে করেছিলেন।

১৯. এসসি ৭৯, ২৩-১১-১৮৪০।

সাফল্য ঘোষিত হলো। বিকালে নও নিহাল সিং-এর দেহ সেই জায়গায় নেয়া হলো যেখানে তার পিতার ছাইসমূহ এখনও ধিকিধিকি করে জ্বলছে। দু'জন সঙ্গীকে তার সঙ্গে চিতায় চড়ানো হলো। একজন শের সিং-এর পাগড়ির চূড়ায় রাজকীয় নিশানা দিল; আরেকজন ধিয়ান সিং ডোগরার কপালে স্যাক্রনের প্রলেপ দিল এটা প্রমাণের জন্য যে তিনি একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাদের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে 'সাতিশ' রাজপুত্র এবং প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য শপথ গ্রহণ করিয়েছিল।

২. মহারানী চান্দ কৌর এবং মহারাজা শের সিং

চান্দ কৌরের তার স্বামী এবং পুত্রের মৃত্যুর শোক কাটিয়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। যে শোকের উৎপত্তি হয়েছে তাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেন এবং সিংহাসনের প্রতি দাবি জানালেন।^{২০} তিনি গুলাব সিং ডোগরাকে জম্মু থেকে পাঠালেন তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে, ধিয়ান সিং-এর প্রভাবে। ধিয়ান সিং সম্মতি দিলেন পরামর্শ দেন। তিনি শের সিংকে বিবাহ করতে পারেন অথবা সম্মতি দিলেন হওয়ার কারণে শের সিং-এর ছেলে প্রতাপ সিংকে পালক নিতে পারেন। চান্দ কৌর অবজ্ঞাভরে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি কিভাবে এমন একজনকে বিয়ে করবেন যাকে তিনি শের কোবা বলেন— রঞ্জককারীর জ্বরজ্ব ছেলে? তিনি প্রতাপ সিংকে পালক সম্মান নেয়ার প্রস্তাবকে ঠেকান এবং ধিয়ান সিং ডোগরার ছেলে হীরা সিংকে দণ্ডক নেয়ার ইচ্ছা করেন। তিনি এও ভাবেন সে নও নিহাল-এর একজন বিধবা গর্ভবতী। ধিয়ান সিং তার এই কারণের জন্য যথায়থ চেষ্টা করেন। তিনি তার পায়ে পাগড়ি রাখেন এবং তাকে মৃত স্বামীর সম্পত্তিপ্রাপ্ত রানী খেতাব দেন শের সিং-এর সাথে পদ ও কার্যকালের প্রধান হিসেবে। চান্দ কৌর এই প্রস্তাব অবজ্ঞা করলেন। দরবারের ঝড়ো পরিস্থিতিতে, ধিয়ান সিং অনিষ্টকারীদের কথায় কান না দেয়ার জন্য চান্দ কৌরকে সাবধান করেন। তিনি তাকে বলেন যে পাঞ্জাবের সরকার না তার উপর না শের সিং-এর উপর অথবা রাজকীয় পরিবারের কোনো দাবিদারের উপর নির্ভর করেন না। কারণ এটাই খালসার মূল সরকার।^{২১} দেশজুড়ে বিষাদ ছড়িয়ে পড়ল; গণকেরা খালসা সরকারের সর্বনাশ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেন ১৮৪০ সালে।^{২২}

২০. এসসি ১১৬, ৭-১২-১৮৪০।

২১. এসসি ১১৬, ৭-১২-১৮৪০। 'রাজা ধিয়ান সিং অক্লান্ত এবং কঠোর... তিনি এই দুর্ভোগের সময়ে অনিরাপদ খালসাকে উন্নত করেন।'

২২. এসসি ১১৭, ৭-১২-১৮৪০। এই ভিত্তিটা অনেকগুলো ভেজাল রকমের একটা ছিল সৌ সাধী-একশো পৌরাণিক কাহিনী- গুরু গোবিন্দ সিংকে দায়ী করা হল। এটা সম্ভাব্য ১৮৯৭-এ খালসা

কয়েকদিন পরে দু'জন সন্ধ্যাওয়ালিয়া সরদার, অজিত সিং এবং আস্তার সিং লাহোরে পৌছান এবং নিয়ন্ত্রণ নেন। ২ ডিসেম্বর ১৮৪০-এ চান্দ কৌরকে পাঞ্জাবের মহারানী বলে ঘোষিত করা হয় 'মালিকা মুকাদ্দাস'— শ্রদ্ধেয় সম্রাজ্ঞী। পরেরদিন শের সিং তার রাজ্য বাটালার উদ্দেশ্যে লাহোর ত্যাগ করেন। একমাস পরে ধিয়ান সিং ডোগরাও রাজধানী থেকে বের হতে বাধ্য হলেন। চান্দ কৌর এবং সন্ধ্যাওয়ালিয়ারা প্রশাসন ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব অর্জন করলেন।

চান্দ কৌরের বিরুদ্ধে হুকার গুটি ভালোভাবেই চালা হলো। পাঞ্জাবিরা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ তারা এমন একজন মহিলার দ্বারা শাসিত হচ্ছিল যিনি জেনানার পর্দার নির্জনতা থেকে বের হতে পারবেন না।^{২৩} এবং চান্দ কৌর কূটনৈতিক কৌশলের ব্যাপারে পুরোপুরি অপটু তা প্রমাণ করেছেন; তিনি ছিলেন নিষ্কল, অল্পেই রেগে যেতেন এবং এমন ভাষা ব্যবহার করতেন যা মহারানীর চেয়ে বাজারের মহিলার মতো হতো।

চান্দ কৌর যেহেতু জনতার মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছিল তাই 'মাই'— মায়ের প্রধান সমস্যা ছিল সেনাবাহিনীর প্রতি বিশ্বস্ততা। শের সিং দল এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তার কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব দেন। অনেক সেনা পালিয়ে গিয়ে রাজপুত্রের দলে যোগ দিতে লাগল। বেশিরভাগ ভগ্নবাহিনী তার কাছে গিয়েছিল এবং মাইয়ের লোকেরা অস্ত্র বহনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। পক্ষকালের মাঝেই তিনি তার ক্ষমতা বুঝতে পারেন, মাই দুইটা সৈন্যদলকে দুর্গের ভেতরে মোতায়েন করতে বাধ্য হলেন তার লোকদের রক্ষা করার জন্য। এই অনিশ্চয়তা গ্রামাঞ্চলের অসহায় লোকদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি করেছিল। ইংরেজরা সুতলেজের দিকে তাদের দলের যাত্রা শুরু করেছিল।^{২৪}

সরকারের জন্য বড় দুর্ভাগ্য বয়ে আনলো (খ্রিস্টপূর্ববর্তী ১৮৪০) এবং এটার পুনর্বহাল পরের বছরে হরি সিং নালওয়ার পুনর্জন্ম আত্মা দ্বারা করা হল।

২৩. উনার বেদী বিক্রম সিং, যিনি এই ব্যাপারে লাহোরে তদন্ত করতে এসেছিলেন, তার বক্তব্য বলেছিলেন, 'তিনি টিকা (স্যাফ্রনের চিহ্ন) দেয়ার জন্য এসেছিলেন কুমার শের সিংকে এবং একজন মহিলাকে নয়, একজন মহিলার জন্য নয় অথবা লাহোরের রাজত্বকালেও না।' মাই বেদীর কাছে খবর পাঠান যে, তিনি নিজেই নিজের খেয়াল আরও ভালো রাখতে পারবেন। এসসি ১০৭, ২১-১২-১৮৪০।

৭ ডিসেম্বর পাঞ্জাব ইনটেলিজেন্সের মতে : 'মাই পরমার্থে বসে আরও পাঁচ অথবা ছয়জন অন্যান্য মহিলার সাথে পর্দার পিছনে বসে দরবার পরিচালনা করতেন, সভায় প্রধানেরা...পর্দার বাইরে বসে তাদের মতামত দিতেন; এসসি ১০৪, ২৮-১২-১৮৪০।

২৪. ব্রিটিশদের তাদের মৈত্রীচুক্তির ব্যাপারে ব্যবহার ছিল, তারা শুধু তাদেরকে যুদ্ধে জয়লাভ করতেই সাহায্য করেনি উপরন্তু তাদের এলাকা ব্রিটিশ আর্মিদের প্রধান সাধারণ সড়ক ব্যবহারের অনুমতি দিল; স্যার উইলিয়াম ম্যাকনটেন এবং কলকাতায় গভর্নর জেনারেলের মধ্যবর্তী অবস্থাকে মূল্যায়ন করে এমন করা হল। ম্যাকনটেন প্রস্তাব করেন যে, ১৮৩৯ সালের যা একপক্ষীয়ভাবে ব্রিটিশ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল তা বাতিল হবে এবং দুররানী রাজত্বের মধ্যে পেশোয়ারকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। (ম্যাকনটেন থেকে গভর্নর জেনারেল, ২৬ নভেম্বর ১৮৪০; গভর্নর জেনারেল থেকে ম্যাকনটেন,

শের সিং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বিধবার দুর্বল হাত থেকে সব শক্তি কেড়ে নিবেন এবং পাঞ্জাবকে বিভক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবেন। তিনি জনাব ক্লার্কের কাছে লুথিয়ানায় একজন বার্তাবাহককে পাঠালেন সিংহাসনের নিলামের ব্যাপারে ইংরেজদের প্রতিক্রিয়া কী জানার জন্য। ব্রিটিশরা আফগানিস্তানে পঁকে আটকা পড়েছিল এবং তাদের ভীষণ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। ইংরেজপ্রেমী শের সিং-এর মাঝে তারা মৈত্রীপূর্ণ আভাস দেখতে পেয়েছিল এবং তাকে সাহায্য করার নিশ্চয়তা দিয়েছিল।^{২৫}

শের সিং সেনাপ্রধানের কাছে লাহোরে পৌঁছালেন যারা পলাতক বাহিনীর ঝাঁক এবং যারা রঙ বদলে তার সাথে যোগ দিয়েছে; বেশিরভাগ দরবারের ইউরোপীয়ান কর্মকর্তা তার সাথে ছিল।

মাই আশা হারাননি। তিনি গুলাব সিং ডোগরাকে কমান্ডার-ইন-চিফ পদে দায়িত্ব দেন এবং তাকে শহর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেন। তিনি সৈন্যদের বেতনের চারমাসের বকেয়া টাকা পরিশোধ করেন এবং সোনার বালা, গলাবন্ধ, গহনা এবং শাল কর্মকর্তাদের মাঝে অপব্যয় করে দিয়েছিলেন। তিনি শহরের ব্যাঙ্করদের শের সিংকে টাকা ধার না দেয়ার আদেশ দিলেন। এইসব পদক্ষেপের উলটো ফল হলো। সৈন্যদলগুলো তার অস্থিরতা বুঝতে পারল এবং অনুভব করেছিল তিনি আবার হেরে যাওয়া ঘটনায় ঘুষ দেয়ার মাধ্যমে জেতার চেষ্টা করছেন। শের সিং-এর টাকা কম ছিল। কিন্তু তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে, তিনি জিততে যাচ্ছেন এবং সৈন্যদের বেতন প্রতিমাসে স্থায়ীভাবে বাড়াবে, সাথে সাথে যারা নতুনভাবে যোগদান করেছিল তাদেরও পুরস্কারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তার ওয়াদা পালন করলেন। যে দলটি শহরের সীমানার বাইরে ছিল তা ছড়িয়ে পড়ল। শের সিং-এর কাছে ২৬,০০০ পদাতিক বাহিনী, ৮০০০ ঘোড়া, ৪৫টি বন্দুক ছিল। মাইয়ের কাছে শুধুমাত্র ৫০০০ মানুষ, কিছু বন্দুক এবং স্বল্পপরিমাণে গোলাবারুদ ছিল।

শের সিং শহরের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি দেরিতে ঘোষণা দিলেন যে, শহরের^{২৬} অধিবাসীদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং যারা তার কাছে পড়বে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। প্রধান সভাসদেরা আত্মসমর্পণ করেন এবং মাই ও গুলাব সিং ডোগরাকে তাদের অস্ত্র ফেলে দেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

২৮ ডিসেম্বর ১৮৪০)। তিনি আরও পরামর্শ দেন পাঞ্জাবকে আবারও দুইভাগে বিভক্ত করার জন্য। পাহাড়ী এলাকা ডোগরাদের এবং সমতলভূমি সন্ধ্যাওয়ালিয়াদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

২৫. এসসি ৬৬, ১-২-১৮৪১ এবং এসসি ৯৩, ২২-৮-১৮৪১।

২৬. মহারাজা শের সিং বাহাদুরের নির্দেশক্রমে গুরু রাম দাসের (চতুর্থ শিখ গুরু যিনি লাহোরে জন্মেছিলেন) রাজ্যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল যে, কেউ যদি জনসাধারণের সম্পত্তিতে হাত দেয় তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।' এসসি ৬০, ১-২-১৮৪১। সৈন্যদল অনেক বাজার লুট করার পর এবং অফিসারদের মদ্যভাণ্ডারে ডুবে থাকার কারণে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

মাই, যিনি গুলাব সিং ডোগরা কর্তৃক সমর্থিত ছিলেন, আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং যুদ্ধে যোগ দেন। দুইদিন ধরে শের সিং-এর গোলন্দাজবাহিনী দুর্গের কাঠামোতে গোলা বর্ষণ করে। ১৭ জানুয়ারি ১৮৪১-এর সন্ধ্যায় ধিয়ান সিং ডোগরা পৌছান এবং যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করেন। মাইকে একজন গুন্দের জাগিরকে গ্রহণ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছিল এবং সিংহাসনের প্রতি তার দাবি বর্জন করা হয়েছিল।^{২৭} শের সিং ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে সম্মান দেখালেন এবং যেসমস্ত মানুষ তার পক্ষে ছিলেন তাদের ক্ষমা করলেন। তার দেড় মাসের রাজত্বকাল শেষ হয়ে গেল। মধ্যরাতে গুলাব সিং এবং তার ডোগরাসমূহ দুর্গ থেকে পালিয়েছিলেন— লাহোরে রক্ষিত দরবারের স্বর্ণ ও অন্যান্য অলংকার তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন।^{২৮} অজিত সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়া লুধিয়ানার ব্রিটিশ সদস্যের কাছে সাহায্য চাইতে গিয়েছিলেন। ক্লার্কের অসহযোগিতার কারণে তিনি কলকাতার গভর্নর জেনারেলের সাথে দেখা করতে যান। আন্তার সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়া তাকে ব্রিটিশ রাজত্ব পর্যন্ত অনুসরণ করেন।

শের সিং দুর্গ দখল করেন এবং পাঞ্জাবের মহারাজা খেতাব পান।^{২৯} ধিয়ান সিং ডোগরাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। শের সিং-এর খারাপ শাসনকাল শুরু হলো। তিনি সৈন্যদলের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষাও করেনি, যারা বাজার লুট চালিয়ে যাচ্ছিল। সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, সৈন্যদলের হিসাব রক্ষক ও কর্মকর্তাদের খুন করেছিল যাদের তারা তাদের বেতন আত্মসাৎকারী অথবা ইংরেজদের সাথে চুক্তি করেছিল বলে সন্দেহ করেছিল। শের সিং এবং ধিয়ান সিং প্রতিটা কোম্পানি, সৈন্যদল এবং বন্দুকধারীদের থেকে দু'জন করে প্রাসাদে ডেকেছিল এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেছিল। তারা দুর্নীতিবাজ হিসাবরক্ষকদের বরখাস্তের ব্যাপারে একমত হলো কিন্তু প্যানসেস-এর চাহিদা অনুযায়ী কর্মকর্তাদের যাদের তারা পছন্দ করত না তাদের বদলির ব্যাপারে অমত জানালো; এই আলোচনা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। দুর্বল বাসনার শের সিং তার হাত শূন্যে ছুড়ে কাঁচাপাকা সামহালো (শাব্দিক অর্থে, 'কাঁচা বা পাকা, এটা তোমাদের'), চিহ্ন দেখান, যা প্যানসেসদের বুঝতে সাহায্য করে যে তারা নিজেদের মধ্যেই চিন্তা ভাবনা করে ব্যাপারটা ঠিক করার ক্ষেত্রে স্বাধীন।^{৩০}

২৭. এসসি ৯৭, ৮-২-১৮৪১। এই ব্যাপারে লতিফের মতামত কিছুটা ভিন্ন ছিল। *হিস্ট্রি অফ দ্য পাঞ্জাব*, পৃ-৫০৬।

২৮. এসসি ৮৮, ৮-২-১৮৪১। গুলাব সিং ডোগরা তন্নাশি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তার লোকজন দুর্গে সমর্পণ করার অবস্থায় ছিল। মাই তাকে কুদি কুড়িওয়ালি রাজ্যের দূত হিসেবে নিয়োগের মাধ্যমে তার আস্থা প্রকাশ করেছিলেন, যা গুলাব সিং-এর অধীনস্থ এলাকা।

২৯. সৌজন্যমূলক তিলক পরানোর অনুষ্ঠান ২৭ জানুয়ারি ১৮৪১-এ পালিত হয়েছিল, উনার বিক্রম সিং বেদী কর্তৃক। প্রতাপ সিংকে প্রতীত উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এসসি. ৯৫, ৮-২-১৮৪১।

৩০. *কারমাইকেল স্মিথ, হিস্টোরি অফ দ্য রেগনিং ফ্যামিলি অব লাহোর*, পৃ-৮৭। দু'জন ইউরোপীয়ান, কর্নেল ফকস এবং মেজর ফর্ড, গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। কোর্ট তার জীবন বাঁচাতে সক্ষম

মহারাজা শের সিং তার অসংখ্য গুণগ্রাহীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমর্থ ছিলেন। সৈন্যদের সাথে বিদ্রোহের সময়, তিনি সবচেয়ে ভালো যা করেছেন তা হলো তাদের পক্ষ কারণবশত সমর্থন করা এবং তার যা টাকা ছিল তা দিয়ে দেয়া। তার রাজত্বকালের প্রথম ছয়মাসের মধ্যে তিনি প্রায় ৯৫ লাখ রুপি তার সৈন্যদের দেন। এমনকি এটা তাদেরও শান্ত করতে পারল না যারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার হুমকি দিয়েছিল। তাদেরকে দৃঢ়তার সাথে মোকাবেলা করার পরিবর্তে শের সিং গোলক হতে বের হওয়ার রাস্তা খুঁজেছিল বারবণিতা—এবং মাই-এর সান্নিধ্যে এসে।^{৩১} পাঞ্জাব যা চেয়েছিল তা হলো একনায়কতন্ত্র। যা পেয়েছিল তা হলো সুদর্শন-চমৎকার একজনকে যে ফরাসি মদ এবং সুগন্ধি সম্পর্কে রাষ্ট্রপরিচালনা ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি জানত।

শের সিং-এর সাফল্যের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের আচরণ বিপরীতমুখী ছিল। গভর্নর জেনারেল তাকে পাঞ্জাবের শাসক হিসেবে চিহ্নিত করেন কিন্তু একই সময়ে অজিত সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়াকে আশ্রয় দেন^{৩২} এবং পাঞ্জাবে প্রবেশের জন্য যে দল তৈরি হয়েছে তার ব্যাপারে কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

প্রাসাদের শোচনীয় পরিণতি জানার পরে যাদের দরবারের প্রতি আস্থা ছিল তাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশ আরও পরাজয় যোগ করলো শত্রুভৌম রাষ্ট্রের জন্য সন্ধিচুক্তি বাতিল করে। সবচেয়ে স্পষ্টত গর্হিত কাজ ছিল মেজর ব্রডফুটের অতিরিক্ত সৌহার্দতা। পাঞ্জাব থেকে আফগানিস্তান অতিক্রম করে শাহ জামান এবং শাহ সুজার হারেমে তাকে যেতে অনুমতি দেয়া হয়েছিল এবং তার সঙ্গী হিসেবে মুসলমানের একটি দলকে প্রেরণ করা হয়। মেজরের আচরণ শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছিল এবং একের অধিক অনুষ্ঠানে তার মানুষদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে যেসব পাঞ্জাবি

হয়েছিলেন; ডেনচুরার বাড়িকে পাহারা দেয়া হয়; অভিভাবিল পেশওয়ারে ব্রিটিশ সদস্যের সাহায্য চান যাতে তিনি ইউরোপে পালাতে পারেন; কাশ্মীরের গভর্নর কর্নেল মিহান সিং, অমৃতসরের রক্ষীবাহিনীর কমান্ডার শোভা সিংকে হত্যা করা হয়; জমাদার খুশাল সিং, তার ভাতিজা তেজ সিং এবং লেহনা সিং মাজিথিয়া তাদের ঘরের প্রতিরক্ষা করতে বাধ্য হন।

৩১. একজন বৃদ্ধ প্রধান ১৮৪১ সালে জানুয়ারির ২৪ তারিখে দরবারের সবার সমানে পরামর্শ দেন যে শের সিং তার বিধবা ভাবীকে বিবাহের মাধ্যমে রক্ষা করতে পারেন (কাদুর আন্দাজ) এসসি ৯৭, ৮-৩-১৮৪১। চান্দ কৌরের হৃদয়বিদারক সমাপ্তি হয়েছিল; তিনি তার দাসী দ্বারা ১১ জুন, ১৮৪২ সালের রাতে নিহত হয়েছিলেন। সেইসব বিশ্বাসঘাতকদের গ্রেফতার করা হয়েছিল কিন্তু তাদের অপরাধের উদ্দেশ্য ফাঁস হওয়ার আগেই তাদের জিহ্বা কেটে দেয়া হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় থিয়ান সিং ডোগরার আদেশের মাধ্যমে। এজন্য ইতিহাসবিদরা যেমন প্রেম সিং এই কৃতকর্মের জন্য ডোগরাদের দায়ী করেন (মহারাজা শের সিংহ, পিপি. ১৬৩-৭০)। এই পাপকর্মের জন্য কানিংহাম শের সিংকে দায়ী করেন (পৃ-২৬১)। ক্লার্ক তার চিঠিতে তার সরকারকে ১৫ জুন ১৮৪২ সালে এই হত্যা সম্পর্কে জানান।

৩২. এসসি ৮৯, ৮-২-১৮৪১।

তার উৎসের কাছে আসবে তাদের উপর প্রকাশ্যে গুলি চালাতে। দরবারের অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হতে লাগল। ব্রডফুট ইন্ডাস অতিক্রম করলে তিনি পাঠানদলের সদস্যদের ডেকে পাঠান দরবারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য।^{৩৩}

ব্রডফুটের পর্ব বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের প্রতি সভাসদদের মহৎব্যক্তি এবং অফিসারদের বিশ্বাসঘাতকতা, তুলে ধরে, পাঞ্জাব আর্মি দেশের প্রতি জোরালো আওয়াজ তোলার জন্য জোর প্রদান করে। একমাত্র সংস্থা যেটার সাথে তারা পরিচিত ছিল তা পঞ্চগয়েত— বয়স্কদের সভা— তারা যে গ্রাম থেকে আসে সেই গ্রামের ঘটনা নিয়ে আলোচনা চলে। এই সংস্থার ব্যাপারে আর্মিরা জানত, প্রতিটা রেজিমেন্ট তাদের নিজস্ব পঞ্চ নির্বাচন শুরু করে, যাদের দায়িত্ব ছিল কমান্ডিং অফিসারের নির্দেশ সুচিন্তা করা এবং এ ব্যাপারে জনগণকে তাদের মতামত জানানো। সৈন্যবাহিনীতে পঞ্চগয়েত প্রশাসন ব্যবস্থায় যথোপযুক্ত উন্নতি করতে পারেনি, এবং বেশিরভাগ নির্ভর করত নির্বাচিত লোকদের সামর্থ্যের উপর। তাদের প্রভাব বজায় রাখার জন্য। পঞ্চদের প্রায়ই বিশেষ সুবিধা এবং বেতন বাড়ানোর প্রতি জোর দেয়া হতো যা ছিল অন্যায়, কিছু উর্ধ্বতন পঞ্চরা এমনই ক্ষমতাবান হয়েছিল যে তারা অফিসারদের চাকরি নিলামে উঠিয়েছিল; তারা ডেপুটিদের নিয়োগ দেয় তাদের সিদ্ধান্ত সৈন্যবাহিনীর কাছে

৩৩. 'এটা আসলে বোঝা যায়নি যে ব্রডফুটের আকাজক্ষা আদৌ অপরিমিত ছিল কিনা...এইসব স্রেফ শিখদের অবিশ্বাসের মূলত: বিরক্ত এবং উদ্বেগের সৃষ্টির জন্য ছিল, এবং শের সিংকে সুযোগ করে দিল তার বিদ্রোহী সৈন্যদের দিকে আঙুল তোলার ক্ষেত্রে যে পাঞ্জাব ঘেরাও করা হয়েছিল ইংরেজ আর্মিদের দ্বারা যারা প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক ছিল তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য।' ক্যাপ্ট. জে.ডি. কানিংহাম, *হিন্দি অফ দ্য শিখস* (১ম প্রকাশ, পৃ-২৪৫)।

নিম্নোক্ত লাইনগুলো এক ব্যক্তিগত চিঠিতে মিসেস হেনরি লরেন্স কর্তৃক ২৬ মে, ১৮৪১-এ লিখিত হয়েছিল (যখন পাঞ্জাব আর্মিরা ব্রিটিশদের সাহায্য করেছিল), এটা ব্রিটিশদের মানসিক অবস্থা নির্দেশ করে 'যুদ্ধ, যুদ্ধের গুজব প্রতি পাশে ছিল এবং এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে পরবর্তী শীতকাল নির্ধারণ করবে পাঞ্জাব দখল করতে কতদিন লাগবে : হেনরিকে তার বেসামরিক এবং সামরিক সামর্থ্য অনুযায়ী সম্ভবত যা চলছে তাতে অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছিল।' (গুরুত্ব প্রদান করেছিল)।

ওয়েলিংটনের ভূপতিক ১৫ অক্টোবর ১৮৪১ সালে লর্ড এলেনবরো যে পত্র লিখেছিলেন তাও সমান তথ্য ফাঁস করে। 'আমি লর্ড ফিংডারয়কে অনুরোধ করেছিলাম তাকে (লেফটেন্যান্ট ডুরান্ড) সকল তথ্যসহকারে এক্ষুনি নিয়োগ দিতে যাতে পাঞ্জাবের প্রতি সম্মান থাকে এবং তোমার বিবেচনায় দেশের প্রতি স্মারক তৈরি করবে। আমি তোমার মতামত নিয়ে খুবই চিন্তিত যাতে মূল বিষয়গুলোকে দেশের বিরুদ্ধে প্রচারণার জন্য চলছে।' তিনি আরেকটা চিঠির সাথে ডুরান্ডের মেমো পেলেন ২৬ অক্টোবরের; যাতে লেখা, 'বর্তমানে ১২,০০০ মানুষ ফিরোজপুরে একত্রিত করা হয়েছে শিকদের পর্যবেক্ষণের জন্য এবং দরকার মতো ব্যবস্থা নেয়ার জন্য।' 'আমি যা চাচ্ছিলাম তা হল তোমার মতামত যা কিনা অসম্পূর্ণ ভৌগোলিক তথ্যের উপর স্থাপিত তা পাঞ্জাবে আক্রমণের ভালো পছন্দ হিসেবে তোমাকে দেয়া হবে।' গান্ধা সিং, *প্রাইভেট করেসপন্ডেন্স রিলেটিং টু দ্য অ্যাংলো-শিখ ওয়ারস*, পৃ-৪৭।

ইন্ডিয়ান প্রকাশিত ইংলিশ পেপারে প্রায়ই পরোক্ষভাবে পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের নকশা উল্লেখ করা হত। ম্যাডকের কাছে মহারাজা শের সিং তাদের নামে প্রতিবাদ জানান, যিনি দরবারে ব্রিটিশ মিশন পরিচালনায় ছিলেন। এসসি ৫, ১৫-১-১৮৪৩।

পৌছে দেয়ার জন্য এবং তাদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য। এর পরিণতি ছিল ধ্বংসাত্মক। সৈন্যবাহিনী নিয়মশৃঙ্খলা হারিয়ে ফেললো তাদের অফিসারের নির্দেশমতো যার কিনা সামরিক বিষয়ে অনেক জ্ঞান ছিল।

যখন লাহোরের দরবারে বিদ্রোহীদের শাস্ত করার চেষ্টা চলছিল এবং আফগানিস্তানে ব্রিটিশদের দুর্দশায় সাহায্য করার কথা ভাবছিল, তখন ডোগরাবন্দ তিব্বতের জয়ের জন্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে চলেছে।

জম্মু এবং কেলাম-এর উপত্যকার সীমান্ত হিমালয় ছাড়িয়ে বিস্তৃত করার জন্য অর্থনৈতিক কারণ ছিল (যা গুলাব সিং ডোগরা এর সরকারকে হত্যা করে দখল করেছিল) যখন থেকে ব্রিটিশরা তাদের সীমান্ত বর্ধিত করতে শুরু করে সুতলেজ পর্যন্ত, তিব্বতীয় ক্যারাভানগুলো বুশাইর পরিবর্তে কাশ্মীর হয়ে যেতে লাগলো। কাশ্মীরী শাল প্রস্তুতকারকরা, যারা বেশিরভাগ কাঁচামাল আনতো লাদাখ ও লাহসা হতে তারা সবচেয়ে বেশি ভুগেছিল, কাশ্মীর উলের কারখানা এই বিপদে প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি রোহতাক জেলা যা গারোদের প্রদেশ, এর সুনাম ছিল সোনা, বোরাক্স, সালফার এবং খনিজ লবণ সম্পদশালী হওয়ার জন্য এবং একটি সমৃদ্ধশালী বাজার ছিল যা মূল এশিয়ার অনেক জায়গায় পৌছে দিতো। এখানে রাজনৈতিক কারণও ছিল বিস্তৃতির জন্য। উত্তরে এবং পরে পূর্বদিকে আঘাতের পরে, পাঞ্জাব একটি সাধারণ সীমান্ত করতে সক্ষম হয় ভারত, নেপালের অন্যান্য স্বাধীন রাজ্যের সাথে এবং সম্ভাব্য ব্রিটিশ বেটন থেকে এভাবে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে।

জোরাওয়ার সিং ডোগরা ১৮৩৪ সালে লাদাখ দখল করেন এবং অধিকতর দূরত্বে ছড়িয়ে পড়েন ইস্কার্দু দখলের মাধ্যমে, ইন্দাসের দুই প্রান্তের মাঝামাঝি। মন্দী আর কুলুর চাকরির মাধ্যমে এইসব পর্বতময় এলাকায় পৌছানোর আরেকটা রাস্তা উন্মুক্ত হলো। ডোগরা জেনারেল এসব এলাকা আরও দূরে ছড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন; এক হলো উত্তরদিকে এবং আরেকটা হলো পূর্বদিকে নেপালের সীমান্ত বরাবর। এইসব আত্মসী বিষয়ের জন্য বাহানা খোঁজা কঠিন কিছু ছিল না। এপ্রিল ১৮৪১-এ জোরাওয়ার সিং গারোদের পাঞ্জাবের সাথে রাখার দাবি জানান এই ভিত্তিতে যে, গারো ইস্কার্দুর প্রতি অধীন এবং ইস্কার্দু তখনকার পাঞ্জাবের একটি প্রদেশ ছিল, পরিবর্তিত ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি আরও ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, পিকিং-এর চেয়ে লাহোরের প্রতি লাহাসা শ্রদ্ধা পোষণ করবে। জোরাওয়া সিং গারোর দিকে অগ্রসর হলেন যখন আরেক সারি সৈন্য কুমাওন পাহাড় বরাবর পূর্বদিকে অগ্রসর হলো এবং লাহাসার সাথে ব্রিটিশদের যোগাযোগ ছিন্ন করলো। ১৮৪১ সালের জুনে ডোগরারা গারো দখল করে। জোরাওয়ার সিং এটাকে রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এই ব্যাপারে বুশাইরের রাজাকে তিনি অবগত করেন, যিনি ব্রিটিশ কর্তৃক রক্ষিত ছিলেন। গারো থেকে ডোগরারা টাকলাকোটের দিকে সম্মুখে অগ্রসর হয়। যে তিব্বতীয় ফৌজ তাদের বিরোধিতা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল তা নিশ্চিহ্ন করা হয়, এবং কিছুদিন পরে টাকলাকোটে দরবারের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ডোগরাগণ তিব্বতের হৃদয়ের

মর্মবস্ত্র ভেদ করতে পেরেছিল। এরপরে তারা নতুন জয়ের মাধ্যমে দূত করতে সমর্থ হয়েছিল, পাহাড়ে প্রচারণা কাল শেষ হয়েছিল। তাদের এই কৃতিত্ব ব্রিটিশদের সতর্ক করে দিয়েছিল,^{৩৪} এবং তাদের দূত দাবি করে যে দরবার তাদের নতুন জয় হতে অব্যাহতি দিয়েছে।^{৩৫} যখন লুধিয়ানা এবং লাহোরের মধ্যে মৌখিক যুদ্ধালোচনা চলছিল, তখন চীনারা তাদের সৈন্য সমাবেশ করছিল। প্রথম তুষারপাতের সাথে সাথে তারা ডোগরাদের বাড়ন্ত খুঁটিকে বেঁটন করে, তাদের সরবরাহকারী তার কেটে দেয় এবং ধৈর্য্য সহকারে বাকি কার্যের উপকরণের জন্য অপেক্ষা করে।

ভয়ানক অভাবের কারণে ডোগরাদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। তাদেরকে নির্বাসন দেয়া হয় বিশাল সমুদ্র প্রবাহ এবং বরফের মধ্যে ১২,০০০ ফিট উচ্চতায়। তারা খাদ্য ও জ্বালানির জন্য দৌড়াদৌড়ি করেছিল এবং শীতের আক্রমণে সৈন্যরা মরতে শুরু করেছিল। ডোরাওয়ার সিং প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন, কিন্তু চীনারা ফাঁদে পড়া পাখিকে তাদের মুঠো হতে বেরিয়ে দেয়াতে অনিচ্ছুক ছিল, তুমি যখন লাদাখকে গ্রহণ করার করেছিলে আমরা তখন চূপ ছিলাম। তুমি আরও দূত হয়ে চলেছ এবং গার্টক এবং টাকলাকোটের ভার নিয়েছ। যদি শান্তি চাও, লাদাখকে ছেড়ে দাও এবং নিজের রাজ্যে ফিরে যাও, ছিল চীনাদের জবাব।^{৩৬}

ডোগরাদের যুদ্ধ হতে বাঁচার রাস্তা খুঁজতে বাধ্য করা হলো। ক্ষুধা ও শীত তাদের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে ফেলেছিল, তাদের এমন শত্রুর মুখোমুখি হতে হলো যারা শুধু সংখ্যায় বেশি ছিল না—একজনের জন্য দশজন করে উপরন্তু তারা শীতকালে যুদ্ধের জন্য পূর্বপ্রস্তুত ছিল। ১২ ডিসেম্বর ১৮৪১-এ দুঃসাহসিক জোরাওয়ার সিং-এর পতন ঘটলো। দলের বাকিরা অস্ত্রহারা হয়ে পড়লো এবং তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হলো। টাকলাকোট একা পড়ে গিয়েছিল। বসন্তকাল আসার পূর্বে চীনারা তাদের তিব্বতীয় পদ পুনরুদ্ধার করলো এবং তাদের তাঁবেদারগণকে ইস্কার্দু এবং লাদাখে পুনর্বহাল করলো। শুধুমাত্র লেহতে এখনও পাঞ্জাবের পতাকা স্পর্ধা সহকারে তিব্বতীয় মৃদু বাতাসে পত পত করে উড়তে লাগলো।

গুলাব সিং ডোগরা তড়িঘড়ি করে লাদাখের উপর জোর খাটালো। ১৮৪২ সালের বসন্তকালে ডোগরার সৈন্যদল লেহতে পৌঁছায় এবং সামনে এগিয়ে যায় লাদাখে পুনর্দখলের জন্যে। গারোর দিকে দুই দিক হতে সাঁড়াশি আক্রমণের মতো অগ্রসর হলো। এক সারি সৈন্য জেলার সীমান্তে পৌঁছাল ১৮৪২ আগস্টে কিন্তু

৩৪. এসসি ৭১, ১৮-১০-১৮৪১।

৩৫. হিমালয় অতিক্রম করে পাঞ্জাবের বিস্তৃতির উত্তেজনা দরবার ও ব্রিটিশদের অন্যান্য সম্পর্ককে দুর্বল করে দেয়নি। ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে, দরবার তাদের পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে রোজকার কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার দিকে এবং যেসব মালামাল পাঞ্জাবে আনা হয় তা নির্ধারিত কম মূল্যে এক জায়গায় দরদাম করা হয়। এই পদক্ষেপের কারণে পাঞ্জাব এবং তার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বিন্দুমাত্র আর্থিক সমস্যা তৈরি হয়নি।

৩৬. এসসি ৫৯, ৬-১২-১৮৪১।

ব্রিটিশ অফিসাররা কানিংহামে থাকার জন্য অগ্রসর হতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল। লাহাসা থেকে এই দলের বিরুদ্ধে যে চীনা দল পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করা হয়েছিল।

১৭ অক্টোবর ১৮৪২ সালে দরবারের সদস্য এবং গুলাব সিং-এর নিজস্ব নির্বাচিত প্রতিনিধি লাহাসাতে চীনা রাজার প্রতিনিধিদের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে সই করেন। দুইপক্ষের মতোই লাদাখ এবং লাহসার সীমান্ত অলঙ্ঘনীয় এবং বাণিজ্য বিশেষ করে চা এবং পাশমিনা উল পূর্বের মতোই লাদাখ দিয়ে যাবে।^{৩৭}

তিব্বতের উপর ডোগরাদের আকস্মিক হামলার সাথে আফগানিস্তানের ঘটনার জন্য ব্রিটিশরা কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে বিরত হয়। ১৮৪১-এর শরতে আফগানরা উঠে দাঁড়ায় এবং ব্রিটিশ সৈন্যদের ধ্বংস করে। এদের মধ্যে স্যার আলেকজান্ডার বার্নসও মারা যান—যিনি সিন্ধু, পাঞ্জাব এবং আফগানিস্তানের ব্রিটিশ সীমান্ত বর্ধিতকরণের প্রধান স্থপতি ছিলেন। শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে পুনর্বহাল করার জন্য পাঞ্জাবি—ব্রিটিশ একত্রিত হয়, সাথে সাথে কাবুলে ব্রিটিশদের বিধ্বস্ত অবস্থা দরবারের চোখ এড়ায়নি, ব্রিটিশদের শাস্ত করার জন্য সাধারণ নির্দেশ দেয়া হয়।^{৩৮} পাঞ্জাবিরা আলী মসজিদ পুনর্দখল করে কিন্তু শীত পড়ার সাথে সাথে তা ধরে রাখতে পারেনি। তুম্বার বন্ধের সাথে সাথে তারা আবার অগ্রসর অবস্থায় গেল এবং ব্রিটিশদের অনিশ্চয়তায় ফেলল, ১৮৪২-এর বসন্তে তারা আলী মসজিদ

৩৭. ব্রিটিশরা লাদাখের চুক্তি বাতিলের সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল, যখন তারা গুলাব সিং-এর কাছে ১৮৪৬ সালে কাশ্মীর বিক্রি করেছিল, ক্যাপ্টেন এ কাসিংহাম, যাকে গুলাব সিং-এর রাজত্বের উত্তর এবং পূর্ব দিকের সীমানা নির্ধারণ করতে পাঠানো হয়েছিল, তিনি চীনা এবং তিব্বতীয় বণিকদের এই বার্তা পৌছান যে, তাদের মালপত্র কোন চাঁদা ছাড়াই ব্রিটিশ সীমানায় প্রবেশ করতে পারবে। লর্ড হার্ডিঞ্জ লাহাসাতে একটি চিরকুট লিখে এটা ব্রিটিশ অধিরাজত্বের চীনাদের কাশ্মীরে জানানোর এবং পরামর্শ দিলেন আগের চুক্তি উল্লিখিত করার ব্যাপারে সে লাদাখ পথে কোন বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হবে না। লাহাসার চুক্তি ১৮৪২ সালের পুনর্লিখিত করা হলো ১৮৪৬ সালের আগস্টে যেমনটা ব্রিটিশরা চেয়েছিল।

৩৮. ব্রিটিশরা পাঞ্জাবের সাহায্য দেখে অবাক হয়েছিল, কারণ তাদের উপদেষ্টা— ওয়েড, ক্লার্ক এবং শাহমত আলী— তাদেরকে বলেছিল যে পাঞ্জাবিদের পেশাদার বন্ধুত্বের প্রতি কোন আস্থা না স্থাপন করার জন্যে (দেখুন কলকাতা রিভিউ, III ১৮২)।

১১ এপ্রিল ১৮৪২ সালের এক চিঠিতে হেনরি লরেন্স লিখেছিলেন ‘শিখদের শুধুমাত্র ৬০০০ লোক নিয়োগ দেয়া অনিশ্চিত। কিন্তু তারা কাজ করতো ১৫,০০০-এর নিচে নয়, উপস্থিত সংখ্যাকে তাদের জায়গায় বাদ দিয়ে, এবং বাকিদের জমরুদ এবং পেশাওয়ারে পাঠালে, যেখানে তারা সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত থাকবে প্রয়োজন হলে।’ এডওয়ার্ড এবং মেরিভেল, *দ্য লাইফ অফ হেনরি লরেন্স*, I, ৩৬৩।

৩৯. গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরো, ১৯ এপ্রিলের অফিসিয়াল নোটিশে মহারাজা শের সিং-এর দলের ব্যবহারের প্রতি তার পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি আর্মিদের জানান যে, শিখদের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে পাসের হামলায় যা তাদের উপর জোরপূর্বক করানো হয়েছিল, বুঝতে পেরেছিল যে তা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের দলের কাছেও সমপরিমাণে তুলে ধরবে।’ এলেনবরো লাহোরে তার দূতকে অভিনন্দন জানাতে ‘কী সম্মানীয় শিখ আর্মি, নির্দেশ দেন।’ *গান্দা সিং, প্রাইভেট কন্সপন্ডেন্স রিলেটিং টু দ্য অ্যাংলো-শিখ ওয়ারস*, পৃ-৪২।

আবার নেয়। দরবার শস্য, গবাদি পশু এবং অন্যান্য জিনিস ব্রিটিশ দলে সরবরাহ করলো এবং আফগানিস্তানে ব্রিটিশদের থেকে বড় দল দ্রুত প্রেরণ করলো। পাঞ্জাবিরা জালালাবাদ মুক্ত করে দিল এবং আফগানিস্তানে ব্রিটিশ শক্তি পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করলো। ব্রিটিশদের জন্য সৌভাগ্যবশত শাহ সুজা মারা গেলেন (অথবা নিহত হলেন)। তারা সামান্য ত্রিপক্ষীয় আনুষ্ঠানিক চুক্তি করে এবং দোস্ত মোহাম্মদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আমিরকে শান্তি হতে অব্যাহতি দেয়া হলো এবং কাবুলে প্রেরণ করা হলো।^{৭৯}

আফগান ক্যাম্পে ব্রিটিশদের ব্যবহার শের সিং-কে বিভ্রমায় ফেলে দিল। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে, তারা কিভাবে আফগানিস্তানে পৌঁছার জন্য পাঞ্জাবকে ব্যবহার করছে এবং এমন করাতে দরবারের আগ্রহ ছাড়াই আনুষ্ঠানিক চুক্তি ভঙ্গ করে।^{৮০} আফগানিস্তান ধ্বংসের পরপরই প্রচারণা ছাড়াই সিন্ধুর বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা পদক্ষেপ নেয়। কোন কার্যকারণের অপেক্ষা ছাড়াই, স্যার চার্লস নেপিয়ার প্রদেশটি ১৮৪৩-এর মার্চে দখল করেন।^{৮১} ব্রিটিশরা যে এমনকাজ পাঞ্জাবের সাথে করবে না তার কি নিশ্চয়তা ছিল?

দৃশ্যতই দরবার এবং ব্রিটিশের সম্পর্ক শীতল হয়ে গেল। শের সিং বন্ধুত্বের ভান করে যেতে লাগলেন কিন্তু ব্রিটিশদের সাথে দ্বিতীয়বার হিসাবে ভুল করলেন না। তিনি পাঞ্জাবিদের সাথে অগণিত যুদ্ধে তলোয়ার চালানোর জন্য দোস্ত মোহাম্মদকে সংবর্ধনা প্রদান করেন যখন তিনি লাহোর হয়ে কাবুলে যাচ্ছিলেন। দরবারের একটি আলাদা চুক্তিতে তাকে আফগানিস্তানের আমির হিসেবে পরিচিতি দেয়া হলো।

শের সিং-এর উপর হতে বিশ্বাস হারানোর জন্য ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের নৈপুণ্যহীনতাকে উপলব্ধি করে। তারা এটাও বুঝতে পারে যে যতদিন পর্যন্ত ধীয়ান সিং ডোগরার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে থাকবে ততদিন দরবারের আচরণ তাদের প্রতি একই থাকবে। তাদের বন্ধুত্ব রক্ষার দাবিতে তারা শের সিং-কে সন্ধ্যাওয়ালিয়া সর্দারদের যারা ধীয়ান সিং ডোগরার কাছে প্রতিকূল ছিল নির্দেশ দিতে বলে যে পাঞ্জাবে ফিরে যেতে এবং তাদের কাছে তাদের রাজ্য বুঝিয়ে দিতে।^{৮২}

৪০. ১৮৪২ সালের শীতে, লর্ড এলেনবরো শের সিং-এর সাথে দেখা করার এবং তাকে তার পক্ষ হতে ধন্যবাদ দেয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন আফগান প্রচারণায় পাঞ্জাবিদের ভূমিকার জন্য। শের সিং যিনি প্রথমে সাক্ষাতে রাজী হয়েছিলেন, পরে খসড়া চুক্তির ঠুনকো যুক্তি দিয়ে নিজেকে বিরত করেছিলেন। শের সিং-এর ছেলে ১১ বছরের প্রতাপ সিং এবং ধীয়ান সিং ডোগরার সাথে হাত মিলিয়েই গভর্নর জেনারেলকে তৃপ্ত থাকতে হলো।

৪১. 'আমিরদের শান্তির প্রধান কারণ ছিল' কেউ বলেন, 'ব্রিটিশ যা আফগানদের কাছ থেকে পেয়েছিল তার সম্মিলিত শক্তি। বৃহৎ রাজনীতির পথে এটাকে ব্রিটিশদের কাউকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল এবং এটা সিন্ধুর আমিরদের আঘাতের মাধ্যমে নির্ধারিত হলো।' *ক্যালকাটা রিভিউ*, ১, ২৩২।

৪২. এপ্রিল ১৮৪২-এ, যখন ক্লার্ক শের সিং-এর সাথে দেখা করেন, মহারাজা ব্রিটিশ দূতকে বলেন যে, সাতলেজ অতিক্রম করে সন্ধ্যাওয়ালিয়ারা যদি দরবারের কোন পদে আসীন হয়, কেট কাপুরা,

মহারাজা, যিনি ধীয়ান সিং-এর শাসনের অধীনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, ব্রিটিশদের এই পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ১৮৪২ সালের নভেম্বরে লাহারো অজিত সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়া পৌছান এবং সাধারণমনা শের সিং প্রসারিত বাহুতে তাকে গ্রহণ করেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের তাদের পদে পুনর্বহাল করা হলো। সম্ভবত আগেই বোঝার কারণে সন্ধ্যাওয়ালিরা ব্রিটিশ সমর্থক, ডোগরার বিপক্ষ দল হিসেবে দরবারে থাকে।

ধীয়ান সিং ডোগরা রাজপুত্র বা সভাসদের খেয়ালগুলো দূর করার জন্য দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। সন্ধ্যাওয়ালিয়াদেরকে হিংস্রতার আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এজন্য লাহারে পরিষ্কার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। হয় তারা নিজেরাই কাজ শুরু করবে অথবা ব্রিটিশদের কাছ থেকে সাহায্য কখনও জানা যাবে না যে রক্তেস্রোতের মাঝে ধ্বংসযজ্ঞের প্রমাণ রেখেছে। ১৮৪৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর, হিন্দু পঞ্জিকা মতে আসুজের প্রথম মাসে, ব্যবস্থা করা হলো যে শের সিং এক কুচকাওয়াজে জনগণকে অভিবাদন জানাবেন এবং অজিত সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়ার সৈন্যদলকে দেখবেন। শের সিং তার বড় ছেলে প্রতাপ সিংকে সাথে নিলেন এবং বাচ্চাটিকে নিজে পাশের বাগানে খেলতে দিলেন। কুচকাওয়াজের পরে, যেখানে মহারাজা বসে ছিলেন সেখানে সন্ধ্যাওয়ালিরা রাজাকে দেয়ার জন্য ইংরেজ প্রত্নতত্ত্বকারক কর্তৃক তৈরি দোনলা বন্দুক নিয়ে আসে কলকাতা থেকে। অস্ত্রটি নেয়ার জন্য যখনই মহারাজা হাত বাড়ালেন, অজিত সিং ট্রিগারে চাপ দিলেন, ‘এহ কি দুখ! এ কেমন ধরনের প্রতারণা!’ মৃত্যুর পূর্বে দুর্ভাগা মহারাজা চিৎকার করেছিলেন সন্ধ্যাওয়ালিয়ার লোকজন শের সিং-এর লোকদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল; অজিত সিং মহারাজার মাথা কুপিয়ে কেটে নিল এবং তা বর্ষার চূড়ায় স্থাপন করলো, একই সময়ে অজিতের চাচা প্রতাপ সিং-কে দেখল এবং ছেলেটির ঘাড়ের করুণ অবস্থা করলো। সেও তার শিকারের মাথাটি তার বর্ষার চূড়ায় স্থাপন করলো এবং তার ভাতিজার সাথে যোগ দিল। তারা এই রাজহত্যা করে শহরে দৌড়ে তাদের অর্জন জাহির করতে থাকলো। অজ্ঞাত কারণবশতঃ দুর্গে আস্তানা গাড়লো। তারা ডোগরাদের নিমন্ত্রণ করলো—ধীয়ান সিং, হীরা সিং এবং সুচেত সিং— তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য। ধীয়ান সিং ফাঁদে পড়লেন এবং খুব কমসংখ্যক সঙ্গী নিয়ে দুর্গে গেলেন। তাকে হত্যা করা হলো এবং তার ২৫ বছরের শরীর রক্ষককে ২৫ টুকরো করা হলো। যখন সুচেত সিং এবং হীরা সিং শহর হতে কয়েক মাইল দূরে ছিলেন তখন ধীয়ান সিং-এর হত্যার খবর পেলেন, তারা আশ্রয়ের খোঁজে ক্যান্টনমেন্টে যান এবং এই হত্যার শোধ নেয়ার জন্য খালসা আর্মিদের কাছে আর্জি জানান। সন্ধ্যাওয়ালিগণ দুর্গ এবং প্রাসাদের দখল নেয় এই বিশ্বাসে যে তারা এখন পাঞ্জাবে রাজত্ব করবে, তারা জনগণ ছাড়াই গণনা করেছিল।

আকালগর, নারাইনগর অথবা ওয়াধনি) তাদের দলকে টানার জন্য রাস্তা করে দেয়া হবে এবং ‘তাদের পেট একটানে ছিন্ন করা হবে।’ এসসি ১৩৪, ২৯-৬-১৮৪২। ছয়মাস পর, শের সিং ও ক্লার্ক কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে সন্ধ্যাওয়ালিাদের ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানালো।

কাপুরুষোচিত অপরাধের খবর বাতাসের বেগে লাহোরে ছড়িয়ে পড়ল। আর্মি পঞ্চাশ শহর প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নিল এবং অপরাধীদের শাস্তি দেবার চিন্তা করলো এবং এজন্য তারা ধীয়ান সিং ডোগরার ছেলে হীরা সিং-কে দলনেতা হিসেবে নির্বাচন করলো, দুর্গকে ঘিরে ফেলা হয়েছিল। পুরো রাতজুড়ে গোলন্দাজ বাহিনী গোলক নিক্ষেপ করতে থাকলো। পরদিন সকালে নিহাং ঝড়ের কারণে সব ভেঙ্গে পড়ে এবং নগর দুর্গ দখল করা হয়। আততায়ীরা এবং তাদের দলের ৬০০ জনকে তরবারির নিচে বলি দেয়া হয়। কিন্তু আজর সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়া বেঁচে যান। তিনি সেনাকর্তৃক লাহোর দখলের খবর পান এবং তিনি সুতলেজ অতিক্রম করে পালিয়ে যান সেখানে ব্রিটিশরা তাকে নির্বাসন দিয়েছিল।^{৪৩} রনজিত সিং-এর ছোট ছেলে দালিপ সিং-কে মহারাজা এবং হীরা সিং ডোগরাকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করা হয়। মূল ক্ষমতা কিভাবে যেন প্রাসাদ হতে সেনানিবাসে চলে যায়।

৩. ডোগরাদের অধীনে পাঞ্জাব

রোগ ছড়ানোর মতো দলাদলি ছাড়া দরবার রক্তক্ষানের কারণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। সিংহাসনের দাবিদারের কারণের ভিত্তিতে সভাসদে শতুন বিন্যাস করা হলো এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত, মহারাজা দালিপ সিং-এর দু'জন সৎভাই ছিল, পেশোয়ারা সিং এবং কাশ্মীরা সিং, যারা তার থেকে বয়সে বড় ছিলেন এবং তাদের সিংহাসনের প্রতি দাবি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল। যদিও হীরা সিং ডোগরাকে প্রধান ভাজির হিসেবে রাখা হয়েছে, তার নিয়োগ প্রশ্নের বাইরে ছিল না। যখন মহারাজের মাত্র সাত বছর বয়স তার প্রাণবন্ত এবং মনোরম মা জিন্দান^{৪৪} রানীমাতার ভূমিকা পালন করেন এবং তার ভাই জওহার সিং-এর

৪৩. ১৫ এবং ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৩-এর রক্তক্ষাত অবস্থা নিশ্চয়ই ব্রিটিশরা পূর্বেই অনুধাবন করেছিল। লর্ড এলেনবরো ওয়েলিংটনের রাজাকে ১৮৪৩ সালের ২ আগস্ট লেখেন (যখন কলকাতায় সন্ধ্যাওয়ালিয়ারা কয়েকদিন ছিল তার পরে), 'পাঞ্জাবের ঘটনাসমূহ শের সিং-এর মৃত্যুতে নাটকের শেষ স্তর বুঝতে পারবে' যখন শের সিং যুবক এবং তার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন ভিন্ন ভিন্ন টুকরায় দরবারে পরিবেশিত হয়েছিল রিকমন্ড কর্তৃক ১৮৪৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বরে, নিম্নোক্ত লাইনগুলো ধীয়ান সিং ডোগরা এবং শের সিং-এর পুনঃসম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ (যদিও একতা দেখা যাচ্ছে এবং তীব্র অনুভূতি এবং মদের নিচে পড়ে অমেরামতযোগ্য ভঙ্গন দেখা যেতে পারে যা সম্ভবত শের সিং-এর মৃত্যুতে শেষ হবে।' এসসি ৪৫৫, ২৩-৩-১৮৪৪।

কলকাতার ব্রিটিশ-ভারতীয় ছাপাখানা আরও যোগ করে যে, যদিও শের সিং-এর হত্যার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি জড়িত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, তবু এটা 'ইদুর গন্ধের মতন', ফ্রেড অফ ইন্ডিয়া, ডিসেম্বর ১৮৪৩।

৪৪. রাজকীয় কুকুরপালনের ঘরের এক দায়িত্ব কর্মীর মেয়ে ছিলেন জিন্দান। ১৮৩৫ সালে রনজিত সিং-এর সাথে তার বিয়ে হয়েছিল, দালিপ সিং সেপ্টেম্বর, ১৮৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিচিতি দেন সভাসদে অভিভাবক এবং উপদেষ্টা হিসেবে। এই দুয়ের পাশাপাশি সুচেত সিং ডোগরা মনে করেন যে, তার ভাতিজা হীরা সিং-এর চেয়ে তার প্রধান ভাজির হবার দাবি বেশি, গুলাব সিং ডোগরা^{৪৫} সুচেত সিংকে সমর্থন করেন।

ডোগরাদের মধ্যে তিক্ততা আরও বাড়তে থাকল একজন ব্রাহ্মণ যাজক জল্পার উপস্থিতিতে যিনি হীরা সিং ডোগরার ছেলেবেলা হতে সঙ্গী-শিক্ষক ছিলেন। জল্পা বিরক্তিকর চিন্তাভাবনার খুবই উদ্ধত ব্যক্তি ছিলেন এবং দ্রুতই তাকে সবাই অপছন্দ করা শুরু করে, অন্য কারও চেয়ে গুলাব সিং ডোগরা এবং সুচেত সিং তাকে বেশি ঘৃণা করতো।

প্রাসাদের ষড়যন্ত্র আদালত ও সভার শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিল, এসব ছাড়া তাদের কাছে অল্প সময় ছিল নিত্যদিনের প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য। ব্রিটিশদের মতে তাদের এখন নির্দেশের ব্যাপারে নাকগলানো উচিত এবং সুতলেজ পর্যন্ত দলকে এগিয়ে নেয়া উচিত। এসব সৈন্যদলের যাতায়াত পাঞ্জাবের অবস্থা আরও খারাপ করে দিয়েছিল। অনেক সর্দার ব্রিটিশদের সাথে তাদের জাগির নিশ্চিত করার জন্য খোলাখুলি আলোচনা করেছিল। বাইরের বিপদের হিংস্রতা এবং অন্তর্গত দলদলি সেনাবাহিনীকে^{৪৬} রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী উপাদানে পরিণত করেছিল।^{৪৭} খালসার অপরাজেয় ঐতিহ্য আবার জেগে উঠলো। যে মানুষ অগ্রগামী হিসেবে এসেছিল সে এখন ভাই বীর সিং,^{৪৮} অবসরপ্রাপ্তরা বৈরাগী হলো এবং তাদের নিজেদের আশ্রম সুতলেজের নওরাঙ্গাবাদ গ্রামে স্থাপন করলো। দেশের দুদিনে, শিখ সৈন্যরা এবং কৃষকশ্রেণীগণ নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ভাই বীর সিং-এ পরিণত হয়। ভাইয়ের সাথে

৪৫. সুচেত সিং ডোগরার নিজের কোন ছেলে ছিল না। গুলাব সিং তার ছোট ছেলে রণবীর সিংকে পালক নেয়ার জন্য তাকে জোর করেন (মিয়ান ফিনু নামেও পরিচিত) এটা গুলাব সিং ও তার ছেলেদের মাঝে সুচেত সিং-এর ভাগ্য সম্পর্কে কৌতূহলী করে।

৪৬. এই সময়ে ৬৯,৫০০ পদাতিক বাহিনী, ২৭,৫৭৫ অশ্বারোহী বাহিনী, ৪১৩০ গোলন্দাজ বাহিনীর সংখ্যা ছিল। ১৮৪৩ সালের ১ অক্টোবর, এসসি ৫২১, ২৩-৩-১৮৪৪।

৪৭. ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪ সালের রিকমন্ডের প্রতিবেদন বলে : 'সৈন্যদলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বলছি, আমি হয়তো লক্ষ্য করেছি যে প্রতিটা দল এবং প্রতিটা মানুষের শরীর কিছু গুরুত্বকে বাঁচিয়েছে, আফগানরা এবং হিন্দুস্তানীরা মূলত: রাষ্ট্রের এবং তাদের অফিসারের প্রতি যে আনুগত্য তা একপাশে ছুঁড়ে ফেলে রেখেছে। শিষ্টাচারের অভ্যাস, নিজেদের বিবেক এবং 'খালসা'তে নতিস্বীকারের অনুভূতি তাদেরকে বর্তমানের জন্য একটি অস্বস্তিক্ত দেহ হিসেবে একত্রিত করে রেখেছে।' এসসি ৫৬২, ২৩-৩-১৮৪৪।

'এখন আমাদের আপাত সরকারের একজন কর্মক্ষম মানুষ রাজা গুলাব সিং ও তার বিশাল সেনাসদস্য এবং অবিন্যস্ত যারা এখনও হারেনি তাদের সাথে বোঝাপড়া করতে হবে; এবং শিখদের সাথে যাদের এখনও বর্তমান কোন নেতা নেই, কিন্তু বিজয় প্রতিপাশে, এবং কষ্ট ছাড়াই, যদি তাদের উদ্যম পুরোপুরি রহস্যময় খালসার পাশে থাকে।' রিকমন্ড, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৩. এসসি ৪৮৭, ২৩-৩-১৮৪৪।

৪৮. বীর সিং (ডি. ১৮৪৪) তেহসিল থেকে তার্ন তারানে আসেন।

১২০০ জন বন্দুকবাজ এবং ৩০০০ ঘোড়সওয়ারী মানুষ স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য হিসেবে যোগ দেয়। ১৫০০ তীর্থযাত্রীর উপচর প্রতিদিন তার রান্নাঘরে খায়।

হীরা সিং তার দিকে যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে তা অনেক শক্তি নিয়ে মোকাবেলা করেছিল, সে ইউরোপীয় অফিসারদের যারা ব্রিটিশের সাথে ষড়যন্ত্র করতো তাদের ছাঁটাই করলো, এবং সৈন্যদের সুতলেজ অতিক্রম করার পরিকল্পনার বৃত্তান্ত জানার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করলো।^{৪৯} খোলা আদালতে তিনি ব্রিটিশ উকিল—পক্ষ সমর্থনকারীকে—জিজ্ঞেস করলেন ব্যাখ্যা দিতে যে, কেন তার সরকার ফিরোজপুরকে ঘিরে রেখেছে এবং কেন নির্বাসনে আক্তার সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়াকে পাঠানো হলো, যিনি আগের মহারাজা এবং প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার জন্য দায়ী এবং যিনি বর্তমান অবস্থার শত্রু। উকিল ব্রিটিশদের সুনামের ব্যাপারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো এবং বললো যে, সে সরকারের কাছে দরবারের ভীতির সংবাদ পৌঁছে দেবে।^{৫০} হীরা সিং এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট ছিল না এবং কাসুরে (ফিরোজপুরের দিকে) রক্ষীসেনা মোতায়েনের এবং ফিলাওরের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করার জন্য নির্দেশ দিল।

সীমান্তের দুই পাশেই দলের আগা-গোনা জনতার মধ্যে অস্থিতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। ধনীরা তাদের টাকা-পয়সা এবং গয়না ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে পাঠাতে লাগলো এবং অনেক বড় ঘরের পরিবাররা তীর্থযাত্রী সেজে পাঞ্জাবে পালিয়ে গেল।

রাজপুত্র পেশোয়ারা সিং এবং কাশ্মীরা সিং রাজ্যের এই অস্থিরতার সুযোগ নিলেন এবং সিংহাসনের প্রতি তাদের দাবি ঘোষণা করলেন। হীরা সিং তার চাচা গুলাব সিং ডোগরাকে জিজ্ঞেস করলেন সে শিয়ালকোট অবধি রাজপুত্রদের বিরুদ্ধে

৪৯. পাঞ্জাব আখবার, ১ জানুয়ারি ১৮৪৪। দরবার সদস্যরা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান দলের সাথে সুতলেজে বিশ্বস্ততার পরিচয় সাফল্যের সাথে দিয়েছিল, পুরো শীতকাল জুড়ে ১৮৪৩-৪ সিল্কের মাঝে নিজেদের ভেতর একতা গড়ে উঠেছিল এবং সুতলেজেও সিল্ক সৈন্যদের বেতন মাঝেমাঝে কমিয়ে দেয়া হতো। (এটা অধিকারের পরে, ব্রিটিশদের জন্য সিল্ক একটি নিষিদ্ধ 'বিদেশী স্থান' হিসেবে পরিণত হয়), সুতলেজে, প্রধানত ফিরোজপুরে, বেতনের বৈষম্যের ফলাফল হিসেবে কোম্পানীকে ৮½ রুপি প্রতিমাসে এবং দরবারের দলকে ১২½ রুপি করে প্রতি মাসে দেয়া হতো।

এই ঘটনা ছড়িয়ে পড়া নিয়ে লর্ড এলেনবরো খুব সতর্ক ছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, একতার প্রভাবে খালসা সাফল্য পাবে 'শত্রুতা ঘোষণা করার চেয়েও এটা ভয়ানক'। ১৮৪৪ সালের প্রথমদিকে আরেকটি চিঠিতে গভর্নর জেনারেল ওয়েলিংটনের রাজাকে লিখেছিলেন, পরিকল্পনা বৃদ্ধিহারে চালিয়ে আমরা জাহাজে যাত্রা করব যদি আমরা কখনও সুতলেজ অতিক্রম করি। আমি জানি এটা একটা দীর্ঘায়িত চরিত্র'। কোলচেস্টার, হিস্টোরি অফ দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ লর্ড এলেনবরো, পৃ. ৪২৫।

ফিরোজপুরের বিদ্রোহ গভর্নর জেনারেল এবং কমান্ডার-ইন-চীফ এর মাঝে বিবাদের বিষয় তৈরি করলো, যার ফলশ্রুতিতে স্যার রবার্ট ডিককে সুতলেজ সীমানা থেকে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তার জায়গায় মেজর জেনারেল ওয়াল্টার গিলবার্টকে দেয়া হয়। রেইট, লাইফ এ্যান্ড ক্যাম্পেইনস অফ ডিসকাউন্ট গগ I, ৩৫১-২।

৫০. পাঞ্জাব আখবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৪।

অগ্রসর হবেন কিনা। গুলাব সিং এই অভিযানকে ক্ষিপ্তকারিতার সাথে নিলেন (শিয়ালকোট তার সীমানায় যুক্ত হয় এবং তিনি তা অধিকার করতে পারেন)।

রাজপুত্ররা শক্ত বাধা দিল। তাদেরকে শিয়ালকোট থেকে বের করে দেয়ার পর তারা মাঝার মাঝখান দিয়ে গেল এবং তারপর নওরাঙ্গাবাদে ভাই বীর সিং-এর সাথে যোগ দিল। তারা সেনাবাহিনীর ডোগরাবিরোধী মনোভাবের উপর চাবুক চালালো এই বলে যে, হীরা সিং ডোগরা সত্যিকার অর্থে সিংহাসন জবর দখল করে বসে আছে। পঞ্চরা প্রধানমন্ত্রীকে ডাকলো এবং অন্যান্য জিনিসের সাথে শর্ত দিল যে, দালিপ সিং-কে আনুষ্ঠানিকভাবে মহারাজা করার জন্য; পেশোয়ারা সিং এবং কাশ্মীরা সিং-কে তাদের রাজ্য পুনরুদ্ধার করে দেয়ার জন্য; ও লাহোরে আকস্মিক ডোগরাদের পাহাড়ে ফেরত পাঠানোর জন্য। হীরা সিং ডোগরা এইসব শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। দালিপ সিং সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তার চাচা জওহার সিং যিনি সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়, কাশ্মীরা সিং (যিনি শিয়ালকোট ফিরে পেয়েছিলেন) এবং পেশোয়ারা সিংকে লাহোরে অভ্যর্থনা জানানো হলো এবং তাদের ভাতা মঞ্জুর করা হলো।

হীরা সিং-এর চাকরির মেয়াদের দ্বন্দ্বযুদ্ধে এবার তার চাচা সুচেত সিং ডোগরা আসেন, যিনি রানী জিনদানের চোখে উচ্চমর্যাদায় ছিলেন। সুচেত সিং লাহোরে পৌঁছালেন এবং হীরা সিং এবং পণ্ডিত জল্লার মুক্তি দাবি করেন। সেনাপঞ্চায়েত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সুচেত সিং লাহোর থেকে পালিয়ে যান। একদল সৈন্য তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে ও তার সঙ্গীদের হত্যা করেছিল।

হীরা সিং-এর ভাগ্যে শান্তিতে রাজ্য চালানোর কথা ছিল না। যখন তিনি অনেক কষ্টে চাচারটা শেষ করলেন তখন আরেকটি শিপদ এসে তার স্থানকে হুমকি দিয়েছিল। আক্তার সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়া, যার ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় শত্রুতাপূর্ণ কাজকর্মের কারণে অনেকের প্রতিবাদের বিষয় হয়েছিল, সুতলেজ অতিক্রম করে দরবারের সীমানায় পৌঁছায় এবং ভাই বীর সিং-এর সাথে নওরাঙ্গাবাদে যোগদান করে।^{৫১} রাজপুত্র কাশ্মীরা সিং এবং পেশোয়ারা সিংও তাদের রাজ্য নওরাঙ্গাদের জন্য ত্যাগ করে; ভাই বীর সিং-এর আস্তানা পাঞ্জাবের উপর ডোগরাদের প্রভাবের বিরোধিতার জন্য শিখ বিদ্রোহীদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।

আক্তার সিং ছিল ক্ষমার অযোগ্য শত্রু। তিনি ছিলেন রনজিত সিং-এর আত্মীয় এবং তাকে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য করতেন। তাকে অন্যতম একজন সাহসী

৫১. ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট, ৪মে, ১৮৪৪ রানী ভিক্টোরিয়াকে লেখা এলেনবোরো চিঠিতে ১০ জুন ১৮৪৪-এ বলা হয় 'এটা খুব দুঃখজনক যে উত্তর সিং-কে খানে সিং হতে সুতলেজ যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে সেই জিনিস সাথে করে যা লাহোর সরকারের বিরুদ্ধ। ব্রিটিশ দূতের এই ভুলটা শিখদের চুক্তিসংক্রান্ত পত্রের হিংস্রতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল, যাদের দলকে বামদিকের তীরে উত্তর সিং-কে ধরার জন্য পাঠানো হলো এবং এ সমস্ত ঘটনার কারণে এটাকে বিষয়হীন হিসেবে কিন্তু সকল ব্যাপার ভুলে যাওয়ার অভিযান হিসেবে বিবেচনা করা হল।' কোলচেস্টার, হিস্ট্রি অফ দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অফ লর্ড এলেনবোরো, পৃ-১২৯।

জেনারেল হিসেবে বিবেচনা করা হতো, রনজিত সিং-এর জীবনের শেষ কয়েক বছরে তিনি সকল শিখ সর্দারের মাঝে সর্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। ব্রিটিশরা তাকে সমর্থন করত, এমন কি মৃত মহারাজার পুত্ররাও অগ্রহী ছিল তার দাবি অর্জনের জন্য।

হীরা সিং ডোগরা তার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বত্বতা দেন, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন যে মহারাজা শের সিংহ, রাজপুত্র প্রতাপ সিং এবং তার পিতা (হীরা সিং-এর) ধীয়ান সিং ডোগরার হত্যার জন্য সন্ধ্যাওয়ালিয়ারা দায়ী, সন্ধ্যাওয়ালিরা ইংরেজদের সাথে গত ছয় মাস ধরে আছে এবং ব্রিটিশদের ওয়াদা করে যে, রাজত্ব থেকে প্রাপ্ত প্রতি রূপিতে ছয় আনা ব্রিটিশদের দিবে যদি এই ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ সফল হয়, সুচেত সিং ডোগরার বিধবা বিদ্রোহীদের অর্থ সরবরাহ করতো সেই টাকা দিয়ে যা তার স্বামী ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে নিয়োগ করেছিল, এবং ভাই বীর সিং এবং রাজপুত্ররা বিশ্বাসঘাতকের হাতের পুতুল হওয়াতে অনিচ্ছুক ছিল। সেনা পঞ্চরা হীরা সিং ডোগরার পাশে দাঁড়াতে রাজি হলো এবং দরবার দল নওরাঙ্গাবাদের দিকে অগ্রসর হলো।

ভাই বীর সিং একটি সমঝোতার চেষ্টা চালান, যখন আলোচনা চলছিল, অধৈর্য সন্ধ্যাওয়ালিয়া ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে এবং দরবারের একজন অনুসারীকে হত্যা করে। ভাইয়ের আস্তানায় দরবারের গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করে আক্তার সিংহ, রাজপুত্র কাশ্মীরা সিংহ^{৫২} এবং ভাই বীর সিংহসহ প্রায় একশজন সৈন্যকে মারা যায়।

দলটি জয়ী হওয়া সত্ত্বেও অনুতাপে ভুগতে শুরু করল। তারা তাদের হাত রক্তরঞ্জিত করেছে মহারাজা রনজিত সিং-এর পরিবার এবং এমন একজনের যে গুরু হিসেবে ছিল। তারা ডোগরাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়লো। হীরা সিং ডোগরা তাদের অনুভূতির জন্য প্রস্তাব করেন ভাই বীর সিং-এর স্মৃতির জন্য এবং ঘোষণা করেন যে শিখ ধর্মে রূপান্তরিত হবেন।^{৫৩} হীরা সিং ডোগরাকে যা সত্যিকার অর্থে রক্ষা করলো তা হলো বাতাসের বেগে গুজব যে, ব্রিটিশরা পাঞ্জাবে ঢোকার জন্য তৈরি^{৫৪} এবং একটি ছোট যুদ্ধ রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে।^{৫৫}

৫২. রাজপুত্র পেশোয়ারা সিং ইতোমধ্যে ভাইয়ের ডেরা পরিত্যাগ করে এবং দরবারে যোগদান করে। পরে সে সূতলেজ অতিক্রম করে এবং ব্রিটিশ কর্তৃক নির্বাচিত হয়।

৫৩. ১৪মে ১৮৪৪-এর পাঞ্জাব ইন্টেলিজেন্স প্রকাশ করে যে, রাজা হীরা সিং সৈন্যদের খোশমেজাজে রাখতে প্রচেষ্টা চালান এবং প্রচুর ওয়াদা করেন, একই সময়ে তাদেরকে উপহার এবং সম্মানও দেন। শিখ সৈন্যরা পুরস্কারগুলো নেয় ঠিকই কিন্তু বলে, “আমরা আমাদের গুরুকে হত্যা করেছি এবং আমরা দুই রূপি পেয়েছি, আমরা কেমন ধরনের মানুষ?”

৫৪. কাসোলি থেকে সাংবাদিক জানায় যে, বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠিয়ানা এবং ফিরোজপুরের দিকে গিয়েছে; ফিরোজপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলে যে জমিদারদের হেমন্তের ধান রোপণ না করার পরামর্শ দেয়া হয় কারণ অনেক সেনা এখানে জমায়েত হবে; সেনানিবাসে মজুদ করেছিল অস্ত্রের জিনিস এবং সূতলেজের গভীরতার পরীক্ষা করে।

এইচ.আর. গুপ্তা, পাঞ্জাব অন দ্য ইভ অফ ফাস্ট শিখওয়ার, পিপি. ৮০, ১৯৮, ২০১, ২০৬, ২০৮, ২০৯।

১৮৪৪ সালের জুলাইতে লর্ড হার্ডিঞ্জ, যিনি অনেক সুনামের অধিকারী ছিলেন— তিনি গভর্নর জেনারেল হিসেবে লর্ড এলেনবরোকে প্রতিস্থাপিত করেন। এই নিয়োগ নিয়ে দরবার বৃন্দের মধ্যে চিন্তার উদ্বেক ঘটে।^{৫৬} পাশপাশি অক্টোবরে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দলের কমান্ডার-ইন-চীফ ভারতে আসে লুধিয়ানা ও ফিরোজপুরের সৈন্যদল পর্যবেক্ষণ করতে, পাঞ্জাবের সৈন্যরা একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য সতর্ক হয়ে যায়; সীমান্তের বাইরের জায়গায় নদীতে দ্রুত রক্ষীসেনা মোতায়েন করা হয় এবং নদীর অগভীর অংশ এবং ফেরিতে চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি করা হয়। এই দুশ্চিন্তা কয়েক সপ্তাহ ছিল।

হীরা সিং ডোগরার স্বল্পসময়ের রাজ্যপরিচালনার প্রধান সমস্যা জল্লা দ্বারা ত্বরান্বিত হলো। নিজে গোঁড়া নয় বলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত রানী জিনদানের চরিত্র সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে।^{৫৭} রানী এবং তার ভাই জওহার সিং সেনা পঞ্চের কাছে আবেদন জানান, যারা জিনদান এবং তার পুত্রকে দাবি করে, এবং প্রতিজ্ঞা করেছিল যে হীরা সিং ডোগরা এবং জল্লাকে পাঞ্জাব হতে বিতাড়িত করবে।

হীরা সিং ডোগরা তার চাচার কাছে সাহায্য চাইলেন। গুলাব সিং ৭০০০ ডোগরা নিয়ে দ্রুত জম্মু হতে নেমে আসলেন। পাহাড়ী মানুষের এই আগমনের সংবাদে খালসা সৈন্যরা ক্ষুব্ধ হয়, যারা প্রধানমন্ত্রী এবং তার পুরোহিতকে গ্রেফতার করবে বলে ঠিক করেছিল। ডোগরাদের সাথে হীরা সিং এবং জল্লা সঙ্গী হয়ে এবং রাজধানীতে পলায়ন করে। খালসার দলটিকে পলায়নরত ডোগরা এবং তার ব্রাহ্মণ পরামর্শদাতাসহ আটক করা হয়। এই ঘটনার জেরেই চলমান যুদ্ধে ১০০০ ডোগরার বেশি মানুষ মারা যায়। হীরা সিং ও জল্লাকে খুন করা হয় এবং তাদের মাথা বর্শার চূড়ায় চাপানো হয় এবং লাহোরের রাস্তায় প্রদর্শন করা হয়।

৫৫. ফতেহ খান তিয়ানা দক্ষিণে বিদ্রোহ করেন, গুলাব সিং ডোগরা রাজস্ব পাঠাতে অস্বীকার করেন এবং উপজাতিদেরকে পেশাওয়ার লুণ্ঠনের জন্য উত্তেজিত করেন। মুলরাজ, মুলতানের সরকারকে ফতেহ খানের বিরুদ্ধে পাঠানো হল। মিথ্যা তিয়ানার যুদ্ধে দুইপক্ষের প্রায় ৯০০ মানুষ মারা গেল। ফতেহ খান তার ছেলেকে হারান এবং জমা দিতে বাধ্য হন। গুলাব সিং-এর প্রতিরোধ দূরীভূত হল যখন দরবার দলকে জম্মুতে যেতে আদেশ করা হল। সে তার ছেলেকে বন্ধক হিসেবে লাহোরে পাঠালো।

৫৬. যখন এই খবর আদালতে পড়া হচ্ছিল, জল্লা পুনঃচিহ্নিত করলো: 'লর্ড অকল্যান্ড আফগানিস্তানে প্রবেশ করে এবং তার সফলকামী, লর্ড এলেনবরো সিন্ধু ও গোয়ালিয়োরে প্রবেশ করে, এবং বর্তমানে নতুন লর্ডের পাঞ্জাব দখল করা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই।' *পাঞ্জাব ইন্টেলিজেন্স*, ২৩ জুন ১৮৪৪। এতে কোন সন্দেহ নেই যে চিহ্ন সম্পর্কিত তথ্য কয়েকদিন আগেই পাঠানো হয়েছে যাতে গভর্নর জেনারেলের সভা তার গোপন বৈঠকে বসে আন্ডার সিং স্কয়াওয়ালিয়াকে নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে পারে কারণ, যদি সে বেঁচে থাকতো তবে যুদ্ধ ছাড়াই ব্রিটিশরা পাঞ্জাব দখল করতে পারতো, কোম্পানির দল থেকে যেসব সেনা পালিয়ে এসেছিল তারা এই বলে ভয় বাড়াতে লাগলো যে, সেপ্টেম্বরে ব্রিটিশরা সুতলেজ অতিক্রমের পরিকল্পনা করেছে।

৫৭. রানী জিনদান, যার নাম বিভিন্ন সভাসদের সাথে যুক্ত ছিল, বলা হয় যে, লাল সিং-এর সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কের দরুন তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়েন। গর্ভপাতের পর তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, আদালতে প্রকাশ্যে এটা বলা হয় যে, যদি তিনি মারা যান তাহলে লাল সিং-কে ফাঁসির হুকুম দেয়া হবে। তিনি বেঁচে উঠলেন রোগ হতে এবং তার প্রভাবেই লাল সিং-কে রাজা উপাধি দেয়া হয়েছিল।

হীরা সিং ডোগরা ছিলেন অসাধারণ প্রতিভা এবং সাহসী মানুষ। যদি পরিস্থিতি ভিন্ন হতো তাহলে তিনি পাঞ্জাবের প্রথম ডোগরা শিখ মহারাজা হতে পারতেন। কিন্তু হঠাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং উদ্ধত জল্পার কারণে আর তার এই পরিণতি।

হৃন্দহীন কবিতার মাধ্যমে জল্পার স্মৃতিকে অভিশাপ দেয়া হয় :

উপার আল্লাহ
তলে ডাল্লাহ
জাল্লে দে সার তে খাল্লা

উপরে খোদা
এবং নিচে জল্লা
এবং তিনি নিশ্চয়ই জল্পার মাথায় জুতা দিয়ে আঘাত করবেন।

৪. মহারানী জিনদান এবং দালিপ সিংহ

হীরা সিং ডোগরা এবং জল্পার খুনের পর কিছুসময় ধরে দরবারে কোনো কাজ সংঘটিত হয়নি।^{৫৮} ধীরে ধীরে মহারানী জিনদান আদালতের কাজগুলো নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাকে সাহায্য করেছিল তার ভাই জওহার সিং (যে ভাজির খেতাব পেয়েছিল), রাজা লাল সিং এবং তার চাকরানী মঙ্গলা,^{৫৯} যে কিনা মধ্যবর্তীণী হিসেবে কাজ করত মহারানী পর্দার ভেতরে থাকার কারণে। জিনদানের প্রথম কাজ ছিল সেনাদলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। এক্ষেত্রে তাকে রাজপুত্র পেশোয়ারা সিং-এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।^{৬০} জিনদান পেশোয়ারা সিং-কে ছাপিয়ে গেল এবং কিছু

৫৮. 'রানী তার ছেলে এবং তার ভাইসহ দুর্গে একা ছিলেন। রানী ভাই রাম সিংকে খবর পাঠালেন। কিন্তু তিনি আসলেন না। তারপর তিনি সভার সর্দারদের আনার জন্য পাঠালেন যারা কিছুদিন আগে দরবার ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কেউ তার কাছে গেল না। তারা ঘোষণা দিল যে, রাজ্য এখন সেনাদলের হাতে এবং তাদেরকে অবশ্যই অধ্যাদেশ জারি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' কুরিকে ব্রডফুট, ৪ জানুয়ারি ১৮৪৫, এসসি ৫৮, ৪-৪-১৮৪৫।

৫৯. মঙ্গলা ছিল কংগ্রার পানিবাহকের কন্যা যাকে ১৮৩৫ সালে জিনদান চাকরি দিয়েছিল। রনজিত সিং-এর মৃত্যুর পর সে মহারানীর একজন বিশ্বস্ত অনুচরে পরিণত হয়েছিল এবং গুজব ছড়িয়েছিল যে সে তার মালকিন এবং লাল সিং-এর মধ্যবর্তীণী হিসেবে কাজ করেছে। সে নিজেও জিনদানের ভাই জওহার সিং-এর রক্ষিতায় পরিণত হয়। এসব প্রশ্নের সময় তার বয়স ৩০ বছর ছিল। জিনদানের সাথে লাল সিং-এর সম্পর্ক এবং মঙ্গলার সাথে জওহার সিং-এর সম্পর্ক ছিল কলেঙ্কারির বিষয়বস্তু।

৬০. ৫ জানুয়ারি ১৮৪৫ সালে কুরিকে লেখা ব্রডফুটের একটি চিঠিতে বলা হয় যে, 'দলের আস্তানাতে বিদ্রোহের দৃশ্য দেখা যায়, তারা ঘোষণা দেয় যে তাদের অন্য কোনো শাসক না শুধু পেশোয়ারা সিং-কেই চাই, যে তাদের বেতন বাড়াবে এবং যার অধীনে তারা জাসরোতা ও জম্মু জয় করতে পারবে। তারা ঘোষণা করে যে, রানী ও তার ভাই সরকার চালানোর অযোগ্য এবং সভার সর্দার এবং তাদের কর্মকর্তারা কিছুই করে না, শুধু জাগির পায়, যখন তারা (ব্যক্তিগত সৈন্য) সমাধান করলো যে এমন শাসক না, সে তাদের বেতন বাড়াবে না'। এস.সি. ৬১, ৪-৪-১৮৪৫।

সময়ের জন্য সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিশ্চিত করলো তার পুত্র, মহারাজা দালিক সিং-এর জন্য।^{৬১}

লাহোরে এই সমস্যার কারণে গুলাব সিং তা কাজে লাগিয়ে জম্মুতে স্বাধীন শাসক হিসেবে ছিল। তিনি বারাকজাই আফগান এবং ব্রিটিশদের সাথে খোলাখুলি আলোচনায় বসেন; তিনি তার দুর্গকে শক্তিশালী করা শুরু করলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে পাহাড়ি মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। ‘পাহাড়িরা শিখদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ; তারা এই যুদ্ধটাকে এক ধর্মের মতো মনে করতেন’, তিনি প্রতিবেদনে বলেন।^{৬২}

ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫ সালে সুতলেজ বরাবর দরবারের একটি দলকে বদলি করা হয় যাতে জম্মুর দিকে ব্রিটিশরা প্রবেশের চেষ্টা করলে তাদের রুখতে পারে। গুলাব সিং ডোগরা প্রদান করলো। সে ৪ লাখ রুপি উপটোকন হিসেবে দিল, খালসা সৈন্যদের ভোজ খাওয়ালো এবং তাদেরকে উপহার সম্বলিত অবস্থায় লাহোরে ফেরত পাঠালো। জম্মু থেকে খালসারা বেশি দূরে যেতে পারেনি তখন ডোগরারা তাদের উপর গুলিবর্ষণ করলো এবং সকল উপহার নিয়ে গেল। তারা জম্মুতে ফিরে গেল এবং ডোগরাদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। গুলাব সিং আবার আলোচনায় বসলেন। তিনি শিখদের ডেরায় যান, ‘তার তরবারি ধাক্কা লাগে এবং মাটিকে রক্ষা করব...এবং তাদের হাতকে একত্রে সাহায্যকারী হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকব’,^{৬৩} এবং তার আনুগত্য প্রদর্শন করলো। লোভী পক্ষের আবার স্বর্ণ এবং মন ভোলানো কথায় রাজি হলো।^{৬৪} শান্তির জন্য একটি চুক্তি করা হয় এতে গুলাব সিংকে ৩৫ লাখ রুপি দিতে হলো, যার মাঝে ৫ লাখ রুপি তৎক্ষণাৎ দিতে হলো^{৬৫} এবং লাহোরে সৈন্যদের সাথে পাঠানো হলো।

৬১. দেওয়ান দীনানাথ বলেন যে, প্রথমদিনের আনন্দ-ফুর্তিতে ২৫ লাখ রুপি খরচ হয় এবং অন্যান্য খরচের উদারতায় তা পনেরো দিনের মাঝে একে কোটিতে পরিণত হয়-যার তিন ভাগই নিয়মিত আর্মিদের পেছনে খরচ হয়ে গিয়েছিল। দল বুঝতে পেরেছিল যে, এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সম্পদের মত এতেও সত্যি কোনো সন্দেহ নেই। মুতুসুদিসের জন্য শুধু এখন একটাই কাজ অনভিজ্ঞ রানী ও অজ্ঞ সৈন্যদের চাহিদা মতো খরচ করা, ও সেই এবং প্রকৃত ব্যয়নির্বাহের মাঝে আত্মসাৎ-এর পার্থক্য বোঝা। দলরা জানে এবং এই ব্যাপারে বলে এবং একদিন তাদের উদ্দেশ্যের জন্য এসব পরিমাণ যোগাড় করবে। কুরিকে ব্রডফুট, ৭ জানুয়ারি ১৮৪৫, এসসি ৬৮, ৪-৪-১৮৪৫।

৬২. এসসি ৬৮, ৪-৪-১৮৪৫।

৬৩. এসসি ১৪৭, ৪-৪-১৮৪৫।

৬৪. পাহাড়ে রাজা গুলাব সিং জনতাকে ক্রমাগত এমন প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল যে, যাতে তারা দরবারে স্থান পায় এবং ভগ্ন হৃদয়ে এবং শান্তিতে মরার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি যুদ্ধের জন্য অনেক শক্তি সংগ্রহের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং শিখদের কাছে প্রতিটি শত্রু এবং তার কাছে প্রতিটি সাক্ষীকে সুতা দিয়ে নাচাচ্ছিলেন যাতে তার দূতরা পৌছাতে পারে। তার বহিরাবরণ অবিরাম ছিল আরও দরবারে, পেশোয়ারা সিং, সৈন্যদের সাথে এবং সুতলেজ এই পাশে এবং দিনের পর দিন তার দূত প্রস্তাব দেয় ও গ্রহণ করে পরিষ্কারভাবে শর্তগুলো যেগুলো সভাকর্তৃক আলোচিত হয়নি।’ কুরিকে ব্রডফুট, ১৬ জানুয়ারি ১৮৪৫, এসসি ১০২, ৪-৪-১৮৪৫।

৬৫. এসসি ২২, ২০-৬-১৮৪৫।

ডোগরারা বড় মনের পরিচয় দিয়েছে এবং রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায় বিচারশূন্য দক্ষের মতো নিজেদের খারাপ পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করেছে। আদালতে যাওয়ার পূর্বে সে সমনের হিসাব-নিকাশ করে নিয়েছিল এই বলে যে, সে খালসা সৈন্যবাহিনীর অনুচর ছিল, দরবারের নয় এবং সে শুধুমাত্র পক্ষদেরকে উত্তর দিবে।^{৬৬} (পূর্বে যে ঘোষণা করেছিল সে পদাতিক সৈন্যের মাসিক বেতন জনপ্রতি ১২ থেকে ১৫ রুপি বাড়ানো হবে।)^{৬৭} সে লাল সিং-এর দলে যোগদান করে এবং তার সাথে তরবারি বদলের মাধ্যমে অস্ত্রের ভাই সম্পর্ক করে।^{৬৮} (কিছু সপ্তাহ পরে তাকে গোপনে হত্যার চেষ্টা চালানোর জন্য লাল সিং-কে অভিযুক্ত করেন।)^{৬৯} তাকে ঘরবন্দি করে রাখা হয়; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বের হওয়ার রাস্তা পেয়ে যান। তাকে ৬৮ লাখ রুপি জরিমানা করা হয়; কিন্তু তিনি শুধু ২৭ লাখ দিয়েই ছাড়া পান।^{৭০} তাকে জানানো হয়েছিল যে তার উত্তর প্রদেশের মাঝে চীনারা অনুপ্রবেশ করতে পারে এবং জম্মু ফেরত যাবার অনুমতি পেলেন। যত দ্রুত সম্ভব তিনি যখন তার পাহাড়ে ফিরলেন তিনি ব্রিটিশদের সাথে পুনঃআলোচনায় বসলেন এবং প্রস্তাব দিলেন যে, শিখদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবেন।^{৭১}

যখন দরবারের দলটা জম্মুতে ব্যস্ত ছিল, রাজপুত্র পেশোয়ারা সিং পাঞ্জাবে ফিরলেন এবং শিয়ালকোটে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আদালত গড়লেন। এটা ছিল আইনবিহীন জিনিসের উদ্ভবের সংকেত। নিহাঙ-এর দল মাঝে মধ্যে জুড়ে ঘুরে বেড়াত এবং অমৃতসর ও লাহোর লুণ্ঠ করার হুমকি দিয়েছিল।^{৭২} রানী জিনদান তার ছেলের পক্ষে ক্ষমতাবান প্রধানদের বিরুদ্ধে জয়ের চেষ্টা করতেন।^{৭৩} কল, পেশোয়ারা সিং-এর দাবির বিরুদ্ধে এবং দেশের আইনকানুন পুনর্গঠনের জন্য। তিনি তুলনামূলক গরীব নাক্কাইসের সাথে দালিপ সিং-এর বাগদান ভেঙে দিলেন এবং চাট্টার সিং আন্তারিওয়ালার মেয়ের সাথে বাগদান করালেন। এটা পেশোয়ারা সিং-কে নিরুৎসাহিত করেনি। তিনি অ্যাটকের দুর্গ দখল করেন। নিজেকে মহারাজা বলে দাবি করেন এবং আফগানদের কাছে সাহায্যের জন্য যান। চাট্টার সিং আন্তারিওয়ালার অ্যাটকের দিকে যান।

৬৬. এসসি ৫৮, ২০-৬-১৮৪৫।

৬৭. এসসি ৪৯, ২০-৬-১৮৪৫।

৬৮. এসসি ৫৩, ২০-৬-১৮৪৫।

৬৯. এসসি ৩৪, ১৫-৬-১৮৪৫।

৭০. এসসি ৫৮, ২০-৬-১৮৪৫।

৭১. ব্রডফুট গুলাব সিং-এর দূত শেওদত্তকে ডেকে পাঠালেন ১৮৪৫-এর আগস্টে এবং এই বার্তা নিয়ে যে 'শিখদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য তাকে সবার মাঝ থেকে (পাহাড়ীদের) এক্সুনি কারণ দর্শাতে হবে এবং ব্রিটিশকে জানাতে হবে অথবা চাইলে সে পাহাড় থেকে ৪০,০০০ দল, সম্ভবত ৫০,০০০-এর পাশে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু অবশ্যই ৪০,০০০ এবং শিখদের আক্রমণ করতে হবে।' এসসি ৪৬, ২৫-১০-১৮৪৫।

৭২. এসসি ১৪৭, ৪-৪-১৮৪৫।

আফগানদের কাছ থেকে সাহায্য নিশ্চিত করা ও জনতাকে তার দিকে আনার চেষ্টা সফল হয়নি। সে চাট্টার সিং আন্তারিওয়ালা কর্তৃক তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা প্রদানে রাজি হয়েছিল এবং রাজধানী পর্যন্ত তার সাথে যেতে সম্মত হয়েছিল। অ্যাটক হতে বিশ মাইল দূরে, রাজপুত্রকে গ্রেফতার, দুর্গে আনা হয় এবং হত্যা করা হয়। পঞ্চরা আবিষ্কার করলো যে, সৈন্যদেরকে আবার দরবারের একদলের বিরুদ্ধে আরেক দল কাজে লাগাচ্ছে। তারা মনে করে যে পেশোয়ারা সিং-এর হত্যা রানী জিনদানেরই ভাই জওহার সিং কর্তৃক পরিকল্পিত ছিল এবং তাকে সেনাপঞ্চের সামনে হাজিরা দেয়ার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল।

২১ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় ১৮৪৫ সালে ভীত জওহার সিং নাবালক দালিপ সিং-কে বক্ষস্থলে আঁকড়ে ধরে হাতির উপরে তার সাথে করে নিয়ে পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। রানী জিনদান ও তার দাসী মঙ্গলা তাদের যাত্রাকে অনুসরণ করছিল। সেনানিবাসে এসে জওহার সিং হাতি থেকে নামতে আপত্তি জানান। রক্ষীরা মহারাজাকে তার কোল থেকে উঠিয়ে নেয় এবং হাওদাতে যেখানে তিনি বসেছিলেন সেখানে বর্শা নিক্ষেপ করে। পরদিন সকালে মন্ত্রীর অন্তিম সংস্কার করা হলো। তার চারজন স্ত্রী সতী হলো, মরতে মরতে খালসাকে অভিষেক দিল এবং ভবিষ্যৎদ্বাণী করলো যে শিখ সৈন্যদের স্ত্রীরা খুব শীঘ্রই বিধবা হয়ে যাবে এবং পঞ্জাব বিধবস্ত হয়ে যাবে। জিনদান প্রাসাদে ফিরে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিগোপে চিৎকার করতে থাকল এবং নিজেকে এবং নিজের ছেলেকে বলি দেয়ার ভূমিকা দিতে থাকল।

সেনা পঞ্চায়েত রাজ্যের কাজের দায়িত্ব নিল এবং পঞ্জাবের সার্বভৌমত্ব রক্ষা পেল। দেওয়ান দীনা নাথকে তাদের মুখপাত্র হিসেবে নির্বাচন করা হলো এবং নির্দেশনা দেয় হলো যাতে কোনো চিঠি ব্রিটিশদের কাছে না যায় যতক্ষণ না পঞ্চরা তার বিষয়বস্তু জানতে পারে। পঞ্চায়েতরা খালসা হিসেবেই কাজ করেছিল।^{৭৩} এটার নির্দেশ সম্পাদিত হয়েছিল 'আকাল সাহাই'-এর মোহরে—ঈশ্বর আমাদের সাহায্যকারী।^{৭৪}

৭৩. কিছু সময়ের জন্য আর্মি পঞ্চরা মানুষের মাঝে কঠোর নিয়ম এবং রাজধানীর আদেশ মান্য করতে সক্ষম হয়েছিল। এটা মজার ব্যাপার যে, শিখদের পুনরুদ্ধানের এই পরিবেশে সেনাসভার অনেক নেতাই ছিল ডোগরা হিন্দু। মিয়া আলবেল সিং-এর পুত্র মিয়া পৃথ্বী সিং রায় কেশী সিং-এর পুত্র মিয়া পাচাত্তার সিংহ; এবং মিয়া লাভ সিং-এর পুত্র মিয়া নওরাও সিংহ। এসসি ১১৯, ২০-১২-১৮৪৫। এটা বোঝাই যাচ্ছিল যে শিখ-ডোগরার দ্বন্দ্ব বেশিরভাগই উচ্চবংশীয় ঘটনা।

৭৪. সরকারের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্রিটিশদের কী হবে এটা নিয়ে তারা যথেষ্ট গবেষণা করেছিল। লক্ষ্য করা হয়েছে শারবাত খালসা শব্দটি যখন থেকে মহারাজা শের সিং মারা গিয়েছেন তখন থেকে দরবারের কর্মকর্তাদের কাছে পরিচিত এবং সেনাসভা ক্ষমতা পাওয়ার কারণে প্রাসাদে দলের মাঝে সরকার খালসাজি এবং খালসা পাহু শব্দগুলোর প্রথা শুরু হয়। ব্রিটিশ দূতকে নির্দেশ দেয়া হয় পরিষ্কারভাবে যে, তার সরকার অন্য কোনো সরকারকে চিনবে না যাঁরা রাজতন্ত্রকে রক্ষা করে

৫. প্রথম ব্রিটিশ-শিখ যুদ্ধ

ক. ব্রিটিশদের প্রত্নতি

কখন ব্রিটিশরা সিদ্ধান্ত নিল যে পাঞ্জাবের অরাজকতা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুতলেজ সীমানার কাছে জোরদার করা দরকার এবং যদি দরকার হয়, তবে নদী অতিক্রম করবে? এবং কখন শিখরা বুঝতে পারল যে ব্রিটিশরা পাঞ্জাবকেও ভারতের বাকি জায়গার মতো দখল করে নিবে এবং তাদের দলকে শত্রুভাবাপন্নভাবে অগ্রসর করবে?

নির্ভুলভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া সম্ভব না। ইংরেজরা বিশ্বাস করে যে শাসন করা এবং প্রতিবেশীদের সভ্য করা তাদের লক্ষ্য; ব্রিটিশ প্রেসের কিছু বিভাগ এই দর্শনের মনোভাব প্রকাশ করে এবং প্যাক্স ব্রিটানিকার সীমানা উপমহাদেশের সীমানা এমনকি তা ছাড়িয়েও যাবে। দরবার এসব ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল না। কলকাতার পত্রিকায় খবর বের হতো, ইংরেজ কর্মকর্তাদের ভাষণ এবং রেজিমেন্টের কথাবার্তা সবই লাহোরে পৌঁছাত। রনজিত সিং-এর মৃত্যুর পর, পাঞ্জাবের প্রচারণা ছিল ব্রিটিশদের মাঝে সর্বসময়ের অলৌচ্য বিষয়। শের সিং-এর মাহারাজা হবার সময় থেকে। এসব আলোচনা জায়ের সূক্ষ্ম পরিকল্পনায় পরিণত হয়। জুলাই ১৮৪৪-এ অভিজ্ঞ সৈন্য লর্ড হার্ডিঞ্জ পৌঁছার সাথে সাথেই, পরিকল্পনার নীলনকশা আঁকা হলো;’ মানুষ এবং সামরিক রসদ প্রচারণার সময় যা হেমন্তকালে

এবং ‘সেনাবাহিনীর সাথে পঞ্চায়েতকে যাদের বিষয় নিয়ে কোনো ধারণা নেই এবং সরকারের চাকরি করে।’ এসসি ১১৪, ৪-৪-১৮৪৫।

১. হার্ডিঞ্জের কৌশলের মুখোমুখি হওয়ায় শিখ সাম্রাজ্যের একটি কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমদিকে সে বিশ্বাস করত যে শক্তিশালি শিখ রাজ্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এবং ইন্দাস ছাড়িয়ে মুসলমান দেশগুলোর মাঝে সংঘর্ষকারক হিসেবে কাজ করবে। তিনি এই কৌশল ব্যবহার করেছেন ১৮৪৫-এর ডিসেম্বরে হীরা সিং ডোগরা এবং জল্লার মৃত্যু পর্যন্ত। তারপর তিনি বুঝলেন শিখরা স্থায়ী সরকার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন শিখদের দুর্বল করে এবং পাহাড়ে ডোগরাদের শক্তিশালী করে এবং সুতলেজ সীমানায় নিরাপত্তা তৈরি করলেন যাতে সুযোগমতো পাঞ্জাবে প্রবেশ করতে পারেন। ‘পাঞ্জাবের সরকারকে অবশ্যই শিখ বা ব্রিটিশ হতে হবে’, তিনি লর্ড রিপনকে ৮ জানুয়ারি ১৮৪৫ সালে লিখেছিলেন—শব্দগুলো নিজেই বাঁকা ছাদে লিখেছিলেন।

শুরু হবে তার জন্য পাঞ্জাব সীমান্তে মজুদ করে রাখল।^২ ১৮৪৪-এর সেপ্টেম্বর ব্রডফুটকে তার সাংঘাতিক পাঞ্জাববিরোধী আচরণ এবং ‘যুদ্ধে জন্য খুব উৎসাহ’র জন্য দূত নির্বাচিত করা হয় লুধিয়ানায় কর্নেল রিকমন্ডের বদলে।

সেনাদল যেটা সুতলেজের কাছে ছিল তা পাঞ্জাবে প্রবেশের জন্য তেমন শক্তিশালী ছিল না। না এমন করার জন্য তাদের কাছে কোনো যুক্তি ছিল।^৩ প্রবেশের ব্যাপারটা আপাতত স্থগিত রাখা হয় কিন্তু বাতিল করা হয় না। সীমান্তের দিকে দলের যাত্রা অব্যাহত থাকে।^৪ ষাটটা চওড়া প্রশস্ত তলবিশিষ্ট সেতুতে যাওয়ার জন্য নৌকা নির্মাণ করা হয় এবং এক যাত্রাতে ৬০০০ জন পদাতিক সেনা যেতে পারবে,^৫ এগুলোকে সুতলেজ-এর পূর্বদিকের তীরে একত্রে রাখা হয়; ১৮৪৫-এর গ্রীষ্মে ব্রডফুট এসব নৌকা কোনো ‘গোপনতা বা রহস্য করা’ ছাড়াই পরীক্ষা করে দেখেন।^৬

২. ‘উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, আমি গগের সাথে আমাদের সব অশ্বারোহী বাহিনী এবং বলদগুলোকে পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্য; ও আমরা আমাদের ইউরোপীয় সঙ্গীদের পাঠাবো মানুষ আনার জন্য যারা শূন্যস্থান পূরণ করবে।’ এলেনবরোকে হার্ডিঞ্জ, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৪, ফরেন এন্ড পলিটিকাল ডিপার্টমেন্ট রেকর্ডস।

এই গোপন ঘটনায় লর্ড হার্ডিঞ্জ তার সাথে তার দুই ছেলেকে সামাল দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

৩. ২৩ জানুয়ারি ১৮৪৫ সালে লেখা একটি পত্রে হার্ডিঞ্জ পরিস্থিতি সমীক্ষার জন্য এলেনবরোর প্রশংসা করেছে। তিনি লিখেন ‘এমনকি এই দুর্যোগে সাক্ষী চালসের মতো কেস ছিল, আমরা তৈরি না... মাঝারি কিছুতে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না, এই বিরতিতে যদি পাহাড়ীরা ও সমতলবাসীরা একে অপরকে দুর্বল করে দেয়; কিন্তু এই একশতাব্দের মাসের কিসের প্রেক্ষিতে আমরা পাঞ্জাব আক্রমণ করব এবং আমাদের সেনা তৈরি করব?’ চিঠিতে আরও বলা হয় ‘আত্মরক্ষার জন্য শিখ আর্মিদের ছড়িয়ে দিতে হতে পারে, অন্তত ঘটনা দেখিয়ে তাদেরকে আতঙ্কিত করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে অন্যতম হল, কিভাবে আমরা আমাদের বন্ধুদের রাজত্ব চুকব যারা আমাদের ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে?’ গান্দা সিং, প্রাইভেট কন্সপনডেন্স রিলেটিং টু দ্য অ্যাংলো-শিখ ওয়ারস, পৃ.-৭২।

৪. ‘আমাদের সৈন্যদের পাশাপাশি ফিরোজপুর, লুধিয়ানা এবং আশালা, ব্যারাকে, নেয়া উচিত যেহেতু আমরা প্রায় প্রস্তুত। যতই গভীর ও তাপমাত্রা বাড়তে থাকল, এই যাতায়াত কোনো সংকেত দেয়নি কিন্তু নীরবে আমরা যথাস্থানে দলদের পেয়ে গেছি।’ এলেনবরোকে হার্ডিঞ্জ, ৮ মার্চ ১৮৪৫, ফরেন অ্যান্ড পলিটিক্যাল ডিপার্টমেন্ট রেকর্ডস।

৫. চার্লস হার্ডিঞ্জ যে তার পিতার সাথে সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছিল, তাদের চলে যাওয়ার খবর লুধিয়ানাতে অবস্থিত দূতকে জানালো। ‘তারা সমান আকৃতির, প্রত্যেকে একটি করে বন্দুক বহন করে, শক্ত শিকল সম্বলিত দুটি লোহার আঁকশি এবং ১০০ জন মানুষ, অল্প দূরত্বের জন্য সেখানে ৬০টি নৌকা ছিল। যেমন একযাত্রাতে নদীপথে ৬০০০ পদাতিক সৈন্য নেয়া যায়।’

তরুণ অধস্তন কর্মকর্তা চক্রান্তকারীকে পরামর্শ দেয়, ‘এটা আশানুরূপ না যে উদ্দেশ্যে নৌকাগুলো ব্যবহার করার কথা তা অপ্রয়োজনীয়ভাবে গোপন রাখা হচ্ছে।’ যদি লাহোর দরবারের বাকিল জিজ্ঞাসা করে, ব্রডফুট বলবে যে এগুলো ইন্দাসে বাণিজ্য প্রসারের কারণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ব্রডফুট, ক্যারিয়ার অফ মেজর জর্জ ব্রডফুট, পি.পি. ২৮৩-৬।

৬. ইবিদ, পৃ.-৩৩১।

১৮৪৫-এর শরতে ভারতে ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড় দল পাঞ্জাব সীমান্তে প্রবেশ শুরু করে। এলেনবরোর সময়ে এই সংখ্যা ১৭,০০০ মানুষ এবং ৬৬ বন্দুক ছিল যা বেড়ে ৪০,০০০ মানুষ এবং ৯৪ বন্দুক হয়।^৭ লুধিয়ানার সাথে (যেটা ১৮০৯ পর্যন্ত একমাত্র মূল বাহিনী থেকে দূরে অবস্থিত ফাঁড়ি ছিল), আম্বালা, ফিরোজপুর এবং সিমলার পাহাড়ী এলাকায় সুতলেজকে উপেক্ষা করে নিবাস তৈরি করা হয়েছিল। ১৮৪৫-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লর্ড গগ নিজেই মীরাট ও আম্বালা থেকে সৈন্যদের নিয়ে ফিরোজপুরে যান সেখানে জেনারেল লিটলার তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং নৌকাগুলোকে সুতলেজ অতিক্রম করার জন্য জড়ো করছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ গগের সাথে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নেন তার কমান্ডার-ইন-চিফের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগের জন্য।

খ. শিখদের অপ্রস্তুত অবস্থা

‘লাহোরে তারা শান্ত আছে, পান করছে এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করছে এবং প্রণয়ে আছে।’^৮ জুলাই, ১৮৪৫-এ ব্রডফুট লিখেছেন। একমাস পর তিনি একই জিনিস লিখেছেন, ‘আমার মাঝেমাঝে মনে হতো আমি এক সরকারের প্রতিনিধি—আরেক জনের চাইতেও একধরনের বেশ্যালয়ের দারোয়ান।’^৯ এমনকি ব্রিটিশ দূতের প্রতারণার পরে ভাতা দেয়া সত্ত্বেও এটা বাজারের প্রকৃত স্বরূপে পরিণত হলো, কেউ উপসংহার এড়াতে পারল না যে, যখন ব্রিটিশরা সতর্কভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিল— আক্রমণাত্মক অথবা প্রতিরক্ষামূলক— দরবার নিরাপত্তার মিথ্যা ফাঁদে পড়ে এবং মাংসের আনন্দে মজে থেকে একে পরিত্যাগ করে। রানী জিনদান, রাজা

৭. পদ	লর্ড এলেনবরো যেমন শক্তি রেখে গিয়েছিলেন	প্রথম যুদ্ধ সংঘটনের সময় শক্তি
ফিরোজপুর	৪৫৯৬ মানুষ ১২টি বন্দুক	১০,৪৭২ মানুষ ২৪টি বন্দুক
লুধিয়ানা	৩০৩০ জন মানুষ ১২টি বন্দুক	৭২৩৫ জন মানুষ ২২টি বন্দুক
আম্বালা	৪১৩৩ জন মানুষ ২৪টি বন্দুক	১২,৯৭২ জন মানুষ ৩২ টি বন্দুক
মোট শক্তি পাহাড়ী ঘাঁটি বাদ দিয়ে, যা একইরকম ছিল	১৭,৬১২ জন মানুষ ৬৬টি বন্দুক	৪০,৫২৩ জন মানুষ ৯৪টি বন্দুক

সূত্র : চার্লস হার্ডিঞ্জ, ভিসকাউন্ট হার্ডিঞ্জ, পৃষ্ঠা-৭৬।

৮. এসসি ১০, ৫-৯-১৮৪৫।

৯. কুরিকে ব্রডফুট, ৬ আগস্ট ১৮৪৫, এসসি ১০, ৫-৯-১৮৪৫।

লাল সিংহ, প্রধানমন্ত্রী এবং শিখ বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ তেজ সিং এবং অনেক প্রধান সদস্য শিখ ও ডোগরা উভয়েই ব্রিটিশদের সাথে যোগাযোগ করে এবং পাঞ্জাবকে বিক্রি করে তারা নিজেদের জীবন ও জাগিরের নিরাপত্তা চায়।^{১০} সভাসদরা বিশৃঙ্খল সেনাসদস্যদের ভয় পেল এবং এর ধ্বংস দেখতে পেল। ব্রিটিশ দলের যাতায়াত একটা সুযোগ তাদের দিল। সেনাদের মনোযোগ ব্রিটিশ থেকে সরিয়ে দিল এবং খালসাদের ইংরেজীতিকে চাবুক মারলো।^{১১}

খালসা সেনাসদস্যরা দরবার ও ব্রিটিশ উভয়ের প্রতিই শত্রুভাবাপন্ন ছিল। প্রথমে তারা তাদের মুখ বন্ধ রাখার বদলে বেশি বেতন দাবি করলো (কোম্পানীর সিপাহীর মতোই বেশি পাঞ্জাবি দলটি প্রায় দ্বিগুণ নিল।); ধারণা করা হয় পরবর্তীটা মন্ত্রীদের এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপর খরচের জন্য ব্যবহৃত হয় জয়ের উপযুক্ত পরিকল্পনার জন্য। যদিও সেনাবাহিনী রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পেছনে ছিল, সেনানিবাসে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পঞ্চরা সমর্থ ছিল^{১২} এবং তারা নতুন বন্দুক, পরিবহনের ব্যবস্থা, গোলাবারুদ, প্রাচীন দাগা বন্দুক এবং তরবারি প্রভৃতি জমা করতে সমর্থ ছিল।^{১৩} সেনার বিভিন্ন পদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা, খালসার অপরাডেয়েত্বের রহস্য পুনরুজ্জীবিত করা এবং গুলি করে ফিলিস্তিনের সাগরে ফেলার লক্ষ্যেও তাদের ছিল।^{১৪}

১০. 'তুমি ভালো থাকবে এই শুনে যে, আসলে তোমার প্রভাবশালী ক্ষমতাবানের সংখ্যা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা আছে, তাদের কার্যকলাপের পরিচয় এবং মুক্তি-প্রচেষ্টায় তারা যে শর্ত আশা করে এবং তাদের মধ্যকার চুক্তি সম্পর্কে, তাই পাঞ্জাবের সম্পদের একটি বিরাট অংশের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য জমিসহ সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রধানদের উপর কিছু গুরুত্ব দেয়ার জন্য যারা দেশের প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোকে তুলে ধরে।' ব্রডফুটকে হার্ডিঞ্জ, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৫, এসসি ৪৮, ২৫-১০-১৮৪৫।

১১. 'দেখিতে হলেও আমাদের প্রত্নুতি সম্পর্কে তারা কিছু বিচলিত হয়েছিল। সেই খবর তারা তাদের সাংবাদিকদের কাছ থেকে পেয়েছিল যারা আমাদের বিভিন্ন স্থানে থেকে প্রতিটি গুজবকে পত্রিকায় এবং সেনানিবাসে ছড়িয়ে দেয়।' কুরিকে ব্রডফুট, ১৪ জুলাই, ১৮৪৫। এসসি ৩৪, ১৫-৮-১৮৪৫।

১২. 'তথাপি পূর্বের ঘটনায় এই অরাজকতার জন্য একটি নির্দেশ জারি হয়; দলের এবং পঞ্চায়েতের, শুধুমাত্র শোরগোলের সময় অধস্তনের কথাবার্তা বাদে যদিও তারা সুদৃঢ়ভাবে আদেশ দিয়েছিল এবং তাদের ইচ্ছা ছিল নামমাত্র তাদের দল থেকে একইভাবে কাউকে ক্ষমতা দেয়া। যদিও পাহাড়ে তাদের বাড়তি ব্যবহার ভালোই ছিল, মূলত নারীদের ক্ষেত্রে, তথাপি তারা তাদের ক্যাম্প আদেশ মেনে চলত, শস্য নিয়ে বাজারে ব্যবসায়ীদের কাছে যেত; যাদের নিরাপত্তা সম্মানিত ছিল এবং তাদের কর্মকর্তাদের কমান্ডারের চেয়ে দাস বেশি দেখাতো এবং পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের বাইরে তারা কোনো কিছু করার সাহস পেত না। তারা শুধু গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে পঞ্চায়েত এবং চৌধুরী অনুমোদিত এলাকায় চলাচল করত।' কুরিকে ব্রডফুট, ২৭ মার্চ ১৮৪৫। এসসি ৩৩, ২০-৬-১৮৪৫।

১৩. এসসি ৩৪, ১৫-৮-১৮৪৫।

১৪. কর্নেল গার্ডনার লাহোরে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছিলেন। তিনি যেমন বলেছিলেন 'প্রকৃত বিশ্বাস হল ব্রিটিশদের মতিগতি আক্রমণাত্মক ছিল, যেমন গৃহে উত্তেজনা তৈরি করে পরিবারকে লুণ্ঠন করা, এবং যেমন তাদের মন পড়ে ছিল রহস্যময় বিশ্বাসে, একটি নাছোড়বান্দা লক্ষ্য প্রতিটি

সেনাদলের প্রস্তুতির ব্যাপারে ব্রিটিশ দূত ব্যাখ্যা চেয়েছিল। দরবার জবাব দেয় যে, তারা ব্রিটিশদের আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর পাশাপাশি, দরবার সুচেত সিং-এর সম্পদ ফেরতের কথা জিজ্ঞেস করে যা প্রায় ১৭ লাখ রুপির বেশি, নাভাতে মোরন গ্রামের পুনরুদ্ধার এবং সুতলেজ অতিক্রম করে দরবারের জায়গায় পাঞ্জাব সেনাবাহিনীর কনস্টেবল বাহিনীর জন্য রাস্তা ছেড়ে দেয়া— একটি অধিকার যা কাগজে ব্রিটিশদের দ্বারা অর্জিত কিন্তু বাস্তবে প্রায়ই অবহেলিত।^{১৫} ব্রিটিশ সরকার দরবারের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

লর্ড গগ অগ্রসর জারি রাখলেন। কার্নালে লর্ড হার্ডিঞ্জ ২৬ নভেম্বরে তার সাথে যোগ দিলেন এবং দুইজন মিলে ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হলেন। ৩ ডিসেম্বরে ব্রিটিশদের সাথে দরবারের কূটনৈতিক সম্পর্ক চরমে উঠল দরবারের দূতকে ছাড়পত্র দেয়ার মাধ্যমে। ইংরেজরা যে যুদ্ধ চায় তা নিয়ে এখন সন্দেহের অবকাশই নেই। যদি তাদের দলের সাথে ফিরোজপুর যোগ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে তারা অবশ্যই সেতু অতিক্রম করবে এবং লাহোরে বিপদ তৈরি করবে। তাদের যাত্রা খালসা সৈন্যবাহিনী আগেই অনুধাবন করে ব্যবস্থা নিয়েছিল। একদলকে পাঠানো হলো জেনারেল লিটলারকে ব্যস্ত রাখার জন্য এবং আরেক দলকে অগ্রসরমান গগ ও হার্ডিঞ্জকে বাধা প্রদানে পাঠানো হলো।

১১ ডিসেম্বর ১৮৪৫-এ পাঞ্জাব সৈন্যবাহিনী হরিকি পাঞ্জাবের^{১৬} কাছে সুতলেজ অতিক্রম করা শুরু করে নিজস্ব এলাকাতে নদীর অপরাধী পাশে। ১৩ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জ যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি শিখদের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রবেশের জন্য দায়ী করেন, ‘কোনো ছায়ার প্ররোচনা ছাড়াই।’ সুতলেজের বামপ্রান্তে দরবারকে আটক করা হলো এবং সুতলেজ প্রধানদেরকে ‘সাধারণ শত্রু’^{১৭}দের শাস্তির জন্য সাহায্য করতে ডাকা হলো।

সৈন্যের বক্ষস্থল পূর্ণ ছিল। এই শব্দ ছড়িয়ে পড়েছিল, “আমরা আত্মত্যাগ করব।” *মেমোরিস অফ আলেকজান্ডার গার্ডনার, হিউ পিয়ার্স কর্তৃক সম্পাদিত, পৃ-২৫-৬৫-৬।*

১৫. ১৮১৯এ, নাভার রাজা, রনজিত সিংকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোক প্রধান করেন। পাঞ্জাবের ভূমির বদলে গ্রামে রনজিত সিং এদের মাঝে হতে একজন সর্দারকে দেন। নাভার রাজা জোর জবরদস্তি করেন এবং জড়বীদের লুটে নেন। ১৮৪৩ সালে দরবারের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও, নাভা রাজার কার্যকলাপ ব্রিটিশরা সমর্থন করে।

১৬. প্রকৃত অতিক্রমের তারিখ নিয়ে কিছু সন্দেহ আছে। ব্রিটিশরা মনে করে যে শিখরা ৮ হতে ১২ ডিসেম্বরের মাঝে অতিক্রম করে। কয়েকজন ভারতীয় ইতিহাসবিদ (সীতা রাম কোহলি এবং ডঃ গান্ধা সিং)-এর মতে তারিখটা পরে-ডঃ কোহলির মতে মূলত ১৪ বা ১৫ ডিসেম্বর, মানে হার্ডিঞ্জের যুদ্ধ ঘোষণার পরে। এই বিষয়ে সন্দেহ আছে যে, হার্ডিঞ্জের ঘোষণা দেয়া হয় কিছু শিখ দলের অতিক্রমের পরে। সম্ভবত এই কাজটি ছোট নৌকা ভর্তি এবং বেশি প্রতরা দিয়ে সংঘটিত হয় যা সমাপ্ত হতে কয়েকদিন নেয়।

১৭. যুদ্ধের ঘোষণা স্পষ্টভাবে দেয়া সত্ত্বেও, লর্ড হার্ডিঞ্জ তার এই কার্যকলাপের নৈতিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। পাঁচ দিন পরে তিনি ব্রডফুটের নিজস্ব সহকারী রবার্ট কাস্টকে জানান

ইংরেজদের বিরুদ্ধে দরবার যে দল পাঠিয়েছিল তা জানা যায়নি, কিন্তু-এর কোনো প্রমাণ ছিল না যে তা ছিল শত্রুদের দল থেকে বড়। এখানে যেভাবেই হোক কিছু সন্দেহ ছিল যে, উভয় কমান্ডার লাল সিংহ^{১৮} এবং তেজ সিং ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ রাখছিল এবং খুব সম্ভব রানী জিনদান অবগত ছিলেন যে, লাল সিং ইংরেজদের লিখেছেন, ‘তাকে বিবেচনা করার জন্য এবং বন্ধু হিসেবে বিবি সাহেবা (জিনদানকে) ভাবার জন্য এবং তাদের জন্য বুরচাদের কেটে ফেলতে (রাফিয়ানরা যেমন— খালসা)।’^{১৯}

‘ইংল্যান্ডের জনতা কি এটাকে আমাদের সীমান্তে প্রকৃত অর্থে প্রবেশ এবং যুদ্ধের নৈতিকতা নিয়ে বিবেচনা করবে?’ এটা বিস্ময়কর নয় যে কাস্ট ব্রিটিশবাহিনীর অধসরতাকে ‘স্বাধীন পাঞ্জাব রাজ্যে প্রথম ব্রিটিশের প্রবেশ’ নাম দেন। *লিংগুইস্টিক এ্যান্ড ওরিয়েন্টাল এসেইস*, ভি, ৪৬-৭।

অন্য দুইজন ব্রিটিশ অফিসারদের মতামতের কোন নির্দিষ্ট মূল্য ছিল না যারা ইংরেজ-পাঞ্জাবি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত ছিল। নর্থ ওয়েস্টার্ন এজেন্টের মেজর জি. কারমাইকেল স্মিথ লেখেন : ‘পাঞ্জাব যুদ্ধ সম্পর্কে, আমি মানতে পারছি না যে শিখরা কোন উস্কানি ছাড়াই আক্রমণ করেছে বা আমরা তাদের সাথে খুব ধৈর্যের আচরণ করেছি, শিখদের যদি পুরোপুরিভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের কাছে জবাবের অপেক্ষা না করেই বিবেচনা করা হয়, আমাদের তাদেরকে প্ররোচিত করা উচিত নয়— দাবির জন্য যে সারিসারি নৌকা বম্বে হতে আনা হয়, তা যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য নয়, কিন্তু প্রতিরক্ষার জন্য যা বিরক্তিকর; এর পাশাপাশি শিখরা স্যার চার্লস নেলসনের বক্তব্য অনুবাদ করে (যা দিল্লি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল) যাতে বলা হয় যে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি; এবং এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় শক্তি দেখানো হয় যে শিখরা তাদের ময়দানে এটাই প্রথমবার। তারা আমাদের রাজত্বের প্রবেশ করেনি, কিন্তু তাদেরটাতে ছিল।’

‘...এবং আমি শুধু জিজ্ঞাসা করেছি, সর্বপ্রথমে আমরাই কি বন্ধুত্বের নিয়ম হতে সরে আসিনি? যুদ্ধের আগের বছরে ফিরোজপুর ও পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী স্থান আমরা রেখেছি, যদিও এটা শিখদের ছিল তারা গভীর পানিতে পড়েছিল এবং দ্বীপের মাঝখানে।’

‘... কিন্তু অপরক্ষেত্রে ১৮০৯-এর চুক্তিমতে, দুই সরকারের মধ্যে হুদাতা তৈরি হয়েছিল, তাহলে সোজা প্রশ্ন হল, কে প্রথমে এই “বন্ধুত্ব” থেকে সরে আসলো? আমার মতামত হল আমরাই সরে এসেছি।’ *হিস্টি অফ দ্য রেইনিং ফ্যামিলি অফ লাহোর*।

এমনকি আরও দুঃখজনক বিষয় হল স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে তখন কৈথালে নিয়োগ করা হল (একটি শিখ রাজ্য যা ব্রিটিশ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত)। তিনি লিখেছিলেন : ‘এটা ইতিহাসের বর্ষপঞ্জিতে উল্লেখ থাকবে, অথবা যাকে আমরা ইতিহাস বলি, তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে যাবে এভাবে যে, আমাদের আক্রমণ করার লক্ষ্যে শিখ সেনাবাহিনী ব্রিটিশ রাজত্বের প্রবেশ করে এবং অনেক মানুষ খুব অবাধ হবে এই শুনে যে তারা এমন কোন কিছু করেনি। তারা আমাদের সেনানিবাসে কোন আক্রমণও করেনি বা আমাদের সীমানায় পা পর্যন্ত দেয়নি। তারা যা করেছে তা হল নদী অতিক্রম এবং নিজস্ব রাজত্ব দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছে।’ *মেমোরিজ অফ মাই ইন্ডিয়ান ক্যারিয়ার*, পৃ-৭৮ দেখুন *ডব্লিউ ডব্লিউ হাম্বলি, জার্নাল অফ এ ক্যাভালরি অফিসার*, পৃ-৩৭।

১৮. সুতলেজ অতিক্রম করার সময় লাল সিং প্রথমে যে কাজটা করেন তা হল ফিরোজপুরে ক্যাপ্টেন নিকোলসনকে লেখেন ‘আমি শিখ সেনা নিয়ে অতিক্রম করেছি। তুমি ব্রিটিশদের জন্য আমার বন্ধুত্ব সম্পর্কে জানো, বল কি করতে হবে।’ নিকোলসন জবাব দিলেন ‘ফিরোজপুরে আক্রমণ করো না। যতদিন পারো স্থিত অবস্থায় থাকো এবং পরে গভর্নর জেনারেলের দিকে অধসর হও।’ *গান্দা সিং, প্রাইভেট কনসপন্ডেন্স রিলেটিং টু দ্য অ্যাংলো শিখ ওয়ারস*, পৃ-৯০৭। আরও *ডব্লিউ ডব্লিউ হাম্বলেই, জার্নাল অফ এ ক্যাভালরি অফিসার*, পৃ-৪০-২।

১৯. নিকোলসনের ডায়েরী হতে ১২ ডিসেম্বর ১৮৪৫ তারিখের।

গ. মাডকির যুদ্ধ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৪৫

দূরবারের সেনাবাহিনী দুইভাবে বিভক্ত হয়েছিল। তেজ সিং ফিরোজপুরের দিকে অগ্রসর হয়েছিল জেনারেল লিটলারের সাথে বোঝাপড়ার জন্য। ফিরু শহরের (পরে ফিরোজ শহর নামে পরিচিত) কাছে গ্রামে লাল সিং একটি বড় জায়গা দখল করেন এবং নিজেই গগ ও হার্ডিঞ্জকে বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হন। তিনি বুঝতে পেরে অবাক হন যে, ব্রিটিশরাও মাডকি থেকে দূরে অবস্থান করে অগ্রসর হচ্ছে। শত্রুপক্ষের লোকবল ও অস্ত্রবল বেশি থাকা সত্ত্বেও যখন নিহাল সিং ফিরোজ শহর থেকে চলে যাচ্ছিলেন তখন তার দলকে শত্রুভাবাপন্ন হওয়ার আদেশ দেন। নেতাবিহীন পাঞ্জাবিরা হাতাহাতি যুদ্ধ করে বহু সংখ্যক শত্রুর বিরুদ্ধে যারা খুব অভিজ্ঞ ইউরোপীয় কমান্ডার কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল। মধ্যরাত পর্যন্ত আতঙ্কের সাথে এই যুদ্ধ অব্যাহত ছিল (এবং এই হতে ‘মধ্যরাত মাডকি’ হিসেবে পরিচিত)। তাদের অর্ধেক সৈন্য ও পনেরোটি বন্দুক হারানোর পর, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঞ্জাবিরা অব্যাহতি দেয়।

মাডকিদের যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকলাপ খুব বেশি সেনাবাহিনীর দিক থেকে গুরুত্ব পায়নি ব্যতিক্রম ছিল এটা ব্রিটিশদের জন্য পাঞ্জাবি সৈন্যদের সাথে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জনের সহায়ক। ব্রিটিশ সৈনিকদের ক্ষতি হয় অনেক বেশি; ২০ আশালা, মীরাট এবং দিল্লি হতে শক্তি পাঠানো হলো। লর্ড হার্ডিঞ্জ তার গভর্নর জেনারেলের উচ্চপদ ছেড়ে দিলেন এবং তার কমান্ডার প্রধানের দ্বিতীয় কমান্ডার হতে রাজি হলেন। সুতলেজের দিকে অগ্রসরতা পুনরায় শুরু হলো।

Bangladesh

ফিরোজশহরের যুদ্ধ, ২১ ডিসেম্বর ১৮৪৫

২১ ডিসেম্বরের সকালে পাঞ্জাবিদের মাঝে গগকে ফিরোজশহরে দেখা যায়। দুপুরের দিকে জেনারেল লিটলার, যিনি তেজ সিং-এর কাছ হতে পালিয়ে এসেছিলেন, গগের সাথে দলে যোগদান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ কমান্ডাররা তৎক্ষণাৎ আক্রমণের আদেশ দিল। যুদ্ধটা শুরু করতে দুপুরের পর যা হলো তা বছরের সবচেয়ে ছোট দিন। ব্রিটিশরা পাঞ্জাবিদের তাড়াতে চাইল বিশাল অশ্বারোহী, পদাতিক বাহিনী এবং গোলন্দাজ বাহিনী দিয়ে হত্যা। সন্ধ্যাজুড়ে যুদ্ধ আরও হিংস্রতার সাথে জেগে উঠল যতক্ষণ না দুই সেনাদল অন্ধকারে ডুবে যায়। একটি কামান পাঞ্জাবি গোলাবারুদের উপর পড়ে এবং অনেক তাঁবুতে আগুন ধরে যায়। পাঞ্জাবিরা দুর্ভাগ্যে পড়ল শত্রুপক্ষ আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে যারা তাদের সীমানায় প্রবেশ করেছে। মধ্যরাতে যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে চাঁদ উঠাতে পাঞ্জাবিদের আরেকটা সুযোগ করে দিল শত্রুদের কতল করার

২০. ৮৭২ জন মৃত ও আহত হয় কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল স্যার রবার্ট সেন, স্যার জন ম্যাকগাসকিল এবং ব্রিগেডিয়ার বলটনসহ।

জন্য এবং যে ভূমি তারা হারিয়েছিল তা অর্জনের জন্য। ব্রিটিশদের প্রচুর ক্ষতি হলো, গভর্নর জেনারেলের দলের প্রতিটি সদস্যই নিহত অথবা আহত হয়েছে,^{২১} সেই শীতের রাতে 'ভারতের ভাগ্য ভারসাম্যের জন্য কেঁপে উঠছিল।'^{২২}

ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্রিটিশদের সৈন্যবাহিনীর উপর দিয়ে সূর্য উঠল ফিরোজশহরের ভূমিতে। এতে গোলাবারুদের ভান্ডার নিয়ে গেল, এবং যুদ্ধের জন্য মানুষজনের মনে স্বাভাবিক অবস্থা ছিল না। এই সময় তেজ সিং ফিরোজপুর থেকে তাদের দলসহ পৌঁছালেন, যুদ্ধের জন্য তৈরি ও আগ্রহী অবস্থায়।^{২৩}

তেজ সিং-এর বন্দুক হতে গুলি চলল, ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে উত্তর দেবার মতো কিছু ছিল না। তারপর কোন কারণ ছাড়াই, তেজ সিং-এর বন্দুকও চুপ করে গেল, এবং কয়েক মিনিট পরে, তেজ সিং তার দলকে ফিরে যেতে বলল। লর্ড গগ দ্রুত বুঝতে পারল যে শিখ কমান্ডার তার বিশ্বাসঘাতকতার ওয়াদা পূর্ণ করেছে। সে তার অশ্বারোহী বাহিনীকে আদেশ দেয় ফিরোজশহর দখল করতে। প্রতিরক্ষাবাহিনী, যারা খুব বিশ্বাসের সাথে আশা করেছিল যে তেজ সিং শত্রুদের তাড়িয়ে আকস্মিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে কিন্তু পরে তারা অবাক হয়েছিল। তারা তাদের নিবাস হতে পলায়ন করলো, ফেলে গেল তাদের বন্দুক-গুলি, ৮০,০০০ পাউন্ডের বারুদ এবং তাদের সব মজুদ।^{২৪}

২১. মৃতদের মাঝে কুখ্যাত ব্রডফুটও ছিল।

২২. স্যার হোপ গ্রান্ট, একজন ব্রিটিশ জেনারেল যিনি ইংরেজ-শিখদের যুদ্ধে লড়েছিলেন, লিখেছেন : 'সত্যিকার অর্থে সেই রাত ছিল বিষাদ, হতাশার ও আসন্ন ভীষণতার রাত এবং কখনও আমাদের ভারতের যুদ্ধের বর্ষপঞ্জিতে এমন হয়নি যে বিপুল পরিমাণে ব্রিটিশ সৈন্য থেকেও প্রতিরোধ না করতে পেরে পূর্ণধ্বংস হয়েছে। সত্যিকারভাবেই শিখরা তাদের ক্যাম্পের দখলকৃত অংশ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়; আমাদের বিধ্বস্ত এবং দুর্দশাগ্রস্ত বিভাগগুলো কোন আলোচনা ছাড়াই বড় জায়গা জুড়ে অস্থায়ী শিবিরে পরিণত হয়...' লাইফ অফ জেনারেল স্যার হোপ গ্রান্ট, ও ৫৮-৯, এইচ. নলিস কর্তৃক সম্পাদিত।

লর্ড হার্ডিঞ্জ তার ছেলেকে মাডকি ফেরত পাঠালেন তরবারিসহ যা তাকে তার নেপোলীয়ান প্রচারণা কাজের জন্য দেয়া হয়েছে এবং বলা আছে যে যুদ্ধের সময় তার ব্যক্তিগত কাগজপত্র ধ্বংস করার জন্য। রবার্ট কাস্টের ডায়েরীর প্রথমদিকে দেখানো হয়েছে যে ব্রিটিশ জেনারেল তাদের অস্ত্র ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ২২ ডিসেম্বর গভর্নর জেনারেলের কাছ হতে খবর আসে যে গতকালকের আমাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে, যে ব্যাপারগুলো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, সে রাজ্যের সব কাগজপত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং যদি সকালের আক্রমণ ব্যর্থ হয়, তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে; এই ব্যাপারটা কুরি গোপন করেছিলেন এবং আমরা শতহীনভাবে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম আহতদের বাঁচানোর জন্য, খবরের এই অংশটি আমাকে সবচেয়ে বেশি দুঃখ দিয়েছে।' লিংগুইস্টিক অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল এসেস, VI, ৪৮।

২৩. আরও দেখুন ভল্যুম II, পৃ. ১৬২ দ্য অটোবায়োগ্রাফী অফ ল্যাফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার হ্যারি স্মিথ, যা জি.সি. মুর স্মিথ কর্তৃক সম্পাদিত।

২৪. যুদ্ধের পরপরই, তেজ সিং ব্রিটিশদের ক্যাম্পে যান এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের দুইজনের মাঝে কি হয় তা জানা যায়নি; কিন্তু পাশাপাশি ব্রিটিশরা বিশ্বাসঘাতকের সাথে কী করে, তা অনুমান করা কঠিন নয়।

ফিরোজশহরের দুর্যোগে কিছু সংখ্যক দরবার সদস্যদের নৈতিকতা ভেঙে দিল যারা এতদিন ধরে দেশের প্রতি অনুগত ছিল। গুলাব সিং ডোগরা লুধিয়ানায় তার দূত পাঠায় ব্রিটিশকে তার সাহায্যের জন্য আলোচনার ব্যাপারে;^{২৫} অন্যান্য অনেক সদস্য তার অনুসরণ করে।^{২৬} আরও বিপত্তি বাধানোর জন্য হার্ডিঞ্জ সকল হিন্দুস্থানী প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করে স্বেচ্ছা দেয় দরবার হতে প্রত্যাহার করার জন্য, তাদের সম্পত্তির উপর জরিমানা দেয়ার জন্য এবং ব্রিটিশ সরকার থেকে নিরাপত্তার দাবি করা হয়।

বাড্ডোওয়াল, ২১ জানুয়ারি ১৮৪৬।

আলীওয়াল, ২৮ জানুয়ারি ১৮৪৬।

লর্ড গগ সুতলেজ অতিক্রমের আগে এবং লাহোরে প্রবেশের আগে সিদ্ধান্ত নিলেন শক্তির সাহায্য না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। দরবার তথ্য পেল যে শত্রুপক্ষ দিল্লি ও আম্বালা থেকে উত্তরের দিকে গুলি ও কামান সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। লুধিয়ানায় এসব অস্ত্রশস্ত্র জড়ো করা হয়েছিল ফিরোজপুরে দল পাঠানোর আগে।^{২৭}

রানযোধ সিং মাজিথিয়া এবং লাডওয়ার অজিত সিং সুতলেজ অতিক্রম করেন ফিলৌরে দলে ৮০০০ মানুষ এবং ৭০ বন্দুক নিয়ে। দ্রুত গদক্ষেপের মাধ্যমে তারা ফতেহগর, ধর্মকোট, গঙ্গারানা এবং বাড্ডোওয়ালের দুর্গ স্বাধীন করেন এবং লুধিয়ানা থেকে সাত মাইলের দূরত্বে বরাণ হারিতে আস্তানা গড়েন। পাঞ্জাবিরা লুধিয়ানা সেনানিবাস দখল করে এবং আগুনের জন্য অনেক ব্যারাকের ব্যবস্থা করে। লুধিয়ানাকে মুক্ত করতে স্যার হ্যারি স্মিথকে পাঠানো হয়। তিনি ফিরোজপুর থেকে উত্তরদিকে যান। সুতলেজ থেকে কিছু মাইল দূরে। রানযোধ সিং মাজিথিয়া স্মিথের দলকে নাগালে পান এবং যখন স্মিথ বাড্ডোওয়ালে বিকল্প পথ ব্যবহারের চেষ্টা করেন, তখন তাকে হিংস্রতার সাথে আক্রমণ করেন এবং তার মালপত্র এবং রসদ দখল করেন।^{২৮}

২৫. এসসি ৩১৯, ২৬-১২-১৮৪৬।

২৬. ডিসপ্যাচ টু সেক্রেট কমিটি নং ২, ২৬-১২-১৮৪৬।

২৭. এসসি ২৪৬, ২৬-১২-১৮৪৬, দরবার দলে অনেক হিন্দুস্থানী সিপাহী ছিল জমাদার খুশাল সিং এবং তার ভতিজা তেজ সিং, মীরাট-এর প্রধান কমান্ডার।

২৮. স্যার হ্যারি স্মিথ, রানযোধ সিং মাজিথিয়ার বাড্ডোওয়ালে চাতুরীর জন্য উপটোকন পাঠান। 'এটা ছিল সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত সময়', তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, 'এবং সে জানে তার জায়গায় কিভাবে মুনাফা করতে হয় তাই সে এমন অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। যেরকম তার ফরাসি শিক্ষক শিখিয়েছে সেরকম আক্রমণাত্মকভাবে আমাকে তার আক্রমণ করা উচিত ছিল এবং আমাকে ধ্বংস করা উচিত ছিল, আমার তুলনায় তার দল অনেক ভারী ছিল; তারপর লুধিয়ানার

কিছুদিন পরে, স্যার হ্যারি স্মিথ যে শক্তি-সাহায্যের আশা করেছিলেন তা পেলেন এবং পাঞ্জাবিদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। আলিওয়ালে স্মিথের সাথে রানযোধ সিং মাজিথিয়া ও লাডওয়ার অজিত সিং-এর কঠিন লড়াই হয় (দু'জনেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন)। এর আগে পাঞ্জাবিরা কিছু দিতে অস্বীকার করলো।^{২৯} অনেক মানুষ লড়াইয়ে মারা যায়; অনেকে নদীর গভীরে ডুবে যায়। শত্রুদের কাছে ছাপ্পান্নটি বন্দুক হারায়।

সাব্রাওন, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৬

আলিওয়ালে অস্ত্র ও বর্ম প্রস্তুতকারীদের হারিয়ে দরবারের সৈন্যরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নেয়। এটা অনিশ্চিত ছিল যেখানে শত্রুরা সুতলেজ অতিক্রম করতে পারে এবং তাই তাদের দলটিকে ভাগ করে দেয়। লাহোরে শত্রুদের অগ্রগতি পরীক্ষা করার জন্য সৈন্যবাহিনীর একটি বড় অংশ সাব্রাওন গ্রামের কাছে সুতলেজে ঘোড়ার খুরের ন্যায় রেখার মতো দখল করে; এটা করা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক তেজসিং-এর আদেশে, অপর বিশ্বাসঘাতক লাল সিং নিজে নদীর থেকে কিছু উপরে লোক দেখানো অবস্থান নেয় অমৃতসরে আক্রমণ বাধা দেয়ার জন্য।

সাব্রাওনে পাঞ্জাবিরা সুতলেজের বাম পাশে অবস্থান নেয় একটি সেতুর সাথে যা তাদেরকে তাদের বেসক্যাম্পের সাথে যুক্ত করে। তাদের বড় বন্দুকগুলো উঁচু বেড়িবাঁধের পিছনে রাখা ছিল এবং পাশাপাশি আক্রমণাত্মক কাজের জন্য অচল করে দেয়া ছিল। পদাতিক সেনাবাহিনীও মাটি দিয়ে নির্মিত প্রতিরক্ষা বাঁধের পেছনে রাখা হয়েছিল এবং যাতে তারা ছড়িয়ে পড়ে শত্রুকে পরাস্ত না করতে পারে।

গগ ও হার্ডিঞ্জ সিদ্ধান্ত নিলেন যে সাব্রাওনে সামনাসামনি পরাস্ত করবেন এবং দরবারের বাহিনীকে এক ফুঁয়ে ধ্বংস করবেন। এই পরিকল্পনা কোন সন্দেহ ছাড়াই করা হয়েছিল এই বিশ্বাসের সাথে যে শিখ কমান্ডাররা তাদের পাশে আছে।^{৩০}

দলের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, তাদের আঘাত করে এবং বরখাস্ত করে এবং শহর জ্বালিয়ে দেয়....' দ্য অটোবায়োগ্রাফি অফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্যার হ্যারি স্মিথ (ভলুম II, ১৮৬-৭)।

২৯. 'যদিও তাদের নেতা রানযোধ সিং প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পলায়ন করেন তার সাহসী অনুসারীদের রেখে হয় জিতবে বা হারবে, তাদের সাহস কখনও কমেনি', হাম্বলি লিখেছেন, 'আবার তারা র্যালি করেছে এবং একটি শেষ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। যদিও যুদ্ধ তাদেরকে বেপরোয়া করেছিল তারা এমন মানুষের মতো যুদ্ধ করেছিল যারা সবার ক্ষতি করতে পারে।' হাম্বলি, *জার্নাল অফ এ ক্যাভালরি অফিসার*, পৃ-১৫০।

৩০. মধ্যবর্তী মানুষের কারণে হেনরি লরেন্স পর্যাপ্ত তথ্য পেতেন লাল সিং-এর কাছ থেকে যা তাকে 'আপাতভাবে শত্রুর অবস্থান ও শক্তি সম্পর্কে ৭ ফেব্রুয়ারির রাতে সাব্রাওনে' তৈরি হতে সাহায্য করে। সেক্রেটারির কাছে প্রধান কমান্ডার হেনরি লরেন্সের প্রেরণ, ১৬ মে ১৮৪৬. হেনরি লরেন্সের ব্যক্তিগত পত্র হতে।

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। পরবর্তী দুই দিন প্রচুর বৃষ্টিপাত হলো আগের মতোই, এবং সুতলেজে সাত ইঞ্চি বৃদ্ধি পেল, নদীর যেসব অংশ হেঁটে পার হওয়া যায় তা প্রায় পারাপারের অযোগ্য হয়ে পড়ল; শুধু একটা দুর্বল সেতু বামতীরের সাথে সেনাদলের ক্যাম্পের সাথে রয়ে গেল। গগ খুব দ্রুত এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। যত দ্রুত বৃষ্টি বন্ধ হলো, সে ফিরোজপুর হতে অগ্রসর হয়ে এবং অন্ধকারের আড়ালে সাত্রাওনে তার দখল নিল।

১০ ফেব্রুয়ারি সকালে নদী থেকে ঘন কুয়াশা বৃষ্টিযুক্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়ল, উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে ঢেকে ফেলল, যখন কুয়াশা ভেদ করে সূর্য উঠল, পাঞ্জাবিরা নিজেদেরকে দুটি ঘোড়ার খুরের মাঝে ঘেরাও অবস্থায় পেল; তাদের সামনে ছিল ব্রিটেনের স্থায়ী অধিবাসীরা এবং পিছনে ছিল সুতলেজ যা এখন উত্তাল। প্রথমদিকে কামানবাজির যুদ্ধের পরে, ব্রিটিশ অশ্বারোহী পাঞ্জাবি বন্দুকের সঠিক স্থান খোঁজার জন্য ভান করে। কামান আবার ব্যবহৃত হলো এবং দুই ঘণ্টার মাঝে ব্রিটিশদের বন্দুকের কারণে দরবারের গোলন্দাজ বাহিনী কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তারপর ব্রিটিশরা পাঞ্জাবের তিন দিক হতে আটক করে ফেলল।

তেজ সিং নদীর উপরের সেতু দিয়ে পালিয়েছিলেন এবং এটাকে ধ্বংস করেছিলেন। কিন্তু বেশিরভাগ জেনারেল যুদ্ধ করার জন্য থেকে যাঁন এর মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন শাম সিং আন্তারিওয়ালা^{৩১} যিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে একরোখাভাবে পাঞ্জাবিদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যারা পালাতে চেষ্টা করেছিল তারা সুতলেজের ঘূর্ণায়মান পানিতে ডুবে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে প্রায় ১০,০০০ জন পাঞ্জাবি প্রাণ হারায়। তাদের সকল বন্দুক হয় দখল করে নেয়া হয়েছে অথবা নদীতে তলিয়ে গেছে। এটা ছিল একটি পূর্ণ এবং ধ্বংসাত্মক লড়াই।^{৩২}

লর্ড গগ সাত্রাওনকে ভারতের ওয়াটারলু হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি পাঞ্জাবিদের পুরস্কার দেন, ‘আমাকে নিয়ে যে ব্যবসা জনতার সামনে এবং

৩১. শাম সিং আন্তারিওয়ালা ছিলেন নিহাল সিং-এর পুত্র, রনজিত সিং-এর একজন মানগণ্য জেনারেল। শাম সিং আন্তারিওয়ালা ১৮০৩ সালে মহারাজার জন্য কাজ করেন এবং মুলতান, কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ করেন। তার মেয়ে রনজিত সিং-এর পৌত্রকে, নও নিহাল সিং-কে বিয়ে করেন। শাম সিং আন্তারিওয়ালা অবিস্মরণীয় খ্যাতি লাভ করেন সাত্রাওনে তার বীরত্বের জন্য। পাঞ্জাবি বার্ড শাহ মোহাম্মদ লেখেন ‘এমনভাবে সাদাদের রক্ত বের হল যেন কেউ চিপে লেবুর রস বের করছে।’

৩২. ‘শিখদের কারণে বলতে হয় যে তারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে; জেনারেল স্যার জোসেফ থ্যাকওয়েল লিখেছেন, যিনি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন; ‘যদিও যুদ্ধ ও ভেঙ্গে চুরে যাওয়ার জন্য তারা কখনও পালাননি, বরং শেষ পর্যন্ত তাদের তলোয়ার দিয়ে লড়ে গিয়েছে এবং আমি তাদের কিছু সর্দার ও মানুষের সাহসীকতার সাক্ষী।’ *মিলিটারী মেমোইরস অফ লে. জেনারেল স্যার জোসেফ থ্যাকওয়েল, সম্পাদনা করেছেন কর্নেল উইলি, পৃ-২০৯।*

লর্ড হার্ডিঞ্জ, যিনি এই যুদ্ধ দেখেছেন, লিখেছিলেন ‘কিছু পালিয়েছিল, বাকিরা বলা যায় আত্মসমর্পণ করেছিল, শিখরা অব্যাহতির সাথে তাদের ভাগ্যের সাথে মিলিত হল যা তাদের দৌড়ের চেয়ে ভিন্ন ছিল।’

ডিসকাউন্ট হার্ডিঞ্জ, পৃ-১১৯।

অসাধারণভাবে শত্রুর পতন দেখে আমার আবেগ ধরে রাখতে পারছি না অথবা নায়কোচিতভাবে, শুধু একাই না সমষ্টিগতভাবে শিখ সর্দার ও সেনাবাহিনী নিয়ে এবং আমি ঘোষণা করছি দেশের ভালর জন্য তারা অভিযুক্ত না। এই ত্যাগের দরকার ছিল, আমার ভয়ঙ্কর হত্যাকারীদের—যারা মানুষের শরীরে নিয়োজিত তাদেরকে মুছে ফেলা দরকার।^{৩৩}

যুদ্ধের সময় মালওয়ার মানুষের ব্যবহার দুঃসাধ্য ছিল এবং ব্রিটিশদের মনোযোগী হওয়ার দরকার ছিল। এই এলাকার অসংখ্য শিখ প্রধানের মধ্যে শুধুমাত্র চারজন—পাতিয়ালা, জিন্দ, ফরিদকোট এবং চাকরাউলি শত্রুকে সাহায্য করেছিল; অন্যরা মাঝামাঝি দলের ছিল অথবা দরবারের সাথে সহানুভূতি প্রকাশ করতো।^{৩৪} দুইজন মুসলিম প্রধানের মধ্যে মালেরকোটলা ছিল ব্রিটিশদের দলে; মামদোত, তার রাজ্যের নিশ্চয়তার প্রস্তাব জেনেও, তার ভাইকে ফিরোজশহরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অনিশ্চয়তায় ঠেলে দিল।^{৩৫} সাধারণ মানুষের ব্যবহার ফিরিজিদের জন্য পুরোপুরি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। কৃষকেরা শস্য বেচতে অথবা খাজনা দিতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আপত্তি করলো।

সুতলেজ প্রচারণার শেষদিকে, ব্রিটিশ সরকার রূপার, লাওয়া এবং আলোওয়ালা দখল করে, নাভা সীমানার এক-চতুর্থাংশ জায়গা নেহা এবং সাহায্যকারী প্রধানদের মাঝে ভাগ করে দেয়। বিচার করার ক্ষমতা থেকে মালওয়া জাগিরদারদের বঞ্চিত করা হয় এবং শুধু খাজনা আদায়ের অধিকার দেয়া হয়।

৩৩. রেইট, দ্য লাইফ এ্যান্ড ক্যাম্পেইনস অফ ভিসকাউন্ট গগ, পৃ-১০৮।

বিশ্বাসঘাতক লাল সিং ও তেজ সিং-কে “স্মরণীয় করে রাখা” হয় তাদের নামে ছন্দহীন কবিতার মাধ্যমে :

লালু দি লালী গায়ি, তেজু দ্য গিয়া তেজ
রান ভিচ পিঠ দিখায়ি কে মোরা আয়ি ফের।

লালু লজ্জাশরমের মাথা খেয়েছে,
তেজুর তেজ হারিয়ে গিয়েছে,
যুদ্ধে তারা উল্টো ঘুরে যাওয়াতে
তারা আটকে গেল এবং যুদ্ধে জয় হল।

৩৪. এতে নাভা, লাওয়া, আলোওয়ালা, মালাউর, থানেসার, রূপার, খেরি, মানি, মাজরা, শাহবাদ, সিকরি, শামগড়, বুড়িয়া এবং আনন্দপুরের সোধিস অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৩৫. এসসি ১৩০০, ২৬-১২-১৮৪৬।

৬. ব্রিটিশদের অধীনে পাঞ্জাব

সাব্রাওনে তাদের জয়ের দুইদিন পরে, ব্রিটিশ দল সুতলেজ অতিক্রম করে এবং কাসুর দখল করে। দরবারের ক্ষমতা গুলাব সিং ডোগরাকে দেয়া হয়,^১ যিনি আগেই পাহাড়ি সেনাসহ লাহোরে নেমে এসেছিলেন শান্তিচুক্তির আলোচনার জন্য। গুলাব সিং ডোগরাকে প্রথমে সেনা পঞ্চায়েত আশ্বস্ত করে যে তারা তার শর্তে রাজি হবে এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের অধীনে দরবার থাকবে। হার্ডিঞ্জ আগেই ঠিক করেছিলেন যে শিখ রাজ্যের ভবিষ্যত কি হবে। তিনি জানতেন এখনও অনেক সৈন্য দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অধিকার আদায়ের জন্য; তাই তিনি নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন যথাযথ সময়ের সদ্ব্যবহার করার জন্য। তিনি রাজ্যকে দুর্বল করে দিয়েছিলেন তাকে তার মূল্যবান, রাজ্য হতে বঞ্চিত করে, সেনাসংখ্যা কুশ্লি দিয়ে এবং সীমান্তে উচ্চতর প্রতিদ্বন্দ্বীপূর্ণ ক্ষমতা স্থাপন করে। এসব শর্ত দরবারের চুক্তিতে চাপিয়ে দেয়া হয়।

১. ব্রিটিশদের কাছে গুলাব সিং গ্রহণযোগ্য ছিল কারণ তাদের সাথে তার পূর্বেই চুক্তি হয়েছিল এবং সে ডোগরাদের পাঞ্জাবিদের সাথে যোগদান করা থেকে বিরত রাখতে পেরেছিল। ১৮৪৬-এর জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন দূতের মাধ্যমে গুলাব সিং গভর্নর জেনারেলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিল। এদের মধ্যে একজন ছিল বাঙালি চিকিৎসক, বানসি ধর ঘোষ, যিনি একটি চিঠি তার মনিব থেকে লেফটেন্যান্ট ই. লেককে (গভর্নর জেনারেলের সাহায্যকারী দূত) ১৫ জানুয়ারি ১৮৪৬ সালে পৌছে দেন। তার একত্রে মিলে কাজ করার প্রস্তাব ডোগরার আগেই পেয়েছিল। সে লিখে ‘যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে চায়, তাকে অবশ্যই দিন গুরুর সাথে সাথে যাত্রা করতে হবে; যদি সে দেরি করে তবে রাত তার কাছে চলে আসে মনে হয় যে, সে তার হৃদয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে পেরেছে; পর্বতের গভীরতায় যে গুপ্তধন লুকানো আছে তা তার জন্য পুরস্কার হয়ে দাঁড়ায়, যে সর্বপ্রথমে এর চূড়ায় পৌছায়; এসসি ৩১৯, ২৬-১২-১৮৪৬।

ফেব্রুয়ারি ১৮৪৬-এর প্রথমে গুলাব সিং তার নিজস্ব দূতকে পাঠায় মেজর হেনরি লরেন্সের কাছে যে ব্রডফুটের কাছ হতে গভর্নর জেনারেলের সংস্থার দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিল, এটা পরিষ্কার যে সাব্রাওনের যুদ্ধের পূর্বেই ব্রিটিশ ও গুলাব সিং-এর মাঝে সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। গোপন কমিটিতে তার লেখা ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৬-এর চিঠি অনুযায়ী যেমনটা বলা হয়েছে, হার্ডিঞ্জ গুলাব সিং-কে আশ্বস্ত করে যে তার চাহিদাগুলো পূর্ণ বিবেচনায় রাখা হবে। কানিংহামস হিন্ডি অফ দ্য শিখস-এর ১৯৫৫তম সংখ্যায় সম্পাদকের মতে, মূলতঃ হার্ডিঞ্জ ও গুলাব সিং-এর মধ্যের যোগাযোগ ফাঁস হওয়াতে কানিংহামকে রাজনীতি থেকে সৈন্যবাহিনীতে নেয়া হলো।

ক. লাহোরের চুক্তিসমূহ, ৯ এবং ১১ মার্চ ১৮৪৬^২

জয়ী ব্রিটিশদের শর্তের চাপে পড়ে দরবারকে জালান্দার দোআব ছেড়ে দেয়ার জন্য জোর করা হলো,^৩ যুদ্ধে ১ কোটি রুপি খরচ করা হলো, এর সেনাসদস্য ২০,০০০ পদাতিক বাহিনীতে ও ১২,০০০ অশ্বরোহীতে কমিয়ে আনা হলো, সুতলেজের প্রচারণার সময় যেসব বন্দুক ব্যবহৃত হয়েছে তা ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সুতলেজের উভয় তীরের ভার ব্রিটিশরা নিয়েছে। আরেকটি শর্ত পরে যোগ করা হয় : লাহোরে একটি ব্রিটিশ দল পাঠানো হবে যতক্ষণ না বছরের শেষ পর্যন্ত খরচের হিসাব দেয়া হবে। যদিও রানী জিনদান রাজপ্রতিভা হিসেবে এবং রাজা লাল সিং উজির হিসেবে ছিলেন, মূল ক্ষমতা ব্রিটিশ অধিবাসী কর্নেল হেনরি লরেন্সের কাছে ছিল।^৪

দরবার পুরো যুদ্ধের খরচ বহনে অসমর্থ ছিল এবং পাহাড়ী এলাকার রাস্তার বদলে বিস এবং ইন্দাসের মাঝে কাশ্মীর ও হাজারাসহ। এই পুরো জায়গা নিয়ে হার্ডিঞ্জ খুব শান্তিতে ছিলেন।^৫ ডোগরাদের শক্তিশালী করে পাঞ্জাবিদের দুর্বল করার যে কৌশল তার জের ধরে, সে চক্কি নদীতে রেখা টানল ও কুলু, মন্দি, নুরপুর ও কংসা (যা— ছাড়া) রেখে দিল বাকিগুলো বিক্রি করে দিল গুলাব সিং ডোগরার কাছে ৭৫ লাখ রুপিতে।^৬ ১৬ মার্চ ১৮৪৬, অমৃতসরে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

২. দেখুন পরিচ্ছেদ ২ এবং ৩।

৩. জালান্দার দোআবকে অধিকার করা হয়েছিল কারণ মনে করা হয়েছিল সুতলেজের চেয়ে ভূমিখণ্ড সেনাবাহিনীর সীমান্ত হিসেবে ভালো, এবং তাদের আশা ছিল রাজ্য দুর্বল হয়ে যাবে যা গড়ে তুলেছিল ‘সেনা ব্যবস্থাপনাটি যে কোনো ব্রিটিশ সেনার এ যাবৎ পর্যন্ত দেখা সবচেয়ে ভাল প্রশাসন ছিল।’ জালান্দার দোআবও খুব উর্বর ছিল, যা ৩০ লাখ রুপি প্রতি বছরে অর্জন করে ব্যবস্থাপনার সকল খরচের অর্থ জোগানোর পরেও, এটা সহজেই চাকরির ক্ষেত্রে খরচ যোগাতে পারে।

৪. ‘সংখ্যা লঘুত্বের সময় আমরা যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিলাম তার মাঝে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে লাহোর চুক্তি, মার্চ ১৮৪৬ মতে, পাঞ্জাব কখনও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না, আমার যোগকৃত অংশবিশেষ মতে, রাষ্ট্রের প্রধান না যুদ্ধ না শান্তি করতে পারবে আর না সীমানার এক একর বদল বা বিক্রি করতে পারবে, না একজন ইউরোপীয় কর্মকর্তাকে যুক্ত করতে পারবে, না আমাদেরকে সীমান্ত থেকে ফিরিয়ে দিতে পারবে, না এমন কিছু করবে (তাদের নিজস্ব প্রশাসন ব্যতীত) যাতে আমাদের মতামত নেই। এমনকি প্রতিবেশী রাজপুত্র আমাদের শৃঙ্খলে বন্দি এবং আমাদের নিরাপত্তায় থাকবে এবং অবশ্যই আমাদের জন্য নিলামে চড়বে।’ হেনরি লরেন্সকে হার্ডিঞ্জ, ১৪ আগস্ট ১৮৪৭; এডওয়ার্ডস ও মেরিভেলি, লাইফ অফ হেনরি লরেন্স, পৃ-৪১৭।

৫. ‘এর জন্য আমাদের সাথে ঝামেলা হতে পারে অনেক ক্ষমতাবান প্রধানদের সাথে। যাদের জন্য দমনমূলক বড় সেনাবাহিনী স্থাপিত হয়েছিল, আমাদের প্রদেশ ও সেনা সম্পদের কাছ থেকে ভাল দূরত্ব দরকার.... দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে হবে এবং জনতার ভিড়ের সাথে আমাদের এমন কিছু করতে হবে যা এ যাবৎ পর্যন্ত হয়নি। রাজ্যে আমাদের শাসনকাল, ব্যতিক্রম কাশ্মীর, যা তুলনামূলকভাবে অনুর্বর এবং চাকরি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্বল্পই খরচ যোগাতে পারবে।’ গভর্নর জেনারেলস ডেসপ্যাচ টু সেক্রেট কমিটি নং ৭, ৪ মার্চ, ১৮৪৬।

৬. ‘অপরক্ষণে রাস্তা ঘুরে গেল যখন রাজা গুলাব সিং ও জম্মু পরিবারের পুরো পাহাড় এর অন্তর্ভুক্ত হয়; এবং যখন সীমান্ত রেখা লাহোর হতে দুর্বল হতে শুরু করে সে বোঝা যায় না অন্যান্য এশিয়ার

হলো যাতে গুলাব সিং ডোগরাকে জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ডোগরা আশাতীত পুরস্কার পেল তার সাহায্যের জন্য।^৭ সে পুরস্কার গ্রহণ করলো, নিজেকে সত্যবাদী হিসেবে যার খারিদ—অর্থাৎ স্বর্ণ দ্বারা ক্রয়কৃত দাস।

পাঞ্জাবের বাকি অংশ^৮ তিনভাগে বিভক্ত করা হয় লরেঙ্গ ভাইদের ও গুলাব সিং ডোগরার মাঝে; কমিশনার হিসেবে জালান্দার দোআব শাসন করেন; পেশোয়ারে থেকে জর্জ হাজারা^৯ও দেরাজাত নিয়ন্ত্রণ করেন। নির্দিষ্ট জায়গায় ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয় রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ ও দরবারের কার্যকলাপে তাদের সাহায্যের জন্য। তরুণ মহারাজা ও তার দরবার রাজ্যে নকল সাজসজ্জায় ছিল সে সবই বিলীন হতে চলেছে শুধু নাম ছাড়া।^{১০}

শক্তির মধ্যে এটা অবস্থানের গর্ব, এর অবস্থান আমাদের রাজা গুলাব সিং-এর শেষদিকের বিবেচনা সম্পর্কে অবহিত করে, তাকে নিয়ে যে ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত যেমন এশিয়ার অন্য প্রধানরা একতা থেকে ব্রিটিশরা চাহিদার দিকে ঝুঁকে, হুমকি ও আঘাত করার জন্য একটি শক্তিশালী ও বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে এবং যা করা প্রয়োজনীয় ছিল। লাহোর রাজ্য তার সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ছিল এবং একই সময়ে আমাদের নিরাপত্তার জন্য তারা ক্যাম্পের ক্ষতিপূরণ দেয়, যা আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত করেছে এবং ব্যতিক্রম হল সীমানায় লাহোর সরকার তা বহন করার অবস্থায় নেই।’ ইবিদ, ৪ মার্চ, ১৮৪৬।

৭. ‘কাশ্মীর থেকে বঞ্চিত করে শিখদের দুর্বল করা গত মাঠেই দরকার ছিল। কাশ্মীর ও সূতলেজের মধ্যকার দূরত্ব ছিল ৩০০ মাইল যা পাহাড়ী দেশের জন্য কঠিন, পুরোপুরি অবাস্তব ছিল হয় মাসের জন্য। কোনো সহযোগিতার সম্ভাবনা থেকে ব্রিটিশদের ৩০০ মাইল দূরে রাখতে ব্যবস্থা নেয়া হয়—যা সোজা এবং অভিজাত মণ্ডলীর সদস্য নয়; ভিসকাউন্ট হার্ডিঞ্জ, পৃ-১৩৩।

৮. রাজ্যে যে রাজস্ব ছিল হিসাবমতে তা ১ কোটি এবং ৬০ লাখ রুপি (১,৬০০,০০০ ট) খরচ কেটে নেয়ার পরে বাকি ছিল ১০৮ লাখ রুপি (১,০৮০,০০০ ট) :

জেলাসমূহ	অবশিষ্ট রাজস্ব	মোট রাজস্ব
পেশাওয়ার	২৬৪,৯৬৫	১,৩৩৯,০৪৭
মুলতান	৩,০০০,০০০	৪,৭৪৩,৭৫৫
পাঞ্জাব	৭,৫৫৪,১৯৫	১০,০২২,৪২০

(উপরোক্ত জেলা ও ১০,৮১৯,১৬০ ১৬,১০৫,২২২
জালান্দার দোআব ব্যতিত)

এসসি ১৩২৫, ২৬-১২-১৮৪৬

৯. হাজারাকে নিতে গুলাব সিং-এর অনিচ্ছা (ও অসমর্থ) ছিল। তাকে পাশাপাশি জম্মু রাজ্য দিয়ে বুঝ দেয়া হল। জনতার উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেয়া হল (৬ নম্বর, ২৫ মে ১৮৪৭ তারিখে) দরবার কর্তৃক যা বদল নিয়ে বলেছে ‘হাজারা দেশটি খেলাম নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সমানভাবেই নদীর পূর্বদিক জম্মুর দিকে যায়।’ এসসি ১৩৪, ২৬-৬-১৮৪৭।

১০. এপ্রিল ১৮৪৬-এ একটা ঘটনা ঘটে যা ইতিহাসে পরিচিত ‘গরুর সারি’ হিসেবে। এটা ইঙ্গিত করে ‘রক্ষকের’ মনের অবস্থা ও তাদের মানুষের প্রতি ব্যবহার।

একজন ইংরেজ হাবিলদার, গরুর পালের চাপে বিরক্ত হয়ে এর মাঝে কয়েকটাকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলে, এবং এভাবে হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মাঝে ধর্মীয় আঘাত হানে। প্রশাসনের আবাসিক ও অন্যান্য কর্মকর্তা যারা শহরে যায় ব্যাখ্যা করার জন্য হাবিলদারের অশোভন আচরণের

চুক্তিতে দরবার ও গুলাব সিং-এর সাথে জোর করার জন্য ব্রিটিশদের কিছু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। হেনরি লরেন্স কংথার দিকে একটি দল নিয়ে গিয়েছিলেন দুর্গ দখল করার জন্য। কাশ্মীরের অবস্থা ছিল আরও চতুরতা সম্পন্ন। গভর্নর শাইখ ইমামুদ্দিন দরবার থেকে আদেশ পান প্রশাসনের দায়িত্ব গুলাব সিং ডোগরাকে হস্তান্তরের জন্য। একইসময়ে তিনি একটি গোপন চিরকূট পান রাজা লাল সিং-এর কাছ থেকে (যিনি ব্রিটিশ সরকারের গুলাব সিং-এর প্রতি উদারতার জন্য বিরক্ত ছিলেন) পরামর্শ দেন ডোগরাকে অনাহূত প্রবেশে বাঁধা দেয়ার জন্য।^{১১} শেখ যিনি আশা করেছিলেন তার চাকরি নিশ্চিত হবে এর বদলে তার বিরুদ্ধে যে ডোগরারা আছে বহিষ্কৃত হলেন। আবারও একবার হেনরি লরেন্স আনুগত্যের পরিচয় দিলেন। আবাসিকদের জন্য শেখ ইমামুদ্দিন কোনো বাধার প্রস্তাব দেননি এবং অফিসের লাগাম ধরে তিনি রাজা লাল সিং-এর কাছ থেকে যেসব গোপন তথ্য পান তা পাচার করে দেন। ব্রিটিশ আদালত রাজা লাল সিং-এর বিচার করে তার দ্বিমুখীতার জন্য এবং পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করেন।^{১২} তার বদলে তেজ সিং-কে দরবারের প্রধান করা হয়।

১৮৪৬-এর ডিসেম্বরে লর্ড হার্ডিঞ্জ পাঞ্জাবে আসেন। রাজনির্মাতাদের ব্যবহারে খুশি হয়ে তিনি সরদারদের ঘড়ি পুরস্কৃত করেন (অল্প কয়েকদিন সময় দেখতে পারত) এবং দরবারে ব্যবস্থা করেন একটি লিখিত অনুরোধের^{১৩} যে ব্রিটিশ দল যাতে ১৮৫৪ পর্যন্ত পাঞ্জাবে অবস্থান করতে পারে, যখন দালিপ সিং প্রাপ্তবয়স্ক হবে।

যাকে তারা পাথর ছুড়ে মারছিল। এই অপমানের পরেই শান্তি তারা দাবি করে। পরেরদিন মহারাজা দালিপ সিং-কে লাল সিং এসে নিয়ে যায় ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আবাসিক কর্মকর্তার কাছে। বাজারের অনেক ঘরে যেখানে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা ধূলিসাৎ করা হল এবং যে তিনজন মানুষ প্রধানত পাথর নিক্ষেপ করেছে তাদের মধ্যে একজনকে ফাঁসি দেয়া হল এবং দুজনকে নির্বাসিত করা হল। যেই ইংরেজ সৈন্যের জন্য এমন হলো তাকে 'সতর্ক করা হল ভবিষ্যতে যাতে এমন না হয়।'

১১. এসসি ১২২৪, ২৬-১২-১৮৪৬, আরও দেখুন শেঠি, ট্রায়াল অফ রাজা লাল সিংহ।
১২. ইবিদ, ১৮৬৭ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লাল সিং ধেরা ধুন এবং মুসৌরিতে বাস করেন।
১৩. একটি লিখিত অনুরোধপত্র জমা দিয়েই দরবারের অনীহা প্রকাশিত হল। ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৬-এর একটি চিঠিতে কুরিকে হার্ডিঞ্জ লেখেন 'দরবার ও সর্দারদের লজ্জা পাওয়াটাই স্বাভাবিক; এবং তাদের কাছ হতে কোন পত্র আসলে এর বক্তব্য অবশ্যই স্পষ্ট ও অনুপযুক্ত শর্তে থাকতে হবে; একটি শুরুদায়িত্ব নেয়ার জন্য আমাদের অনীহা অবশ্যই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।' আরেকটি চিঠিতে লর্ড হার্ডিঞ্জ কুরিকে নির্দেশ দেন 'এই ব্যাপারে শিখ দরবারকে প্রস্তাব দেয়ার জন্য কথা শুছিয়ে রাখা অথবা তাদের প্রস্ততি যে কোন ব্যাপারে আমাদের উপর সাহায্যের আশায় মূল্য দিতে হবে।' এসবের পাশাপাশি, গভর্নর জেনারেল যোগ করেন 'এই অনুরোধ অবশ্যই তাদের আচরণ দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়।' কুরিকে হার্ডিঞ্জ, ১২ ডিসেম্বর ১৮৪৬, প্রাইভেট কorespondence রিলেটিং টু দ্য এ্যাংলো-শিখ ওয়ারস, পি/১০৭, পৃ-১২-১৩, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬-এর সক্ষ্যায় রানী জিনদান, দালিপ সিংহ, লাল সিংহ, ভাই রাম সিংহ, ফকির নুরুদ্দিন এবং জন লরেন্সের মধ্যে আলোচনা হয়, দরবারের সদস্যদের সাথে আলোচনার পরে রানী জিনদান বলেন যে 'সেনা প্রত্যাহারের জন্য গভর্নর জেনারেলের কাছে প্রস্তাব দেবেন, পরিণতিতে তারা সবাই একমত হলেন যে, 'সরকারের অস্তিত্ব, এমনকি তার নিজের

ভৈরোয়ালের চুক্তি, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৪৬

লাহোরের মার্চ ১৮৪৬-এর চুক্তির বদলে অন্য চুক্তি হয় যা ভৈরোয়াল কর্তৃক অনুমোদিত। এই চুক্তির শর্তমতে ব্রিটিশ সরকার প্রশাসনের দেখাশোনা করবে ও মহারাজের দুর্দিনে তার সুরক্ষা করবে। রাজ্যের প্রতিক্ষেত্রে সব ব্যাপারে আবাসিকদের পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হলো। গভর্নর জেনারেলকে ইংরেজ সৈন্য দিয়ে শক্তিশালী করা হলো এমনভাবে যাতে সে রাজধানীর প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিতে পারে, মহারাজার নিরাপত্তা দিতে পারে এবং দেশের শান্তি রক্ষা করতে পারে।^{১৪} সংক্ষেপে, ব্রিটিশ আবাসিকদের নিরপেক্ষ উপদেষ্ট করা হলো এবং গভর্নরের পর্যায়ে উচ্চাঙ্গীকরণ করা হলো।^{১৫} এ সকল ক্ষমতা থেকে রানী জিনদান বঞ্চিত ছিলেন এবং প্রতি বছরে দেড় লাখ রুপি ভাতা পেতেন।

অর্জনকারীরা অধিকৃত রাজ্যে এবং দরবারের নামে যে প্রশাসনিক পরিবর্তন করেছিল তা লক্ষ্য করার মতো। জালান্দার, হুশিয়ারপুর ও কংগ্রা জেলার সমন্বয়ে গঠিত জালান্দার দোআবে, জন লরেন্স ভূমির পুনর্কঠামো চালু করেন যা স্বার্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী ছিল। তিনি দেখেন যে ভূমি দখলের বিভিন্নতার মাঝে পাহাড়ি প্রধানরা তাদের অস্ত্রধারী দলের সাথে আছে যাদেরকে এই নির্দেশ

জীবন বা মহারাজের, পুরোপুরি নির্ভর করে এর উপস্থিতি এবং লাহোরে ব্রিটিশ দূতের উপর।' তিনি আরও বলেন যে 'শুধু যদি সেনারা অবস্থান করে দরবার তাহলে ব্রিটিশ সরকারের মতে চাপিয়ে দেয়া যে কোন শর্তে রাজি হবে।' ভাই রাম সিং পরদিন সকালে জন লরেন্সের সাথে দেখা করে এইসব আলোচনা অব্যাহত রাখেন। এসসি ১০৪৩, ২৬-১২-১৮৪৬।

১৪. দেখুন পরিচ্ছেদ ৪।

১৫. চুক্তির ৩নং প্রচ্ছদ আবাসিকদের দেয়া হয় 'পূর্ণ ক্ষমতার সরাসরি অধিকারী এবং রাজ্যের প্রতিটি বিভাগের সব কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।' গোপন কমিটিকে হার্ডিঞ্জ লেখেন 'এসব ব্যবস্থা তোমার কমিটি করবে, এসব জেলার কার্যনির্বাহী প্রশাসন থাকবে আমার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে এবং দেশের এই জায়গা ত্যাগ করার আগে আমি এসব এলাকাকে কার্যকর প্রশাসনের আওতায় দেখতে ইচ্ছুক, শুধু নীতির উপরে স্থাপিত এবং যা কল্যাণকর তা মেনে চলার জন্য। এযাবৎ পর্যন্ত এমন হয়নি, এবং ন্যায় ও পূর্বের নীতি অনুসরণ করে এই রাস্তায় ব্রিটিশ প্রশাসনের চরিত্র বোঝা যায় যা এখনও আমাদের নিয়ন্ত্রণে, এত বেশি মেনে চলাও হয়নি যেমনটি আমরা চেয়েছিলাম।' গভর্নর জেনারেলস ডিসপ্যাচ টু সেক্রেট কমিটি নং ১, ১৮৪৭।

এটা পরিচালকের বোর্ড থেকে অনুমোদন পেয়েছিল। তাদের বক্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ 'আমরা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছি আপনার প্রকল্পে আমাদের সমর্থন আছে পাঞ্জাবে ব্রিটিশ কার্যালয় স্থাপনের জন্য, এক্ষেত্রে আপনার দেশ ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক না। কোনো মাঝামাঝি সিদ্ধান্ত হয়তো দূরদর্শী বা নিরাপদ হবে; এবং যতদিন আমাদের রাজত্ব থাকবে, ততদিন সম্পূর্ণ ও পুরোপুরি হবে।' এসসি ১৩৫০, ২৫-১-১৮৪৭।

রেগে যাওয়ার চেয়ে হার্ডিঞ্জ বেশি মনখোলাই ছিলেন। চুক্তি সম্পর্কে তিনি লেখেন : 'বাস্তবিক অর্থে শিখদের দমনের মাধ্যমে অধিকার করা গিয়েছে, বর্তমান খরচ আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া ছাড়াই এবং দ্বিধায়ুক্ত অর্জনের ভবিষ্যৎ অসুবিধা ছাড়াই? ব্রগটন পেপারস (এড. মিসস ৩৬, ৪৭৫ ফ্যাসিকুল ২২০) ব্রিটিশ জাদুঘর।

দেয়া আছে যে, প্রয়োজন মনে করলে দরবারকে সাজিয়ে দেয়ার জন্য, মাঝা মিসলদারের বংশধরের রাজ্য এবং গুরুদের বেদী ও সৌধি বংশধররা ধর্মীয়ভাবে বৃত্তি প্রদান করে যা সনদ কর্তৃক গৃহীত এবং পুরস্কারের জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত রাজ্যে সেবা প্রদানের জন্য, প্রভৃতি। পাহাড়ী প্রধানদের তাদের রাজ্য সম্পর্কে জন লরেন্স নিশ্চিত করেন, কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে ও জাগিরদারের ক্ষেত্রে তিনি আদেশ করেন যে, নগদ টাকায় দলকে সাজানো হবে। এই এলাকার বেশিরভাগ দুর্গ ধ্বংস করে দেয়ার জন্যও তিনি আদেশ দিয়েছিলেন।

অন্যান্য জাগির সম্পর্কে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, মহারাজা শের সিং-এর মৃত্যুর পরের সব দাবি-দাওয়া অথবা অনির্দিষ্ট মানুষরা যেমন নাযিম এবং কাদাররা যে দাবি করেন তা পুনরায় শুরু করা হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাগিরদের দরবারের বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে খেতাব দেয়া হয়। জন লরেন্স এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন যে, এসব জাগিরদাররা এখন অলস, কার্যহীন, অবিশ্বস্ত এবং 'সবসময় নিষ্কর্মা লোক। ব্যতিক্রম হলো যখন তারা সুযোগ পায় আমাদেরকে দুর্বল করার জন্য হুঁল ফোটানোর চেষ্টা করে।' ^{১৬}

জন লরেন্সের এসব ব্যবস্থা কৃষকদের জন্য অনেক সুবিধা করেছিল। জমিদারদের জন্য তা ক্ষতিকর ছিল। তারা লাহোরের দলের মাধ্যমে অস্বস্তি তৈরি করে যেহেতু সুতলেজ প্রাপ্ত প্রধানরা জালান্দর দোআবে বিশাল রাজ্য পেয়েছিলেন। প্রধানরা বুঝতে পারেন যে, যদি ব্রিটিশরা পাঞ্জাবের বাকি অংশ দখল করে নেয়, তারা বাকি জাগির থেকে বঞ্চিত হবে।

জাগিরের নিষ্পত্তি করার সাথে সাথে ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করাও জরুরি ছিল। জন লরেন্স তিন বছরের হিসাব করেন, যা দায়ারের হিসাব থেকে কম ছিল, পরিশ্রমের প্রয়োজন ছিল কারণ খাজনা শস্যের পরিবর্তে নগদ টাকায় দেওয়ার জন্য বলা হয়। তিনি আরও সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণ করেন গ্রামের প্রতিনিধির সাথে, এভাবে তিনি চৌধুরী ও লাম্বারদারদের এড়িয়ে যান, যারা ক্রমাগত রাজস্বহীন ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। জাগিরদারদের জন্য রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারটি অসন্তোষ তৈরি করেছিল। ^{১৭}

১৬. জনলরেন্স কর্তৃক ১৬ ডিসেম্বর ১৮৪৬, প্যারা ৮-এর।

১৭. 'যদি আমাদের শাসনব্যবস্থার সূচনা অধিকাংশ চাষিদের মাঝে, এবং সমাজের নিচু স্তরের মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে থাকে, এটা অবশ্যই উচ্চস্তরের মানুষের বিপরীত (চাহিদার)। জাগিরদারেরা তাদের ক্ষমতা, প্রভাব ও সম্পত্তি দেখিয়েছে যা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত; চৌধুরীগণ এবং তালুক ও গ্রামের প্রধানরা একইভাবে নিঃস্ব অবস্থায় পর্যবসিত হল এবং তাদেরকে সমৃদ্ধ করা থেকে বিরত থাকল সার্বিকভাবে পরিশোধিত গ্রামের মুনাফার মাধ্যমে। একই সময়ে তারা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হল উচ্চদামের নগদ, ইনাম, ভাড়াহীন জমি অথবা উপযুক্ত নির্ধারিত জায়গায়।' আর.এন. কাস্ট, ডেপুটি কমিশনার, হুশিয়ারপুর, কমিশনার ও সুপারিনটেনডেন্টের কাছে সুতলেজ দিয়ে, ৮ জুলাই, ১৮৪৭, বোর্ডস কালেকশন ১১৭১৭২, পৃ-১৬০-১. ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী।

'জাগিরদাররা বিবেচনাহীনভাবে আমাদের পরিত্যাগ করলো, তাদের জাগির আবার নতুন করে শুরু করার জন্য। গ্রামের চৌধুরীরা তাদের প্রভাব হারাতে শুরু করেছিল। তাদের পুরস্কার বা অর্থ খরচ

পাঞ্জাবের যা দরবারের আওতাধীন ছিল, আবাসিক ইংরেজরা একইরকম পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিল। হেনরি লরেন্স চেষ্টা করেছিলেন দরবারকে চালাতে; তার ভাই জন, সে কিছু সময়ের জন্য তার সাথে কাজ করেছিল, এই ঝামেলা করতে পরবর্তীতে তিনি রাজি হলো না। দরবারের এলাকাকে চারটি বিচার সংক্রান্ত জেলায় বিভক্ত করা হলো। প্রতিটি ছিল একজন বিচারকের আওতাধীন।^{১৮} প্রত্যেক বিচারককে একজন ডেপুটি দেয়া হয়েছিল এবং তার নির্দেশ পালনের জন্য দল দেয়া হয়েছিল। কারদারের সিদ্ধান্ত থেকে বিচার করা আপীল শোনাতে এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সিদ্ধান্ত নিতে (কিন্তু না রাজস্বের ব্যাপারে আর না কারদারের নিয়োগসংক্রান্ত)। ইংরেজ কর্মকর্তারা এসব আদালতের কাজকর্মের দেখভাল করত। জন লরেন্সের দণ্ডবিধি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় ছিল যা লাহোরে ছাপা হয়।^{১৯} (একটি পাথরের ছাপাখানা রাজধানীতে জানুয়ারি ১৮৪৮-এ স্থাপিত হয়) এবং বিচারক কর্মকর্তাদের বিলি করা হয়। ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে জন জালান্দর দোআবের কথা বলে যা পরে দরবারের সীমানাধীন হিসেবে পরিচিত হয়।

রানী জিনদান ও দরবার প্রধানদের এটা বুঝতে সময় লাগেনি যে, তাদেরকে রনজিত সিং-এর রাজ্য থেকে দূর করা হবে; তবু দুই-তৃতীয়াংশ হানাদারদের ও হঠাৎ বিস্তারিত জোৎনারদের মাঝে ভাগ করা হয়েছে; এবং তৃতীয় যেটা থাকি আছে তাও ফিরিঙ্গিদের দিকে যাচ্ছে। তারা তাদের লোকদের রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশদের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং খালসা সৈন্যবাহিনীর সম্পত্তির জন্যও নিভরশীল ছিল। ব্রিটিশরা তাদেরকে সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু এজন্য তাদের কাছ থেকে চরম মূল্য আদায় করলো। দরবারকে সকল ক্ষমতা দিল, ভূমি আভিজাত্যের অর্থনৈতিক আধিপত্যকে ভয়াবহভাবে বিপদগ্রস্ত করলো। যেভাবে চলছিল তা নিয়ে রানী জিনদান সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং রাজ্যের বিষয়ে খালি খালি ব্যস্ত হয়ে পড়েন।^{২০} আবাসিক ইংরেজরা এটা বুঝতে পেরে হতাশ হলো যে, রনজিত সিং-এর

কমিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং ভাড়াহীন জমি ধরে রাখায় তাদের দাবিটি নাকচ করা হয়েছিল।' এইচ. ভানসিতার্ত, ডেপুটি কমিশনার, জালান্দার, প্রাপক কমিশনার ও সুপারিনটেন্ডেন্ট, সূতলেজ দিয়ে, ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৭, আইপিসি ৩১-১২-১৮৪৭, খণ্ড-৮, নং- ২২৮৯ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী।

১৮. লাহোরের জন্য জেনারেল কাহান সিং মানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল; কাজ দোআবের জন্য রাম সিং জাল্লাওয়ালাকে, চাট্টার সিং আত্তারওয়ালাকে বেলাম ও ইন্দাসের মধ্যবর্তী গ্রাম; মাঝসহ দক্ষিণ-পূর্বের উপরে পাহাড় ও নিচে কামুর পর্যন্ত লেহনা সিং মাজিথিয়াকে দেয়া হয়েছিল।

১৯. পাঞ্জাব সরকার রেকর্ড, লাহোর পলিটিক্যাল ডায়েরীস ১৮৪৭-১৮৪৮, III, ৪৪৪। রাজ্যে প্রথমবারের মতো ফাঁসি দিয়ে মৃত্যু প্রথা চালু করা হল। (এমনকি রনজিত সিং-এর সময় খুনিকে জরিমানা করে শাস্তি দেয়া হতো মৃত ব্যক্তি বা অঙ্গহানির প্রেক্ষিতে।)

ব্রিটিশদের প্রভাবে দরবারে অনেক উন্নয়নশীল পদক্ষেপ নেয়া হয়। দরবার কিছু প্রথার বিরুদ্ধে দাবি করলো। যেমন- সতীদাহ, শিশুহত্যা, দাসত্ব এবং জোরপূর্বক পরিশ্রম (বেগার)। যেভাবেই হোক দাবিটি সফল হয়নি এবং এসব কথা দেশে রাজত্বকালের পর পর্যন্ত চলতে থাকে।

২০. জিনদান খুব দৃঢ়ভাবে বৈভরোওয়ালাদের চুক্তির বিরোধিতা করেন এবং সর্দারদের রাজি করতে সক্ষম হন যে, ব্রিটিশদের সাহায্য ছাড়াই তারা দেশ চালাতে পারবে। 'আবেগ ও দেশপ্রেমই এই বিরোধিতার

নামে যেন কী যাদু আছে যে জনতা তার বিধবা স্ত্রীর পূর্বের খারাপ কৃতকর্ম দেখেও না দেখার ভান করে এবং তাকে রানীমাতা হিসেবে দাবি করেন। তাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া আবাসিকদের জন্য জরুরি হয়ে গিয়েছিল।^{২১} একটা বাহানা খুঁজে পাওয়া গেল যখন সম্মানিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান হচ্ছিল, আর রাজা তেজ সিং-এর কপালে দালিপ সিং তিলক পরিয়ে দিতে আপত্তি জানালেন।^{২২} আবাসিকরা বুঝতে পারে এই ঘটনার পিছে জিনদানের হাত আছে এবং দুইদিন পরে তাকে শিখপুরায় বদলি করা হয়। তার মতে তাকে, 'চুলের মুঠি ধরে টেনে-হিঁচড়ে বের করে দেয়া হয়'^{২৩} দুর্গতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তার ভাতা তিনভাগ হতে আরও কমিয়ে দেয়া হয়। রাগত রানী আপত্তি জানায় 'অবশ্যই কখনও রাজকীয়দের সাথে এভাবে ব্যবহার করা হয়নি যেভাবে তোমরা আমাদের সাথে করছ! রাজ্যের গোপন রাজা হওয়ার চেয়ে তোমরা কেন নিজেদেরকে তা বলে ঘোষণা দিচ্ছ না? তোমরা বন্ধুত্বের কথা বল এবং তারপর আমাদের জেলখানায় রাখ। তোমরা লাহোরে বিশ্বাসঘাতক প্রতিষ্ঠা করেছ এবং তাদের নিলামে তোমরা পুরো পাঞ্জাবকে মারতে এসেছ।' ^{২৪}

জিনদানের জন্য একজন কড়া প্রহরী নিয়োগ দেয়া হলো। কিন্তু যত বাধা ও অসম্মান ব্রিটিশরা জিনদানের উপর চাপিয়ে দিচ্ছিল, ততোই সে জমতীর চোখে নায়িকা হয়ে উঠছিল। অনেক প্রধান ব্যক্তিই জনসম্মুখে তার জন্য সহানুভূতি প্রদর্শন

মূল কারণ ছিল না', এটা ছিল হেনরি লরেন্সের অভিমত। সর্দারদের (মূলত শের সিং আন্তারিওয়াল) জিনদানের নিজস্ব বাসস্থানে আসা নিষিদ্ধ করলো আবাসিকরা। এসসি ১৬৬, ৩০-১-১৮৪৭।

২১. ১৮৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি ষড়যন্ত্র আবাসিকদের এবং রাজা তেজ সিং-এর হত্যা খোলাসা করে। এটা আরও আবিষ্কার করে যে প্রেমা, যে ষড়যন্ত্র মূল হোতা ছিল তার সাথে জিনদানের চাকরের আসা-যাওয়া ছিল। মহারানীকে দায়ী করার জন্য এটা খুব বেশি কিছু ছিল না। গভর্নর জেনারেল যেভাবেই হোক তার থেকে পরিত্রাণের জন্য আবাসিকদের অন্য কোনো উপায় খোঁজার জন্য উৎসাহ দিলেন। গভর্নর জেনারেলস ডিসপ্যাচ টু সেকরেট কমিটি, ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭; কুরিকে হার্ডিঞ্জ, ১০ জুন ১৮৪৭।

প্রেমা ও অন্য তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয় এবং অন্য পাঁচজনকে বিভিন্ন সময়ের জন্য জেলে পাঠানো হয়। পাঞ্জাব সরকারের রেকর্ড, লাহোর পলিটিক্যাল ডায়েরীস ১৮৪৭-১৮৪৮, III, ২৮৪।

২২. এটা ছিল ১৮৪৭ সালের ৭ আগস্ট। আবাসিকরা গভর্নর জেনারেলকে লিখেন : 'মাননীয় মহারাজ তার মশমলের গদির উপর এমনভাবে গেড়ে বসলেন যা তার বয়স ও ভদ্রতার বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খায় না।'

২৩. জন লরেন্সকে জিনদান, ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭, এসসি ১১৯, ৩০-১০-১৮৪৭।

২৪. 'আপনি বলছেন আমি মাসে ৪০০০ রুপি করে পাব এবং এই থেকে আমার মনে হয় যে, আপনি আমার ভাতা কমিয়ে দেবেন। আমি রাজস্বমতে, ৩ কোটি রুপির দেশের মালিক...। কীসের হিসেবে আপনি মনে করলেন আমার ভাতা প্রতিমাসে ৪০০০ হবে? চুক্তিতে যা ঠিক হয়েছিল আমি তাই নিব এবং যদি কোনো পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে বাড়িয়ে করতে হবে, কমিয়ে নয়...। আপনি শুধু আমার চরিত্রই ধ্বংস করেননি, বরং আমাকে কারাবন্দি করেছেন এবং আমার সন্তান থেকে আমাকে আলাদা করেছেন। আমাকে রুটি দিন, কেনো এই অভাবের মধ্য দিয়ে আমার জীবন কেড়ে নিচ্ছেন। আমি একটি রাজ্যের প্রাপক। আপনারা আমার সাথে অবিচার করেছেন।' এস ১১৯, ৩০-১০-১৮৪৭।

করে। ভাই মহারাজ সিংহ, যিনি নওরাঙাবাদে ভাই বীর সিং-কে জয় করেছিলেন এবং তার কৃষক ও মহৎ পূর্বসূরীদের মতোই বৃহদাকারে তাকে দাবি করেন।^{২৫} আবাসিকদের নির্দেশে ভাইকে গ্রেফতার করা হয় কিন্তু তিনি পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যান। তিনি পুলিশকে সুকৌশলে এড়িয়ে যান এবং মূল পাঞ্জাবে বড় বড় আলোচনা করেন, জনতাকে জাগ্রত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন এবং ফিরিস্তিদের তাড়ানোর ব্যাপারে বলেন।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি বাড়তে থাকল। জালান্দার দোআবে জাগিরদের উচ্ছেদ, ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন এবং এর সংগ্রহ রাগিয়ে তুলেছিল যাদের ভূমি আছে তাদের এবং রাজস্ব কর্মকর্তাদের। প্রতিটি ইংরেজের ধৃষ্টতা জনতার কাছে তাদেরকে আদরণীয় করেনি। তারা অমুসলিম জনতার ধর্মীয় মূল্যবোধে আঘাত হানে গুরু জবাইয়ের মাধ্যমে;^{২৬} জুতা পরে গুরুদুওয়ারাতে গেলে শিখদের অসন্তোষ তারা বুঝতে পারেনি।^{২৭} কুরুচিতে আসক্তি, স্থানীয়দের সাথে খারাপ ব্যবহার ও ইংরেজ সৈন্যকর্তৃক মহিলাদের যৌননিপীড়ন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। পাঞ্জাবিরা সরল বিশ্বাসে আদিম গল্প শুনত যে দুই মাসের জন্য ইউরোপীয় সৈন্যরা স্বাধীনতা দেবে তাদের পছন্দের নারীর বিনিময়ে।^{২৮} সকল দরবারের মন্ত্রীকে কারাবাস দেয়া হবে;^{২৯} এবং সাহেবরা স্থানীয়দের মৃতদেহ হতে মুমিয়াই (মানব তেল) নিংড়ে নেবে।^{৩০} এদের মধ্যে যারা বেশি জাগ্রত ছিল গুজব শোনার ব্যাপারে তাদেরকে সুতলেজ প্রচারণার পর রেহাই দেয়া হয়; ২০,০০০-এর উপরে তারা কোনো চাকরি ছাড়াই হারিয়েছিল।^{৩০}

২৫. এসসি ১৪২, ৩১-৭-১৮৪৭। রাবন গ্রামের (লুধিয়ানা জেলার) দায়িত্বে ছিলেন মহারাজা সিং এবং বীর সিং-এর মৃত্যুতে উপস্থিত ছিলেন।

২৬. পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ড, লাহোর পলিটিক্যাল ডায়েরীস ১৮৪৬-১৮৪৯, IV, ৪৩১, খোলা বাজারে গরুর গোশত বিক্রি সংক্রান্ত।

২৭. ১৮৪৬ সালে লাহোর চুক্তির পরে হরিমন্দিরে প্রবেশের মুখে একটি কাগজ লাগানো হয় যাতে লেখা থাকে অমৃতসরের পূজারীরা গোলযোগের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন, গভর্নর জেনারেলের নির্দেশমতে যা সবার জানা দরকার, ইংরেজ সংক্রান্ত আলোচনা মন্দিরে বা এর এলাকায় ঢুকলে নিষিদ্ধ (দরবার বলা হয়ে থাকে) অমৃতসরে অথবা যেকোনো মন্দিরে অবশ্যই জুতা পরে ঢোকা যাবে না। অমৃতসরে গুরু হত্যা করা যাবে না বা কোনো শিখকে নিপীড়ন করা যাবে না অথবা এই সংক্রান্ত কিছুই করা যাবে না।

ভুসতে জুতা খুলে রাখতে হবে পুকুরের কোণায় এবং কোনো মানুষই জুতা পরিধান করে পুকুরের চারপাশে হাঁটতে পারবে না। লাহোর, ২৪ মার্চ, ১৮৪৭। এসডি : হেনরি লরেঙ্গ, আবাসিক।

২৮. পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, লাহোর পলিটিক্যাল ডায়েরীস ১৮৪৭-১৮৪৮, III, ২৩২।

২৯. ইবিদ, ৪১৩। মুমিআইভালার ঐতিহ্য, যা ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে কাজ করছিল তা ঠিক ১৯৪৭ পর্যন্ত চলেছিল। এই শব্দটি সম্ভবত মুনাই খান থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, একজন মঙ্গল প্রধান, যিনি তার শিকারকে শাস্তি দেন ফাঁসিতে ঝুলিয়ে এবং তাদের পায়ের উপর ধীরে আগুন জ্বালিয়ে।

৩০. 'আমি আমার চারপাশে দেখি এবং শুনি অনেক মানুষ যারা জেনারেল ও কর্নেল হিসেবে শিখ সেনাবাহিনীতে ছিল। তারা এখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করছে।' হেনরি লরেঙ্গ, ২৯ এপ্রিল ১৮৪৭, গভর্নর জেনারেলকে। এসসি ১১২, ১৬-৬-১৮৪৭।

৭. ইংরেজ-শিখের দ্বিতীয় যুদ্ধ

লর্ড হার্ডিঞ্জ জানুয়ারি ১৮৪৮-এ অফিসের দায়িত্ব হস্তান্তর করেন, তারা উত্তরসূরীদের আশ্বস্ত করেন যে, ‘কয়েক বছরের জন্য ভারতে এসে থাকার জন্য বন্দুক দাগানোর দরকার নেই।’ হার্ডিঞ্জের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি কিন্তু শিখদের (বা শিখসহ ডোগরা) অধীনে রাখার কৌশলমতে কেন্দ্রীয় এশিয়ার মোহাম্মদীয়দের বিরুদ্ধে শিখদের পাথর স্থাপন’ ব্রিটিশদের সাথে বন্ধুত্বে আপত্তি জানায় এবং পাঠান ও আফগানদের সাথে যেরকম তারা চেয়েছিল। হার্ডিঞ্জ সফল হয়েছিল একজন দাঙ্গিক, অভিজাত তরুণ লর্ড ডালহৌসির জন্য। পাঞ্জাবে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল তা যুবক লর্ডকে একটা সুযোগ করে দিল দরবারের কাছে পরিবর্তন করে ব্রিটিশ কৌশল জানিয়ে দেবার জন্য। শিখ রাজ্যকে দুর্বল করা ছাড়াও সে বিশ্বাস রাখে ‘সীমানা জয় করার জন্য তাদের সকল অধিকার কেড়ে নেয়া বা যতবার ইচ্ছা ততবার রাজস্ব আদায় করা।’ এক সৌভাগ্যের মুহূর্তে সুযোগ আসতে বেশি দেরি হয়নি। হেনরি লরেন্স যিনি দরবারের ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন, তিনি ইংল্যান্ডে অসুস্থতার ছুটিতে ছিলেন। তার ভাই জন এবং এডওয়ার্ড কুরি যারা তার অসুস্থতামানে আবাসিক কর্মকর্তার দায়িত্বে ছিলেন, তারা ডালহৌসির বর্ধমান বিদ্যালয়কে সুযোগ দিলেন।

ঝামেলা শুরু হলো মূলতানে। দেওয়ান মুলরাজকে আবাসিকরা ২০ লাখ রূপি তার প্রদেশের জন্য দিতে বলে। একই সময়ে ঝাংয়ের জেলা যেটা তার তৃতীয় সম্পত্তি ছিল তা তার থেকে কেড়ে নেয়া হয়। মুলরাজ এইসব শর্তে রাজি ছিল কিন্তু পূরণ করতে ব্যর্থ ছিল কারণ আবাসিক কর্মকর্তারা নদীপথে পরিবহন বন্ধ করেছিল, যা মূলতানের আয়ের একটি বড় অংশ ছিল। আবাসিক কর্তৃক মুলরাজের বিচার আবার দেখা হলো। তিনি তার পদত্যাগপত্র ডিসেম্বর ১৮৪৭-এ জমা দেন। তার পদত্যাগ গ্রহণ করা হলো, কিন্তু দেওয়ানকে অফিস করার জন্য বাধ্য করা হলো মার্চ ১৮৪৮ পর্যন্ত যখন শীতের ফসল জমা করতে শুরু করা হয়।

মুলরাজকে সফল করার জন্য জেনারেল কাহান সিং মানকে নির্বাচিত করা হয়। দুজন ব্রিটিশ অফিসার সিভিল সেবার ভনস অ্যাগ্নিউ ও লেফটেন্যান্ট অ্যাভারসনকে নদীপথে পাঠানো হয় সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে। দুর্গের বাইরে দরবার হলে আস্তানা করে। পরদিন মুলরাজ কাহান সিং মান ও ইংরেজদের অভ্যর্থনা জানান।

তাদের দুর্গ ঘুরিয়ে দেখান, এবং তাদেরকে প্রাসাদের চাবি দিয়ে দেন। মুলতানের কামান গর্জে উঠল এবং দরবারের দল দায়িত্ব নিল। ইংরেজরা যখন দুর্গের ফটক দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাচ্ছিল তখন তাদের নিপীড়ন করা হয়। ফলে ভন্স অ্যাগ্নিউ, লেফটেন্যান্ট অ্যান্ডারসন এবং আরও কয়েকজন আহত হয়। মুলরাজ সাহায্যের জন্য ঘুরে দাঁড়ান এবং দরবারের ডেরায় চিরকুট পাঠান ঘটনার দুঃখ প্রকাশ করে। দেওয়ানের চিরকুটের ব্যাপারে ভন্স অ্যাগ্নিউ জানতে পারে এবং এই অপমানের জন্য তাকে সব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি আরও একটি প্রতিবেদন পাঠান আবাসিকদের কাছে যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়, ‘আমি মনে করি না মুলরাজ এর সাথে জড়িত। আমি তার সাথে বেড়াচ্ছিলাম যখন আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়।’^২ তিনি সাহায্য চেয়েছিলেন লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ড ও জেনারেল ভন কোর্টল্যান্ডট-এর কাছে। যারা তখন পর্যায়ক্রমে ফতেহ খানের আস্তানা এবং ইসমাইল খানের আস্তানায় ছিলেন।

মুলতানের নিষিদ্ধ সৈন্যরা মুলরাজকে তাদের নেতা হওয়ার জন্য জোর করে। তারা দরবার দলের কাছে আবেদন জানায় তাদের সাথে যোগ দিয়ে ফিরিসিদের তাড়ানোর জন্য। কাহান সিং মান এবং কয়েকজন লোক ছাড়া দরবারের বাকি সবাই মুলতানীদের দলে যোগ দেয়। পরদিন সন্ধ্যায় তারা ব্রিটিশ আস্তানায় ডাকাতি করে এবং ভন্স অ্যাগ্নিউ ও লেফটেন্যান্ট অ্যান্ডারসনকে হত্যা করে। শিখ সৈন্যরা পাঞ্জাবে তাদের সহধর্মীদের জন্য আবেদন করে।

‘এখন আমরা গুরুর আদেশে আপনাদের সকলকে লিখিতভাবে জানাচ্ছি, আমাদের খালসা জেগে উঠেছে। যারা সত্যিকারের ও নিয়মানুবর্তী শিখ, তারা এখানে আমাদের সাথে আসতে পারে। আপনাদের বেতন দেয়া হবে, এবং গুরুর দরবারে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হবে...’

‘মহারাজা দালিপ সিং গুরুর দয়ায় তার রাজ্যে পাকাপোক্তভাবে বসবেন, গুরু ও ব্রাহ্মণদের রক্ষা করা হবে এবং আমাদের পবিত্র ধর্মের উন্নতি সাধিত হবে...’

‘মহারাজা ও তার মা কষ্ট ও যন্ত্রণায় আছেন। তাদের কারণে যুক্ত হওয়াতে, আপনারা তাদের দয়া ও সহযোগিতা পাবেন। খালসাজি, গুরুর হেফাজতে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে এবং গুরু গোবিন্দ সিং আপনার সম্মান রক্ষা করবে। ১২ বৈশাখ, ১৩০৫’, (২২ এপ্রিল ১৮৪৮)।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এত তীব্র ঘৃণা ছিল যে কিছু দিনের মাঝে রেকনা, দোআব, চেনাব এবং ইন্দাসের মাঝের দোআন পাঠান ও বেলুচ তলোয়ারবাজের ঝাঁক দ্বারা

২. এডওয়ার্ডেস এ ইয়ার অন দ্য পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার, II, ৭৮। আবাসিকদের এডওয়ার্ডেস এই প্রসঙ্গে চিরকুট লেখেন ‘আমি মনে করি মুলরাজ এই বিদ্রোহে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং একজন দুর্বল মানুষ হওয়াতে সে তার অফিসারদের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল যে তার জন্য কোনো আশা নেই কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে বিদ্রোহের কারণ ছিল পাঠান, বেলুচ ও মুলতানীদের (উচ্চবংশ, উদ্বীপনা ও মিথ্যা গৌরবের মানুষ) ঘৃণা যা বাড়ছিল সেনাবাহিনীতে কাজ করার জন্য এবং এসব মানুষ একাত্মতার সাথে যুদ্ধ করে এবং মৃত্যুবরণ করে...’ II, ১০০।

ভর্তি হয়ে গেল যারা শিখদের সাথে মিলে ফিরিসিদের বিরুদ্ধে হিন্দু সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করেছিল।

আবাসিক কর্মকর্তার (এডওয়ার্ড কুরির) ভন্স অ্যাগ্নিউ বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া ছিল মূলতানে সৈন্যদলকে আদেশ করা কিন্তু পরদিন যখন তিনি শোনে যে ভন্স অ্যাগ্নিউ ও লেফটেন্যান্ট এন্ডারসন উভয়ই মৃত এবং দরবার দল বিদ্রোহে যোগদান করেছে, সে তার আদেশ পরিবর্তন করলো। তিনি কাউন্সিলের প্রতি সমন জারি করলেন ও সহজ করে বললেন যে, দরবার কর্তৃপক্ষ যখন থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, এটা দমনের ব্যাপারও দরবারের উপরে। তিনি ঠিক করলেন ভৈরোয়ালের প্রাদেশিক চুক্তি অবজ্ঞা করবেন যাতে দরবার কর্তৃক ব্রিটিশ দলকে যে টাকা দেয়া হয়েছিল তা মূলত দেশের শান্তিরক্ষার জন্য ছিল।

সভাসদরা এই অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে অসমর্থ হওয়ার কথা স্বীকার করেন।^৩ লর্ড ডালহৌসি এবং তার কমান্ডার-ইন-চিফ (যিনি বুঝেছিলেন যে, এটা ইংরেজ সৈন্যদের জন্য বছরে সমতলে যুদ্ধ করার ভুল সময় ছিল)^৪ আবাসিক কর্মকর্তার সাথে একমত পোষণ করেন যাতে অবস্থার আরও অবনতি হয় এবং তারপর তারা তাদের সুবিধা করতে পারেন।^৫ বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আবাসিক কর্মকর্তা তার সর্বোত্তম চেষ্টা করেছিল। রানী জিনদান, যাকে শিখপুত্রা দুর্গে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিল এবং বেহিসাবী হয়ে পয়সা ওড়ান জ্যোতিষীদের সাথে পরামর্শ করার জন্য এবং ব্রাহ্মণকে খাওয়ানোর জন্য, যা পাঞ্জাব থেকে বাতিল করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছিল। আবাসিক কর্মকর্তা বিশ্বাস করতেন যে, 'আইনগতভাবে

৩. 'প্রধানরা গতকাল সকালে ফেরত আসেন, এবং শোনে যে, আমি তাদের বিদ্রোহ দমনের ব্যাপারে কি বলেছি এবং দোষীদের ন্যায়বিচারের জন্য, তাদের নিজেদের জন্যই শুধু তাদের সরকারকে বাঁচানো, তার আলোচনা করা ও পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে অবহিত করা।

অনেক আলোচনার পর তারা অসমর্থ বলে ঘোষণা করে, ব্রিটিশ সাহায্য ছাড়া দেওয়ান মুলরাজকে মূলতানে দমন করা হয় এবং বিশ্বাসঘাতকদের কঠোর আইনের মাঝে আনা হয়েছিল। এসবের পরে যা হল, আমার মনে হল যদি প্রশ্ন উঠে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিখ সরকার ও তাদের প্রদেশের শান্তি রক্ষার জন্য আমাদের উচিত হবে বেশি বেশি ব্রিটিশ রক্ত ও সম্পদ উৎসর্গ করা', ডালহৌসিকে কুরি, ২৭ এপ্রিল ১৮৪৮, এল ১৩৯/বিকে ১৭৮, পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস।

৪. গভর্নর জেনারেল আবাসিক কর্মকর্তার মনে কি ছিল তা সম্পর্কে সব ইংরেজ কর্মকর্তা অবগত ছিলেন না। হারবার্ট এডওয়ার্ডসের মতে ভারতের ইতিহাসে কিছু কঠিন প্রচারণার সময় ছিল গরমকালে এবং মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে না যখন তাদের মন চিন্তাযুক্ত থাকে... আমাদের এই ব্যাপারে আরও শক্ত হওয়ার জন্য এখনও যুক্তিতর্ক চলেছে। আমাদের জাতীয় বিশ্বাস যেমনটি চুক্তিতে আছে তার পুরো মতে ছোট দিলীপের সিংহাসন রক্ষার জন্য আমাদের সকল শক্তি ব্যবহার করা উচিত। এখন যদি আমরা দেশটাকে সঠিকভাবে চালাতে চাই এবং সিংহাসনের পতন চাই, তাহলে আমাদের শুধু মূলতানে শিখ সৈন্যদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা দলের সাথে, দেশবিভাগ অবিশ্বস্ত তা ও পাঞ্জাবের আত্মরক্ষার তাগিদে যে উত্তাল হাওয়া সবই একই সূত্রে গাঁথা। বিশ্ব আমাদের ত্যাগ করেছে, এটা না জেনে যে আমরা কী জানি; কিন্তু না খোদা না আমাদের জ্ঞান এমন করতে পারে? কুরিকে এডওয়ার্ডস, ৪ মে ১৮৪৮। এল. ৪৪/বিকে ১৯১, পি.জি.আর।

৫. 'ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে পাঞ্জাবের এই ফোঁড়া মাথা পর্যন্ত, এবং যখন পাকবে তখন সাবধানে এটাকে কেটে ফেলতে হবে। আসন্ন শীতকালে।' থোরবার্ন, দ্য পাঞ্জাব ইন পিস এ্যান্ড ওয়ার, পৃ. ১০১।

এই অপকর্মের প্রমাণ করা হয়তো সুবিধা হবে না', তিনি গভীরভাবে ষড়যন্ত্রে নিযুক্ত ছিলেন স্থানীয় সৈন্যদের বিশ্বস্ততার সাথে তাল মেলানোর জন্য।^৬

এখানে সহজ কাউন্সিলের প্রচুর আপত্তি সত্ত্বেও, এই আদেশটি গুরুতর হয়ে উঠল। জিনদানকে কড়া নিরাপত্তা দিয়ে বেনারসে নিয়ে যাওয়া হলো; তার মাসিক ভাতা আরও কমিয়ে ১০০০-এ আনা হলো।

পাঞ্জাবে অসন্তোষের ঢেউ বয়ে গেল। মুলতান বিদ্রোহের সময়, মূলত সেখানে কেউ ছিল না রানী জিনদানের নিলামের জন্য; এক সপ্তাহ পর রাজ্য থেকে যখন তাকে সরিয়ে দেয়া হলো, তখন খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি ছিল যারা তার জন্য তাদের জীবন দিতে রাজি হয়নি। আবাসিক কর্মকর্তা গভর্নর জেনারেলকে আরও জানান, 'মহারানীকে সরিয়ে দেয়া নিয়ে খালসা সৈন্যরা খুব বিরক্ত ছিল তারা বলে যে, তিনি সকল খালসার মাতা, এবং তিনি চলে যাবার যুবক দালিপ সিং আমাদের হাতে থাকবে, তাদের কাছে তাদের জন্য যুদ্ধ করার এবং উর্ধ্ব তুলে ধরার কেউ থাকবে না...'^৭, এমনটি আফগানিস্তানের আমির দোস্ত মোহাম্মদও পাঞ্জাবের জনগণের সাথে সহর্মিতা প্রকাশ করেন।^৮

জিনদানকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিল যে দরবারের মান্যগণ্যরা ব্রিটিশ দলে জায়গা করে নিয়েছে। এই সময় পর্যন্ত তারা বিশ্বস্ত ছিল কারণ ব্রিটিশরা খালসা সৈন্য থেকে তাদের রক্ষা করে, তাদের পদমর্যাদা ও সম্মানের নিশ্চয়তা দান করে এবং তাদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়।^৯

৬. তিনজন মানুষকে এই ষড়যন্ত্রে ফাঁসি দেয়া হয়। জিনদানের অপরাধের প্রমাণ সাব্যস্ত হয় একজন দোষী মানুষের বক্তব্য দ্বারা। সে তার শাস্তির উর্ধ্ব ছিলেন। তিনি আরও দোষী করেন জেনারেল কাহান সিং মানকে জিনদানের গুপ্তচর হিসেবে মুলরাজে ছিলেন। সাক্ষ্যের এই অংশটি গভর্নর জেনারেল বিশ্বাস করেননি।

৭. ইলিয়টকে কুরি, ২৫ মে ১৮৪৮। নং ৫১৫/ডব্লিউ.ই. ২৭-৫-১৮৪৮। পি.জি.আর.। পেশোয়ারে থাকতে জর্জ লরেন্স দু'জন শিখ সৈন্যের মাঝে আলোচনা শুনে পান জিনদান ও তার পুত্রের বিচ্ছেদ নিয়ে তারা 'ভাবছে আমরা তার সাথে ন্যায্য খেলা (যুবক মহারাজার) খেলছি'। আরেকজন বলে, 'তারা যা করে বিশ্বাস রাখ; তারা সবসময় তাদের কাজে সত্যতা রাখে।' 'আহা কিত্তু', অন্যজন বলল, 'ব্যক্তিটি অসাধারণ তারা কী এটা জিততে পারবে!' পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস লাহোর পলিটিক্যাল ডায়েরীস ১৮৪৬-৪৯, IV, ৩৯৭।

৮. 'এতে কোনো সন্দেহ ছিল না যে শিখরা দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কিছুসংখ্যককে চাকরি হতে অব্যাহতি দেয়া হল, অনেককে হিন্দুস্তানে নির্বাসন করা হল, নির্দিষ্টভাবে মহারাজা দালিপ সিং-এর মাকে, যাকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল এবং দুর্ব্যবহার করা হয়েছিল। এমনই দুর্ব্যবহার ছিল যে তা উঁচু-নিচু সবার কাছে মৃত্যুর চেয়ে খারাপ ছিল।' ক্যান্টেন অ্যাটকে দোস্ত মোহাম্মদ; নথিবন্ধ ১৩, নং ৪৪, পার্লামেন্টারি পেপারস (১৮৪৭-১৮৪৯)।

৯. 'সর্দাররা সত্যবাদী ছিল, আমার মতে সৈন্যরা মিথ্যাবাদী, আমি জানি'। গভর্নর জেনারেলকে কুরি। জুন ১৮৪৮।

এডওয়ার্ডসও একমত পোষণ করেন 'সর্দারদের প্রতি সম্মান রেখে বলছি, আমি মনে প্রাণে তাদেরকে আমাদের দলে আছে বলে বিশ্বাস করি, যা সমর্থন করে জাগিরদের উপাধি, কর্মসংস্থান এবং সবকিছুকে। কিন্তু তাদের দলকে আমি সমান বিশ্বাসের সাথে আমাদের মানুষের বিরুদ্ধে ভাবি।'।

কিন্তু জিনদানকে অপসারণ করা এবং যাদের সাথে তার^{১০} ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাদেরকে আটক করা হলে তাদেরকে তাদের 'রক্ষকের' প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। আত্তারিওয়ালা সম্পর্কে পরিবারটি সবচেয়ে বেশি সচেতন ছিল কারণ চাট্টার সিং-এর মেয়ের সাথে মহারাজা দালিপ সিং-এর বাগদান হয়েছিল। তারা জিনদানের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করেছিল এই আশায় যে, যদি সব ভালোমতো চলে তাহলে আত্তারিওয়ালা পাঞ্জাবের মহারানী হবে এবং তারা রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী পরিবারে পরিণত হবে। যদিও বয়স্ক চাট্টার সিং যিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জেলার নাযিম ছিলেন, এবং তার ছেলে শের সিং যিনি কাউন্সিল অফ রেজেন্সীর সদস্য ছিলেন উভয়ই। কূটনৈতিক কারণে জিনদানের মুক্তিতে রাজি ছিলেন। তারাও সন্দেহ করতে শুরু করেন যে, মহারাজা দালিপ সিং প্রাপ্তবয়স্ক হলেও ব্রিটিশদের পাঞ্জাবের দায়িত্ব তার হাতে তুলে দেয়ার ইচ্ছা নেই।

এসব ইচ্ছাকৃত অকর্মণ্যতা নিম্নতম কর্মকর্তাদের হজম হয়নি, এদের মধ্যে সবচেয়ে রসিক ছিল লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডেস, যিনি আমাদের প্রথমের ভাস্যমতে ফতেহ খানের ডেরাতে ভন্স অ্যাগ্নিউর চিরকূট পান। তিনি আদেশের অপেক্ষা করেননি^{১১} কিন্তু ভন কোর্টল্যান্ডকে তার সাথে মূলতানে যোগদানের জন্য জিজ্ঞাসা করেন। তিনি প্রতিবেশী মুসলিম উপজাতিদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করেন যাওয়ার পথে। তিনি ইন্দাস অতিক্রম করেন এবং লিয়ান দখল করেন; তারপর তিনি লিয়ান থেকে চলে যান এবং মংগ্রতা দখল করেন। ৮ মে-এর মাঝামাঝি সময়ে সে ও ভন কোর্টল্যান্ড গাজী খানের ডেরা দখল করেন এবং দক্ষিণ থেকে মূলতানে যাত্রা করেন। এডওয়ার্ডেসের এই আত্মবিশ্বাসী চলাচল আবাসিক কর্মকর্তাকে আক্রমণের জন্য লজ্জা দেয়। তিনি জেনারেল হুইশ ও শের সিং আত্তারিওয়ালাকে আদেশ দেন মূলতানে যাওয়ার জন্য এবং এসব কুকর্মে বাহাওয়ালপুরের নওয়াবকে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করেন।

১০. পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, লাহোর পলিটিক্যাল ডায়েরীস ১৮৪৬-১৮৪৯, IV, ৫৬২।

১১. লর্ড গগের অলসতা নিয়ে গ্রীষ্মে যে যুদ্ধ হয়েছিল তা নিয়ে এডওয়ার্ডেস যে মতামত ব্যক্ত করেন তা সত্য ছিল। 'বিদ্রোহ যেন মদ্যপানের মতো ছিল সাথে মুলরাজের কাছে ত্রিকোণবিশিষ্ট চিরকূট গেল, এমন তারিখে যা বেশি গ্রহণযোগ্য।' ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার, দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি, পৃ-৭৩। এই দোআব পাঠান জনগোষ্ঠী দিয়ে ভর্তি ছিল যা কর্মসংস্থানের ভেতর ও বাহির ছিল এবং দুর্গে তাদের মনোরঞ্জন করা হত, আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা নিজেদের মধ্যে পদবির মাধ্যমে নিরাপত্তা দিত। এমনকি আমাকেও বিশ্বাস করানো হয় যে, মূলতানের পুরো অসহনীয়তার উৎপত্তি হল দেওয়ান পাঠান দল যেহেতু তাদেরকে কর্ম হতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল।' পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, লাহোর পলিটিক্যাল ডায়েরীস ১৮৪৭-৪৯, V, ৩২০।

১২. ৮ মে ১৮৪৮ আবাসিক কর্মকর্তার (২৯ এপ্রিলে) কাছ হতে এডওয়ার্ডেস পত্র পান যেখানে তাকে আদেশ দেয়া হয়েছে মূলতান থেকে দূরে থাকতে এবং তার কার্যকলাপ যা ইন্দাস অতিক্রম করে তা বন্ধ করতে। ইবিদ, পৃ.-৩২২।

মুলরাজ বাহাওয়ালপুরীদের সাথে যুক্ত হয়ে কিনেরিতে যুদ্ধ করেন (১৮ জুন ১৮৪৮) এবং পরে তা পরিহার করেন। এডওয়ার্ডেস ও ভন কোটল্যান্ড বাহাওয়ালপুরীদের সাথে যুক্ত হন, মুলরাজকে বাধ্য করেন এবং তার উপর আবার স্যাদোসামে আঘাত হানেন। (১ জুলাই ১৮৪৮) মুলরাজ বাধ্য হলেন মুলতানে সরে যাওয়ার জন্য। দরবার দলের সাথে যারা উত্তর থেকে নেমে এসেছে এবং হুদের সাথে, এডওয়ার্ডেস ও ভন কোটল্যান্ড পূর্ণশক্তির সাথে দক্ষিণ হতে, মুলরাজের সময় মনে হয় দৌড়ে পালাচ্ছে।

ভাই মহারাজা সিং বিচ্যুত দেওয়ানের আশ্রয়ে এসে উঠেন। জিনদানকে সরানোর সময় তিনি সক্রিয় ছিলেন। যখন তিনি মুলতানে বিদ্রোহের খবর শুনলেন, তিনি তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে দক্ষিণ দিকে সরে যান। তিনি মুলরাজের দলে তার জনতাকে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন যে এটা সৌসখী^{১৩}তে লিখিত ছিল যে সম্বাত ১৯০৫ (১৮৪৮)-এ খালসা পাঞ্জাবের সার্বভৌমত্ব পুনর্জন্ম করবে।

দরবার দলকে ভাই মহারাজা সিং-এর দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রেরণা করা হলো। তারা তাকে চেনাবে ধরে এবং তার অনুসারীদের প্রতি অনেক নির্যাতন করে। ভাই পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং মুলরাজের সাথে যোগ দেন। তার এই আগমনে দেওয়ানদের মাঝে উত্তেজনা তৈরি হয়, যিনি হীন অবস্থা থেকে জাতীয় লায়কের মতো উচ্চপদে আসীন হলো। কী হয়? যখন নির্দিষ্ট এলাকার বিদ্রোহ স্থগিত করার জন্য যুদ্ধ হয়ে যায়। পাঞ্জাবের সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে যে, দলটি মুলতানের জন্য ঘোষিত।

আত্তারিওয়ালারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তখনই গেল যখন শুধু তাদের সন্দেহ হলো যে ব্রিটিশরা ভৈরোয়ালের চুক্তির সম্মান নিশ্চিত করবে না। তার বাবার বদলে, শের সিং লেফটেন্যান্ট এডওয়ার্ডেসকে আবাসিক কর্মকর্তার কাছে লিখতে বাধ্য করেন যাতে দালিপ সিং-এর বিবাহের তারিখ স্থির করা হয়! আত্তারিওয়ালারা বুঝতে পারে যে সাড়া দেয়ার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা যাবে যে ব্রিটিশরা কী চিন্তা করছে। আবাসিক কর্মকর্তা ওয়াদা করলো এই ব্যাপার তিনি দেখবেন কিন্তু তার পত্র শেষ করেন এমনভাবে যে আত্তারিওয়ালার নিশ্চিত হতে সমস্যা হলো। তিনি লেখেন 'আমি দেখতে পাচ্ছি না যে কীভাবে মহারাজা বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৌশল যা সরকার ঠিক মনে করে তা করতে বাধ্য হওয়া বা যেকোনো ভবিষ্যতে পাঞ্জাবের প্রশাসনের সাথে জড়িত হবে।'^{১৪} এই অসন্তোষজনক প্রতিউত্তরের পরে শীঘ্রই, চাত্তার সিং

১৩. বিভিন্নভাবে এসব ভবিষ্যদ্বাণীর সংগ্রহ শুরু গোবিন্দ সিং-এর কাছে নেয়া হল। তিনি অনেক সময় ধরে শিখ সম্প্রদায়কে প্রেমে আক্রান্ত করেছেন। এই বইয়ের বিভিন্ন প্রকাশনায় (উপযুক্ত পরিবর্তন সহকারে) প্রকাশ করা হল ১৮৫৭-এর বিদ্রোহে (তারা ভবিষ্যদ্বাণী করে যুগ্মভাবে ইংরেজ-শিখদের জয় হবে মুঘলদের বিরুদ্ধে); নামধারীদের মতে ১৮৬০ সালে এই দাবিকে সমর্থন করেন যে, রাম সিং-এর মধ্যে শুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রতিমূর্তি দেখা যাবে এবং ভবিষ্যতের ভারতের শাসক হবে; দালিপ সিং-এর সমর্থনকারীদের দ্বারা ১৮৮০ সালে। (ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে তার পাঞ্জাবে মহারাজা হিসেবে প্রত্যাবর্তন রাশিয়ানদের সাহায্য করবে)

সৌসখীর নতুন প্রকাশগুলো যেন ভক্তদের দাবিকে শক্তিশালী করে তোলার ধারা অব্যাহত রেখেছে।

১৪. এডওয়ার্ডেসকে কুরি, ৩ আগস্ট ১৮৪৮।

আন্তারিওয়ালা ও ক্যাপ্টেন অ্যাবট, যিনি তার সাহায্যের জন্য ছিলেন এদের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। আগস্টের প্রথমে ১৮৪৮-এ কোনো নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই অ্যাবট শিখদের বিরুদ্ধে মুসলিম দলকে খেপিয়ে তোলে।^{১৫} উপজাতিরা হরিপুরে আক্রমণের হুমকি দেয়। তার নিজের রক্ষার জন্য, চাত্রার সিং আন্তারিওয়ালা কর্নেল কানোরাকে (দরবারের একজন আমেরিকান কর্মকর্তা) আদেশ দেন দুর্গ যাতে তার জন্য খালি করা হয়। কানোরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যতক্ষণ না অ্যাবট আদেশটি নিশ্চিত করেন। আন্তারিওয়ালা তার দলকে জোর করে দুর্গের দখল নেয়ার জন্য আদেশ দেন। অ্যাবট চাত্রার সিংকে 'ঠাণ্ডা খুনে' অভিযুক্ত করেন। আবাসিক কর্মকর্তাকে বাধ্য করা হলো ক্যাপ্টেন অ্যাবটকে তিরস্কার করার জন্য;^{১৬} কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি অধঃস্তন পরিদর্শক কর্মকর্তার কাছে আদেশ নিশ্চিত করেন চাত্রার সিং-এর জাগিরদের বাজেয়াপ্ত করার জন্য এবং তাকে নাজিমের^{১৭} পদ হতে বরখাস্ত করার জন্য। বৃদ্ধ ও অসুস্থ হওয়ার কারণে^{১৮} চাত্রার সিং-এর কাছে অন্য উপায় ছিল না অথচ তার সাথে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়েছে। তিনি আমির দোস্ত মোহাম্মদ ও তার ভাই সুলতান মোহাম্মদের সাথে খোলা আলোচনায় বসেন। তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে শিখদের^{১৯} পক্ষ নেয়ার ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেন। তাদেরকে পেশওয়ার ও ডেরাজাত আবার প্রদান করা হয়। চাত্রার সিং সাহায্যের জন্য তার বন্ধু গুলাব সিং ডোগরার কাছেও সাহায্য চান। ডোগরা তার দলকে পাঞ্জাব সীমান্তে পাহারার কথা বলেন, তার প্রকৃত ইচ্ছা সম্পর্কে শিখ ও ব্রিটিশদের বুঝিয়ে দেন।

মূলতানে, শের সিং আন্তারিওয়ালা গুনতে পান কীভাবে আবাসিক কর্মকর্তা তার বৃদ্ধ বাবার সাথে ব্যবহার করেছে কিন্তু নিজেকে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত রাখছে, ৯ সেপ্টেম্বর, তিনি ব্রিটিশদের পক্ষে দুর্গ দখলের চেষ্টার জন্য যুদ্ধ^{২০} করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, যখন তিনি কারণ জানতে পারলেন যে ব্রিটিশরা তাকে অপহরণ

১৫. 'আমি তাদের ডেকেছি তাদের নিহত মা-বাবার, বন্ধু-বান্ধবের ও আত্মীয়-স্বজনের স্মৃতি জাগরণের জন্য ও শিখদের ধ্বংস করার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করার জন্য।' কুরিকে অ্যাবট, ১৭ আগস্ট ১৮৪৮।

১৬. তিনি লেখেন : 'এটা স্পষ্ট যে, ব্রিগেডের (চাত্রার সিং-এর অধীনে) মনে যা ছিল কোনো অতিমাত্রায় তাদের মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেয়নি যতক্ষণ না গুরুটা তোমরা করছ সশস্ত্র কৃষকশ্রেণী নিয়ে, এবং সেনানিবাসে ব্রিগেডকে ঘেরাও করছ। কোনো কর্তৃপক্ষ ছাড়াই তোমাদের খাজনা উঠাতে দিয়েছি, এবং জরুরি অবস্থায় সেনার দল নিযুক্ত করেছি। এই ঘটনায় কেন জানি আমি সন্দেহপ্রবণ, এটা বেশি বেশি, আমি ভাবছি, বিলাপ করার মতো...যে তুমি উদ্দেশ্য যাচাই কর, এবং দলের নাজিমদের অনুভূতি ও আনুগত্য, যার খবর গুপ্তচর ও বার্তাবাহক দিয়েছে, সম্ভবত বেশি আশ্রয়ী এসব বিষয়ে ভুল প্রচার করার জন্য। কোনো হিসাব নাই যে এখনও তোমাকে কমেভন ক্যানোরার খুন সম্পর্কে ন্যায়বিচার করবে, না দাবি করবে যে এটা ছিল সর্দার চাত্রার সিং-এর পূর্বপরিকল্পিত খুন।' অ্যাবটকে কুরি, ১৯ আগস্ট ১৮৪৮।

১৭. কুরিকে নিকোলসন, ২০ আগস্ট ১৮৪৮।

১৮. পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, লাহোর পলিটিকাল ডায়েরি ১৮৪৬-৪৯, IV, ১৪৯।

১৯. ইবিদ, পৃ-১৬৭।

২০. 'শিখরা চমৎকারভাবে যুদ্ধ করেছে- কী খোঁচা তারা দিল!' পিয়ার্স, জার্নাল কেস্ট ডিউরিং দ্য সেইজ অফ মূলতান (এমএসএস), পৃ-৪৮।

করার পরিকল্পনা করেছেন, তিনি তার দলের সাথে ব্রিটিশ ক্যাম্প পরিত্যাগ করেন। পরদিন তিনি ঘোষণা দেন :

এটা সবাই জানেন সকল পাঞ্জাবের অধিবাসী, শিখরা এবং তারা যারা খালসা প্রাপ্তি করেছেন এবং অবশ্যই বিশ্ব, যে কী পরিমাণ নিপীড়ন, জুলুম ও হিংস্রতা দেখিয়েছে ফিরিস্জিরা মহান মহারাজা রনজিত সিং-এর বিধবা স্ত্রীর সাথে এবং দেশের জনতার প্রতি তারা কী পরিমাণ নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে।^{২১}

শের সিং মুলরাজের সাথে যোগদানের প্রস্তাব দেন। দেওয়ানের সন্দেহ তৈরি হলো একটি নিষিদ্ধ পত্র পেয়ে—যা ব্রিটিশরা চেষ্টা করেছিল তার হাতে পৌছাতে—এই পত্রে শের সিং-কে গোপন ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে—যাতে ঠকিয়ে মুলতান দখল করতে পারেন—এবং মুলরাজ দুর্গে শের সিং-এর প্রবেশকে নিষিদ্ধ করেন। এজন্য বিরক্ত শের সিং মুলতান ছেড়ে তার পিতার কাছে সাহায্যের জন্য যান। আন্তারিওয়ালাদের এই দলত্যাগ একটি সংকেত ছিল সর্দারদের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারে। এভাবে একটি ক্ষুদ্র সমস্যা জাতীয় বিদ্রোহে পরিণত হলো। শুধু লাহোরে, রাজা তেজ সিং এবং কিছুসংখ্যক একই পদস্থ লোক দরবারকে ক্ষুদ্র দুর্ভাগা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এমন করেন কারণ যেহেতু তারা ফিরিস্জিদের কাছে নিলামে বিক্রি হয়েছেন।

লর্ড ডালহৌসি এসব ঘটনায় প্রীত ছিলেন কারণ এটা তাকে সুযোগ করে দিল যার জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। ‘হাজারাতে ভালো মতোই ঝামেলা হলো...আমি এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করতে পারি না...আমি এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো প্রয়োজন দেখছি না অধিকার আদায় করা ছাড়া...আমি তলোয়ার চালিয়েছি এবং এইবার তা কাপুরুষদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছি।’^{২২} তিনি শের সিং-এর পরাজয়ের খবর পান এবং খুব ভালো মনে উল্লসিত হন কারণ এজন্য দুর্ভোগ পোহাতে হয় সেজন্য তিনি মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছেন। তিনি লেখেন, ‘আমরা এখন ইন্ডের উপর নেই কিন্তু শিখ জাতি ও পাঞ্জাব রাজ্যের সাথে যুদ্ধের মাঝামাঝি আছি।’ কলকাতা ছাড়ার আগে, ডালহৌসি তার নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার মতো করে যুদ্ধের ঘোষণা দেন। ‘পূর্বের ঘটনা থেকে অসতর্ক, উদাহরণ থেকে অনুপ্রাণিত না হয়ে শিখ জাতি যুদ্ধের আহ্বান করে এবং আমার মতে স্যার, তাদের এতে একটা শিক্ষা হওয়া উচিত।’^{২৩} তিনি পৃথকভাবে দরবার নিয়ে ঝামেলা করেন তার আলোচনায় তাই ব্রিটিশরা জোরপূর্বক ঢুকতে পারবে ‘লাহোর সীমান্তে যারা সরকার গঠন করে শত্রু হিসেবে নয় শুধু আদেশ ও আনুগত্য পুনরুদ্ধার জন্য।’^{২৪}

২১. এডওয়ার্ডস কর্তৃক সংগৃহীত কুরির কাছে, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮। নং-১৫৯১/ডব্লিউ.ই. ২৩-৯-১৮৪৮, পি.জি.আর.।

২২. বাইর্ড, প্রাইভেট লেটারস অফ দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি, পিপি ৩৩-৪।

২৩. কুরিকে ডালহৌসি, ৮ অক্টোবর ১৮৪৮। ট্রিটার, লাইফ অফ মারকুইস অফ ডালহৌসি পৃ-৩৮।

২৪. ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মনে এই বিধার প্রচারণা পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এমনকি ব্রিটিশ দলের কমান্ডার লর্ড গগও নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি দরবারের পক্ষে না বিপক্ষে যুদ্ধ করছেন। তার

এটা অসম প্রতিযোগিতা ছিল। ১৮৪৬-এর লাহোর চুক্তি অনুসারে বেশিরভাগ পাঞ্জাবির অস্ত্র জমা নেয়া হলো এবং তাদের সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে ২০,০০০ পদাতিক ও ১২,০০০ অশ্বারোহীতে আনা হলো এবং কৃষক সম্প্রদায় থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়া হলো। ব্রিটিশরা অপরদিকে ৫০,০০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈন্য জড়ো করেন সুতলেজ বরাবর নিবাস স্থাপন করেন ৯০০০ লাহোরে এবং ৯০০০ ফিরোজপুরে। অনেক শক্তিশালী দুর্গসহ লাহোর, কংগা, শিখুপুরা তাদের হাতে ছিল।

নভেম্বর ১৮৪৮-এও কীভাবে জানি একই অবস্থা ছিল। চাজ এবং সিন্দ সাগর দোআবরা স্বাধীনতার ঘোষণা দেন; বাকি দোআবগণ ব্রিটিশদের অধীনে ছিল। বাধা দেয়ার দুইটা কেন্দ্র ছিল—একটা ছিল উত্তর-পশ্চিমে আন্তারিওয়ালা কর্তৃক পরিচালিত, অন্যটি দক্ষিণে ছিল যা মুলরাজ পরিচালনা করেন। শের সিং আন্তারিওয়ালা লাহোরের কাছ দিয়ে গিয়েছিলেন; তিনি যেমনটি ভেবেছিলেন তেমনভাবে জনতার উত্থান হয়নি। তিনি লর্ড গগের লাহোরের দিকে আগমনের খবর শুনতে পান এবং উত্তরের দিকে ব্রিটিশদের চেনাবে ধরার জন্য সরে যান।

গগ চেনাবের দিকে এগিয়ে আসে ও নদীর অপর তীরে আন্তারিওয়ালার দলকে দেখে। পাঞ্জাবিরা নদী অতিক্রম করে, রামনগরের দুর্গ দখল করে, জেনারেল ক্যাম্পবেলের অধীনে ব্রিটিশদের আক্রমণ করে।^{২৫} লর্ড গগ ক্যাম্পবেলের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পান। ব্রিটিশ দল চেনাব অতিক্রম করে দুটি বিন্দুতে এবং শের সিং আন্তারিওয়ালাকে গোলন্দাজ যুদ্ধে কাছের গ্রাম সাদল্লাপুরে নিষ্কৃত করে।

আগুনশক্তিতে ব্রিটিশদের প্রাধান্যের কারণে পাঞ্জাবিরা তাদের চেনাবে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ঝেলামে ফিরে যায়। তারা নিজেরা এমন জায়গা খনন করে যেখানে নদী তাদের পিছনে থাকে এবং একটি মোটা বাঁধ দ্বারা গভীর সঙ্কীর্ণ উপত্যকাকে তাদের সামনে ভাগ করে। ব্রিটিশরা প্রায় তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাঞ্জাবি ঘাঁটি থেকে অবস্থান নেয়। কিছু সময়ের জন্য দুই দলই নিষ্ক্রিয় ছিল। তারপর পাঞ্জাবিরা প্রদেশের জন্য চেষ্টা করলো শত্রুপক্ষকে তাদের জায়গা থেকে সরিয়ে দিতে। অন্য জায়গা থেকে খবর পেয়ে যুদ্ধবাজরা ঝেলামে শত্রুভাবাপন্ন হওয়া শুরু করে। চাত্তার সিং আন্তারিওয়ালা অ্যাটককে ছেড়ে দেন এবং তার সামর্থ্য অনুযায়ী দলের সাথে পাঠান

আত্মজীবনীতে লেখক লিখেছেন এটা নয় যতক্ষণ না লাহোর ত্যাগ করেন যে তিনি জানেন গভর্নর জেনারেলের সিদ্ধান্ত কী ছিল এবং যুদ্ধটি বিপক্ষে হবে এবং দরবারের পক্ষে নয়... 'আমি জানি না,' তিনি ১৫ তারিখে বলেন, 'আমরা কী শান্তিতে আছি বা যুদ্ধে বা কার জন্য আমরা যুদ্ধ করছি।' *আর.এস.রেইট, দ্য লাইফ অ্যান্ড ক্যাম্পেইন অফ ভিসকাউন্ট VV, II, ১৭৮।*

২৫. রামনগর কোনো মহান ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল না। কিন্তু পাঞ্জাবিদের দৃঢ় করতে এটা অনেক প্রেরণা দিয়েছে। একজন ব্রিটিশ অধঃস্তন কর্মকর্তা লিখেছেন 'শত্রুপক্ষ অনেক পালকে সজ্জিত, এবং আমাদের ঘাঁটি হতে আধা মাইলের মাঝে অবস্থান করছে এবং আমাদের ঝোঁজে প্রায় এসে গেছে।' *স্যান্ডফোর্ড, লিভস ফ্রম দ্য জার্নাল অফ এ সাবঅলটার্ন, ২৪ নভেম্বর ১৮৪৮ পৃ.-৬৬* পাঞ্জাবিরা ব্রিটিশ বন্দুক দখল করে এবং রেজিমেন্টকে রঞ্জিত করে।

শের সিং আন্তারিওয়ালা ব্রিটিশদের একটি পত্র পাঠান শত্রুতা বন্ধের প্রস্তাব দিয়ে যদি তারা লাহোর খালি করে দেয়ার ওয়াদা করে। এই প্রস্তাব গ্রাহ্যই করা হয়নি।

এবং ওয়াদা করেন যে শত্রুপক্ষের আক্রমণে তার ছেলের সাথে যোগ দিবেন। মুলতান থেকে খবর পেয়ে ব্রিটিশরা আরও প্রেরণা পেল। একটি ব্রিটিশ কামানের গোলা দুর্গের গোলা-বারুদের গুদামে ফেলা হলো, ৪০০,০০০ পাউন্ড বারুদ উড়ে গেল এবং এর প্রতিরক্ষার জন্য নিয়োজিতদের মাঝে পঁচশ'র বেশি মানুষ মারা গেল।^{২৬} যুদ্ধের ডেউ ব্রিটিশদের পক্ষে সরে গেল। তারা তাদের বাজেয়াপ্ত বন্দুকের পৌছানোর অপেক্ষা করে যাতে তারা মুলরাজকে আত্মসমর্পণের জন্য বাধ্য করতে পারে।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ, ১৩ জানুয়ারি ১৮৪৯

ব্রিটিশ^{২৭} ও পাঞ্জাবিরা দখলের জন্য উঠেপড়ে লাগেন। লর্ড গগ জঙ্গল এড়ানোর চেষ্টা করেন এবং পাঞ্জাবিদের কোমরে আঘাত করে। শের সিং আন্তারিওয়াল গতি বন্ধ করেন এবং জঙ্গল ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকা নিয়ে যা এখনও তাকে শত্রুদের থেকে আলাদা করে রেখেছে।

১৩ জানুয়ারি ১৮৪৯-এর দুপুরে ব্রিটিশরা তাদের আক্রমণ শুরু করে। পাঞ্জাবিরা তাদেরকে চিলিয়ানওয়াল গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে দেখল এবং দ্রুত গুলি ছুড়ল। এক ঘণ্টা ধরে পাঞ্জাবি বন্দুক শত্রুদের কিনারায় আটকে রাখল। যখন তাদের গুলি শেষ হয়ে আসলো, ব্রিটিশরা, যারা সংখ্যায় বেশি হওয়ার সুযোগ নিল, চেষ্টা করলো পাঞ্জাবিদের জোর করে নদীতে নেয়ার। পাঞ্জাবিরা গুলোর জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাদের ঘনঘন আক্রমণের শব্দ পাথ (মারো ও দৌড়াও) শুরু করলো।^{২৮} যুদ্ধ চলতে থাকল যতক্ষণ না রাত উভয় সৈন্যদলকে ঢেকে ফেলল। পাঞ্জাবিরা চারটি ব্রিটিশ বন্দুক ও তিনটা রেজিমেন্টের রং দখল করে। ব্রিটিশরা ভারতে আসার পর চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধটাই তাদের জন্য সবচেয়ে খারাপ ছিল।^{২৯} পরদিন সকালে পাঞ্জাবি বন্দুক একুশবার গর্জে পাঞ্জাবিদের জয়কে শ্রদ্ধা জানাল।^{৩০}

২৬. এটা ছিল ৩০ ডিসেম্বর ১৮৪৮। জেনারেল কাহান সিং মান ও তার ছেলে যারা ভূগর্ভস্থ কারাগারে আটক ছিলেন তারা এই বোমা হামলায় নিহত হন। পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, লাহোর পলিটিকাল ডায়েরীস ১৮৪৭-৪৯, গ, ৩২৯, মুলরাজ ২২ জানুয়ারি ১৮৪৯-এ আত্মসমর্পণ করেন।

২৭. কর্নেল স্টিনবাক (একসময় দরবারের অনুগত) ও রোহিলার অধীনে ডোগরারা, যারা পাঞ্জাবিদের বিতাড়িত করেছে, চিলিয়ানওয়ালাতে ব্রিটিশদের সাথে যোগ দেন।

২৮. 'শিখরা' একজন ইংরেজ পরিদর্শক লেখেন 'শয়তানের মতো যুদ্ধ করেছে...এমনকি মৃত্যুর সময়ও হিংস্র ও অবাধ্য...এমন মানুষের দল আমি কখনও দেখিনি এবং সিং-এর মতো সাহসী তারা বেয়োনেটের সামনে দৌড়ে যায় ও তাদের আততায়ীদের আঘাত করে যখন তারা শেষ হয়ে যায়।' স্যান্ডফোর্ড, লিভস ফ্রম দ্য জার্নাল অফ এ সাবঅলটার্ন, পৃ-১০৬-৮।

২৯. রাতটি ব্রিটিশদের জন্য ভয়াবহ আতঙ্কের ছিল। জেনারেল থ্যাকওয়েল লিখেন 'পুরো সৈন্যবাহিনীতে দ্বিধা দেখা যায়। সাধারণভাবেই এত ভয় পায় যে শত্রুরা (পাঞ্জাবিরা) রাতে

আবারও, ফিরোজ শহরে, পাঞ্জাবিরা তাদের সুবিধা নিয়ে ঘরে ফিরতে ব্যর্থ হয়। তাদের নিজেদের ক্ষতি সহনীয় ছিল, এবং তারা তাদের শত্রুকে কতটুকু শাস্তি দিয়েছিল সে সম্পর্কে অবগত ছিল না। এসব উপাদানও ব্রিটিশদের উদ্ধারে সহায়তা করলো। যখন যুদ্ধ বন্ধ হয়, তখনই বৃষ্টি শুরু হয়; পরবর্তী তিনদিন অব্যাহত ধারায় বৃষ্টি হলো, সংকীর্ণ উপত্যকা যেটি পাঞ্জাবিদের শত্রু থেকে আলাদা করে রেখেছিল সেটি গভীরে পরিণত হলো। চতুর্থদিন যখন আবার সূর্য উঠল, তখন ব্রিটিশরা চিলিয়ানওয়ালার দখল নিল এবং চাজ অতিক্রম করে চেনাবের তীরে সরে গেল।^{৩০}

আন্তারিওয়ালার জর্জ লরেন্সকে পাঠাল, যে তাদের এসব ব্যাপারে প্রতিনিধি ছিল। তারা মহারাজা হিসেবে দালিপ সিং-এর সুবিধার কথা এবং ব্রিটিশদের পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো। প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হলো।

গুজরাটের যুদ্ধ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯

আন্তারিওয়ালার চেনাবের দিকে অগ্রসর হলো এবং তার সৈন্যদের ষাট গাড়ী ঘোড়ার খুরের মতো গুজরাট শহর ও নদীর মাঝে। তারা উভয় দিক দিয়েই দুর্বল ছিল বন্দুক (৫৯ যেখানে ব্রিটিশদের ৬৬) এবং জনশক্তিতে। ব্রিটিশ আক্রমণ শুরু হয়

আক্রমণের চেষ্টা চালাবে। যদি তারা এমন করে এবং তাদের সুযোগ নিতে পারে, তারা অবশ্যই আমাদের দিকে তাদেরকে ঠেলে দিবে...। যে জঙ্গল তাদের কাছে বন্ধুসুলভ ছিল আক্রমণের শুরুতে এখন তা আমাদের রক্ষা করবে।' পরদিন সকালের দৃশ্য ও জেনারেল থ্যাকওয়েল কর্তৃক অঙ্কিত হয়েছিল 'রাজপুত্র অ্যালকটের টুপি ও মিলিটারী জুতা অবশ্য সব দিকে প্রচুর পরিমাণে মাটিতে দেখা যেতে হবে...পরদিন ক্যাম্পে অস্ত্রোপেক্ষিক্রিয়ার জন্য বিষণ্ণতা বজায় ছিল।' এবং এটা ভাল যে প্রায় ৩০০০ ব্রিটিশ মৃত বা আহত হয়েছে সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় এবং ঝোপেঝাড়।
থ্যাকওয়েল, ন্যারেটিভ অফ দ্য সেকেন্ড শিখ ওয়ার, পৃ-৭৩।

৩০. ব্রিটিশরাও চিলিয়ানওয়ালার জয়ের দাবি করে। লর্ড ডালহৌসি, কীভাবে জানি সত্য ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে একটি ব্যক্তিগত পত্র লর্ড ওয়েলিংটনকে লেখেন ২২ জানুয়ারি ১৮৪৯-এ। তিনি লেখেন 'জনতার সামনে আমি অবশ্যই ভালো কাজ করি। আমি এটাকে মহান জয় বলে ভাবি। কিন্তু গোপনে তোমাকে লিখেছি, আমার বলতে দ্বিধা নেই যে আমি ভাবি আমার অবস্থান কবরে...' দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি, পৃ-২০৯।

৩১. ব্রিটিশ ইতিহাসবিদদের উলটো মতে ব্রিটিশদের বন্দি ও আহতদের সাথে শিখদের ব্যবহার; জর্জ মেরেডিথ, যিনি তার প্রথম কবিতা চিলিয়ানওয়ালার নিয়ে প্রকাশ করেন, তাদের বলেন, 'অসভ্য লুণ্ঠনকারী শয়তানের তাদের সবচেয়ে খারাপ কাজ করেছে খুনীদের মধ্যে। ...আহত ও নিহতদের একজন ব্রিটিশ অধঃস্তন কর্মকর্তা লেখেন '৯০০০ জন বন্দির মধ্যে দু'জনকে কারাগারে নেয়া হয়। আরেকদিন এই সকালে শের সিং-এর সুনামসহ ফেরত পাঠানো হয়। তাদেরকে দুঃখিত মনে হল ফিরে আসাতে যেহেতু তাদের সাথে রাজপুত্রদের মতো ব্যবহার করা হয়েছিল, পিলাওয়াদসহ মদ ও ব্র্যান্ডি জড়বুদ্ধিদের দেয়া হল এবং পাঠানো হল তার প্রতি পকেটে ১০ টাকা দিয়ে।' স্যারফোর্ড, লিভিংস্টোন দ্য জার্নাল অফ এসাব অলটার্ন, পৃ-১২।

সকাল ৭.৩০ মিনিটে। পাঞ্জাবিরাও দ্রুত গুলি করা শুরু করে; তারা তাদের গোলাবারুদ শেষ করতে থাকে এবং তাদের বন্দুকের অবস্থানকে প্রতারণা করে। গোলাবর্ষণ একঘণ্টা ধরে চলে। ব্রিটিশদের বন্দুক পাঞ্জাবিদের গোলন্দাজ বাহিনীকে চূপ করিয়ে দেয়।^{৩২} তারপর তাদের অস্থারোহী ও পদাতিকবাহিনী পাঞ্জাবিদের জায়গা দখল করে নেয়। আফগান, অস্থারোহী, যারা পাঞ্জাবিদের সাথে যোগ দিয়েছিল, শত্রুকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু এর উদ্দেশ্য সফল না করেই প্রত্যাহার করে। পাঞ্জাবিরা শত্রুদের সাথে হাতাহাতি যুদ্ধ করে। ‘চিলিয়ানওয়ালার মতো এই আক্রমণেও’, জেনারেল থ্যাকওয়েল লেখেন, ‘শিখরা তাদের আততায়ীর বেয়োনেট ধরে তাদের বাম হাতে এবং ডান হাতে ভয়ংকরভাবে তলোয়ার চালিয়ে দেয়...এই একটি ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে এসব মানুষের বিরল সাহস ছিল।’^{৩৩}

যেদিকে সংখ্যা ও অস্ত্র ভারি ছিল তাই ফলাফল নির্ধারণ করলো। পাঞ্জাবিরা হাল ছেড়ে দিল। ব্রিটিশরা গুজরাট দখল করে এবং পাঞ্জাবিদের বাধ্য করে যতক্ষণ না তারা যা ধ্বংস করেছে তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।^{৩৪} সংঘবদ্ধ পাঞ্জাবিদের ফিরিঙ্গিদের জন্য বাঁধা দেয়ার মাধ্যমে গুজরাটের যুদ্ধ শেষ হয়। ১১ মার্চ ১৮৪৯-এ, আন্তারিওয়ালারা আনুষ্ঠানিকভাবে রাওয়ালপিন্ডির কাছে হারমাকে মেজর জেনারেল গিলবার্টকে তাদের তরবারি জমা দেন।^{৩৫} ১৪ তারিখ পর্যন্ত পুরো শিখ সৈন্যদল এমন করে। জেনারেল থ্যাকওয়েলের মতে দৃশ্যটি ছিল ‘কিছু বৃদ্ধ সম্মানীয়

৩২. জেনারেল থ্যাকওয়েল মনে করিয়ে দিলেন, ‘শিখ বন্দুকসজ্জা যা বিখ্যাত দেখিয়েছে তা পুরস্কারের যোগ্য তারা তাদের নিজেদের অবস্থান থেকে আনুগত্য দেখিয়েছে, যখন তাদের চারপাশের পরিবেশে ব্রিটিশ কর্তৃক গুলিবৃষ্টি চলছিল, তা বর্ণনার প্রয়োজন নেই।’ ই.জে. থ্যাকওয়েল, *ন্যারেটিভ অফ দ্য সেকন্ড শিখ ওয়ার*, পৃ-২১৩।

৩৩. ইবিদ।

৩৪. ‘কিছুটা হলেও আমার বলতে লজ্জা লাগছে, যা দেয়া হল— এবং আমরাও এমনকি আমাদের মানুষের প্রতিহিংসা হতে বাঁচতে পারলাম, আমার ভয়, পরে হত্যা করা হবে। কিন্তু, আসলে এটা সম্পূর্ণ শেষ করে দেয়ার জন্য যুদ্ধ।’ স্যামুয়েল ফোর্ড, *লিভস ফ্রম দ্য জার্নাল অফ এ সাব অলটার্ন*, পৃ-১৫৫।

৩৫. *সেক্রেট ডিসপ্যাচ টু দ্য সেক্রেট কমিটি নং-১৮*, ২১ মার্চ ১৮৪৯। যখন আন্তারিওয়ালাগণ ও তাদের সৈন্যরা তাদের অস্ত্র নামিয়ে রাখল, অনেক মানুষ যুদ্ধের জন্য চেষ্টা করতে থাকল। নারায়ণ সিংকে জীবিত অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়; আলীগড়ের কাছে কর্নেল রাকপাল সিংকে হত্যা করা হয়। ২৮ ডিসেম্বর ১৮৪৯-এর রাতে, ভাই মহারাজ সিং যার মাথার মূল্য ১০,০০০ টাকা ঘোষণা করা হয় তাকে অস্ত্রহীন অবস্থায় একুশজন নিয়ে যায়। ‘শুরু সাধারণ মানুষ ছিলেন না।’ জনাব ভনসিট্রাট লেখেন : ‘যে তাকে গ্রেফতার করেন। সে এত আপন ছিল যা ক্রিস্টিয়ানদের কাছে যীশু ছিল।’ *এসসি ৪৯*, ২৫-১-১৮৫০। সরকার জনতার সামনে ভারতে পরীক্ষা নেননি, এবং সিদ্ধান্ত নেন যে তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কয়েক বছরের জন্য ভাইকে আলাদা কারাগার কক্ষে রাখা হয়েছিল। তিনি ৫ জুলাই ১৮৫৬-তে মারা যান।

মুলরাজ খুনের চেষ্টা করে এবং তাকে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। জীবনের জন্য ভাগতে হবে এভাবেই তাকে মৃত্যুর শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তিনি ১১ আগস্ট ১৮৫১ সালে বেনারসের কাছে মারা যান।

৭৪ ॥ এ হিস্টি অব শিখ

খালসাদের অনীহা সাক্ষী ছিল এই অস্ত্র জমা দেয়ার ব্যাপারে। কেউ কেউ তার চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। আবার অনেকের চেহারায়ে ক্রোধ ও ঘৃণা স্বভাবতই দৃশ্যমান ছিল।’ একজন ধূসর দাড়ির লোক যখন তার বন্দুক নামিয়ে রাখছিল তখন সংক্ষিপ্তভাবে পাঞ্জাবের ইতিহাস বলল ‘আজ রানজিত সিং মার গায়া’—আজকে রনজিন সিং মরে গিয়েছে।

২৯ মার্চ ১৮৪৯-এ একটি দরবার দুর্গে জমায়ের হয়। একটি ঘোষণায় বলা হয় যে শিখদের রাজ্য একটি সমাপ্তিতে এসে পৌঁছেছে। মহারাজা দালিপ সিং কোহিনূর হীরা হস্তান্তর করেন এবং তার বিখ্যাত বাবার সিংহাসন হতে নিচে নেমে যান—আর কখনও এখানে বসা হবে না।

দ্বিতীয় পর্ব

পাঞ্জাবে ব্রিটিশ ক্ষমতার দৃঢ়করণ

দশ বছরের অরাজকতা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শিখদের ইচ্ছাশক্তি কমে গেল তাদের রাজ্য অধিকার করার ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার জন্য। ইংরেজরা আরও বুঝতে পারে যে, পাঞ্জাব শাসনে সর্বোত্তম পন্থা হলো স্বতন্ত্র ক্ষমতার ন্যায়বিচার ('আমি তোমাদের শাসন করব কলম অথবা তরবারি দিয়ে', জন লরেন্স বলেছিলেন) এবং সমৃদ্ধ কৃষক শ্রেণী। প্রশাসনিক বোর্ড পাঞ্জাবকে সৈন্যমুক্ত করে, আইনকানুন পুনর্বীর প্রতিষ্ঠা করে, এবং পাঞ্জাবিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়। যদিও তাদেরকে সকল সুবিধা দেয়া হলো, ব্রিটিশরা আগ্রহ দেখাল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে বিভিন্ন কাজ দিয়ে 'হিন্দাস', অনেকের চেয়ে বেশি শিক্ষিতদের কেরানীসংক্রান্ত কাজে প্রাধান্য দেয়া হলো; পুলিশের জন্য মুসলমানদের এবং, বার বার শিখদের বিশ্বস্ততা দেখে তাদেরকে সৈন্যবাহিনীতে নেয়া হলো।

এই কৌশল ব্যাপকভাবে সফল হয়; সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭এ, যখন উত্তর ভারতের বাকি অংশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন পাঞ্জাবিরা ব্রিটিশদের পক্ষে ছিল।

বিদ্রোহের পর, সরকার জনতার জন্য কাজ করতে চাইল রাস্তা তৈরি, রেলপথ তৈরি, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা। এর মধ্যে জনতা সবচেয়ে বেশি যুক্ত ছিল খাল খনন এবং দোআবের পরিত্যক্ত ভূমি পুনরুদ্ধার করা যা পাঞ্জাব নদীর মাঝে ছিল। পাঞ্জাব ভারতের শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হলো। যেসব শিখদের এসব খালি পরিত্যক্ত পদার্থের একত্রীকরণের জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল তারাই এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। এটা বিস্ময়কর নয় যে তারা ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল, কারণ— গভর্নর জেনারেল লর্ড ডুফেরিনের মতে, 'তাদের ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ রাজত্বের সাথে ভারতে ডুবে গেছে।'

পাঞ্জাব অধিকার করা

লর্ড ডালহৌসি অর্ধেক কাজে বিশ্বাস করতেন না। এমনকি পাঞ্জাবিরা অস্ত্র সমর্পণের পূর্বে, তিনি শিখদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হতে অপসারণের পদ্ধতি বের করেন।^১ ‘পাঞ্জাব অধিকার করা আপত্তির বাইরে’ তিনি লিখেছিলেন।^২ এমনকি তাকে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতামতের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল, মূলত হেনরি

১. ‘পাঞ্জাবে কখনও শান্তি আসছে না যতদিন না এর জনগণ যুদ্ধের অর্থ ও সুযোগের ব্যাপার বুঝবে। কখনও বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত করে বলা যাবে না ভারত ঘুমাচ্ছে যতক্ষণ না আমরা শিখদের উপর এর প্রভাব দেখতে পাচ্ছি এবং এর ক্ষমতা একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে নষ্ট করে দিচ্ছি।’ গভর্নর জেনারেলস ডিসপ্যাচ টু দ্য সেক্রেট কমিটি নং ২০, ১৮৪৯।
২. বাইর্ড, প্রাইভেট লেটারস অফ দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি, পৃ-৩০. তার গোপন কমিটিতে দ্রুত প্রেরণ হয় ৭-৪-১৮৪৯-এ, পাঞ্জাবের অধিকার নিয়ে ডালহৌসি তিনটি কারণ দর্শান। প্রথমত, যখন ব্রিটিশরা লাহোর ও ভৈরোওয়ালের চুক্তি নিরীক্ষণ করছিল, তখন দরবার তেমন কিছু দেয়নি এমনকি একটি রূপিও না। বার্ষিক খরচের ২২ লাখ রূপি মুলরাজের দরবারে বিরুদ্ধে পাঠানো হয়নি। দ্বিতীয়ত, দরবার সৈন্যবাহিনী ও জনতাকে পরিচালিত করেছে, রাজ্যের সর্দার, চুক্তির স্বাক্ষরকর্তা এমনকি কাউন্সিল অব রেজেন্সীর সদস্যরা’ (এর মধ্যে একজন শিখ আর্মিকে মাঠে নির্দেশ দেয়) ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। তৃতীয়ত, শিখরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আফগানদের ডেকে এনেছে।
মহাজন ইন সারকামস্ট্যানসেস লিডিং টু দ্য এনেক্সেশন অফ দ্য পাঞ্জাব ১৮৪৬-৪৯(পৃ-১২৬) সাথে গান্দা সিং-এর প্রাইভেট কorespondence রিলেটিং টু দ্য অ্যাংলো- শিখ ওয়ারস (পৃ-১৫৮) ডালহৌসিকে অভিযুক্ত করা হয় প্রথম কারণে ভুল করার জন্য যে বার্ষিক খরচের কোন অংশেই লাহোর দরবার দেয়নি, এবং আবাসিক কর্মকর্তা থেকে লাহোরে পত্রের অনুলিপি গভর্নর জেনারেলকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮-এ দেখানো হয় ব্রিটিশ সম্পদের চাহিদা মেটাতে স্বর্ণের মাধ্যমে ১৩ লাখেরও বেশি টাকা প্রদান করা হয়। এটা স্পষ্ট যে, লাহোরের আবাসিক কর্মকর্তার হিসাব থেকে যে স্বর্ণ ডেবিটের বিরুদ্ধে ক্রেডিট দেখানো হয় লাহোর দরবার কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারকে যা ভৈরোওয়ালের চুক্তি থেকে উচ্চ ছিল (এসসি ২৪৫, ৩০-১২-১৮৪৮) এবং সে ধার ব্রিটিশ সরকার লাহোর দরবার হতে এপ্রিল ১৮৪৭-এ নিয়েছিল তা এখনও শোধ করতে পারেনি রাজ্য অধিকারের সময় (এসসি ৭৮, ২-৫-১৮৫১. তখনও বার্ষিক খরচ মেটাতে তাদের টাকা ছিল কম, প্রথম পরিশোধ করা হয় ১৮৪৮-এর মে মাসে।
দালিপ সিং অনেক পরে তার ব্যাপারটি তুলনা করে অভিভাবকত্বে প্রতারণার সাথে যখন সে তার রাজ্য ফেরত পাওয়ার জন্য ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। ‘ব্রিটিশ জাতির একটি ক্ষেত্র ছিলাম আমি; এবং অভিভাবকদের জন্য এটা অন্যায্য হবে যদি আমার রাজ্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয় অভিভাবকত্বে পাস না করার জের ধরে।’ দ্য টাইমস-এর চিঠি, ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮২।

লরেন্স, তিনি দ্রুত ইংল্যান্ড হতে ফেরত আসেন এবং তার পদ হয় আবাসিক কর্মকর্তার। এই দখলের বিরুদ্ধে হেনরি লরেন্স ছিলেন।^৩ জন লরেন্স ডালহৌসির সাথে একমত ছিলেন এই দখলের ব্যাপারে ‘উভয়ই অকাট্য ও জোরদার’ লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালকদের আদালতও ডালহৌসিদের পিছে ছিল।^৪ এই সমর্থনকে নিশ্চিত করে হেনরি লরেন্সকে গভর্নর জেনারেল বলেন যে দখল করার ঘোষণা লিখিত আকারে বের করতে। এই কাজে হেনরির মত ছিল না, এবং সে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়ান মুলরাজের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে চায়। যখন ডালহৌসি হেনরির কাগজের এবং তার ইচ্ছা পাঞ্জাবের ভাগ্য নিয়ন্তা হওয়ার ইচ্ছা দেখে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান,^৫ হেনরি তার বরখাস্তপত্র জমা দেয়। তাকে তার বন্ধুরা এটা প্রত্যাহারে জোর করে এবং অতিশাসন ও অবহেলিত হওয়া সত্ত্বেও, গভর্নর জেনারেলের আদেশ পালনে রাজি হয়। ডালহৌসি মহারাজা দালিপ সিং-কে পাঞ্জাব হতে সরিয়ে ফেলার আদেশ দেন।^৬ শিখ পতাকা নিচে নামানো হয়,

৩. ‘আমার অভিমত, যেমনটি আমি তোমাকে একবারের অধিক ব্যক্ত করেছি, তা হল শিখদের মহান খালসা দলকে জাহত করা অভিজাতভাবে। তৎক্ষণাৎ ঝুঁকে পড়ে ও উত্তর-পশ্চিমে আমাদের রাজ্যের জন্য সাহায্য চেয়ে; রনজিত সিং-এর মৃত্যুর পর একক ও স্বাধীন ক্ষমতা—যখন এটা শত্রুভাবাপন্ন তখন সামলানো, যখন বাতিল হবে তখন নষ্ট করা, এবং এর বৃহৎ সৈন্যদলকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বাধা হিসেবে ব্যবহার করা এবং যদি দরকার হয় তাহলে রাশিয়ার বিরুদ্ধেও। তার অনুপস্থিতিতে যে বিদ্রোহ ১৮৪৮ সালে হল, কিন্তু যা তিনি দেখেননি তা সম্ভাব্যত—খারাপভাবে বিন্যস্ত, কিন্তু তা পূর্ণভাবে তার স্বপ্ন সত্যি করেনি।’ এডওয়ার্ডেস এবং মেরিডেলি, লাইফ অফ স্যার হেনরি লরেন্স, পৃ-৪৭০।
৪. ‘শিখদের চাঞ্চল্য ও প্রাণোদ্যম একক ভাগে (এখানকার স্বাধীনতাবিদদের) রাজ্যজয়ের জন্য ছিল না, আমার মতে, এটা একটা তর্ক যা আমাকে ধ্বংস করতে পারে, যদি আমি সেখানে রাজ্য অধিকারের জন্য থাকতাম।’ হেনরি লরেন্সকে হার্ডিঞ্জ, ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি, পৃ-৮৩
৫. ‘আপনি যে দাবির প্রস্তাব তুলেছেন তা আমি দেখব, এটাতে বাধা দেয়ার কারণ, যে ব্যাপারে এটা ঠিক হয়েছিল, হিসাব করে দেখা হল এটা তাদের জন্য যারা এই লজ্জাজনক যুদ্ধে যুক্ত ছিল বেশি আশা নিয়ে, শান্তি থেকে বাঁচার আশায় ছিল, তাই আমি তাদেরকে মেনে নিয়েছি। ব্যবহারে এটা বাধা দেয়ার ব্যাপার; কারণ (ইচ্ছাকৃত নয়, কোন সন্দেহ নেই) এর পুরো দায়ভার তোমার ব্যক্তিগত, যেমন লাহোরের আবাসিক কর্মকর্তা, তুমি যে সরকারের হয়ে কাজ কর। অনুমান বাড়ানোর জন্য যে নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছিল; তোমার আগমন পাঞ্জাবে শান্তি আনবে যেন সরকারের যুদ্ধের ব্যবস্থা, এবং তুমি শিখদের জন্য শান্তিবাহক হিসেবে আবির্ভূত হবে, যেমন তাদের ও সরকারের মাঝে রয়েছে। এটা হতে পারে না ... সরকার ও দূতের পুরো পরিচয় অবশ্যই থাকতে হবে, সে যেই হোক না কেন... আমি আবার বলছি যে আমি কিছুই বলতে বা করতে পারব না, যা ভারত সরকারের কৌশল সম্পর্কে ধারণা দেয়, বা এর ভাবনা সম্পর্কে, পাঞ্জাবে রেসিডেন্ট হিসেবে তোমার অবস্থান সম্পর্কে... আমি তোমার কাছ হতে শোনার জন্য এক মুহূর্তও পাইনি যে আমি কোন কারণ পাচ্ছি না এই মত হতে সরে দাঁড়াতে যে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি ও মূল আগ্রহে এখন পাঞ্জাব সরকারের শক্তি দরকার যা শুধু আঘাত করা যায়। কিন্তু অর্ধনমিত এবং তাদের খারাপটা নষ্ট করা যায়।’ এডওয়ার্ডেস ও মেরিডেলি, লাইফ অফ স্যার হেনরি লরেন্স, পৃ-৪৩৩-৪।
৬. নিজেকে সান্ত্বনা দিল যে শিখ জাতিকে ধ্বংস হতে হবে, ডালহৌসি জানত যে তিনি নিজেকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিবেন না তার কর্তব্য হতে সরে দাঁড়ানোর জন্য যা তিনি লাখো ব্রিটিশের

ইউনিয়নের পতাকা উত্তোলন করা হয় লাহোর দুর্গের প্রতিরোধ ব্যবস্থার উপর। শিখ মুদ্রার অনেক রকম ছিল (নানাকসাহি, হরি সিংহী, গোবিন্দসাহি, প্রভৃতি), উঠিয়ে ফেলা হয়, এবং কোম্পানির সিক্কা রূপির প্রচলন হয়।

পাঞ্জাবকে সৈন্যমুক্তকরণ

পাঞ্জাবের শহরও ও গ্রামগুলোতে অস্ত্র সমর্পণের আদেশ দিয়ে ঘোষণা দেয়া হয়। ১২০,০০০ এরও বেশি অস্ত্র-বন্দুক, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র স্বেচ্ছায় সমর্পণ করা হয়। দরবার দলের একজন প্রধানকে লাহোরে ডাকা হয়। স্বল্প কিছু দল টিকে রইল, বাকি সৈন্যদের বাতিল করা হলো। দুর্গ ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা— বাস্তবে প্রতিটি পাঞ্জাবি গ্রামেই প্রতিরক্ষা বেড়া আছে— যা চিহ্নিত করা আছে। পুরো রাজ্যের শুধু সে অংশটি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়নি তা হলো পেশোওয়ারের জেলা। (ব্যতিক্রমটি এই ভিত্তিতে করা হয়েছে যে এখানে খুব বেশি ব্রিটিশ সৈন্যদল নেই উপজাতিদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য) সকল সেনার দাবি প্রত্যাহার করা হলো।^৭

নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য অর্জন করেছেন, যে 'ভুল জায়গায় অবস্থান ও ভুল সময়ের জন্য একজন বাচ্চার ভাগ্য।' ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি, পৃ-৮২.

দালিপ সিং ও তার মার বাকি কাজকর্ম ছিল বেশি মানবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিন্তার চেয়েও। ১৮৫৩তে দালিপ সিং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। একবছর পর সে ও তার চাচাতো ভাই, রাজকুমার শিব দেব সিং ইংল্যান্ডের জন্য যাত্রা করে। দালিপ সিং-কে সাফোকের এলভেডনে একটি রাজ্য দেয়া হয়। সে রানী ভিক্টোরিয়ার প্রিয়পাত্রের পরিণত হয় যে তাকে তার দেবপুত্র হিসেবে ব্যবহার করে। রানী জিনদান যিনি নেপালে পালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে ইংল্যান্ডে আসেন সেখানে তিনি ১৮৬৩ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দালিপ সিং তার মায়ের ভ্রম ভারতে নিয়ে যান। ইংল্যান্ড যাওয়ার পরে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া, বাঘা মুলারকে বিয়ে করেন যে একজন জার্মান বণিক ও ইথিওপিয়ান মহিলা। তাদের পাঁচজন সন্তান ছিল, দুইজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে।

দালিপ সিং তার চিন্তার বাইরে জীবনধারণ করেন এবং ধারে ডুবে যান। তিনি তার রাজ্য উদ্ধারের জন্য একটি আপীল করেন প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এবং পরে ব্যক্তিগত কাউন্সিলে। যখন তা বার্থ হল, সে চেষ্টা করলো ইউরোপীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে তার রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে, নিজেকে সে এভাবে বলে 'ব্রিটিশ জনতার অযোগ্য শত্রু', সে প্রচার করতে শুরু করলো শিখ বিশ্বাস এবং খোলা আলোচনা বিভিন্ন ভারতীয় রাজপুত্র ও শিখ প্রধানদের সাথে। তার বিরাট ভীতি ছিল যতক্ষণ না সে জানতে পারল যে কেউই তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। অনেক শিখ সংস্থা সমাধার মাধ্যমে তাকে শাস্ত করার চেষ্টা করলো এবং পরামর্শ দিল রানীর কাছে মাফ চাইতে। ১৮৯০-এ দালিপ সিং-এর ধার পরিশোধিত হল এবং রানী তাকে ক্ষমা করলেন। বাঘা মুলারের মৃত্যুর পর দালিপ সিং আবারও বিয়ে করেন অ্যাডা ডগলাস ওয়েথয়েলকে ১৮৮৯-এর জুনে। তিনি ২২ অক্টোবর ১৮৯৩-এ শারীরিক অচলতা জনিত কারণে মারা যান এবং তাকে কবর দেয়া হয় এক সপ্তাহ পরে এলভেডনে।

৭. ডালহৌসি হেনরি লরেন্সের উপর শাসন করেন। যাকে মিলিটারী জাগিরদের ধরার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি লেখেন 'কিছুই তাদের কাছে (মিলিটারী জাগিরদার) গ্রহণযোগ্য ছিল না কিন্তু নিয়মানুবর্তী ছিল। যে পরিমাণ আলোচনা হয়েছিল কিন্তু তাদের সব ধরনের সম্পত্তি রাজ্য

নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

সরকারের কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন মত ছিল যা পাঞ্জাবের জন্য ঠিক ছিল। স্যার চার্লস নেপিয়ার, যে লর্ড গগের কাছ হতে কমান্ডার-ইন-চীপ-এর দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিল। এই মত দেন যে পাঞ্জাবেও সিন্ধুর মতো সামরিক শাসন চালু হোক, অন্যরা বিশ্বাস করতো যে ভারতের বাকি অংশের মতো এটাও বেসামরিকভাবে পরিচালিত হোক। লর্ড ডালহৌসি এই দুটোর সমন্বয়ের চিন্তা করেন পাঞ্জাবে বেসামরিক প্রশাসনের সাথে উভয়ই বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তা থাকুক।^৮ তিনি তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসন বোর্ড গঠন করেন। হেনরি লরেন্সকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় এবং প্রতিরক্ষা ও সর্দারদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারেও তাকে দেখতে হয়। জমি নির্ধারণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় দেখার জন্য জন লরেন্সকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বিচার প্রশাসন ও পুলিশ ব্যবস্থার দায়িত্ব সি.জি. ম্যানসেলকে দেয়া হয়।^৯ এই তিনজন মিলে পাঞ্জাব শরীরের হৃদপিণ্ড, মেরুদণ্ড ও হাত তৈরি করে। বোর্ডে আপীলের ক্ষমতা সম্পন্ন জীবন ও মৃত্যুর বিধানের সাথে মূল আদালত তৈরি করা হয়। এটার সাথে আরও খুন, রাজত্ব ও পুলিশ শান্তি নিয়মিতকরণ ছিল।

‘ভারতে আপনার সাহায্যের জন্য আপনাকে সবচেয়ে ভাল লোক দেয়া হবে, হেনরি লরেন্সকে ডালহৌসি লেখেন। তিনি ভারতের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ইংরেজদের পাঞ্জাবে পাঠান। এসব ৫৬ কর্মকর্তাদের মধ্যে সেনা থেকে ২৯ জন এবং বেসামরিক ২৭ জন ছিল। হেনরি লরেন্স কৌশল করেছিল ‘বুদ্ধির চেয়ে শক্তি দিয়ে রাজত্ব করা উচিত।’^{১০} প্রত্যেক বেসামরিক কাজ বোর্ডের সদস্য দ্বারা সুনিপুণভাবে পরিচালিত হয়েছিল— আইন, সরকারি রাজস্ব সংক্রান্ত ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা। দুই এলাকা

বাজেয়াণ্ড করেছিল.... এরমধ্যে তাদেরকে এমন জায়গায় রাখা হল যেখানে খেয়াল রাখা যায় ও তাদের সম্পত্তি একত্র করা যায় যতক্ষণ না তাদের উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়। যদি তারা পালিয়ে যায়, আমাদের চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যদি তাদেরকে পাকড়াও করা হয়, আমি তাদের শাস্তি দিব এবং যদি তারা আবার ঝামেলার চেষ্টা করে, আমি তাদের ফাঁসি দেব, এতই নিশ্চিত যে তারা এখন জীবিত এবং আমি বাঁচব।’ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি*, পৃ-৯৯।

৮. যে মতবিরোধ স্যার চার্লস নেপিয়ার ও ডালহৌসির মধ্যে দেখা গিয়েছিল তা গুরুতর ও ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। নেপিয়ার ডালহৌসিকে বলেন ‘যুবক স্কট লেইয়ার্ড... পানির মতো দুর্বল এবং যেন এক সুন্দর যুবক বা কুৎসিত মহিলার মতো।’ ডালহৌসির মনের অবস্থা ছিল না তাকে বলার জন্য নিজের কাজে নাক গলাও। ‘স্যার চার্লস আমি আপনাকে সতর্ক করছি, ডালহৌসি লেখেন, ‘আপনাকে আমার কাজে নাক না গলানোর জন্য এবং আপনার চেয়েও বেশি যত্ন নিব।’ আর্নল্ড, *দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া I*, ২২২, এটাই তার বিরক্তি প্রকাশ থেকে স্যার চার্লসকে বিরত রাখতে পারেনি, ‘বিরলভাবে বোর্ডরা প্রস্তাব আনে এবং পাঞ্জাবের প্রস্তাবে শাসনে কোন পরিবর্তন আসবে না।’

৯. ম্যানসেলকে সরিয়ে মন্টগোমেরি আসেন। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছিল না যে তার সহকারী কর্মীদের সাথে শাসন করেন। এই ব্যাপারে মূলত তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে।

১০. সি.এল. টুপার প্রধান সেক্রেটারী, পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট, কাগজ যা পড়া হল *দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন*, ২৫ জুলাই ১৮৯১।

এ হিন্দি অব শিখ-৬

সিঙ্গ সুতলেজ ও ট্রান্স সুতলেজকে আবার পাঞ্জাবের সাথে যুক্ত করা হলো। ইন্দাস অতিক্রম করে পাঞ্জাবের যে এলাকা রয়েছে তা একই প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত যা ৭৩,০০০ বর্গমাইলের এলাকা নিয়ে গঠিত। এর জনসংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন।

পাঞ্জাবকে সাতটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল অথবা কমিশনারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। যাকে আবারও জেলাতে ভাগ করা হয়েছে (যাতে প্রদেশ ছিল ২৫টি)। পাঁচ সারির প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করা হলো। বোর্ডের পরই ছিল সাতটি বিভাগের কমিশনারগণ। কমিশনারের পরে ছিল ডেপুটি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের অবস্থান; এবং তাদের পর অন্যান্য সহকারী কমিশনার একটি বিশেষ পরিকাঠামো গঠন করা হয়। চাকরি দেয়ার জন্য তাদেরকে 'যারা দরবারের অধীনে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছে।'" গেজেটেড কর্মকর্তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নের পদ ছিল তহসিলদার, যাদের বেসামরিক ক্ষমতা বাড়িয়ে কার্য নির্ধারণ পর্যন্ত ৩০০ টাকা লাগত।

বোর্ডের কার্যক্রম

সবচেয়ে বেশি প্রতিরক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হলো। নির্দেশক সৈন্যের ভাগ বিশেষ, যা হেনরি লরেন্স ১৮৪৬ সালে তৈরি করেছিল, শক্তিসংখ্যা বাড়ানো হলো এবং পদাতিক বাহিনীর সাথে অশ্বারোহী বাহিনী যুক্ত করা হলো। দেশের শক্ত উপাদান দিয়ে যন্ত্রপাতি তৈরি করা হলো; দক্ষ শিকারী এবং ঐচ্ছিক রাহাজানিও গ্রহণযোগ্য হলো। পাহারাদারদের দায়ী করা হলো দুর্গের পাহারার জন্য যা উপজাতীয় অভিযান হতে রক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম থেকে এবং দেরাজাতের শান্তির নিশ্চয়তার জন্য। ভেতরকার প্রতিরক্ষার জন্য দশটি রেজিমেন্ট, পাঁচটি অশ্বারোহী এবং পাঁচটি পদাতিক বাহিনী তৈরি করা হয়েছিল। কিছু দরবার সৈন্যও এসব রেজিমেন্টে ঢুকে গেল। একটি মিলিটারী পুলিশের দল ৮০০০ জন নিয়ে গঠিত হয়েছিল, বেশিরভাগই ছিল পাঞ্জাবি মুসলমান। পুলিশবাহিনীর কাজ ছিল সম্পদের ও কারাগারের দেখভাল করা। পুলিশকে পেট্রলের বড় রাস্তায় উন্নীত করা হয়। একটি পুলিশ তথ্য (খুফিয়া) সংস্থা তথ্যদাতা দিয়ে ভর্তি ছিল এবং গোয়েন্দারা (জাসুস) পুলিশের সাথে কাজ করে সরকারকে জনগণের মেজাজ সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য। পুলিশের সাথে আরও যুক্ত ছিল দশ শিকারী (পাতা, খোজি বা খুরে পাত), যারা তাদের সাথে অস্ত্র উপহার রাখত অনেক সময় ধরে ধূলিময় হারানো পশু অনুসরণ করার জন্য। গ্রামের পুরোনো ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত করা হলো। গ্রামের পাহারাদার-চৌকিদার-গ্রামবাসীরা নিয়োগ দেয়া শুরু করলো কিন্তু এও আশা করলো যে পুলিশও আগন্তকের চলাফেরায় লক্ষ্য রাখবে।

এসব নতুন বিভাগের পুলিশ ও সেনা ছিল ৫০,০০০-এরও বেশি। মাঝাতে বিশেষ সতর্কব্যবস্থা নেয়া হয় পুলিশের জন্য যেখানে ভাই মহারাজা সিং ও তার দু'জন সহকর্মী ছিল। কর্নেল রাজপাল সিং ও নারায়ণ সিং সক্রিয় ছিলেন। যখন প্রদেশের শান্তি নিশ্চিত হলো, বোর্ড জনতার জন্য কাজ করা শুরু করে। পেশোয়ার হতে দিল্লির গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড আবার খুলে দেয়া হয়; বড় শহরগুলো ও সেনার মূল ফাঁড়ি থেকে অবস্থিত সেনার দলকে মুক্ত করে কাজ করা শুরু হয়।^{১২}

খালের সাহায্যে পাঞ্জাবে অনেক যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল। পাবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্ট পরিষ্কার করে হাসলি (যা অমৃতসর ও লাহোরের শালামার গার্ডেনের মন্দিরের ট্যাঙ্কে পানি সরবরাহ করে) একে বর্ধিত করার পরিকল্পনা করেন এবং শাখা খাল খনন করেন। খালের তীরে ও রাস্তার ধারে বৃক্ষ রোপণ করেন। বিশ্রাম ঘর (ডাক বাংলো) তৈরি করা হয় ভ্রমণের সাথে অফিসীয় কাজের জন্য। খালি জমিতে বনায়নের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়। লাহোর, গুরুদাসপুর এবং গুজরানওয়ালা জেলায় দশ লক্ষ চারাগাছ লাগানো হয়। এতে প্রায় নব্বই রকমের কাঠ ছিল। বিশাল রাস্তা ঘাসভূমি-রাখ দ্বারা পৃথক ছিল। জমির মালিকদের গাছ লাগানো এবং ছোট গাছের ঝাড় সম্বলিত ভূমিকে রাজস্বের আওতা হতে বাতিল করা হয়েছে।

বোর্ডের সবচেয়ে বড় কাজ হলো কৃষকদের অবস্থার উন্নতি সাধন যারা ছিল জনতার বেশিরভাগ অংশ। নতুন ধরনের শস্য আবিষ্কার করা হয়েছিল। নতুন অর্লিন তুলা, আখ, শন গাছ, তামাক এবং একধরনের মূল্যবান সমতল ভূমিতে চাষ করা হয়েছিল; মুরি পাহাড় এবং কংখা উপত্যকার ঠালুতে চায়ের চাষ করা হয়েছিল। পাঞ্জাবে এমনিতেও অনেক কালোজন্মের গাছ ছিল; গুঁটিপোকা রপ্তানীর জন্য সেরিকালচার বাড়ানো হলো। ইটালিয়ান মেরিনো রাম লোকাল মদকে অতিক্রম করে যায়, সাথে মাংসজাত ও উলজাত পণ্যের লাভজনক অবস্থা ছিল।

রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা পুরোদমে পরিবর্তন করেন জন লরেন্স যখন তিনি মনে করতেন তিনি আবাসিক কর্মকর্তা। এই হার কমে যাওয়া সত্ত্বেও জমির রাজস্ব ১৮৪৯ সালে ১৩০ লাখ রুপি থেকে ১৮৫১ সালে ১৬০ লাখে উন্নীত করা হয়। বোর্ড একটি ব্যালাস শিট দেখাতে সক্ষম হন ১০২ এবং ৯৬ লাখ উদ্বৃত্তসহ, যথাক্রমে প্রথম দুই বছরের জন্য যা এদেশে ঢুকানো হলো।^{১৩}

১২. লাহোর হতে ২৬৪ মাইল দূরে থেকে সীমান্তে ১০৩টি বড় এবং ৪৫৯টি ছোট সেতু অতিক্রম করে এবং ছয়টি পর্বতমালা আছে। দ্য পাঞ্জাব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট অফ ১৮৪৯-৫০ এবং ১৮৫০-৫১ দাবি করে যে জয়ের প্রথম দুই বছর পর '১৩৪৯ মাইলের রাস্তা পরিষ্কার করা হয় এবং বানানো হয়; এর মধ্যে ৮৫৩ মাইল ছিল নির্মাণাধীন; ২৪৮৭ মাইল খুঁজে বের করা হয় এবং ৫২৭২ মাইল রক্ষা পায়, সব ছিল ছোট এবং শাখা রাস্তা।' (প্যারা ৩৪৬)।

১৩. পাঞ্জাব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৮৪৯-৫০ এবং ১৮৫০-৫১, প্যারাসমূহ ২৬৪, ৪০২-৫. উদ্বৃত্তগুলোর মাঝে বেশিরভাগ এসেছিল জাগিরদের বাজেয়াপ্তকরণ এবং দরবার সম্পত্তির বিক্রির থেকে। এর সাথে এটাও জানা আবশ্যিক যে প্রদেশের খরচ নিয়মিত দলের মেনে চলার জন্য ছিল না।

নিয়মিত করের ব্যাপারে অধিকারের পূর্বে পদক্ষেপ নেয়া হয়। দরবারে ৪৮ রকমের ভিন্ন ভিন্ন কর ধার্য করা হয় এবং অসংখ্য নগর শুদ্ধ ফাঁড়ি স্থাপন করা হয়। সকল অভ্যন্তরীণ কাজ স্থগিত করার ঘোষণা দেয় বোর্ড এবং একসারি নগর শুদ্ধ ফাঁড়ি সীমান্তে স্থাপন করে আমদানির উপর কর গ্রহণের জন্য। অন্তঃশুদ্ধ আগ্রহ ও ওষুধের উপর আদায় করা হতো; ফেরিতে টোল নেয়া হতো; কন্ট্রোলকে দেয়ার বদলে লবণ খনি নিয়ে নেয়া হলো, রাজ্য নিজে এটাকে কাজে লাগালো প্রতি মন্ডে ২ টাকা কর ধার্য করে। (রাজস্থান থেকে লবণ আমদানি নিষিদ্ধ করা হলো।) বোর্ডের ক্ষতিপূরণ হলো অন্তঃনগর কর ধার্যের বিলোপের মাধ্যমে যা বেসামরিক ক্ষেত্রে ডাকের প্রচলন করে। যেহেতু দরবারের করের ব্যবস্থা জটিল ছিল, যা প্রতি বছর শুধু ১৬ লাখ অর্জন করত, এটাকে সরল করা হলো এবং আরও সোয়া লাখের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হলো। এটার আরও সুবিধা ছিল সাধারণ মানুষকে অফিসীয় দামের হাত থেকে বাঁচানো।

খারাপ কর্মকাণ্ড যেমন জন্মের পরেই কন্যা সম্ভানকে ধ্বংস করা, সতীদাহ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হলো। বিবাহ প্রথা, যৌতুক, বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সারীদের অবস্থার অপেক্ষাকৃত উন্নতি হলো। সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আইন তৈরি হয়।^{১৪} যখন তহসিলদার শুধু অফিসীয় কথা বলেন এসব আইন ও সংস্কৃতির ব্যাপারে, তখন তাকে প্রয়োজনীয় বিচারক্ষমতা দেয়া হলো। গ্রামের পাঞ্চায়েতকে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেগুলো গ্রামের বাসিন্দাদের উপর প্রভাব ফেলে এসব কাজ করতে দেয়া হলো। শহরে, নগর সভা গঠন করা হলো বেসামরিক ব্যাপারে পরামর্শ এবং ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে সাহায্য করার জন্য।

ডালহৌসি ড: জেমিয়েনসনকে বলেন একটি প্রতিবেদন লিখতে, বলেন অধিকৃত এলাকার সৌন্দর্য, ভূগোল, ফুল ও পশু সম্পর্কে; ড: ফ্রেমিংকে বলা হয় লবণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এবং এসব এলাকার খনিজ সম্পদ সম্পর্কে লিখতে বলা হয়। একজন ফরাসি খনিজবিদ এম. মারকাডেইন কংক্রাতে গবেষণা করেন; তার প্রতিবেদনে নিশ্চিত করেন যে কংক্রাতে লোহার খনির অস্তিত্ব বিপুল। (এসসি ১১৫-১৬, ২৩-৯-১৮৫৩) স্পিটি এবং কুলু ভূমিতে বোরাক্স পাওয়া যায়। ১৮৯১ সালে প্রথম তেলের খনি থেকে রাওয়ালপিন্ডি ও অ্যাটকের কাছে হতে তেল উত্তোলন করা হয়। সিভিল এ্যান্ড মিলিটারী গেজেট, ২৯ জানুয়ারি ১৮৯১।

১৪. জয়ের চার বছর পরে, স্যার রিচার্ড টেম্পল একজন কর কর্মকর্তার সাহায্যে জরুরি বিচার সভা গঠন করেন পাঞ্জাবের আইন ও সংস্কৃতি নিয়ে। যা পাঞ্জাবের বেসামরিক কোড ১৮৫৪-এ হয় এবং যদিও এটা লিখিতভাবে সাহায্য পায়নি, এটা প্রদেশে ষোল বছর ধরে হয়ে এসেছে। পরবর্তীতে স্যার জেমস স্টিফেন, ভাইসরয়ের কাউন্সিলের একজন আইনের সদস্য ছিলেন ১৮৬৯-৭২ পর্যন্ত। পাঞ্জাবের জন্য আইন বিধি তৈরি করেন লিখিতভাবে। অপরাধের বিষয় ভারতীয় শাস্তি কোড, রাজস্বের বিষয়ে পাঞ্জাব ভূমি রাজস্ব বিধান, এবং অন্যান্য বিষয় পাঞ্জাব আইনবিধি (যা পাঞ্জাব বেসামরিক কোডের সাথে ছিল)। একটি সংশোধনী করেন স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল যে পাঞ্জাবে স্থানীয় সংস্কারকে উপজাতীয় ও পারিবারিক সংস্কার থেকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যতক্ষণ না তারা ন্যায়, সাম্য এবং ভাল নীতির বিপরীতে অবস্থান করবে।

বোর্ড বিস্ময় সহকারে আবিষ্কার করলো যে কিছু ব্রিটিশ প্রদেশের চাইতে পাঞ্জাবে শিক্ষার হার বেশি ছিল^{১৫}। পাঞ্জাবে অনেক প্রয়োজনীয় বিদ্যালয় ছিল এবং এর মধ্যে ১৬টি লাহোরে মেয়েদের বিদ্যালয়সহ। বোর্ড স্থানীয় মাদ্রাসার কার্যক্রম শুরু করার আদেশ দেয় এবং এর সাথে কিছু কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বড় শহরে উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্থাপন করা হয়। পার্সীদের অফিসের কাজে পূর্বের মতো রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নতুন অধিকৃত জায়গার জন্য এবং পূর্ব পাঞ্জাবের জন্য উর্দু।

বোর্ডের প্রশাসন অভাবনীয় সফলতা পায়। এটা দেশে শান্তি ও উন্নয়ন নিয়ে আসে যা বেসামরিক শাসনামলে দশ বছর চলে। আগস্ট ১৮৫২তে বোর্ড প্রথম দুই বছরের কাজের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এটাতে গর্বের সাথে প্রতিষ্ঠিত আছে যে ‘পরবর্তীতে অধিকৃত রাজ্য ভারতের অন্যান্য অংশের চেয়েও উত্তম।’ এসব ক্ষেত্রে যারা জড়িত এটাতে তাদেরও প্রশংসা করা হয়। ‘অন্য কোন অংশের চেয়ে পাঞ্জাবে কম সংস্কার ও প্রথা ছিল... শিখদের কল্লিত ধারণা প্রায় মৃত, হিন্দুরা তুলনামূলক কম কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং পাদ্রীদের দ্বারা পরিচালিত এবং মোহাম্মদীয়রা তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রথার সাথে কম সম্পর্কিত ভারতের অন্যান্য অংশের ^{ধর্মাবলম্বী} চেয়ে।’^{১৬} গভর্নর জেনারেল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডকে ‘উন্নতি ও সফল ফলাফলের জন্য’ অ্যাখ্যা দেয়।

এই পরিবর্তন শিখ সম্প্রদায়কে কিভাবে প্রভাবিত করে? যুদ্ধের মাঠে জয়ের সাথে সাথে শিখ পদবির জাতীয়ভাবে বিশ্বাসঘাতকার ^{জ্ঞান} ছিল এবং রাজকীয় পরিবার ও আভিজাত্যের সাথে নথিবদ্ধ করা হলো। পাশাপাশি, যেমনটি ভাই মহারাজা সিং সম্মানিত ছিলেন, তিনি দরবারের জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেনি; যখন তাকে গ্রোফতার করা হলো এবং সিঙ্গাপুরে পাঠানো হলো, শিখদের মাঝে অস্থিরতা প্রায় দেখাই গেল না। ডালহৌসি রাজকীয় পরিবারকে বহিষ্কার করেন এবং সুতলেজ অতিক্রম করে, যে এলাকায় তাদের মহত্বতা খর্ব করেন।^{১৭} শিখ কৃষক এবং সৈন্যদের সন্দেহ করা হলো এবং সৈন্যদল বা পুলিশে যোগদানের জন্য স্বল্প সুযোগ দেয়া হলো, যাদের বেশিরভাগই মুসলমান ছিল। এসব পরিস্থিতিতে এটা খুব বিস্ময়কর নয় যে, স্থায়ী খালসা সৈন্যদের উৎসাহ (যাদের মধ্যে ৪০,০০০-এর বেশি ইংরেজ-শিখ যুদ্ধের পরে হেরে যায়) অপরাধের

১৫. আর্নল্ড, দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, ১, ৩৪৫।

১৬. ‘ভারতের সর্বোত্তম জনসাধারণের আলোচনার জন্য, আমাদের কাছে ভারত সরকারের শ্রেষ্ঠ মানুষ আছে, গভর্নর জেনারেল নিজে থেকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। করসহ সময়, শ্রম ও সম্পদের কর্মসংস্থান। এটা একটি সাম্রাজ্য নিয়ে পরীক্ষণ, সাম্রাজ্য সম্পর্কিত এবং মুকুটের সাথে আশাবিত ফলাফল পাওয়া যাবে যা অবশ্যই শাসক ও শাসকের মাঝে ব্যবধান করবে।’ ইবিদ, ৩, ৩৫১।

১৭. ২৫ জন শিখ প্রধানের ব্যক্তিগত ও সাহায্যকারী জাগিরদের বাজেয়াপ্ত করা হল, এসসি ৬৮-৭১, ২৬-৫-১৮৪৯ শিখদের মাঝে কোন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ছিল না, পাশাপাশি এগারোজন অতিরিক্ত সহকারী কমিশনারদের সাথে, বোর্ড শুধুমাত্র একজন শিখকে নির্বাচন করতে সক্ষম হল।

দিকে সরে যায়। পাঞ্জাবের মূল জেলাগুলো ডাকাত দিয়ে ভর্তি ছিল, যাদের মাঝে বেশিরভাগই ছিল শিখ। গলাকাটা সুপ্রচলিত হয়ে উঠল— বেশিরভাগ সংঘ ছিল হয় মাজহাবি অথবা সাইনসি শিখদের। গভর্নরকে একজন সুপারিনটেনডেন্টকে নিয়োগের জন্য চাপ দেয়া হলো যাতে গলাকাটাকাটি বন্ধ হয়,^{১৮} এবং কঠোর হাতে অপরাধ দমনের জন্য।

রাজ্যজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল শিখ ও হিন্দুদের নতুন সম্পর্ক। এটা আগেই বলা হয়েছিল যে, যখন থেকে খালসা রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসে। বেশিরভাগ হিন্দু যারা হিন্দুত্বের প্রধান ছিল, পাহল (ব্যাপ্টিসম) গ্রহণ করে। শিখদের রাজত্বকালে শিখ ও হিন্দুদের বিভেদ বিরাট আকার ধারণ করে, খালসারা তাদের চুল ও দাড়ি কামালো না, হিন্দুরা কামালো, বাকিরা, ব্রাহ্মণ হিন্দুরা তাদের নিজস্বতায় ফিরে গেল। নতুন শিখ সম্প্রদায় হিন্দু রাজপুত রাজপুত্রের আচারের মহত্ব ঘোষণা করলো; তারা তাদের নিজস্ব গ্রন্থের পাশাপাশি হিন্দু দেবতার পূজা করত, গুরুকে শ্রদ্ধা করত, হিন্দুদের পবিত্র স্থানে তীর্থযাত্রা করে, ব্রাহ্মণদের খাওয়ায়, গণক ও জ্যোতিষীদের সাথে আলোচনা করে, এবং বিধবাদেরকে তাদের স্বামীর চিতার সাথে জ্বলতে বাধ্য করে। এদের মাঝে কিছু ভাগ ছিল, মূলত বেদীগণ, যে সম্প্রদায় গুরু নানকের মতে চলত, কন্যাসন্তান জন্মের পরপর মেরে ফেলার প্রথা আবার শুরু করা হলো।^{১৯}

১৮. জনাব ব্রেটন একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন, যাঁভাবে ঠগদের ভ্রাতৃত্ব নিয়ে। তিনি একজন মাজহাবি শিখের কথা উল্লেখ করেন, ওয়াজির সিং। প্রদেশে যিনি আইন তৈরি করেন। তাকে হঠাৎ করেই ধরা হল এবং ফাঁসি দেয়া হল। শের সিং ঠগদের রোধ করার জন্য অনেক পদক্ষেপ নিলেন। এস. সি. ২৫৯, ১৪-১-১৮৫৩।

১৯. জন লরেন্স এই রীতি জানলেন যখন তিনি জালান্দার দোআবের কমিশনার ছিলেন। জমির মালিকদের নতুন করে লিজ নেয়ার সময় তাদেরকে দিয়ে জোরে বলানো হয় ‘বেভা মাত জ্বালাও’—বিধবাদের জ্বালিও না, (বেটি মাত মারো)—কন্যা সন্তানদের মেরো না, ‘কোরহি মাত দাবাও’—কুষ্ঠ রোগীদের কবর দিও না, কেসওয়ার্থ স্মিথ, লাইফ অফ লর্ড লরেন্স, I, ১৯৭।

জন লরেন্সের আত্মজীবনীতে আছে রাজপুতরাই শুধু শিশু হত্যা করত না এটা বেদীদের মাঝেও প্রচলিত ছিল.... ‘তারা কখনও একটি কন্যাসন্তানকেও বাঁচতে দিত না।’ ইবিদ, I, ২০৬।

এই মতামতকে বাড়িয়ে বলা হয়েছে মনে করা হল। এসব প্রথার মাঝে গুরু গোবিন্দ সিং শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করেন। তিনি যোগাযোগ বন্ধ করেন কুরিমারদের সাথে (যারা কন্যা সন্তান হত্যা করতো) এবং তাদের শিখ মন্দিরে আসা বন্ধ করলেন। তার এই আদেশ আজও বড় বড় অঙ্করে ছাপা আছে গোল্ডেন টেম্পলের সাথে আকাল তাক্ত-এর প্রবেশ মুখে।

রাজ্য জয়ের দুই বছর পর, গুরদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার জানান যে এসব অপরাধ বেদীদের মধ্যে চলছে। এরপর জানা গেল যে এটা হিন্দু ও মুসলিম রাজপুতের মধ্যেও ছিল; যে সব জায়গায় ছিল শুধু লিয়াহর জেলা, ইসমাইল খানের ডেরা, পেশোয়ার ও হাজারা ছাড়া। এফসি ১৮৫-৯০, ৯-৯-১৮৫৩, ১৮৫৩-এর দিওয়ালীতে অমৃতসরে বড় আলোচনা সভা হল শিখ, মুসলিম ও হিন্দু নিয়ে। যেখানে এসব ব্যাপার আলোচনা করা হয় এবং এসব বন্ধ করার সমাধান পাস করানো হয়। এরপর এরকমই আলোচনা সভা প্রদেশের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়। যৌতুকের পরিমাণ

যত দ্রুত শিখদের হাতে ক্ষমতা দেয়া হলো, বেশিরভাগ হিন্দুরা যারা খালসাদের আচার-রীতি গ্রহণ করেছিল তারা তা ত্যাগ করলো এবং গৌড়া হিন্দু হয়ে গেল। যারা কয়েক বংশ ধরে খালসাতে ছিল তারাও তাদের সাথে চলে গেল। এতই ছোট দুটো সফর ছিল যে লর্ড ডালহৌসি পাঞ্জাবের এই উপক্রমের কারণ বুঝতে পারেন। ‘তাদের মহান গুরু গোবিন্দ সিংকে ধর্ম নষ্ট করার জন্য হত্যা করা হলো এবং তা অনেকাংশে সফল হয়েছিল’ গভর্নর জেনারেল লিখেন, ‘তারা ধীরে ধীরে হিন্দুধর্মে ঝুঁকেছিল; এমনকি যখন তারা শিখ ছিল, তারা বছরে আরও বেশি হিন্দু হতে থাকে; এতবেশি যে এখন জনাব স্যার জিও ক্লার্ক (বোম্বের গভর্নর, ১৮৪৭-৮) শিখদের এই শাখা ৫০ বছরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। এই দৃশ্যের জন্য কোন নির্দেশ জারি করা হলো না, যদিও এটা ছয় মাস আগের চাইতে অনেক স্বাভাবিক ছিল।’^{২০}

বোর্ডের ভাঙ্গন-

হেনরি লরেঙ্গ এবং তার ভাই জনের পার্থক্যের জন্য তাদের সম্পর্ক প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল (মন্টগোমেরি স্বীকার করেন যে তিনি নিয়মিত নিরপেক্ষ লোক ছিলেন দুটো উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনিয়ার মাঝে)। এসবের পর লর্ড ডালহৌসি প্রকাশ্যে জনের পক্ষ নিতেন এবং প্রায়ই ছোট হেনরির বিরুদ্ধে চলতেন।^{২১} এই যুদ্ধ জোরদার হলো যখন উভয় ভাই তাদের পদত্যাগপত্র দেয়। ডালহৌসি দ্রুত বোর্ডকে বাতিল ঘোষণা করেন, হেনরি লরেঙ্গকে রাজপুতানায় স্থানান্তর করেন, এবং পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনার হিসেবে জন লরেঙ্গকে নিয়োগ দেন। এই পরিবর্তন একটি বিষয়ে বেশি হয়ে দেখা দিয়েছিল কারণ জনকে সাহায্য করতে হয়েছিল দুইজন ‘প্রধান কমিশনারদের।’ মন্টগোমেরিকে বিচারবিভাগেই রাখা হলো পাশাপাশি শিক্ষা, সড়ক,

কমানোর জন্য আইন জারি করা হয়- যেটা কন্যাসন্তান ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল-তা উঠিয়ে দেয়া হল। কয়েক মাসের মধ্যে সন্তানহত্যা প্রথা নিষিদ্ধ করা হল।

২০. ৭ মে ১৮৪৯-এর চিঠি, *প্রাইভেট লেটারস অফ দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি*, পৃ-৬৯.

খালসা সম্মান বিলীনের সাথে সাথে এসব দলাদলি বন্ধ হয়; তারা শত শত হয়ে যোগ দেয় এবং হাজার হয়ে বের হয়। হিন্দুত্ব পদবিরা তাদের আবার গ্রহণ করে এবং তাদের বাচ্চারা কখনও অমৃতসরের পাহল পান করবে না।’ *আর্নল্ড, দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, I, ৩৮৬।

২১. ১৩ জুন ১৮৫১-এর একটি পত্রে হেনরি তাই ভাই জনকে লেখে ‘আমি গভর্নর জেনারেলকে বুঝতে পারছি না.... যখন আমরা ভুল করি তখন প্রচুর তিরস্কার করা হয় আমাদের, ঠিক কাজ করার বদলে; কিন্তু ধারণার প্রেক্ষিতে অপমানিত ও লাঞ্চিত হওয়া খুব খারাপ.... একজন আমৃত্যু কাজ করে এবং সবকিছু তাদের রাগ আমাদের উপর ঝাড়ে, এমনভাবে যে, যেন আমরা তার চাকর।’ *এডওয়ার্ডস ও মেরিভেল, লাইফ অফ স্যার হেনরি লরেঙ্গ*, পৃ-৪৪১-২.

৮৮ ॥ এ হিস্টি অব শিখ

পুলিশ, স্থানীয় ও পৌর প্রশাসনেও। জর্জ এডমস্টনকে অর্থবিষয়ক কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

যখন জন লরেন্স এসব হতে বিরত থাকলেন, তিনি ভাই কল্টন বিভিন্ন কৌশলের বুদ্ধি ধরতে পারেন এবং তিনি (জন) বিপরীতে ছিলেন। জাগির ও ভাড়াহীন রায়তীশ্বত্ব, যা থেকে ৬০,০০০-এর বেশি থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গভর্নর জেনারেল থেকে তীব্র তিরস্কার পাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল। জন লরেন্সের প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শিখ সম্প্রদায়ের সাথে তার বিজয়। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে শিখ কৃষক সম্প্রদায়ের শিখরাজ্য ধরে রাখার মনোভাব অতি অল্প তখন তিনি তাদের সৈন্যতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন। কৃষকেরা উৎসাহের সাথে কোম্পানির দলে যোগদান করে। উপজাতীয় পাঠান ও ইংরেজ-বার্মিজ যুদ্ধের (১৮৫২) বিচ্ছিন্ন লড়াইয়ে তাদের কাজ দেখে ব্রিটিশ কমান্ডাররা বিশাল সংখ্যায় তাদের তালিকাভুক্ত করার আগ্রহ দেখান।

শিখ এবং ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ হিসেবে কিছু ভাল ইচ্ছাকৃত কিন্তু খারাপ সময়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সফল গভর্নর জেনারেলগণ কর্তৃক আমহার্স্ট, বেনটিন্ক, আকল্যাড, এলেনবরো এবং ডালহৌসি। এসব পদক্ষেপ সকল শ্রেণীর উপর খারাপ প্রভাব ফেলে, রাজপুত্র থেকে জমিদার, কৃষক এবং সিপাহীরা এর আওতায় ছিল— এসবের মাঝে সিপাহীরাই বেশি ছিল।

অনেক রাজ্য দখল করা হলো যখন সেগুলোর শাসকদের উত্তরাধিকার তৈরি হয়নি। নানা সাহেব, পেশওয়ারের শেষ ছিলেন, তাকে অবসর ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাঁসির রাণী জানত যে তার মৃত্যুর পর তার রাজ্য ব্রিটিশরা নিয়ে নেবে। এই দু'জন মিলে মারাঠা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন।^১ এসব জমায়োত্তর কারণ হলো উধ জয়ের জন্য।^২ হিন্দুস্তানের জনতা বলতে শুরু করে যদি ব্রিটিশ সরকার এমন একজন রাজাকে সিংহাসন থেকে বিচ্যুত করে যে তাদের প্রতি সবসময় বিশ্বস্ত ছিল, তাহলে কি স্বাধীন নবাব বা রাজা কি নিরাপদ?^৩ এমনকি মোঘল রাজকীয় পরিবার বাদ যায়নি। রাজার প্রিয় পুত্র থেকে লর্ড ডালহৌসি জানতে পারেন যে তার পিতার

১. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য যা জয় করা হয় তা হচ্ছে সাম্বালপুর, সাতারা, তাজোর, নাগপুর, মুর্শিদাবাদ এবং কর্ণাটক। শেষ নামটি পাওয়া যায় একটি পত্রে রেকর্ড হিসেবে যা ছিল প্রাইভেট লেটারস অফ দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসি। 'কর্ণাটকের তরুন নবাব হঠাৎ করে এক সপ্তাহ আগে মারা যায়। তার কোন পুত্র ছিল না এবং তার খেতাবটা বন্ধ করে দেয়া সম্ভব; যদি তা হয়, এটা কোম্পানির জন্য সুখবর, এবং আমার অতৃপ্ত লুর্ডেন ও আগোছালো লক্ষ্যের আরেকটা অধ্যায় সূচিত হবে।' (পৃ-৩৫৯)।
২. 'রাজাকে যে চুক্তির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তাতে তিনি সই করতে অস্বীকৃতি জানান। একইসাথে ভারত সরকার উধের সরকারকে বুঝতে পারেন। রাজা তার সকল বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা দেন। তাই আমাদের উদার রাণীর গতকালের চেয়ে আরও ৫,০০০,০০০ বিষয় এবং ১,৩০০,০০০ পাউন্ড বেশি রাজস্ব ছিল।' ইবিদ
৩. নরগেট ও ফিলট, সিপাহী থেকে সুবেদারকে, পৃ-১১২।
'উধের অন্যান্য বিচার', একজন সমকালীন লেখক বলেন, ছিল 'একটি শেষ গুটি যা অনেকদিন ধরে স্বার্থপরের মতো সুযোগ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির আশা ছিল।' জনাবা হ্যারিস, এ লেডিস ডায়েরী অফ দ্য সিয়েজ অফ লঙ্কৌ, পৃ-৬০।

মৃত্যুর পর দিল্লির লালকেল্লা ব্রিটিশদের হস্তান্তর করা হবে। যদিও রাজকীয় পরিবারটি রাজনীতি বন্ধ করে দিয়েছিল, জনতার বাবরের রাজবংশের প্রতি সহানুভূতি ছিল এবং লালকেল্লা ও এটার প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে স্মৃতিচারণ করত।

জমিদার শ্রেণীর লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বড় রাজ্য উঠিয়ে দেয়ার ও লিখিত খেতাব পাওয়ার দাবির পদক্ষেপ নেয়াতে— একটি রীতি যা তখন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল না।^৪

ইংরেজ কর্মকর্তারা জনতার এত ঘনিষ্ঠও ছিল না যে অশিক্ষিত এই জনশক্তি দিয়ে তারা কীরকম কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যদিও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত, বিধবা বিবাহের প্রচলন, একসময় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন সম্পত্তির উপর আইন^৫ যখন খ্রিস্টান মিশনারীগুলো দাবি করে বড় সংখ্যার প্রোসেলেট, এভাবে ভারতীয়দের মতামতকে শক্তিশালী করা হয় যে ইংরেজ শাসকরা তাদের প্রাচীন বিশ্বাস ও প্রথা ধ্বংস করতে চায়।

সিপাহীরা মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয় ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের জন্য তা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রথা অনুযায়ী কাপড়, দাড়ি বা পাগড়ি যা তাদের ধর্মীয় অধিকার ছিল তা আদেশ দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়।^৬ কুসংস্কারী হিন্দুরা এই গুজবে কান দেয় যে তাদের আটার রেশনের সাথে পশুর হাড় মিশ্রিত করা আছে। যখন ১৮৫৬-এর শরতে বৃদ্ধ সিপাহী, ব্রাউন বেসকে দক্ষ এনফিল্ড রাইফেল দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়, তখন এ খবর গ্রহণযোগ্য হয় যে নতুন কার্টিজের ঢাকনার গ্রিজ গুল্ম ও শূকরের চর্বির নির্যাস হতে তৈরি। সিপাহীরা, হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই বুঝতে পারে যে সময় এসেছে কিছু করার : হয় তারা তাদের চাকরি ছেড়ে দিতে পারবে এবং ঈশ্বরের সেবা করতে পারে অথবা তাদের সাথে আঠার মতো লেগে থেকে ইংরেজদের দেখভাল করতে পারে।

সিপাহীদের অন্যান্য আরও অভিযোগ ছিল। তাদের বেতন কম ছিল, তারা যে সর্বোচ্চ পদবি পেত তা হলো সুবেদারের মাসে ৬০-৭০ টাকা করে; একই পদবির জন্য, একজন ইংরেজ পেত দশগুণ বেশি।^৭ তালিকাভুক্তিকরণের সময়, সিপাহীদের আশ্বাস দেয়া হতো তাদের সমুদ্রপাড়ি দিতে হবে না। তথাপি তাদেরকে জাভা ও বার্মায় পাঠানোর চেষ্টা করা হতো। যেমন অবাধ্যতার মাগুল ইংরেজ কর্মকর্তার ভাগাভাগির মাধ্যমে হয়েছে। লর্ড বেন্টিন্জ তাদের বেতন কমানোর আদেশ দেয় ও

৪. বোম্বেতে যে ইনাম কমিশন কাজ করছিল এবং বাংলাতে জমির দেখভালে ছিল তারা দুই প্রদেশের জমিদারদের মধ্যে প্রচুর অস্বস্তি তৈরি করে।

৫. এই আইন ১৮৫০ সালে পাস করা হয়।

৬. এমন আদেশ ১৮০৬ সালে পাস করা হয় এবং ভেলোরে ভয়াবহ বিদ্রোহের সূচনা করে।

৭. একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মকর্তা লেখেন ‘ভারতের পুরো সেনাবাহিনীতে লোকের সংখ্যা ৩১৫,৫২০ যার খরচ ৯,৮০২,২৩৫ পাউন্ড। এই হিসাবের বাইরে ৫১,৩১৬ জন ইউরোপীয় অফিসার ও সৈন্যের পিছনে ৫,৬৬৮,১১০ পাউন্ডের নিচে খরচ করা হয় না।’ *দ্য মিউটিনি অফ দ্য বেঙ্গল আর্মি*, পৃ-২৫।

বিদ্রোহের হুমকি দেয়। যদি সাহেব লোগ তাদের নিজস্ব সরকার গঠন করতে পারে, তবে স্থায়ী বাসিন্দারা কেন নয়? ভারতের সকল শ্রেণী— রাজপুত্র, বর্ণিক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক ও শ্রমিক— যারা সাদা মানুষের সংস্পর্শে একবার এসেছে বা অন্যান্যরা তার দ্বারা বিপথে গেছে, ইংরেজদের দেশে জন্মানো অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ও অর্ধসম্প্রদায়ের ইউরোশীয়ান জ্ঞান ভাণ্ডারে নিম্নো ও শূয়ার (শুকার) জাতীয় শব্দের প্রচলন হয়।

উধের রাজপুত্র বিরজিস কাদের এসব অভিযোগ একত্রিত করে ঘোষণা করেন : 'সকল হিন্দু ও মুসলমান জানে যে প্রতিটি মানুষের কাছে চারটি জিনিস প্রিয়, প্রথমত; ধর্ম; দ্বিতীয়ত, সম্মান; তৃতীয়ত, জীবন; চতুর্থত, সম্পত্তি। একজন স্বদেশীয় সরকারের অধীনে এসব জিনিস নিরাপদ উপরোক্ত চারটি জিনিসের প্রতি ইংরেজরা শত্রু হয়ে উঠেছিল।' বিক্ষিপ্ত হিংস্রতা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ১৮৫৬-এর শরত থেকে শুরু হয় এবং শীত ও বসন্তকাল পর্যন্ত চলে। কিন্তু যখন মীরাটের সিপাহীরা তাদের সাদাচামড়ার কর্মকর্তাকে ১৮৫৭ সালের ১০ মে খুন করে এবং হিন্দুস্তানের রাজা হিসেবে বাহাদুর শাহের দাবি করে দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়, এই খবর বনের আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে এবং দ্রুত কেন্দ্রীয় এবং উত্তর ভারতের বেশিরভাগ অংশ যা দিল্লি থেকে বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত—তা আগুনে পুড়ে যায়। সিপাহীরা বেসামরিকদের হস্তক্ষেপে ইউরোপীয়দের তাদের সেনাখানাস, ঘর, গির্জা এবং জনপ্রতিষ্ঠান যেমন ডাক ও যোগাযোগ অফিসের ক্ষতি করে। কিছু সময়ের জন্য মনে করা হয়েছিল এটা বিদেশীদের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্রোহ। কিন্তু খুব দ্রুত এটা পরিষ্কার হয় যে মুসলিম বিদ্রোহী ও হিন্দুদের মধ্যে উদ্দেশ্যের পার্থক্য খুব কমই ছিল। মুসলিমরা নতুন মুসলিম আইন ভঙ্গ করে; হিন্দুরা ক্ষমতায় মারাঠাকে ফেরত আনার আশা করেছিল। এই দুই সম্প্রদায় শুধুমাত্র এই ক্ষেত্রে একত্রিত হয়েছিল যে তারা একটি একই শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছে, আর তা হচ্ছে ইংরেজ।

যখন পাঞ্জাব বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দু

পাঞ্জাবের অবস্থা ভারতের বাকি জায়গা হতে ভিন্ন ছিল। শিখরা, যারা ভালমতো পুনর্বাসিত ক্ষমতা লুট করতে পারতো, তারা নেতাহীন অবস্থায় ছিল। মহারাজা দালিপ সিং শিখত্বের আবার ঘোষণা দিলেন এবং পরিশ্রমের সাথে নিজেকে পাঞ্জাবি রাজপুত্র থেকে ইংরেজ ভদ্রলোকে পরিণত করার চেষ্টা করতে থাকলেন; শের সিং আন্তারিওয়াল কলকাতায় নজরবন্দি ছিলেন ব্রিটিশ কর্তৃক ভাতাও পেতেন;^৮ ভাই

৮. এস.এন. সেন, এইটিন ফিফটি সেভেন, পৃ-৩১।

৯. যদিও ১৮৫৭ এর আগস্টে, একজন পুলিশ তথ্য দেন যে রাজা জাং গ্রামের কিছু প্রধান লোকের সাথে শের সিং আন্তারিওয়ালার গোপন যোগাযোগ আছে। পাঞ্জাব সরকারের প্রতিবেদন, মিউটিনি রিপোর্টস, ভল্যুম, VIII, অংশ ১, ২৪৭।

মহারাজা সিং এবং রাজা দীনানাথ (একমাত্র উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি যিনি পুরানো দিনের কথা স্মৃতিচারণ করেন) মারা যান;^{১০} বেদী বিক্রম সিং যার কাছে শিখরা নেতৃত্বের আশা করে তিনি গুরু নানকের শিষ্য ছিলেন এবং তার গ্রামে উনাতে কাজ করতেন।^{১১}

শিখ সৈন্যরা হিন্দুস্তানী সিপাহীদের এই দুর্দশা ভাগ করে নিল না। তাদেরকে পাগড়ি ও দাড়ি রাখার অনুমতি দেয়া হলো এবং খালসার রীতিনীতি পর্যবেক্ষণ করতে বলা হলো। তাদের যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকে তাহলে তা হিন্দুস্তানী সিপাহীদের প্রতি (পাঞ্জাবি ঘৃণা-পুরাবিয়াহ হিসেবে পরিচিত— পূর্বের দিকে— অথবা আরেক নাম মাতা দিন), তারা শিখদের সাথে মিশতে ঘৃণা করতো যেহেতু তারা নিম্নবর্ণের লোক।^{১২}

পাঞ্জাবের কৃষক সম্প্রদায়, শিখরাসহ সবাই সম্ভ্রষ্ট ছিল কারণ ফসল ভাল ফলেছে^{১৩} এবং সরকারকে যা রাজস্ব চেয়েছে তা উদারভাবে দিতে পেরেছে।

প্রশাসনিক বোর্ড এবং পাশাপাশি প্রধান কমিশনার জন লরেন্স একটি ভাল কাজ করেন : তারা এমন একটি ভূমিতে শান্তি নিয়ে আসেন যেখানে বিগত দশ বছর ধরে হাঙ্গামা এবং রক্তপাত চলছে। তারা আইন ব্যবস্থা নিয়মিতকরণ করেন এবং দেওয়ানী^{১৪} ও ফৌজদার আদালত উভয়েই বাধাহীনভাবে কাজ করা শুরু করে; তারা

১০. ১৮৫৭-এর ২৭ এপ্রিল 'মৃত্যু রাজা দীনানাথকে সরিয়ে দেয়ায় আমাদের পক্ষে সিংহাসন পাওয়া সোজা হবে।' এফ. কুপার, *ক্রাইসিস ইন দ্য পাঞ্জাব*, পৃ-২০।

১১. *পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, মিউটিনি রিপোর্টস*, খণ্ড VIII, পার্ট I, পৃ-১৭৩. বাবা নানকের ডেরাতে বেদীদের মধ্যে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, কিন্তু এটা কোন বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়নি, *ইবিদ*, পৃ-২৯৪।

১২. 'শিখ ও পুরাবিয়াদের মধ্যকার সম্পর্ক খারাপ ছিল, এবং প্রকৃত সূত্রে প্রাপ্ত যে তারা কাউকে তাদের দেশের ভিতর দিয়ে যাবার অনুমতি দিবে না। এই দুঃস্থের সুযোগ নেয়ার জন্য দৃঢ়চিহ্ন হল এবং প্রতিটি হিন্দুস্তানী সিপাহীকে ধরিয়ে দেবার বিনিময়ে পুরস্কৃত করা হবে বলে উত্তেজিত করা হল।' *ইবিদ*, খণ্ড VIII, পার্ট I, ২৩৪, 'খালসারা হিন্দুস্তানী সম্পর্কে "তীব্র ঘৃণা পোষণ করত এবং এই ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি, এই শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুনরুজ্জীবিত করলো; পাঞ্জাবি ও হিন্দুস্তানীদের মাঝে দূরত্ব তৈরি করলো, এবং আর্চা অনুবাদ করে আরও কঠিন করে তুলল।' কেভ ব্রাউন, *দ্য পাঞ্জাব এ্যান্ড দিল্লি ইন ১৮৫৭*, I, XVI.

সেনাবাহিনীর মতো বেসামরিক ক্ষেত্রেও হিন্দুস্তানীদের প্রাধান্য দেয়া হয়, যেমন, লাহোরে বিভাগের জন্য ছয়জন ভারতীয় অতিরিক্ত সহকর্মী লাগে, পুরাবিয়ারা ছিল পাঁচ জন, *পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, মিউটিনি রিপোর্টস, ভল্যুম VIII, পার্ট I*, ২২৭।

১৩. *ইবিদ*, পার্ট II, ২০১।

পাঞ্জাব প্রদেশে সোনার ফসল ভরে গেছে, যা গত কয়েক বছরেও হয়নি।' এফ. কুপার, *ক্রাইসিস ইন দ্য পাঞ্জাব*, পৃ-২৭।

১৪. স্মলকজ কোর্ট প্রতিষ্ঠান, এর সস্তা ও সুবিধাজনক বেসামরিক কক্ষের বাতিল করা এবং ১৮৫৬-এর ডিসেম্বরে নতুন আইনের অসুবিধা চলাকালে সময় কমিয়ে দেয়—এই পর্যন্ত যে লিখিত কর শুরু হয় বারো থেকে ছয় বছরের মধ্যে, টাকা ফেরত পাবার জন্য রেকর্ড সংখ্যক রুমের ব্যবস্থা করে। ১৮৫৭-এর প্রথম ৪ মাসে ৪৫,৯৫৩ রুম যুক্ত হয়; 'পাঞ্জাবের এক মাথা থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত, কত যে মামলা হল তা বলার অযোগ্য। কোর্টে ভিড় লেগেই থাকতো। হাজার হাজার মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে ফরেনসিকের বিতর্কিত বিষয়ে সাক্ষী দিত।' *পাঞ্জাব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৮৫৬-৫৮, প্যারা ৩।*

শক্ত হাতে শাসন করেন কিন্তু জনতার রং বা ধর্মীয় মূল্যবোধকে আঘাত করে নয়।^{১৫} তারা সমাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন; তারা রাস্তা নির্মাণ করেন, বিদ্যালয়, হাসপাতাল ও বিশ্রামখানা তৈরি করেন যা শুধু বিদেশীদেরই অভিজ্ঞতায় ছিল— তুর্কি, মঙ্গলীয় পাঠান, আফগান এবং মারাঠারা— সংঘবদ্ধ উপায়ে লুণ্ঠন চালিয়ে যায়।

যখন ১০ মে ১৮৫৭ সালে মীরাটে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল, প্রায় ৬০,০০০ সেনা পাঞ্জাবের আশ্রয় নেয়, এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিল হিন্দুস্তানীরা। ব্রিটিশ সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০,০০০-এর মতো,^{১৬}

কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য সিপাহীর মতো পাঞ্জাবে অবস্থিত হিন্দুস্তানী সিপাহীদের উপর কোন প্রভাব পড়ল না। মার্চ ও এপ্রিলে, সেনানিবাসে রহস্যজনক গোলাগুলির খবর পাওয়া যায়, মূলত তাদের মধ্যে যেসব সিপাহীদের নতুন এনফিল্ড রাইফেল দ্বারা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। সংক্ষেপে, ১৮৫৭-এর গ্রীষ্মে, যারা হিন্দুস্তানী সিপাহীদের রোযানল হতে ইংরেজদের রক্ষা করতে পারবে, যাদের সংখ্যা তিন থেকে একের মাঝে। তারা হলো পাঞ্জাবিরা^{১৭} এবং পাঞ্জাবিদের মতো, একমাত্র জনতা যারা আশা করে থাকে আপীলের প্রতি যে মুঘল বা মারাঠা রাজত্ব আবার শুরু হবে তারা হলো শিখ। শিখদের যে তীব্র ঘৃণা হিন্দুস্তানী হিন্দু ও মুসলিমদের প্রতি ছিল ইংরেজরা তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে।^{১৮}

সিপাহীদের নিরস্ত্রকরণ এবং পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দমন

যদিও এই বেড়ে চলাটা পরিকল্পিত ছিল না, পাঞ্জাবের সিপাহী রেজিমেন্ট কিছুই জানতো না মিরাত ও দিল্লির ১০ ও ১১ মে ১৮৫৭-এর ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে। অপরদিকে, মন্টগোমেরি (জন লরেন্সের অনুপস্থিতিতে কাজ করেন) টেলিগ্রাফের মাধ্যমে উঠতি বিদ্রোহের বাহাদুর শাহের দাবি ও এসব শহরে ইংরেজদের বিশৃঙ্খলার বিস্তারিত খবর পান। মন্টগোমেরি উচ্চপদস্থ বেসামরিক এবং সামরিক কর্মকর্তাদের আলোচনা সভা ডাকেন এই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে মিয়ানমারে সিপাহীদের তাদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বঞ্চিত করা হবে। ১৩ মে'র সকালে স্থানীয় রেজিমেন্টগুলোকে অস্ত্র জমা দেয়ার জন্য বাধ্য করা

১৫. ১৮৫১-এর জুন মাসে অমৃতসরে একজন কর্নেল জিয়ান সিংকে একজন মাতাল ব্রিটিশ সৈন্য খুন করে। ডালহৌসি ইংরেজ সৈন্যর ফাঁসির সাথে আপোষ করেননি। এটা পাঞ্জাবিদের খুশি করে, যারা আশা করেনি যে সরকার এমন ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকবে যেখানে একজন ভারতীয়কে একজন সাদা চামড়ার লোক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

১৬. পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, মিউটিনি রিপোর্ট, ভলুম VIII, খণ্ড, ৩২৮।

১৭. কেভ ব্রাউন, দ্য পাঞ্জাব এ্যান্ড দিল্লি ইন ১৮৫৭, ৩, ৪১।

১৮. পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, মিউটিনি রিপোর্টস, ভলুম VIII, অংশ ১, ২৩৪।

হয়।^{১৯} একই দিনে, পেশোয়ারে যুদ্ধ সম্পর্কিত বৈঠক হয়। জেনারেল রিড পাঞ্জাবে আদেশ জারি করেন এবং কেলামে চলনরত সারি^{২০} স্থাপন করেন ‘পাঞ্জাবের প্রতিটি বিন্দুতে যেতে প্রস্তুত থাকবে সেখানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ দমনের প্রয়োজন হবে।’

জন লরেন্স, তিনি বিদ্রোহের প্রথম দুই মাস রাওয়ালপিণ্ডিতে ছিলেন, অধঃস্তনদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন। তিনি দিল্লি পুনর্দখলের উপর বেশি গুরুত্ব দেন। এইজন্যে তিনি পাহাড়ে অবস্থিত দলকে আঞ্চলিক দিকে সরতে পরামর্শ দেন এবং তিনি কমান্ডার-ইন-চীফকে অনুরোধ করেন আক্রমণের জন্য আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীকে মুক্তি দেয়ার। শেষ পর্যন্ত তার পরিকল্পনার লক্ষ্য^{২১}— যাদের বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ আছে তাদের নিরস্ত্রকরণ, নতুন রেজিমেন্ট ও কর ব্যবস্থা গঠন করা, এবং প্রতিটি সহজলভ্য সৈন্যকে পাঞ্জাব থেকে মুক্ত করে দিল্লির দিকে— যে সেনা দলটি যাচ্ছে তা ভারী করা।

যখন লরেন্সের মনে এসব পরিকল্পনা চলছিল, তখন পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে প্রথম আক্রমণের খবর আসে, পূর্বেই সতর্ক থাকার কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মকর্তা অস্ত্রের নিরাপত্তার জন্য পদক্ষেপ নেন এবং বিদ্রোহীদের আক্রমণের জবাব সফলভাবে দেন। একই সময়ে ফিলাউর, গোবিন্দগড়, কংসা, অ্যাটক এবং মুলতানের দুর্গ দখল করা হয়। সিপাহীদের পরিকল্পনা ছিল যে ফিলাউরকে র্যালির কেন্দ্রবিন্দু করবে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।^{২২} সিমলা পাহাড়ী সেনানিবাসের জমিদার, সাবাথু, জাগশাই এবং কসৌলির অবস্থা দুশ্চিন্তার জন্য দেয়। গুরুখা রেজিমেন্ট তাদের ইংরেজ

১৯. এসসি ৪০, ২৯-৫-১৮৫৭।

২০. এই প্রস্তাব লেফটেন্যান্ট কর্ণেল জন নিকোলসন কর্তৃক উত্থাপিত হয়। শুধু বিদ্রোহ দমনের সুবিধার জন্যই নয় (জালান্দার বিদ্রোহীদের পালিয়ে যাওয়ার পর) চলন্ত বাহিনী যেখানে তা হোক না কেন কিন্তু এতে স্থানীয় রেজিমেন্টকে নিরস্ত্রকরণের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়।

২১. ‘সাধারণভাবে অনিয়মিত ও স্থানীয় পাঞ্জাবিদের বিশ্বাস কর, কিন্তু অবশ্যই নিয়মিত সেনাকে অবিশ্বাস করবে। অনিয়মিতদের যেভাবে পারো ব্যবহার কর। সীমান্ত থেকে তাদের সরিয়ে আনো, যেখানে তাদের কাজ ভালমত হয়েছে। তাদের বিষয় হল দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা যেখানে তাদের উপন্যাসের মতো প্রচুর কাজ করার আছে। প্রত্যেকটি রেজিমেন্টের জনসংখ্যা বিশালাকারে বাড়ানো, নতুন রেজিমেন্ট তৈরি কর, যদি দরকার পড়ে, কিন্তু এমনটি যথেষ্ট সতর্কতার সাথে করবে, মনে রাখবে যে অস্ত্র দ্বারা তোমরা তৈরি, হঠাৎ করে তা তোমাদের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। নিয়মিত সৈন্যদের জন্য, তাদের পর্যবেক্ষণ কর, আলাদা রাখো, দুর্গ হতে দূরে সীমান্তে তাদের প্রেরণ কর, যেখানে একত্রিত হয়ে কাজ করা তাদের জন্য কঠিন হবে। যদি তাদের মাঝে বিদ্রোহের কোন চিহ্ন দেখা যায়, সাথে সাথে অস্ত্রহীন করে দেবে। যদি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, ধ্বংস করবে তাদের, যদি সম্ভব হয়, জায়গাতে থেকেই; এবং যদি তারা পালাতে চায়, স্থানীয়দের তাদের বিরুদ্ধে উৎসে দিবে এবং তাদের শিকার করবে। প্রথম দিকের কিছু কঠোর উদাহরণ শেষদিকে অনেক রক্তপাত রক্ষা করতে সক্ষম হবে। তোমাদের নিজ নিজ এলাকায় শিখ প্রধানদের খুঁজে বের কর এবং তাদের মার্শাল প্রবণতা লিপিবদ্ধ কর এবং হিন্দুস্তানীদের প্রতি তাদের স্বাভাবিক ঘৃণাতে তারা তোমাদের পক্ষে দ্রুত চলে আসবে।’ জন লরেন্স কর্তৃক ঠিকানার বস্ত্র। বস ওয়ার্থ স্মিথ, লাইফ অফ লর্ড লরেন্স, II, ৪২-৩।

২২. কেভ-ব্রাউন, দ্য পাঞ্জাব এ্যান্ড দিল্লি ইন ১৮৫৭, I, ১২০।

কর্মকর্তারা বাধ্য হতে অস্বীকার করে, এবং তারা কসৌলিতে সম্পদ লুণ্ঠন করে। তাদের দাবি মেনে নেয়া হয় এবং তারা জয়ীর বেশে ব্যারাকে ফিরে যায়।

খুব দ্রুত মিরাত ও দিল্লিতে বিদ্রোহের খবর ছড়িয়ে পড়ল, ‘প্রকাশ্যে হিংস্র অপরাধ করার সময়’^{২৩} সুতলেজের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল এবং পাঞ্জাবের কিছু শহরে, আম্বালা, পানিপথ এবং থানেসার উল্লেখযোগ্য। প্রকাশ্য দিবালোকের রজ্জার এবং গুজার উপজাতীয়রা লুণ্ঠন শুরু করে।^{২৪} হরিয়ানার কিছু জমিদার রাজপুত্র—ঝব্রেজার এবং দাদ্রির নবাবগণ এবং বল্লভগরের রাজা—বিদ্রোহীদেরকে তাদের অনেক কিছুই দিয়ে দেন; লোহারুর নবাব নিরপেক্ষ থাকেন। পূর্ব পাঞ্জাবে, মুসলিম প্রধান হওয়া সত্ত্বেও—কর্ণাল ও মালেরকোটলার নবাবগণ ব্রিটিশদের পক্ষে ছিলেন, মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় বিদ্রোহীদের সমব্যথী ছিলেন। হিন্দুরা একইরকম থাকলো। ট্রান্স সুতলেজ এলাকার জনতা ব্রিটিশদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া^{২৫} সিস ও ট্রান্স সুতলেজের উভয়ের শিখ জনতা, রাজপুত্রগণ ও কৃষকগণ, ব্রিটিশদের প্রতি অগণিত সমর্থন দেয়। জিন্দ, পাটিয়ালা, নাভা, কালসিয়া এবং কাপুরথালার রাজাগণ, মালাউধ, খেরি, ভাদাউরের প্রধানগণ ও লোধান, সিংপুরীরা ও কস্টারপুরর সোধিরা স্বেচ্ছায় কাজ করেন।

পাঞ্জাবের অপর প্রান্তে, নৌশেরা ও মারদানে^{২৬} বিদ্রোহের কারণে কর্তৃপক্ষ পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করে। পেশোয়ারের মানুষকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে সন্দেহ করা হয় যে তারা ঈদ উৎসবের সময় বিদ্রোহ করতে পারে। ফলস্বরূপ তিনটা স্থানীয় রেজিমেন্টকে অস্ত্রহীন করা হয়। এসব কারণে মারদানের সিপাহীরা বেগ পেল, এবং ৫০০ জনের মতো স্বাত,^{২৭} এ পালিয়ে গেল, ওয়ালিতে তাদের কাজের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।

২৩. পাঞ্জাব অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট ১৮৫৬-৫৮, প্যারা ১৪।

২৪. ‘প্রতিটি গুজার লুণ্ঠন করেছিল এমনভাবে যেন সে তার সারাজীবনে এটা করতে অভ্যস্ত। তারপর প্রকাশ্য দিবালোকে সব জায়গায় ডাকাতি শুরু হল, প্রায় সব গ্রামেই। এক গ্রাম যেন আরেকটার সাথে যুদ্ধের জন্য মুখিয়ে থাকতো।’ ইবিদ

২৫. ‘নলাগড় ও রুপারে একটি সুগু বিদ্রোহ জেগে উঠতেই দ্রুত দমন করা হল। একজন মোহর সিং, রুপার প্রধানের একজন গুণক, যার গরুর হস্তারককে ক্ষমা করার চেষ্টা কিছু বিরূপ ঘটনায় তৈরি করেছিল তাকে ফাঁসি দেয়া হয়। পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট রেকর্ডস, মিউটিনি রিপোর্টস, ভল্যুম VIII, খণ্ড I, ৩৮-৯।

২৬. ৫৫তম পদাতিক সেনাবাহিনীর ১০০ জন শিখ বাকি রেজিমেন্টদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা পোষণ করে যদি তা তাদের কর্মকর্তা দ্বারা পরিচালিত হয় (এসসি ৫, ৩১-৭-১৮৫৭), যদিও এই প্রস্তাব সমর্থন পায়নি, পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, শিখদের হিন্দুস্তানীদের থেকে পৃথক করতে হবে এবং পাঞ্জাবি মোহাম্মদীয় এবং পাহাড়ী মানুষের সাথে একত্র করে নতুন ছোট রেজিমেন্ট গঠন করা হবে।

২৭. স্বাতে বেসামরিক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল যেদিন মীরাটে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। ব্রিটিশদের কাছে ওয়ালির ব্যাপারটি পরিষ্কার ছিল না।

জন লরেন্স পাঞ্জাবকে দুই পাশ থেকেই বন্ধ করে দেয়ার আদেশ দেন। দলের মনোযোগ ছিল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যা পাঠান উপজাতি^{২৮} এবং ক্ষণস্থায়ী আফগানিস্তানের আমির মোহাম্মদের কাছ হতে রক্ষা করার জন্য এবং ভূমিতে নামার সুযোগ নেয়ার জন্য। হরিয়ানার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে দল নিযুক্ত করা হয় যাতে বিদ্রোহীরা পাঞ্জাবে ঢুকতে না পারে এবং যারা পালিয়ে দিল্লি যাচ্ছে তাদের বাঁধা দেয়া। পাঞ্জাবের মাঝেও চলন্ত ইংরেজ সারি এবং বিশ্বস্ত পাঞ্জাবিদের আদেশ দেয়া হলো পলায়নকারীদের ধরার জন্য। রক্ষী নিযুক্ত করা হলো ফেরীতে, এবং উচ্চ বেড়িবাঁধগুলো এমন জায়গায় উঁচু হয়েছে যেখানে নদীগুলো হেঁটে পার হওয়া যায়।

বিদ্রোহের আগুন জালান্দারে ছড়িয়ে পড়ল, যেখানে কর্মকর্তারা স্থানীয় রেজিমেন্টকে নিরস্ত্রীকরণের আদেশ ধীরে ধীরে পালন করছিল। বিদ্রোহীরা ফিলাউরের দিকে যাত্রা করে, যেখানে তারা দেশের পদাতিক সৈন্যবাহিনীর তৃতীয় রেজিমেন্টের সাথে যুক্ত হয় এবং তারপর দিল্লির পথে যাত্রা করে। জন লরেন্স এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সন্দেহযুক্ত রেজিমেন্টকে নিরস্ত্রীকরণ এবং বহু বিদ্রোহীর পলায়ন অন্যান্যদের বিশ্বস্ততার উপর খারাপ প্রভাব ফেলবে। তিনি সিদ্ধান্ত নেন হিন্দুস্তানী সিপাহীদের তাদের অস্ত্র থেকে বঞ্চিত রাখবেন তাদের পূর্ব রেকর্ড ছাড়াই শুধু অনুশীলনের জন্য। এই কৌশল প্রয়োগের সাথে সাথে, পাঞ্জাব সেনানিবাসের সাথে সাথে মুলতান ও ফিলাউরেও নিরস্ত্রীকরণ চলে। সমস্ত ক্ষেত্রেই এটা এত মসৃণভাবে হয়নি। ঝেলামে প্রচুর রক্তপাত হয়,^{২৯} এবং কিছু বিদ্রোহী তাদের আদেশবর্তীদের ধোঁকা দিয়ে জন্মুতে পালিয়ে যায়। ঝেলাম ঘটনার দুই দিন পরে, শিয়ালকোটের সিপাহীরা তাদের কিছু কর্মকর্তাকে গুলি করে এবং দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়। রবির ত্রিশু ঘাটের কাছে নিকোলসন তাদের গতিরোধ করে। এই দুই এনকাউন্টারে প্রতিটি সিপাহী হয় নিহত হয়েছে অথবা ডুবে গেছে।

লাহোরের নিরস্ত্রবাহিনী অস্থির হয়ে পড়ল। ২৬তম পদাতিক বাহিনীর লোকেরা হঠাৎ করে তাদের কর্মকর্তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং রবি বরাবর উত্তরের দিকে সরে যেতে থাকে। একটি সশস্ত্র বাহিনী এবং সশস্ত্র গ্রামবাসী কর্তৃক তারা নিশ্চিহ্ন হয়। এই কাউন্টারে একশত পঞ্চাশজন মারা যায়। মূল বাহিনী, যেটা

২৮. 'একবার পেশোয়ার চলে গেলে', একজন বিশ্বস্ত শিখ প্রধান অমৃতসরের ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন, 'পুরো পাঞ্জাব এভাবে উলটে যাবে', এবং যখন তিনি বলছিলেন তিনি তার আঙুল ও বৃদ্ধাঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে তার আঁচকানের কোনা থেকে সেলাই বরাবর কেন্দ্রে আসেন। 'তুমি জানো আমরা কীসের উপর দাঁড়িয়ে আছি', প্রধান কমিশনারকে এডওয়ার্ডস লেখেন, 'একবার আমাদের পা পিছলে গেলে আমরা মৃত্যুর কাছে চলে যাব।' এবং এডওয়ার্ডস ও তার সঙ্গীদের পা পিছলানোর কোনো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এটাকে নামিয়ে রাখার এবং সেখানেই রাখার ইচ্ছে।' *বোসওয়ার্থ স্মিথ, লাইফ অফ লর্ড লরেন্স, II, ৬৩।*

২৯. দুই দিনের যুদ্ধে ১৮০ জন মারা গেল; ১১৬ জনকে গ্রেফতার ও ফাঁসি দেয়া হল। *কুপার, দ্য ক্রাইসিস ইন দ্য পাঞ্জাব, পৃ-১২৮।*

একটা দ্বীপে আশ্রয় নেয়, পরবর্তীতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার এফ. কাপুরের অধীনস্থ দলের দ্বারা। সাতরে পার হওয়ার সময় পঞ্চাশজন ডুবে যায় বা গুলি খায়। যারা বাকি ছিল (প্রায় ২৮০ জন) তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং অঞ্জলা গ্রামে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। দশ ব্যাচে ভাগ করে কুপার ২৩৭ জনকে গুলি করে; অন্যরা কারাগার থেকে বের হতে আপত্তি জানায় যেখানে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হয়েছিল। কুপার সেই রাতের জন্য তাদের সেখানে ফেলে রাখেন। পরদিন সকালে ৪৫ জনকে শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।^{৩০} বাকি ৩২ বন্দিকে কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়।^{৩১}

একই রকম বেদনাদায়ক ঘটনা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেও ঘটে। আগস্টের শেষ সপ্তাহে পেশোয়ারে অবস্থিত নিরস্ত্র রেজিমেন্টের সিপাহীরা অস্ত্র সংগ্রহের জন্য ব্যারাকে খোঁজ করে সৈন্যদের আহত করে। পঞ্চাশজন বিদ্রোহীকে গুলি করা হয়; যারা পালিয়ে যায় তাদের ধাওয়া করা হয় এবং হত্যা করা হয়।^{৩২} রেজিমেন্টের ব্যারাক বড় বড় হাতি কর্তৃক পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৩০. 'দরজা খোলা হল এবং খুলেই রাখা হল! তারা সবাই প্রায় মৃত! না জেনেই, হিন্দুদের কালো গহ্বরের ট্রাজেডি আবার ঘটল, সেই রাতে কোনো কান্না শোনা যায়নি, শুধু অসহায়ীদের ভিড়ের চিংকার, পুলিশ, পাহারাদার এবং উত্তেজিত গ্রামবাসী ছাড়া। ৪৫টি মৃতদেহ পাওয়া যায় ভয়, বিধ্বস্ত, দুর্বল, তাপমাত্রা এবং আংশিক দম বন্ধের কারণে, তাদেরকে আলোতে টেনেহিঁচড়ে আনা হয় এবং অন্যান্য মৃতদেহের সাথে যুক্ত করা হয়। গ্রামের জমিদারী যে গণকবর খুঁড়ে সেখানে তাদের একত্রে ফেলা হয়।' এফ. কুপার, *দ্য ক্রাইসিস ইন দ্য পাঞ্জাব*, পৃ-১৬২-৩।

৩১. কুপার বিদ্রোহীদের অপরাধ জনতার কাছে ব্যক্ত করে। তার মতে, 'অসাধারণভাবে ব্রিটিশদের সাথে বিচারে একমত হয়েছে' লোক, মহিলা এবং বাচ্চাদের দলকে না মারার জন্য বললেন, যারা বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করেছে। কুপার, *দ্য ক্রাইসিস ইন দ্য পাঞ্জাব*, পৃ-১৬৩।

কুপারের কার্যক্রম লরেন্স ও মন্টগোমেরি অনুসরণ করেন। '২৬তম এন.আই.-এর বিরুদ্ধে আপনার বিজয়ের জন্য আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। আপনি ও আপনার পুলিশ দল খুব শক্তি ও উদ্যম নিয়ে কাজ করেছেন, রাজ্যের ভালো আশা করেন। আমি বিশ্বাস করি, এসব সিপাহীর ভাগ্য দেখে অন্যরা সতর্ক হবে। প্রতিটি উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে যারা বড় অবস্থায় আছে তাদেরকে।

'পুরস্কার বিতরণের ভার মূলত তোমাকে দেয়ার জন্য রবার্টের কোনো দ্বিধা থাকা উচিত না। প্রার্থনা কর যাতে তাদেরকে মেধা অনুযায়ী দেয়া হয়, এবং প্রতিটি মানুষ যাতে তার প্রাপ্য অনুযায়ী পায়' স্যার জন লরেন্স হতে ডেমি-অফিসীয় পত্র যা ২ আগস্ট ১৮৫৭-এর।

৩২. এডওয়ার্ডেস লেখেন 'প্রায় সকল সদস্য ৫১তম স্থানীয় পদাতিক বাহিনীর তুলে নেয়া হয় এবং গুলি করা হয়। সাতশ'রও বেশি লোক তখনই মারা যায়। চার বা পাঁচজন খাইবারের খুন্দুমে পৌঁছায়, যেখানে হুরিখেল বলল যে তাদেরকে মুসলমান বলে কাবুল যেতে দেয়া উচিত, কিন্তু হিন্দুদের না; তাই তাদেরকে ক্ষেত্রেই পরিবর্তন করে দেয়া হয়।' *বসওয়ার্থ স্মিথ, লাইফ অফ লর্ড লরেন্স*, II, ১৭৯।

৫১তমের শিকার নিয়ে কুপারের হিসাব (যাতে ৬৭১ জন ছিল) ঠিক ছিল। 'তৈরি ফসল নষ্ট করা, সংকীর্ণ গিরিসংকটে প্রবেশ করা, যেন কৃষক ও খরগোশের জন্য, এবং সাথে অনেক সফলতা...মোট [নিহত] বিদ্রোহের ৩০ ঘন্টার মধ্যেই জানা যায়, ৬৫৯ এর কমে নয়।' এফ. কুপার, *দ্য ক্রাইসিস ইন দ্য পাঞ্জাব*, পৃ-১৭৭।

যেসব রেজিমেণ্টে কোনো প্রভাব পড়েনি তাদের যে দ্রুততার সাথে নিরস্ত্র করা হয় এবং যাদের বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহের অবতারণা করা হয় তাদের সাথে যে, 'ন্যায়বিচার' করা হয় তাতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে এবং পাঞ্জাবে বিদ্রোহের সম্ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে। সরকার গোলাপের ভাণ্ডার বাজার পার্লামেন্ট, 'মুক্তার দাম', 'সাদা চিনি' এবং 'লাল মরিচের' (ইংরেজদের প্রতীকস্বরূপ) বেড়ে যায়, যখন 'লাল আটা', 'খয়েরি গুড়' (মোলাসেস), এবং 'কাল গোলমরিচ'-এর দাম পড়ে যায়।

উপরোক্ত ঘটনা ছাড়াও (এবং মুসলিম খারাল উপজাতীয়দের বিদ্রোহ ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে গুজিয়ারা জেলায় হয়েছিল) বিদ্রোহ পাঞ্জাবের উপর প্রভাব ফেলে নি যা উত্তর ভারতের বাকি জায়গায় প্রভাব ফেলেছিল। পাঞ্জাবি মুসলমানেরা কান বন্ধ করে তাদের হিন্দুস্তানি ধর্মাবলম্বীদের প্রণোদিত করে জিহাদের জন্য শূকর-খাদক ইসলামের লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে। পাঞ্জাবি হিন্দুরা এবং বৃহৎ কারণে শিখরাও দেরিতে হলেও হিন্দুধর্ম বাঁচানোর আবেদন করে গরু-খাদক বিদেশীদের কাছ থেকে যারা কার্টিজেরে গ্রিজ দেয় গরুর চর্বি দিয়ে। এটা বিস্ময়কর নয় কারণ তারা, যারা ১৮৫৭-এর গ্রীষ্মে দাবি করেছিল স্বাধীনতার জন্য, তারাই যার আট বছর আগে বিদেশীদের হাতের পুতুল ছিল কাজেকর্মে পাঞ্জাবিদের সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে।

পাঞ্জাবি রাজপুত্র ও ধনী জমিদারদের বিশ্বস্ততা চূড়ান্ত ছিল পাঞ্জাবকে রক্ষার ব্যাপারে এবং ব্রিটিশদের ভারতের বাকি অংশ দেয়ার ব্যাপারে। তারা পাঞ্জাবে আদেশ মান্য করতে সাহায্য করে, দিল্লির সড়ক সৈন্যদল সশস্ত্রবাহিনী ও সম্পদ যাওয়ার জন্য উন্মুক্ত রাখে, এবং টাকা, জনবল এবং অস্ত্রের যোগান দেয়।

পাঞ্জাবিদের ক্ষেত্রে, বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে শিখদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিখ সৈন্যরা ইংরেজ প্রতিষ্ঠান এবং পরিবার বিদ্রোহ করে এলাহাবাদ, বেনারস,^{৩৩} লক্ষৌ, কানপুর, আরাহ ও অন্যান্য কেন্দ্রে। যখন থেকে মীরাট ও দিল্লির বিদ্রোহীরা মোঘল শাসন বজায় রাখার ঘোষণা দেয়, তখন শিখরা যারা তাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মোঘল নৃশংসতার কথা শুনে এসেছে তারা বাহাদুর শাহের ঘোষণায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ব্রিটিশরা শিখদের মোঘলবিরোধী মনোভাবকে কাজে লাগায়। সৌ সখীর সংকলনে দিল্লিতে অ্যাংলো-শিখ রাজত্ব করবে বলে জানা যায়। এভাবে লুণ্ঠনের বিষয়কে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলা হয়; শিখরা কোম্পানির দিল্লির দিকে যাত্রারত দলের সাথে যোগদান করে।^{৩৪}

৩৩. যেসব শিখ বিপথে গিয়েছিল তারা বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করে। বেনারসে, 'লুধিয়ানা শিখ'-এর একটি দল যা ৩৭তম পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত তারা ৩ জুন ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহ করে। অনেককে হত্যা করা হয় বা ফাঁসি দেয়া হয়। এ ঘটনায় বেনারস থেকে ৭০ মাইল দূরে জেওয়ানপুরে বিদ্রোহ বন্ধ করা হয়। বেনারসের আদালতঘর ও সম্পত্তির পাহাদার শিখরা বিশ্বস্ত তার পরিচয় দেয়। *হিলটন, দ্য ইন্ডিয়ান মিউটিনি*, পৃ-৭৩-৫।

৩৪. প্রথমে জন লরেন্স খালসাকে ভুল বুঝেছিলেন। ১৮ মে ১৮৫৭-এর একটি চিঠিতে তিনি লেখেন 'আমি বৃদ্ধ শিখ দিয়ে সংখ্যা ভারি করা পছন্দ করি না। আমি তাদের দৃঢ় জাতীয়তা সংগ্রহ করব। তারা কতটুকু পাবে। আমি বৃদ্ধ শিখদের রাজস্ব বাড়ানোর কথা বলছি না। শিখ ও হিন্দুদের মাঝে

শিখ সৈন্যরা দিল্লিতে যাওয়ার পথে লাঞ্ছনার শিকার হয় এবং যখন শহরটি ২০ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭-তে আত্মসমর্পণ করলো, তখন তাদেরকে তাদের হাতে যা উঠে তা নিতে বলা হলো। হডসন তার শিখ অস্থারোহীর সাথে প্রথমে বাহাদুর শাহ বেগম জিনাত মহল এবং তাদের ছেলে জওয়ান বখতকে গ্রেফতার করেন। একদিন পরে তারা বাকি দুই পুত্র বঙ্গু সম্রাটের একজন নাতিকে গ্রেফতার করেন। শিখ নিরাপত্তার কারণে, হডসন কয়েক হাজার সশস্ত্র বাহিনীকে উপেক্ষা করেন, তিন রাজপুত্রকে নগ্ন করে লাঞ্ছনা করেন এবং তার আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি করেন। শিখরা রাজপুত্রদের শবদেহ চাঁদনীচকে নিয়ে যায় এবং গুরুদুওয়ারা সিসগঞ্জের সামনে দেখার জন্য রাখা হয়, যেখানে ১৮২ বছর আগে তাদের গুরু তেজ বাহাদুরকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ফাঁসি দেয়া হলো। এভাবে প্রশস্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সৌসখীর ইংরেজি সংকলনের 'ভবিষ্যদ্বাণী' পূর্ণ হলো।

শিখদের কাজের জন্য তাদেরকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হলো : রাজপুত্রসহ বিশাল রাজত্ব এবং প্রাসাদের মতো বাসা এবং^{৩৫} প্রচলিত লুঠের অর্থ এবং চাকরির সুযোগ পাওয়া।

একটি সাহনুভূতির দৃঢ় বন্ধন আছে, তাই আমি ধীরে ধীরে ও সতর্কভাবে শিখদের উস্কে দিতে চাই, আমি তাদেরকে মোহাম্মদীয় ও পাহাড়ী মানুষদের সাথে মিশে গিয়ে দেবতে চাই।' *বসওয়ার্থ স্মিথ, লাইফ অফ লর্ড লরেন্স, II, ৫৩।*

ধীরে ধীরে জন লরেন্স এটা বুঝতে পারলেন যে হয় শিখদের পুরোপুরি বিশ্বাস করতে হবে অথবা বিদ্রোহী বলে গণ্য করতে হবে। শিখদের প্রভুতি তাকে অসুবিধা থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করলো।

শিখ সৈন্যরা যাদেরকে হিন্দুস্তানি স্বদেশবাসীর সাথে নিরস্ত্র করা হয়েছিল তারা বিশ্বস্ততার প্রতিবাদ করেছিল, তাদের আলাদা করা হয় এবং নতুনভাবে বিস্তৃত শিখ রেজিমেন্ট গঠন করা হয়। এই রেজিমেন্টের শিখরা আখালার দক্ষিণে আস্তানা গড়ে। যারা মাঝাতে ছিল তাদের বাড়ি ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে, তাদেরকে লাহোরে প্রতিবেদন পাঠাতে এবং ছোট নতুন দল গঠন করতে বলা হল। *কেত ব্রাউন, দ্য পাঞ্জাব অ্যান্ড দিল্লি ইন ১৮৫৭, I, ২২৮।* জন লরেন্স দরবার সেনার অবসরপ্রাপ্ত বন্দুকবাজদের নতুন রঙে যোগ দেয়ার আহ্বান জানাল— যারা তা তৎপরতার সাথে করেছিল (ইবিদ, পৃ-২৯৬) প্রকৌশলীর দায়িত্বে নিযুক্ত সৈনিক ও খনি শ্রমিকরা যারা মাজহাবী শ্রমিক সম্প্রদায় থেকে জড়িত হয়েছিল তারা রাস্তা ও খাল খননের কাজ শুরু করে।

৩৫. রাজপুত্রদের অতিরিক্ত রাজত্ব, উপাধি ও সম্পত্তি দেয়া হয়। পাটিয়ালাকে ঝাঞ্ঝার নরনৌল বিভাগে পুরস্কৃত করা হয়, বাহাদুরের চেয়ে উপরের অর্থতিয়ারে, এবং দিল্লিতে বেগম জিনাত মহলের একটি বাড়ি দেয়া হয়। *এফসি ১৮৮, ২-৭-১৮৫৮।* জিন্দকে দাদ্রি দেয়া হয়, কুলেরান পরগণায় ১৩টি গ্রাম দেয়া হয় এবং দিল্লিতে রাজপুত্র আবু বকরের একটি বাড়ি দেয়া হয়; *এফসি ১৮৯, ২-৭-১৮৫৮।* নভকে বাওয়ালের বিভাগ এবং ঝাঞ্ঝার কান্দি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়; *এফসি, ২-৭-১৮৫৮।* ঝাঞ্ঝার প্রেরণকৃত সীমানা হিসাব করা হয়েছিল। একটি প্রায় অফিসীয় দলিল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয় : 'পাঞ্জাবের প্রধান কমিশনারের পরামর্শে সীমানা দেয়া হয়েছে যা বুঝুর জেলা থেকে খুব বিবেচনা করে নির্বাচন করা হয়েছে। পাটিয়ালা মহারাজাকে দেশের সেই সঠিক স্থান দেয়ার ফলে, তীব্রগতি সম্পন্ন মোহাম্মদীয় জনতার মাঝে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ হিন্দু ক্ষমতার স্থান হয়েছে, এবং বাধা তৈরি হয়েছে আলওয়ার ও জয়পুরের স্বাধীন রাজ্যের সাথে শেকাওয়াতি ও

ব্রিটিশ সেনাদলে শিখদের প্রবেশন

শিখদের জানামতে বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল যে, সেনাবাহিনীর চাকরি তাদের জন্য উন্মুক্ত এবং ব্রিটিশ সেনা গঠনের জন্য তাদেরকেই বেশি খোঁজা হচ্ছিল। এভাবেই বার বার পদক্ষেপের মাধ্যমে এটা বেরিয়ে আসে।

১৮৪৬ সালে প্রথম শিখ যুদ্ধের শেষদিকে, নিষিদ্ধ দরবার সেনাদল কর্তৃক একটি অনিয়মিত^{৩৬} দল গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় ইংরেজ-শিখ যুদ্ধের শেষে, এই দলটি শক্তিতে ভারী হয় এবং এটাকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে স্থানান্তর করা হয়। এটি পাঞ্জাব ইরেগুলার ফোর্স এবং পরবর্তীতে পাঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার ফোর্স বিখ্যাত পাইফার নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৪৯ সালে, ডালহৌসি কিছু সত্যিকারের খালসাকে^{৩৭} ব্রিটিশ দলে নেবার সিদ্ধান্ত নেন। যদিও সংখ্যাটি নগণ্য ছিল, তাকে এই পদক্ষেপের জন্য সমালোচনা শুনতে হয়েছে।^{৩৮}

শিখদের প্রবেশনের ব্যাপারে গভর্নর জেনারেল, কমান্ডার-ইন-চিফ, এবং প্রশাসন বোর্ডের হাত ছিল। ব্রিগেডিয়ার হগসন, যিনি শিখ দলকে পরিচালিত করেছেন, এই ব্যাপারে মতামত পোষণ করেন, যার গ্রহণযোগ্যতার পরে, খুব দ্রুতই শিখ প্রবেশন হয়েছিল। এতে বলা ছিল যে, নিয়মিত সেনার পাঞ্জাবির সংখ্যা সীমিত প্রতি রেজিমেন্টে ২০০ করে থাকবে যাদের অর্ধেক থাকবে শিখরা, শিখদের মোট সংখ্যা ৭৪ রেজিমেন্টে ৭৪০০ করে। প্রবেশন করতে হবে ২০ বছরের নিচে—এভাবে দরবার সেনার বৃদ্ধ খালসাদের বাতিল করা হয়েছিল। সৈন্যের মতো মহৎ পেশা পালনের জন্য, শুধু জাত শিখদেরই তালিকাভুক্ত করা হয়; নিম্নবর্ণের শিখদের যেমন মাজহাবি, রামদাসিয়া প্রভৃতিদের জোর করে বাতিল করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়, এবং সেটার শিখদের আলাদা পরিচয়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব

কেব্র বংশের, যারা খুব বিপদের সময় অসহযোগিতার পরিচয় দিয়েছে। বুঝুর সীমান্ত রক্ষার জন্য দরকার একটি শক্তিশালী সীমান্ত পুলিশ, সাথে বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং এই কাজটি এখন পাটিওয়ালা করবে। ভাওয়ালা ও কাস্তির বিভাগ নভ রাজাতে মঞ্জুর হল, যা পাটিওয়ালার মহারাজা কর্তৃক মঞ্জুর নরনৌলের কাছে; এবং এভাবে আমরা দুটিভাবে আমাদের সীমান্তে প্রবেশ রোধ করতে পারি যাদের প্রতি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে পারি তাদের দিয়ে।' কেভ ব্রাউন, দ্য পাঞ্জাব এ্যান্ড দিল্লি ইন ১৮৫৭, II, ২৪৩।

আম্বালা ও থানেসার জেলার প্রধানদের ও জাগিরদারদের তাদের বাকি অর্থ এবং উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

৩৬. 'অনিয়ন্ত্রিত' শব্দটি 'নিয়মিত' শব্দের বিপরীতে ব্যবহৃত হত ভারতীয়দের উচ্চপদে ধরে রাখার জন্য যে কোনো কঠোর উপায়ে ও যেকোনো কাজ করার জন্য এবং নির্দেশমতো কিছু নির্বাচিত ব্রিটিশ কর্মকর্তা ছিল। তাদেরকে মূলত গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

৩৭. এটা মনে রাখতে হবে যে যদিও 'শিখ' শব্দটি দরবার দলের পুনর্কর্মস্থানের জন্য ব্যবহৃত হত, কিছু প্রকৃত পক্ষেই শিখ ছিল। বেশিরভাগ ছিল পাঞ্জাবি মুসলমান, গুরখাগণ এবং দরবার সেনার হিন্দুস্তানীরা।

৩৮. বাইর্ট, প্রাইভেট লেটারস অফ দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসী, পৃ.-৮৪-৫।

ছিল, তা হলো শিখদের যারা সেনাতে যোগ দিবে তাদের নিশ্চিত করা এই বলে যে, খালসার ঐতিহ্যের সাথে তাদেরটা সমস্যা করবে না। নিয়মমালায় ছিল যে :

‘বর্ণ, বা শিখ শত্রুতার ধর্মীয় বিবাদ, অবশ্যই সমস্যা করবে না। শিখদের তাদের দাড়ি এবং মাথায় তাদের চুলের ঝুঁটি রাখার অনুমতি দেয়া হলো, যা তাদের ধর্ম। এসব নির্দেশের যেকোনো অনুপ্রবেশ, যদি অল্পও হয়, তাহলে তার বিশ্বাসের ঘাটতি বলে ব্যাখ্যা দেয়া হবে—যা খারাপ ফলাফল বয়ে আনবে এবং সাধারণভাবেই জনতার অবিশ্বাস ও সতর্কীকরণ উৎসাহিত হবে। এমনকি যারা শিখদের মতো বাহ্যিকরূপে ব্রিটিশদলে ঢুকবে, ঢোকানোর পরে তা ছাড়ার অনুমতি দেয়া হবে না।’^{৩৯}

মাজহাবিদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা অপ্রীতিকর^{৪০} ছিল যেহেতু তারাও জাটের মতো ভালো যোদ্ধা ছিল। শুরুটা হয়েছিল যখন তাদেরকে শ্রমিক হিসেবে প্রবেশ করানো হয়েছিল পাহাড়ে রাস্তা তৈরির জন্য যা পাঠান উপজাতি দিয়ে ভর্তি ছিল। তারা বাড়ি দোআব খালও খনন করে। মাজহাবিদের মাটি মেন (ভূমির শ্রমিক) হিসেবে গণ্য করা হতো এবং না পোশাক আর না অস্ত্র দেয়া হতো।

শিখ সৈন্যরা তাদের যুদ্ধের কৌশল এবং বিশ্বস্ততা প্রমাণ করে ১৮৫২-এর^{৪১} ইংরেজ-বার্মিজ যুদ্ধে এবং দুই বছর পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোহামান্দ উপজাতির বিরুদ্ধে।^{৪২} পাশাপাশি যখন বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল ইংরেজ কর্মকর্তারা নিশ্চিত ছিল যে শিখরা বিদ্রোহীদের পাশে থাকবে না এবং তারা তাদেরকে নির্বাচন করেছে প্রায় নিঃশেষ পুরাবিয়ার বদলে। একই সময়ে মাজহাবিরা শ্রমিকদের দল থেকে উঠে পথপ্রদর্শকের দলে চলে গিয়েছে।^{৪৩}

মে, ১৮৫৭-এর প্রথমদিকে, হডসন একপাল ঘোড়া ও পদমূল তৈরি করে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের সাথে কাজ করার জন্য এবং কর্নেল ও

৩৯. এসসি ৩৮, ২-১৮-৫১। লর্ড ডালহৌসী এসব নিয়মনীতির ব্যাপারে মতামত দিলেন এবং মনে করিয়ে দিলেন, ‘এই মার্চে পাঞ্জাবে যখন আমি ঢুকি, আমি শুনি যে শিখদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু তার সাথে আমি বর্তমানের নিয়মের উপরও জোর দিচ্ছি, তাদের দাড়ি কাটা প্রয়োজন— এমন কাজ যাতে কোনো প্রকৃত শিখ সায় দিবে না; অথবা কিছু সময়ের জন্য প্রয়োজন দেখে করতে পারে, এটা অবিশ্বাস্য যে তারা গভীর দুঃখ ছাড়া এটা করতে পারে...কোনো প্রকৃত শিখ এটা করতে পারবে না— এবং এই নিয়মনীতি জোরপূর্বক করাতে যে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন, তা দ্রুত বাকি শিখদের কাছে পৌছে যাবে, যা সতর্কজনক অথবা বেশি উত্তেজনাকর যা হ্রাস করতে হবে। এই ব্যাপারে, বাকিগুলো এক্ষুনি গুছিয়ে নেয়া উচিত।’ এসসি ৩৯, ২৮-২-১৮৫১।

৪০. এসসি ৪৪, ২৮-২-১৮৫১।

৪১. বাইর্ড, প্রাইভেট লেটারস অফ দ্য মারকুইস অফ ডালহৌসী, পৃ-২০০-১।

৪২. ইবিদ, পৃ-৩২১।

৪৩. মাজহাবিদের প্রবেশনের কৃতিত্বের অধিকারী হলেন বিচার বিভাগীয় কমিশনার রবার্ট মন্টগোমেরি। ম্যাকমান, দ্য হিস্টি অফ দ্য শিখ পায়োনায়ারস, পৃ-২০-২।

মীরাটের মধ্যের রাস্তা উন্মুক্ত রাখার জন্য। হডসন তার প্রথম ১০০ জন শিখকে জিন্দের রাজা থেকে ধার নেয়। তারপর তিনি তিনটি রিসালাহ'স (অশ্বারোহী) তৈরি করেন পুরনো দরবার সেনার বাতিলকৃত ঘোড়কারাহ্ থেকে। এ থেকেই হডসনের ঘোড়ার বিখ্যাত হওয়ার উৎপত্তি।^{৪৪} অন্যান্য ইংরেজ কর্মকর্তা তাদের নিজস্ব অনিয়মিত দল তৈরি করে। শিখ দলের সাথে ব্রাসেয়ের, রথনী ও রাট্টারী নামগুলো জড়িয়ে পড়ে।

এসব ঘটনার পর্যালোচনায় দেখা যায়, ব্রিটিশ সেনাকর্মকর্তারা পাটিয়ালা, জিন্দ,^{৪৫} ও নাভার রাজার সাথে পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্তে আসেন 'কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়...এবং যতদূর সম্ভব আমাদের নিজস্ব সেনাকে গোষ্ঠীগুলোর সাথে বাস্তবযোগ্যভাবে মিশতে হবে।'^{৪৬} শিখদের অনেক প্রশংসা করা হয় বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকার জন্য।^{৪৭}

১৮৫৮ সালে জেনারেল পিলের অধীনে একজন কমিশনারকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে নতুন করে সাজানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। এটা প্রস্তাব করে যে, স্থানীয় ও ইংরেজ দলের অনুপাত অবশ্যই দুইয়ের সাথে এক হতে হবে এবং কোনো স্থানীয়কে গোলন্দাজবাহিনীতে নেয়া হবে না। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এর প্রভাব সোজাভাবে দেখা যায়। দুই বছরের মধ্যে স্থানীয় সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে ১৪০,৫০০ (৭৫,৩০০ ইউরোপীয়) এবং ১৮৬৯-৭০ আর্গেন্টাদ আরও কমিয়ে ১২২,০০০ (৬২,০০০ ইউরোপীয়)-তে আনা হয়। স্থানীয় সৈন্যদের নীতিশাস্ত্রে পরিবর্তন করে গঠনকে স্থায়ীরূপ দেন লর্ড রবার্টস (কমান্ডার-ইন-চিফ, ১৮৮৫-৯৩)। কিছু গোষ্ঠী— শিখ, গুরুখা, ডোগরা, রাজপুট এবং পাঞ্জাবি মুসলমানদের মার্শাল বলে চিহ্নিত করা হলো; অন্যরা পুরাবিয়া, যারা ভারতে ইংরেজদের যুদ্ধের বেশিরভাগে জয়ী হয়েছিল, তাদেরকে 'মার্শাল নয়', এবং মিলিটারি কাজে অযোগ্য বলে ঘোষণা দেয়া হয়। মার্শাল গোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজ অফিসারের প্রিয় দল ছিল শিখ ও গুরুখাগণ।

৪৪. তাদের লাল পাগড়ি ও খাকি পোশাকের উপর কোমরবন্ধের জন্য হডসনের ঘোড়াবাহিনী 'দ্য ফ্রেমিংগো' হিসেবে পরিচিত ছিল।

৪৫. পাঞ্জাবিদের অনুপাত পুরো স্থানীয় সেনাতে এক-তৃতীয়াংশের বেশি রাখার বিরুদ্ধে পাটিয়ালা পরামর্শ দেন; জিন্দও বলে যে- 'এই গোষ্ঠী (শিখ) পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়।' এসসি ও এবং ওও, ২৯-১০-১৮৫৮।

৪৬. এসসি ও, ২৯-১০-১৮৫৮।

৪৭. 'শিখরা খুব কঠিন সময়ে জড়িত হয়েছে যখন অন্যান্য প্রবেশনের পথ ছিল বিদ্রোহীদের হাতে অথবা বিদ্রোহের রাজ্যে। তাদেরকে ডাকা হয় রাজ্য রক্ষা ও তাদের লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য, এবং আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে শক্ত ও বিচক্ষণ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে যাতে তারা মাঠে নামে এবং আমি নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে তাদের নির্দেশমতো চলার ব্যবস্থা নেয়া হবে।' এসসি ২, ২৯-১০-১৮৫৮।

প্রশাসনিক পরিবর্তন- ভারত ও পাঞ্জাবে

বিদ্রোহের পরে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডায়রেক্টর বিলোপ করা হয় এবং এর ক্ষমতা সংসদে হস্তান্তর করা হয়। সংসদ রাষ্ট্রের সেক্রেটারি নিয়োগ করে এবং তাকে বিশ্বাস করে এবং ভারত প্রশাসনসহ গভর্নর জেনারেল নিয়োগ দেয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন ছিল পাঞ্জাবকে যত দূর সম্ভব হরিয়ানা ও দিল্লি প্রদেশের সাথে যুক্ত করা। নতুন জেলার অধিবাসীরা না-পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলে আর না-পাঞ্জাবি মতাদর্শে চলে। তাদের আর্থনৈতিক অবস্থার মতোই তাদের জীবনযাপন ও মূল্যবোধ পাঞ্জাবিদের থেকে আলাদা ছিল। বেশিরভাগ হরিয়ানার মলিন খাদ্য ঘাটতি ছিল এবং দিল্লি ছিল বাণিজ্যিক শহর যার সাথে পূর্বের পাঞ্জাবের কিছুটা মিল আছে। এইসব অধিবাসীরা নিজস্ব সরকারের সমস্যার সৃষ্টি করে।

পাঞ্জাবের প্রশাসনিক প্রধানের পদবির উন্নতি হয়ে চিফ কমিশনার থেকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর হয়। জন লরেন্স এই পদে একমাস ছিলেন। তিনি রবার্ট মন্টগোমেরি কর্তৃক সফল হয়েছিলেন।

১৮৬১ সালের ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট মতে, গভর্নর জেনারেলের সভাতে ভারতীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। বিদ্রোহের সময় শিখদের কর্মকাণ্ড পাটিয়ালার রাজা কর্তৃক মনোনয়ন পেয়ে এই সভায় আসে।

ড্রেসক্যাট ই ফ্লুয়িস^১

বিদ্রোহের পর, সরকার মরুভূমির কাজ, দেশে রাস্তা ও রেলপথের কাজ আবার শুরু করার দাবি করে। হাসলি খাল বর্ধিত করা হয়। রভিকে জায়গা থেকে নিয়ে ভূমিতে প্রবেশ করানো হয়, এবং একটি খাল খনন করা হয় যা অমৃতসর জেলা ও লাহোর জেলা হয়ে এসে মুলতানে ফিরে আসে। এটা করা হয় ১৮৬১ সালে এবং বড়বাড়ি দোআব খাল হিসেবে পরিচিতি পায়।

দশ বছর পরে যমুনার পানিও একইভাবে খাল তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমের যমুনা খাল দক্ষিণের জেলাগুলোতে আম্বালা, কর্ণাল, হিসার এবং রোহটাকে পানি সরবরাহ করে।

১৮৮৬-৮-তে মুলতানকে ঘিরে যে মরুভূমি আছে তা থেকে পানি তোলার জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়। সুতলেজ থেকে পানি নেয়া হয়, এবং ১৭৭,০০০ একর খালি জমিকে চাষাবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরীক্ষা সফল হয়নি। যেহেতু খালগুলো ক্রমাগত পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। মুলতানে যে ভুল হয়েছিল তা প্রকৌশলী এবং আহ্বায়কদের জন্য সুবিধা হয়েছিল যখন চার বছর পর (১৮৯২) চেনাবের পানি দিয়ে দশ লাখ একরেরও বেশি জমি চাষ করা হয়।^২

চেনাব কলোনীর সাফল্যের পাশাপাশি সম্ভ্রমভাবে শাহপুর খাল মরুভূমিতে (১৮৯২ ও ১৮৯৭-তে) ঝেলামের পানি দিয়ে চাষে সাফল্য এসেছিল। এই চাষাবাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহসিকতার ব্যাপার ছিল ট্রিপল প্রজেক্টে, যা ১৯০৫-এ শুরু হয় এবং বারো বছর পর পূর্ণ হয়। এই প্রকল্পটি মূলত মন্টগোমেরিতে (জেলাটির নাম স্যার রবার্টের নামানুসারে রাখা হয়েছে) পানি সরবরাহের জন্য নকশা করা হয়েছিল। যখন থেকে রভি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তা বড়বাড়ি দোআব খাল দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং কোনো অতিরিক্ত পানি থাকে না, পরিকল্পনাটি ছিল ঝেলাম ও চেনাবের পানি দিয়ে রভির খাদ্যের যোগান

১. পাঞ্জাবের লক্ষ্য ছিল 'পানি থেকে শক্তি আহরণ।'

২. ১৯২২ সালে নিম্ন চেনাব খাল ২.৫ মিলিয়ন একরের জমিতে সেচ দেয়। এম. ডার্লিং, দ্য পাঞ্জাব পিসেন্ট ইন প্রসপারিটি অ্যান্ড ভেবট, পৃ-১৫০।

এবং পরে মন্টগোমেরির জন্য নিঃসরণ করা। উর্ধ্ব খেলায় খালে খেলার পানি আসে এবং চাজ দোআবের ৩৫০,০০০ একর সেচ করার পর চেনাবে যেয়ে মিলিত হয়। তারপর উর্ধ্ব চেনাব খাল চেনাব হতে বের হয় এবং রেচনা দোআবের ৬৫০,০০০ একর সেচ করার পর গুজরানওয়ালা ও শিখপুরা জেলাতে রভির সাথে মিলিত হয়, যেখানে ৫৫০ ইয়ার্ড খালি জায়গা সম্বলিত লেভেল ক্রসিং থাকে যা পানিকে অপর পাশে অতিক্রম করতে সহায়তা করে। ট্রিপল প্রজেক্টের তিন নম্বর হলো নিম্নবাড়ি দোআব, তারপর উৎসারিত হয়ে ১৩৪ মাইল পর্যন্ত মন্টগোমেরি দিয়ে মূলতানে যায় এবং রভিতে ফেরত যায়।^৩

এসব খাল খননের সাথে বিশালাকারে মরুভূমির জন্য পুনর্বাসন করা হয়। তখন পর্যন্ত দোআবে ‘সীমাহীন দুর্দশা’ ছিল...মাইলের পর মাইল জুড়ে শুষ্ক এবং পরিত্যক্ত আবর্জনা, যাতে ঝোঁপঝাড় ও মরা গাছপালা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। কিন্তু জীবনের কোনো চিহ্নই ছিল না।^৪

এসব মেসোপটেমীয় অধিবাসীদের বেশিরভাগই ছিল—গৃহপালিত পশুচোর—যারা গ্রামে থাকতে বাধ্য হয় এবং তাদের শক্তিকে আইনত সৎ পেশায় উৎসাহিত করা হয়।

শিখদের জন্য মূলত যে রাস্তা নির্বাচন করা হয়েছে তা নিলিবার নামে পরিচিত, যা চেনাব খাল দিয়ে সেচ দেয়া হয়।^৫ আহ্বায়ক কর্মকর্তারা অমৃতসর, লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুর জেলায় শিখ গ্রাম স্থাপন করেন উত্তম কৃষকদের দিয়ে আসার জন্য। জমায়তকারীদের তিনভাগে ভাগ করা হয়েছিল। নিচে ছিল সাধারণ কৃষকেরা, যাদেরকে ১৪ থেকে ১৬ একরের জমি মূল্যহীনভাবে দিয়ে দেয়া হয়। এরপর ছিল ইয়োমেন, যাদের কাছ থেকে ১১১ থেকে ১৩৯ একর জমি নজরানা হিসেবে ৬ থেকে ৯ টাকা প্রতি একরে নেয়া হয়েছিল। আবার উপরে ছিল ‘পুঁজিবাদীরা’ যাদের ১৬৭ থেকে ৫৫৬ একর ছিল যারা একর প্রতি ১০ থেকে ২০ টাকা দিত। ধারণক্ষমতাসম্পন্ন মানুষকে ‘উত্তরাধিকার এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ সূত্রে চাকরির অধিকার দেয়া হয়েছিল।’

শিখবাহিনীর বেশিরভাগ ছিল মালওয়া জাত যাদের সাথে নতুন অজাতের কৃষিবিদ উপজাতীয়—কাম্বোহ, লাবাণা ও মাজহাবিগন ছিল।

৩. স্যার জন বেনটন ট্রিপল প্রজেক্টের পরিকল্পনা করেন।

৪. স্যার. জে. ডোয়ি কাগজ তৈরি করেন, ৭ মে ১৯১৪, *রয়েল সোসাইটি অফ আর্টস, লন্ডন*। তখনকার প্রচলিত খবর ছিল যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ও তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অনেকগুলোর মধ্যে মাত্র একটি বার পরিদর্শন করেন এবং সন্দিহান হন যে, কৃষকরা অনুর্বর জমি দাবি করতে পারে এমনকি খালও। তারা একজন বৃদ্ধ পাঞ্জাবির সাথে পরামর্শ করেন যিনি উত্তর দেন যে : ‘জনাব, আমি এখানে কোনো মাছি দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যদি এখানে কোনো চিনি রাখা হয়, তখন আপনি দ্রুত মাছি দেখতে পাবেন এবং যদি আপনারা জমিতে পানি ঢালেন তাহলে আপনার চাষীদের অভাব হবে না।’

৫. চেনাব থেকে ৪২৭ মাইলের খাল, ২২৮০ মাইলের পরিবহনকারী পথ এবং ১২,০০০ মাইলের পানির উৎস নেয়া হয়। এগুলো ২.৫ মিলিয়ন একরের জমি চাষাবাদে ব্যবহৃত হয়। মোট খরচ হয়েছিল ২৬ মিলিয়ন রুপি। মোট মূলধনের ৩৪ শতাংশ রাজস্ব আদায় হয়েছিল। চাষকৃত শস্যের বার্ষিক মূল্য ৭,৮০০,০০,০০০ রুপি, যা খালের খরচের তিনগুণ।

বাহিনীগুলো ভীষণ উদ্যমের সাথে কাজ শুরু করে। যা একসময় শুধু মাটি ছিল তা কয়েক বছরের মাঝে শস্য-শ্যামলা দেশে ও গ্রামে পরিণত হয়।^৬ ‘ভাগ্য’ স্থাপনের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হয় (ঘোড়া ও খচ্চরের আস্তাবল সেনাদের জন্য) এবং পরে গৃহপালিত পশুর প্রজনন নির্ধারণ।

নতুন জমির ফসল প্রদেশের দরকারের চেয়েও অনেক বেশি ছিল, এবং প্রথম ফসল গুদামঘরে পচে যায়। রেলপথ ও সড়ক নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত হয়। ১৮৬১ সালে লাহোর ও অমৃতসরকে যুক্ত করে নতুন রেলের সূচনা হয়। পরবর্তী ত্রিশ বছরে অনেকগুলো রেলপথ খালের ভাগগুলোর সাথে ভারতের শহরের সংযোগ তৈরি করা হয়। গম, তুলা,^৭ এবং তৈলবীজ পাঞ্জাব থেকে নিয়ে রেলপথে বোম্বে ও করাচিতে রপ্তানি করা হয়। শুধু গমই বছরে দশ লাখেরও বেশি রপ্তানি করা হয়। জমির দাম, যা এক সময় শুধু প্রতি একর ১০ টাকা ছিল, বেড়ে যেয়ে প্রতি একরে ৪০০ টাকা হয়।^৮ পাঞ্জাবিরা ভারতের সবচেয়ে উন্নতশীল কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়; পাঞ্জাবিদের মধ্যে শিখদের উন্নতিই সবার চেয়ে বেশি ছিল। এই উন্নতি আরও বৃদ্ধি পেল খালের দলের উন্নতির সাথে ও সেনাতে শিখদের প্রবেশের^৯ প্রাধান্য ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ও গোষ্ঠীতে বর্ণবৈষম্যের সৃষ্টি করে। শিখদের^{১০} অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য শিখত্ব ভেঙে হিন্দুত্বে পরিণত হয়। অপরদিকে, ১৯ শতকের শেষ দশকে এবং ২০ শতকের প্রথম দশকে, শিখদের সংখ্যা^{১১} অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়।^{১২} এটা হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকারের উদারতায়^{১৩} জন্য, যাতে সেনাদলে শিখদের জন্য নির্দিষ্ট পদ রক্ষিত ছিল (এবং পরে বেসামরিক ক্ষেত্রে) যা মূলত বেশধারী খালসা দিয়ে ভর্তি ছিল। এই উদারতা^{১৪} আন্দোলনের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করে, সিং সভা^{১৫} (অধ্যায় ৯-এ আলোচিত হয়েছে)। এভাবেই দুঃখজনক ঘটনার সাথে শিখদের কমে আসা, তা লর্ড ডালহৌসী আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন

৬. অর্থনৈতিক কমিশনারের প্রতিবেদন মতে ‘চাষাবাদ এখন অনেক যত্নের সাথে করা হয়; আরামদায়ক এবং আনুষঙ্গিক ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়েছে; সব গ্রামে ভালো কুয়া আছে, অনেক গ্রামেই মসজিদ বা ধর্মশালা আছে এবং একটি বিশ্রামঘর আছে; ছায়া প্রদানকারী গাছের বর্ধন ভালো, গ্রামে ও মাঠে উভয় ক্ষেত্রেই। বেশিরভাগ গ্রামে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং এজন্য গ্রামবাসীরা গর্ব করে এবং তাদের ইট এবং সিমেন্টের বাড়ি নিয়েও। ১০০,০০০ জন সমন্বয়কারীর মাঝে অবশ্যই ব্যতিক্রম ছিল, কিন্তু সাধারণ মত ছিল একটি বৃহৎ উন্নতি, আরাম ও শান্তি, যা থেকে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা আসে এই অভাবনীয় লাভের সমন্বয়ের জন্য এসব সৌভাগ্যবান মানুষের জন্য পনেরো বছরের কম জায়গা অনুপস্থিত থাকবে।’ *সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট*, ২৬ মে ১৯০৯।

৭. পাঞ্জাবে তুলার কারখানা তৈরির সর্বপ্রথম চেষ্টা নেয়া হয় ১৮৮০-এর মার্চে, যখন লাহোরের জনতা এই ব্যাপারে চেয়ারম্যান রাজা হারবাস সিং-এর সাথে দেখা করেন। *ট্রিবিউন*, ১৮ মার্চ ১৮৮৩।

৮. এইচ, কালভার্ট, *দ্য ওয়েলথ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পাঞ্জাব*, পৃ-২১৯।

৯. পৃষ্ঠা-১৪৬-এ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

১০. পৃষ্ঠা-৯৬ দেখুন।

বলে তিনি তা রোধ করতে যে কৌশল খাটান এবং তাকে সাহায্য করে সেনা কামান্ডাররা এবং পাঞ্জাবের প্রশাসকরা।

সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে শিখদের অনুপাত তুলনামূলকভাবে তাদের চাহিদা থেকে বেশি ছিল। শতাব্দীর পরিবর্তনের সাথে মোট শক্তি ৪২,৫৬০ নেয়া হয় পাঞ্জাব থেকে, মুসলিম ২০,০৬০ জন; হিন্দু ১১,৬১২ জন এবং ১০,৮৬৭ জন শিখ।^{১১} (এছাড়াও পাঞ্জাবে আলাদাভাবে ৪১২২ জন শিখ সেনাবাহিনীতে ছিল)। অন্যভাবে বলা যায়, শিখরা, যারা পাঞ্জাবের জনসংখ্যার ১২ শতাংশের কিছু বেশি, তারা সৈন্যবাহিনীর ২৫ শতাংশে ছিল। শিখ সেনাদের মধ্যে, বেশি ছিল জাটগণ (৬৬৬৬ জন ছিল সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীতে; ১৮৪৫ ছিল স্থানীয় সেনাতে)। এরপরে ছিল মাজহাবিরা ১৬২৬ জন। জাটকে প্রাধান্যের জন্য তারা শিখদের মধ্যে উচ্চবর্ণের ছিল। শিখ জাটদের এই উর্ধ্ব দিকে গমন (শূদ্র বলা হয়ে থাকে, হিন্দুদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নবর্ণ) শুরু হয় গুরু গোবিন্দ সিং-এর আমলে, যখন বেশিরভাগদের জাট নামকরণ করা হয়। নামকৃত কেশাধারী জাটরা ছিল শিখদের অস্ত্র যা মহারাজা রনজিত সিং-এর শাসনামলে ক্ষমতা ও পাশাপাশি জমিদারি আভিজাত্যে সাহায্য করে। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে, জাটরা তাদের বর্ণশিখদের মধ্যে উচ্চ মনে করে—ব্রাহ্মণের চেয়ে উপরে, ক্ষত্রিয় (যেখান থেকে গুরুদের উদ্ভব), এবং বেশ্য। মুসলিম অথবা হিন্দু জাট এই মর্যাদা তাদের নিজ নিজ গোষ্ঠীতে স্বীকৃতি করতে পারেনি। একইরকম উর্ধ্ব গমনের সাক্ষ্য দেয় মাজহাবি ও বংশোদ্ভূত শিখরা এবং একই কারণে, অর্থাৎ, সেনাতে প্রবেশের অধিকার এবং জমির দখল।^{১২}

ঐতিহ্যবাদ দিয়ে, এসব বর্ণের মানহানির অঙ্গ কারণ ছিল, ঝাড়ুদার (কুড়া) বা পচাগলা মাংসের কারবারী (কামার)। কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগের সাথে এসব বর্ণের অনেকেই তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত চাকরি ছেড়ে দেয়—সৈন্য বা কৃষক হওয়ার জন্য এবং অন্যান্য সৈন্য ও কৃষকদের সমান মর্যাদা পাওয়ার দাবি জানাতে শুরু করে। যদিও তারা তাদের নিম্নবর্ণের অভিশাপ ঘোচাতে সফল হয়নি, তারা অস্পৃশ্য হিন্দু বা মুসলিম থেকে শিখ সমাজে একটি ভালো স্থান জয় করতে সফল হয়েছিল।

১১. পি.এইচ. কাউন, যেনসাস অফ ইন্ডিয়া, ১৯১১, ভল্যুম XIV, পাঞ্জাব, পার্ট II, টেবিল, পৃ-৪৩৮-৯।

১২. শিখদের বর্ণবৈষম্যের সাথে বিশেষ মতামতের বিস্তারিত বর্ণনা জাট ও অস্পৃশ্যদের উর্ধ্ব যাওয়া প্রসঙ্গে দেখুন, ম্যারেনকো, ক্যাস্ট অ্যান্ড ক্লাস অ্যামাং দ্য শিখস অফ নর্থ ওয়েস্ট ইন্ডিয়া।

ତୃତୀୟ ପର୍ବ

সামাজিক এবং ধর্মীয় পুনর্গঠন

উপমহাদেশে আবহাওয়া সবসময় মাসিহা এবং নবীদের জন্য অনুকূল ছিল। প্রত্যেক বছরের জন্য এর মানুষের কোটা আছে যা প্রার্থনা বা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। এমনকি কেউ কেউ ঈশ্বরের মানব প্রতিনিধি বলে দাবি করে।

শিখরা মাসিহা সাথে আলোচনা করে; মাসিহা পদ্ধতি, মূলত শিখদের নিয়ে ছিল। গুরুরা তাদের শিষ্যদের আশ্বাস দিত যে গুরুর দেখানো পথ ছাড়া কেউ পরিত্রাণ লাভ করবে না। পাশাপাশি গোবিন্দ সিং-এর ঘোষণা মতে মনুষ্য গুরুর রেখা শেষ পর্যায়ে এবং শিখদের আদিগ্রন্থ অনুসরণ করা উচিত যা অনেক প্রজন্ম দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল; এবং টাকা দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য সৌ সখীকে জাল করা হয়েছিল।

প্রথম দুই বিষয়ে কয়েকপাতা জুড়ে শিখদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের কথা আলোচনা করা হয়েছিল; কঠিন দারিদ্র্য থেকে সার্বভৌম প্রাচুর্যে তাদের উত্থান এবং তারপর এক আজব গোষ্ঠীতে তাদের সংখ্যা কমে যাওয়া। প্রথম ঘটনায় সম্পদ তৈরি করে ক্ষমতা এবং সম্পদ করে অধর্ম; দ্বিতীয় ঘটনায়, ক্ষমতার কমে যাওয়া সেই পুরনো সময় যা চলে গিয়েছে তাকে নতুন করে সৃষ্টি করার উদ্যম তৈরি করে। নিরঙ্কারী এবং নামধারীরা এসব ব্যাপার উদাহরণের মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন।

রাধা স্বামী ছিলেন একটি অখ্যাত দলে যার জন্য হয়েছে হিন্দুত্বের উপর শিখত্বের প্রভাব দ্বারা (খালসা ঐতিহ্য বাদে)। এটা হিন্দুধর্ম ও শিখধর্মের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে—যা উভয় গোষ্ঠীর শিক্ষিত জনতার মধ্যে মুদ্রা অর্জন করে।

উপরোক্ত উল্লেখিত তিন বিষয়ের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ধর্মসহ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন যা সিং সভার নামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, গোঁড়া ঐতিহ্যমতে এটা সত্যি ছিল যে ‘কোনো গুরু নেই গ্রন্থ বাঁচাও’; সামাজিক ক্ষেত্রে, এটাকে আধুনিক পরবর্তী অবস্থায় শিখদের মানিয়ে নেয়া। এই জয়ে শিখদের কর্তৃত্বের মর্যাদা থেকে নামিয়ে দেয় শুধু ব্রিটিশদের কাছেই নয়, বরং মুসলিম ও হিন্দুদের কাছেও, যারা সংখ্যায় তাদের চেয়ে বেশি ছিল। সংখ্যাগত কারণে হীনমন্যতা যে ঘটনায় বৃদ্ধি পায় তা হলো, যখন রাজ্য জয়ের কারণে পাঞ্জাব মুসলিম ও হিন্দুরা সরাসরি আলোকিত সহধর্মীদের সংস্পর্শে আসে, শিখরা শুধুমাত্র তাদের মালওয়াই ভ্রাতৃবর্গের সাথে মিলিত হয়, যারা তাদের চেয়েও কম জ্ঞানের অধিকারী ছিল। শাসকের কথা শোনা ছাড়া শিখদের আর কোন উপায় ছিল না। সিং সভার অধীনে, শিখরা ছিনিয়ে নেয় এবং জয়ী হয় ইংরেজ কর্মকর্তাদের সাথে তাদের শিক্ষার দৌড়ের ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় কাজ ছিল তাদের পরিচয় রক্ষা করা। জয়ের কারণে উদ্যমহীন ও নেতাহীন শিখের দল খ্রিস্টান মিশনারীতে যাওয়া শুরু করে এবং হিন্দু আর্য্য সমাজবাদীদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। সিং সভা এর মোকাবিলা করে শিখদের ধর্ম ও ঐতিহ্য রক্ষা করে।

ধর্মীয় কার্যকলাপ

নিরাকারীগণ

মহারাজা রণজিত সিং-এর শাসনামলে, পশ্চিম পাঞ্জাব ও ডেরাজাতের হিন্দুরা শিখধর্মের প্রভাবিত হয়। কিছু লোক পাছল গ্রহণ করে এবং খালসা ভাইদের দলে যোগ দেয়; বাকিরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় কিন্তু হিন্দু দেবতার প্রতি তাদের বিশ্বাস উঠে যায় এবং বেদ মুখস্ত করা ছেড়ে দেয়, গ্রন্থ পড়ার বদলে এবং গুরুওয়ারাতে শিখদের দলে যোগ দেয়। এসব হিন্দুদের মধ্যে অন্তত একটি পুত্রকে কেশাধারী শিখ হিসেবে গড়ে তোলার প্রথা চালু হয়েছিল। এই অর্ধ হিন্দু, অর্ধ শিখ গোষ্ঠী ছিল ক্ষত্রীয়, আরোরা অথবা বানিয়া বর্ণের। তারা নিজেদের বর্ণের মধ্যে বিয়ে করা বজায় রাখে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও।

দয়াল দাস (মৃত্যু সাল ১৮৫৫), যিনি পেশোয়ারের সোলাংগপার বণিক, এই হিন্দু মূলত শিখ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দেবমূর্তি পূজার বিরোধিতা করতেন এবং পবিত্র মানুষের দীক্ষা দিতেন; তিনি ভীষণভাবে গমন এবং ব্রাহ্মণীয় রীতি পালনে অমত পোষণ করেন। তার শিক্ষকতার ভাল দিক ছিল যে ঈশ্বরের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি নেই— নিরাকার (এভাবে তিনি দেবমূর্তি পূজা নিরর্থক বলেন); পাশাপাশি তিনি নিজেকে নিরাকার বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি নিচের বাণীটি তৈরি করেন :

ধন নিরাকার

দেহ ধারী সব খাওয়ার

প্রশংসা নিরাকার সৃষ্টিকর্তার জন্য;

মরণশীলদের পূজা কোন কাজে লাগে না।

দয়াল দাস দ্রুত গুরু উপাধি অর্জন করেন এবং তার সাগরেদ একত্রিত করেন যারা তারই মতো নিজেদের নিরাকার বলে ব্যাখ্যা করে। তারা প্রথমে হিন্দু ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যায় এবং দয়াল দাস পেশোয়ার থেকে রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পরে, গুরু

নানকের বেদীর অনুসারীদের, যারা জেলাতে বড় অনুসারী ছিল। হিন্দু ও শিখ উভয় কর্তৃক নিরাকারীদের প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের নিজস্ব প্রার্থণাগার তৈরি করতে হয়। সবচেয়ে বড়টা ছিল রাওয়ালপিন্ডি থেকে চার মাইল দূরে লাই নদীর তীরে। যখন দয়াল দাস মারা যান, তার জুতাজোড়া পূজার বস্তুতে পরিণত হয়। এগুলোকে গ্রন্থের পাশে রাখা হয় এবং লায়ী মন্দিরের নামকরণ তার নামে (দয়ালসার) রাখা হয়। নিরাকারী দলের জন্য এটা হেডকোয়ার্টারে পরিণত হয়। দয়াল দাস তার তিন ছেলের মধ্যে বড়টিকে দিয়ে সাফল্য পান, দরবারা সিং। দরবারা সিং নিরাকারীদের জন্য নতুন কেন্দ্র (বীরা) তৈরি করেন এবং লিখিত কাগজে তার অনুসারীদের নির্দেশনা দেয়া (ছকুমনামা) শুরু করেন। তার প্রধান উদ্যোগ ছিল আদর্শ রীতি তৈরি যা জন্ম, বিয়ে,^১ এবং মৃত্যু সম্পর্কিত ছিল। এসব রীতি হিন্দু সংস্কার থেকে এত আলাদা ছিল যে এগুলো গ্রন্থকে কেন্দ্র করে হয়েছে এবং হিন্দুদের পবিত্র পঠিত বই মতে নয়। দরবারা সিং (মৃত্যু সাল ১৮৭০) তার ছোট ভাই রতন চাঁদ (মৃত্যু-১৯০৯) দ্বারা সফলতা অর্জন করেছিলেন এবং রতন চাঁদ তার ছেলে সুরজিত সিং (মৃত্যু ১৯৪৭ দ্বারা) নিরাকারীদের বর্তমান প্রধান হলো গুরদিত সিং-এর ছেলে, হারা সিংহ।

বিভিন্ন বিভাগের অনেকগুলো সংখ্যা হিসাব করা হলো।^২ নিরাকারীরা নিজেদের প্রায় ১০০,০০০ জনের মাঝে মূলত অ-জাট শিখ ও অসুরি জারগার হিন্দুদের (স্বর্ণকার) এবং ক্ষত্রীয় বর্ণের অনুসারী বলে দাবি করে।^৩ ১৯৪৭ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রদেশ ও কাশ্মীরে শিখ ও হিন্দু গোষ্ঠীর কাছে তাদের প্রভাব পৌছাতে পারেনি। ভারত বিভাগের পরে, দয়ালসার একই হয়ে যান, এবং কেন্দ্রটি প্রথমে অমৃতসরে এবং তারপর পূর্ব পাঞ্জাবের নতুন রাজধানী চন্ডিগড়ে সরানো হয়।

গোঁড়া শিখ ও নিরাকারীদের মধ্যে পার্থক্য ছিল পরেরটা শুধু গুরুদের প্রার্থনা ও শিখরা আরও দশজনের পূজা করতো। নিরাকারীদের আদর্শ ছিলেন দয়ালদাস এবং তার সাফল্যের লোকেরা যাদেরকে সম্মানিত করা হয়েছে যেমন শ্রী সাতগুরু (প্রকৃতগুরু) এবং শ্রী হাজুর সাহিব (তার পবিত্র মর্যাদা), তারা যুদ্ধ প্রিয় খালসাদের সমর্থন করে না।^৪ নিরাকারীরা দ্রুত তাদের আলাদা পরিচয় হারাতে শুরু করে এবং

১. নিরাকারীরা দাবি করে তারাই সর্বপ্রথম আনন্দ বিবাহের প্রচলন করে যা গ্রন্থমতে ছিল। আনন্দবিবাহ আইন বৈধকরণের সাথে পাস হয় ১৯০৯ সালে।
২. ১৮৯১ সালের আদম শুমারি মতে, নিরাকারীদের সংখ্যা ছিল ৫০,৭২৪, যার মধ্যে ১১,৮১৭ জন শিখ ও ৩৮,৯০৭ জন হিন্দু। ক্যান্টেন এ.এইচ. বিংলে তার হ্যান্ডবুক ফর দ্য ইন্ডিয়ান আর্মিতে মোট নিরাকারীর সংখ্যা ৩৮,০০০ বলে উল্লেখ করেন।
৩. তথ্য দেন নিরাকারী গুরুর পুত্র ডঃ মান সিংহ।
৪. চারজনের মধ্যে দুইজন নিরাকারী গুরু খালসাদের মতো নামকরণ করেনি, এবং নিরাকারীরা 'নিরাকার' শব্দটি ব্যবহার করে 'শ্রী ভগবতী' (তরবারি)র বদলে যা তারা প্রার্থনার শেষ দিকে আবৃত্তি

সম্ভবত, কয়েক দশকের মধ্যে মূল হিন্দু বা শিখ গোষ্ঠীতে ফেরত যাবে। এই গমনের বিশাল গুরুত্ব ছিল যে এটা শুরু হয় প্রথাগত দ্বন্দ্ব নিয়ে যা শিখদের মধ্যে আলাদা থাকার ধারণা তৈরি করে এবং এভাবে হিন্দুত্বে তাদের গমন পদ্ধতি পরীক্ষা করে নেয়।

বিসের রাধা স্বামীগণ

রাধা-স্বামী ভাগের নির্মাতা ছিলেন একজন আত্মার হিন্দু ব্যাংকার, আদি গ্রন্থের শিক্ষা দ্বারা শিব দয়াল (১৮১৮-৭৮) খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তিনি হিন্দুত্ব ও শিখ ধর্ম উভয়ের উপরেই ডক্টরেট ডিগ্রী নেন। তিনি ভগবান রাধা (আত্মার প্রতীক) এবং স্বামীর (কর্তা) মিলিত রূপ বলে উল্লেখ করেন; এবং এভাবেই রাধা স্বামীর পূজা শুরু। শিব দয়াল হিন্দু ও শিখ অনুসারীদের আকৃষ্ট করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম গুরু হন। তার মৃত্যুতে, রাধা স্বামী দুইভাগে বিভক্ত হয় মূল কেন্দ্র ছিল আত্মাতে;^৫ একটি শাখা একজন শিখ শিষ্য জয়মাল সিং^৬ (১৮৩৯-১৯১৩), কর্তৃক বিস নদীর তীরে শুরু হয়, যা অমৃতসর থেকে বেশি দূরে নয়।

করে কারণ, নিরাকারীরা বলে হিন্দুদেবীর আরেক নাম হল ভগবতী। গোড়া শিখদের চেয়ে আরেকটি বিষয়ে তাদের পার্থক্য হল সম্ভাষণে যা ধন নিরাকার যেখানে গোড়াদের সাথে শ্রী আকাল।

৫. শিব দয়ালের বিশ্বাস তার বই সার বাকনে (প্রয়োজনীয় কথা) প্রকাশিত হল এবং সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হল :

মানব সম্প্রদায়, যারা ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি, তারা দুধে ডুবে থাকে কারণ তারা যে নৈপুণ্য দেখাতে সক্ষম তারা তা দেখাতে অসমর্থ হল। এসব সূপতা শুধুমাত্র গুরুর অভিভাবকত্ব দিয়ে হয় যারা দীক্ষা দেয়—একটি গোপন তথ্য—যাতে শারীরিক ও মানসিক শৃঙ্খলতা সমাধি (ধ্যান করা)-র মাধ্যমে অর্জন করা যায় বলে বলা আছে। মানবদেহ দুই ভাগে বিভক্ত উচ্চ তথা চোখেরও উপরে তা আত্মার স্থান; আর নিচে যা চোখের নিচে তা মনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বার বার গুরুর মূর্তি দু'চোখের মাঝে (শিবনেত্র) তৈরির মাধ্যমে ভগবানের উপলব্ধি করা যায় এবং বার বার শব্দ (শব্দটি) বা নাম (ভগবানের নাম) নেয়ার মাধ্যমে। এই পদ্ধতিকে সুরাত শব্দ যোগ বলে বা আত্মার সাথে (সুরাত) শব্দ প্রবাহের (শব্দে) (যোগসূত্র যোগ) স্থাপন করে। বিশ্বাসী লোকের সঙ্গ (সংসঙ্গ) প্রয়োজনীয়। (এই প্রতিষ্ঠানটি রাধা স্বামী সংসঙ্গ হিসেবে পরিচিত।)

৬. শিব দয়াল ১৮৭৪-এ মারা যান এবং আত্মাতে রায় সালিগ্রাম সাহেব বাহাদুর (১৮২৮-৯৮) কর্তৃক সফলতা অর্জন করেন। রায় সালিগ্রাম ছিল দুটি কবিতাসংগ্রহ, যা প্রেমবাণী ও প্রেমপত্র নামে বেশি পরিচিত তার ধর্মীয় সংস্করণ। তিনি ইংরেজিতে আরও লেখেন—‘এন এক্স পজিশন অফ দ্য রাধা স্বামী ডক্ট্রাইন।’

আত্মা রাধা স্বামীর তৃতীয় গুরু ছিলেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্ম শঙ্কর মিশরা (১৮৬১-১৯০৭)। মিশরার পরে আত্মা রাধা স্বামীটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে তাদের দয়ালবাগ শহরতলীতে প্রচুর কারখানা সম্পদ আছে। আত্মা কেন্দ্রটি ধর্মীয় ব্যাপারের চেয়ে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পায়।

৭. জইমাল সিং ছিলেন ঘুমান গ্রামের (গুরদাসপুর জেলার) একজন শিখজাট। তিনি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন সৈন্য ছিলেন এবং যখন আত্মাতে ছিলেন তখন শিব দয়ালের সাথে দেখা

বিসের রাধা স্বামীরা দ্রুত আত্মা কেন্দ্রের মতো স্বনির্ভর হয় এবং গুরুদের উত্তরাধিকার পায়-সবাই শিখ। জয়মাল সিং-এর মৃত্যুতে, তার একজন শিষ্য, প্রকৌশলী সাওয়ান সিং গ্রেওয়াল, পাঞ্জাব রাধা স্বামীর প্রধান হয়েছিলেন। সাওয়াল সিং বিসের কেন্দ্রকে বড় করেন এবং ডেরা বাবা জয়মাল সিং নাম রাখেন। সাওয়ান সিং-এর সময়, বিসের রাধা স্বামীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিখদের পাশাপাশি, যারা অল্প সংখ্যায় ছিল, তারা হলো হিন্দু, মুসলিম, পার্সী এবং খ্রিস্টানরা। সাওয়ান সিং-এর (মৃত্যু ১৯৪৮) সফলতা ধরে রাখেন জগৎ সিংহ, একজন কৃষি বিজ্ঞানের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিন বছরের স্বল্প সময় পর, জগৎ সিং (মৃত্যু-১৯৫১) চরণ সিং গ্রেওয়ালকে (সাওয়ান সিং-এর পৌত্র) তার উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেন। চরণ সিং-এর নেতৃত্বের অধীনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত মানুষ সাথে অসামান্য নৈপুণ্যের অধিকারীও ছিলেন—বিস রাধা স্বামীরা গোষ্ঠীতে পর্যাণ্ড অনুপাতে বাড়তে লাগলো: ১০০,০০০ জনেরও বেশি শিষ্য তাদের গুরুদের জন্মদিন পালনের জন্য একত্রিত হয়। তাদের মাঝে দশ লাখ লোক ও মহিলো বিভিন্ন জাতির এবং গোষ্ঠীর ছিল।^৮

গোঁড়া শিখদের সাথে বিসের রাধা স্বামীদের কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিল। তারা জীবন্ত গুরুকে বিশ্বাস করে, যিনি শিষ্য তৈরি শুরু করেন, যারা আরে গুরু ভাই বা গুরু বোনে (ধর্মের ভাই বা বোন) পরিণত হন এবং একে অপরকে ‘রাধা স্বামী’ শব্দদ্বয় দ্বারা সম্ভাষণ জানান। রাধা স্বামী মন্দিরে কোন গ্রন্থসাহিব নেই কিন্তু গুরুদের বসে জ্ঞান বিতরণের জন্য একটি উঁচু বেদী আছে। তারা কীর্তন করে না কারণ তারা বিশ্বাস করে যে, গুরু মানুষের মনকে শব্দের অর্থ বুঝতে না দিয়ে মনকে সরিয়ে দেয় শুধু গুরু শব্দে আনন্দ পাওয়ার জন্য। এবং, যদিও বিসের রাধা স্বামী গুরুরা ও তাদের শিখ শিষ্যরা কেশাধারী ছিল, তারা না পাহুলে বিশ্বাস করতো (ব্যাপ্টিজম) আর না খালসাদের যুদ্ধ প্রিয় ব্রত^৯ বিশ্বাস করতো।

যদিও রাধা স্বামীরা বেশিরভাগ শিখত্ব ছিল— তাদের গুরুরা আদিগ্রন্থ থেকে বেশি বাণী পড়ে শোনাত— তাদেরকে শিখদের একটা বিভাগ বললে ভুল হবে। যে ব্যাখ্যার দরুন তাদেরকে অন্য শিখ ধর্মের মতই চলাচল বলা হবে তা হলো সহজধারীদের সাথে তাদের কাছের সম্পর্ক। সহজধারীরা দশ গুরুর সবারই শিক্ষা গ্রহণ করে এবং ভ্রান্ত ধারণায় থাকে যে নির্দিষ্ট সময় পরে তারা খালসাদের মতো

করেন। কার্যক্ষেত্র থেকে অবসরের পরে, তিনি পাঞ্জাবে ফিরে যান এবং বিসের বামতীরে রাধা স্বামী কেন্দ্র স্থাপন করেন।

৮. সংখ্যা গণনা অসম্ভব ছিল যেহেতু রাধা স্বামীরা একটি আলাদা ও পৃথক ভাগ তৈরি করেননি এবং তাই আদম শুমারিতে তারা তালিকাবদ্ধ হননি।

৯. প্রাথমিকভাবে রাধা স্বামীরা কিছু ব্রতে জড়িয়ে যান, যেমন, কঠোর নিরামিষ ভোজী, মদ্যপান বন্ধ, প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা করে ধ্যান করা।

নাম পাবে। রাধা স্বামীরা শুধু প্রথম পাঁচ গুরুর আদি গ্রন্থের কথা গ্রহণ করে এবং বাকিদেরটা প্রত্যাখ্যান করে। রাধা স্বামীরা সহজধারী শিখত্বের নতুন রূপ প্রকাশ করে। তাদের অনেক আকর্ষণ ছিল ধর্মীয় শিক্ষা প্রাপ্ত বাড়ন্ত শ্রেণীর প্রতি, হিন্দুধর্মের দীক্ষিত শিখের জন্য, এবং শিখ ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুর জন্য।

নামধারী অথবা কুকা চলাচল

নামধারী শাখাটির স্থাপন করেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার হাজরো গ্রামের বালাক সিংহ।^{১০} বালাক সিং জওয়ার মালের^{১১} ধর্মোপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তিনি দারিদ্র্য অতিক্রম করেন এবং ধনী হন নাস্তিক হওয়ার কারণে। বালাক সিং তার অনুসারীদের বলেন, সাধারণ জীবনযাপন করতে এবং ভগবানের নাম (এভাবেই নামধারী) ছাড়া অন্য কোন ধর্মীয় রীতি পালন না করতে।^{১২} বালাক সিং-এর ব্যক্তিত্ব থেকে তার ধর্মোপদেশ তার শিষ্যদের এমনভাবে প্রভাবিত করতো যে তারা তাকে গুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রতিমূর্তি হিসেবে জানত। বালাক সিং-এর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে তার খুব একনিষ্ঠ ভক্ত মিস্ত্রী রাম সিং-কে^{১৩} নির্বাচন করেন। নামধারীদের মূল সদর দপ্তর হাজরো থেকে সরিয়ে রাম সিং-এর লুধিয়ানা জেলার ভৈনী গ্রামে নেয়া হয়। রাম সিং প্রার্থনার কিছু পরিবর্তন করেন, দৃশ্যমান এবং ঠিকানার গঠন পরিবর্তন করেন যা বাকি শিখদের থেকে তার অনুসারীদের আলাদা করে। তার

১০. বালাক সিং (১৭৯৭-১৮৬২) ছিলেন সার্ভালা গ্রামের (জেলা অ্যাটক) একজন স্বর্ণকারের পুত্র যিনি পরে হাজরোতে তার ব্যবসা স্থানান্তর করেন। তারা ছিলেন বাত্রা উপবর্ণের অরোরা।
১১. জওহার মাল যিনি সেন সাহিব হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি হরিপুরের কাছের সারাই সালেহ গ্রামের দয়াল চাঁদের পুত্র ছিলেন। দয়াল চাঁদ যদিও বৈষ্ণব হিন্দু ছিলেন, দৃঢ়ভাবে তিনি শিখ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি গ্রন্থ পড়তে শুরু করেন এবং তার কেন্দ্রে বড় জমায়েত তৈরি করেন। দয়াল চাঁদকে 'ভগত' বলা হতো এবং তার শিষ্যদের যারা কালাল বর্ণের ছিল তাদেরকে 'ভগতগণ' বলা হতো। ১৮৪৭ সালে জওহার মাল স্বর্গীয় প্রার্থনার জন্য একটি কেন্দ্র খোলেন এবং নাম দেন জগীয়াসী অভীয়াসী আশ্রম।
১২. নামধারীর রাতে ৩টায় উঠতো, দাঁত মাজতো এবং গোসল করতো, তাদেরকে সাধারণ ও বাহ্যিকভাবে জীবন যাপনের আদেশ দেয়া হয়েছিল। কন্যা সন্তান ধ্বংসের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল-যৌতুক দেয়া ও নেয়া প্রথাতেও। নামধারীদেরকে তাদের নিজস্ব আয়ে চলতে বলা হয় এবং ভিক্ষার জন্য হাত পাততে নিষেধ করা হয়। তামাক, নসি এবং মদকে নিষিদ্ধ করা হল। নামধারীদের খাদ্যতালিকা থেকে মাংসকেও বাদ দেয়া হল।
১৩. রাম সিং ছিলেন (১৮১৬-৮৫) একজন রামগড়িয়া ভৈনী গ্রামের (লুধিয়ানা জেলার)। তিনি দরবারের গোলন্দাজ বাহিনীতে ছিলেন এবং বালাক সিং-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন যখন তার দল সীমান্তে অবস্থান নেয়। যখন প্রথম ইংরেজ-শিখ যুদ্ধের পর শিখ গোলন্দাজ বাহিনীকে নিষিদ্ধ করা হয় তখন রাম সিং হাজরোতে থাকতে আসেন। পাঞ্জাব দখলের পরে তিনি ভৈনীতে যান এবং তার পূর্ব পুরুষের পেশা শুরু করেন এবং বালাক সিং-এর বার্তার জন্য উদ্বিগ্ন হন।

মতে তার অনুসারীরা ধর্মসংগীত গায় এবং, দরবেশদের মতো নাচে, নিজেরা সাময়িক উন্মত্ততায় পৌঁছে যায় এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে চোঁচানো শুরু করে (কুকাস); তাদেরকে তাই কুকাস বলা হতো। তারা শুধু একপ্রস্থ সাদা কাপড় পরিধান করতো; তারা নিজেদের মতো করে পাগড়ি বাঁধত (কপালে চ্যাপ্টা করে কোন কোন তৈরি না করে); তারা উলের তৈরি গলার হার পরত; তাদের হাতে কাঠের তৈরি বাদ্যযন্ত্র থাকত; এবং তারা একে অপরকে সম্ভাষণ করতো প্রথাগত সাত শ্রী আকালের পরিবর্তে সাত অকাল পুরাথ বলে। যদিও বেশিরভাগ কুকারা রামগড়িয়া, জাত, কোবলার ও মাজহাবির গরীর শ্রেণী হতে এসেছিল, রাম সিং তাদের নির্বাচিত হওয়ার অনুভূতি যোগান-সন্ধ্যাসী শান্ত খালসা-যেখানে বাকিরা স্লেকা (অপরিষ্কার)। রাম সিং তার অনুসারীদের জন্য হুকুমনামা তৈরি করেন যেখানে নৈতিক, সামাজিক, পরিচ্ছন্নতাসহ রাজনৈতিক ব্যাপারেও কথা ছিল।^{১৪} রামসিং-এর ধর্মীয় কথা রাজনৈতিক দিকে মোড় নেয়া শুরু করে। যখন তিনি পাহুল প্রশাসনে ছিলেন, এসব অনুষ্ঠানে প্রত্যেকদিনের ধর্মোপদেশের পাশাপাশি, রাম সিং শিখ রাজপুত্র ও জমিদারদের নীতিহীনতার কথা বলেন; বেদী ও সোধী শুরু অনুসারীদের দরুন গুরুর পদ শুরু হয়েছিল; মূর্তিপূজা ও বর্ণবাদের দুষ্টত্ব নিয়ে।^{১৫} রাম সিং অনেক হিন্দু রীতির বিরুদ্ধে হলেও তিনি গুরুর গোঁড়া রক্ষক ছিলেন। রাম সিং তার অনুসারীদের জন্য গুরুদুওয়ানাকে আলাদা করে দিলেন। তিনি সুবাস (সরকার) নিয়োগ করেন যারা অর্থ সংগ্রহ করে ভৈনীতে দান করে। তিনি যুবকদের অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেন এবং প্রায় সেনাবাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। কুকাদের নিজস্ব পত্রবাহক ছিল। গোপন বার্তা বহনের জন্য। ১৮৬৩ সালের মধ্যে রাম সিং-এর প্রায় কয়েক হাজার দৃঢ় সমর্থক জুটে যায়। সৌ

১৪. নৈতিক মিথ্যা বলবে না, চুরি করবে না বা পরকীয়া করবে না। ব্যক্তিগত : তামাক, মদ ও যে কোন ধরনের মাংসের প্রতি আসক্ত হবে না। পাগড়ি কপালে চ্যাপ্টা করে পরবে। সামাজিক : কন্যা সন্তান ধ্বংস বা এদের নিয়ে ব্যবসা করবে না; আট বছরের নিচে মেয়েদের বিয়ে দিবে না; বিপুল অংকের যৌতুক দেয়া বা নেয়া যাবে না (রাম সিং ১৮৬৩ সালে খোঁটে গ্রামে তার ভক্তদের মধ্যে গণবিবাহ দেন। তিনি ১৩ টাকার বেশি বিয়েতে খরচ না করার জন্য তার অনুসারীদের আদেশ দেন) সুদসহ টাকা লেন-দেন করবে না; ষাঁড়দের লিঙ্গ কাটবে না; গরু ও অন্যান্য প্রাণীকে জবাই হতে রক্ষা করবে। পরিচ্ছন্নতা : ভোরের পূর্বে উঠবে এবং প্রতিদিন গোসল করবে; (প্রার্থনা করবে এবং উলের দ্বারা তৈরি রোসারি নিয়ে চলবে) রাজনৈতিক সরকারের কোন সাহায্য নিবে না; সরকারি বিদ্যালয়ে সন্তানদের পাঠাবে না; আইনের আদালতে যাবে না কিন্তু পঞ্চায়েত ডেকে মীমাংসা করবে; বিদেশী পণ্য ব্যবহার করবে না; সরকারের ডাক ব্যবস্থা ব্যবহার করবে না।

১৫. গোবিন্দ সিং-এর গ্রন্থ ছিল শুধুমাত্র সত্যি, কল্পনার উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে, এবং শুধু একটি পবিত্র লেখা। গোবিন্দ সিং শুধু একজন পবিত্র গুরু। যে কোন মানুষ, বর্ণ বা ধর্ম নির্বিশেষে, পরিবর্তনের জন্য যুক্ত হতো। তিনি বলেছিলেন সোধী, বেদী, মহাত্মা, ব্রাহ্মণ এবং এমন যারা, তারা প্রতারক, কেউ গুরু গোবিন্দ সিং-এর মতো নন। দেবী, শিবের মন্দির হল জোর করে আদায় করার জায়গা, ঘণার জায়গা এবং কখনও যাওয়ার মতো না। ধর্ম পরিবর্তনকারীকে অন্য কোন বই বা শুধু গোবিন্দ সিং-এর গ্রন্থ পড়ার অনুমতি ছিল।' জনাব কিনচ্যাণ্টের কুকাদের বিশ্বাস নিয়ে প্রবন্ধের বর্ণনায়, ১৮৬৩, এ পেপারস রিলেটিং টু দ্য কুকা সেক্ট।

সখীর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, গুরু গোবিন্দ সিংহ, রাম সিং-এর রূপে পুনর্জন্ম হয়েছে, যিনি ভৈনী গ্রামের মিস্ত্রি। যিনি খালসাদের মোকাবেলা করতে পারে, হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে পারে, এবং তিনি নতুন শিখ সম্প্রদায় তৈরি করবেন। রাম সিং তার ভক্তদের বৈশাখী উৎসবের জন্য অমৃতসরে একত্রিত হতে বলেন- একটি বিশেষ ঘোষণা শোনার জন্য। এটার কারণ হিসেবে গুরু গোবিন্দ সিং আনন্দপুরে যে করেছিল এবং যখন তিনি খালসাদের নামকরণ করেন তা কুকাতে হারিয়ে যেতে পারে না।

রাম সিং অমৃতসরে পৌছান এবং দেখেন পুলিশ কর্তৃক শহর ভর্তি হয়ে আছে। তিনি তার ঘোষণা দিতে অসমর্থ হন। ভৈনীতে পৌছার পর, তাকে গ্রাম ছাড়ার নির্দেশ জারি করা হয়। তিনি অভিযোগ করেন যে তিনি ‘সরকার’ ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য মানুষের.... শিকার।^{১৬} রাম সিং-কে চোখে চোখে রাখা হলো যতক্ষণ না সরকার এটা নিশ্চিত হলো যে কুকারা কোন সমস্যা তৈরি করবে না।

শরত, ১৮৬৭-এর দশেরা অনুষ্ঠানে, রাম সিং তার প্রায় ৩৫০০ ভক্তের সাথে অমৃতসরে যান। তাকে হরিমন্দিরে ও অন্যান্য উপাসনালয়ে সম্মানের সাথে গ্রহণ করা হয় এবং ২০০০ শিখের বেশি নামকরণ করা হয়, এর মধ্যে কিছু খ্যাতিনামা জমিদার পরিবারের সদস্যও ছিল। এইসময় রাম সিং তার কোন ইচ্ছাশক্তিই ছাড়া নিরপেক্ষ প্রধানের খেতাব অর্জন করেন। তিনি রাজপুত্রের মতো সৈন্য দেহরক্ষী নিয়ে ভ্রমণ করতেন এবং প্রতিদিন সভা বসাতেন। তিনি বিভিন্ন শাসক প্রধানের সাথে উপহার বিনিময় করেন এবং নেপালে একটি মিশন পাঠান।

কুকারা এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করেছিল যে শিখদের জাগ্রত হতে খুব বেশি দিন লাগবে না। কিন্তু ঘটনাটি যখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তারা একটি বিষয়ে শিখ জনতার আবেগকে সামান্যই স্পর্শ করে অর্থাৎ গুরুদের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত। এই বিষয়েও তারা তাদের জ্ঞান ইংরেজদের চেয়ে-মুসলিম কসাইদের দিতে পছন্দ করবে। গুরু হত্যার চেষ্টার ফলস্বরূপ তাদের কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ ঘটে।

ধর্মোন্মাদ কুকারা কিছু মুসলিম কসাই এবং তাদের পরিবারকে অমৃতসরে এবং পরে রায়কোট (লুধিয়ানা জেলা) খুন করে।^{১৭} এসব অপরাধের জন্য, আটজন কুকাকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং অন্যদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।^{১৮} সরকার রাম

১৬. অক্টোবর ১৮৬৫তে ভগত জওহার মালকে লেখা পত্র, গন্ধ সিং কর্তৃক উদ্ধৃত, কুবিয়ান ডি ভিদিয়া, পৃ-৫৯।

১৭. ১৮৭১-এর নভেম্বরে, জে.ডব্লিউ. ম্যাকনাব, আম্বালার কমিশনারকে বলা হয় কুকাদের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে। ম্যাকনাবের ধারণা ছিল কসাইদের মৃত্যুর পিছে রাম সিং-এর হাত ছিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে বললেন। ম্যাকনাবের প্রতিবেদনের কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।

১৮. ক্রাউন ভার্সেস ফাতেহ সিং এ্যান্ড আদারস। পাঞ্জাবের কেন্দ্রীয় আদালতের বিচার ৯-৯-১৮৭১ (রেফারেন্স ৫৩) এবং ক্রাউন ভার্সেস মাস্তান সিং এ্যান্ড আদারস’ পাঞ্জাবের মূল আদালতের বিচার ১-৮-১৮৭১ তারিখের, আরও দেখুন ড: গান্ধা সিং-এর পত্র দ্য স্পোকসম্যান বিষয়ে ১৯৬৪-এর ২৯ জুনে।

সিং-কে তার গ্রামে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে এবং ধর্মীয় উৎসবে কুকারদের সম্মেলন নিষেধের আদেশ দেয়। কিন্তু কুকারা ক্ষোভে জ্বলতে থাকে, এবং জানুয়ারি ১৮৭২-এর মাঘী উৎসবে, তারা ভৈনীতে ঝাঁকের মতো যায়। যাদেরকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে তাদের সম্পর্কে নায়কোচিত ভাবের বক্তৃতা দেয়া হয়। সেই সময় সৌ সখী শিখ ক্ষমতার পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে মতামত দেয় তা তাদের হাতে চলে আসে। অনুসারীদের আশ্বস্ত করে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ঘরে পাঠাতে রাম সিং-এর দুর্ভোগ পোহাতে হয়। একদল সিদ্ধান্ত নেয় তাদের গুরুর উপদেশ অবজ্ঞা করবে এবং মালের কাটলায় আক্রমণ করবে, যা একটি মুসলিম রাজ্য যেখানে গরু জবাই আইনত বর্তমান।

মালের কোটলা যাওয়ার পথে দলটি মালাউধের শিখ জমিদারের বাড়িতে অস্ত্রের জন্য হানা দেয়। জমিদারের পাহারাদার তাদের ধরে ফেলে এবং যখন তারা মালের কোটলায় প্রবেশ করে রাজ্যের কনস্টেবলের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়। এল কোয়ান, লুখিয়ানার ডেপুটি কমিশনার, এখানে যোগ দেন এবং দলের ৬৮ জনকে গ্রেফতার করেন। কোয়ান তার কমিশনার টি.ডি. ফরসিথকে কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া পত্রে লেখেন যে ৬৬ জন আসামীকে কামানের গোলা দিয়ে বেঁধে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।^{১৯}

ভৈনীর কুকার প্রধান আস্তানা তল্লাসী করা হলো শুধু কিছু ক্রিস্টিয়ান, কুড়ুল এবং একজোড়া খুকড়ি পাওয়া গেল। রাম সিং ও তার এগার জন শিষ্যকে গ্রেফতার করা হলো এবং বার্মায় প্রেরণ করা হলো।^{২০}

যাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন পাটিয়ালা জমিদার জ্ঞানী রতন সিংহ। যাকে কুকারা অনেক সম্মান করতো এবং বিশ্বাস করতো যে তিনি নির্দোষ ছিলেন।

১৯. 'বিদ্রোহী দলটি' অন্য কোন নাম দিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণভাবে বোঝা যাবে না, কখনওই ১২৫-এর বেশি ছিল না; এর মধ্যে মালোধে ২ জনকে হত্যা, ৪ জনকে গ্রেফতার, কোটলায় ৮ জনকে হত্যা, ৩১ জনকে আহত করা হয়, আহতদের মধ্যে ২৫ বা ২৬ জন সেসময় পালিয়ে যায়, কিন্তু ২৭ জন আহতসহ ৬৮ জন, পাটিয়ালা রাজ্যে গ্রেফতার হয়.... পুরো দলটি প্রায় ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল, আমি পরদিন দিনের আলো ফোটোর সাথে সাথে আসামীদের গুলি করে উড়িয়ে দেয়ার বা ফাঁসি দেয়ার প্রস্তাব করি। তাদের অপরাধ সাধারণ নয়। তারা খুন বা ডাকাতি করেনি; প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছে, সমষ্টিগত কর্তৃপক্ষকে বাধা দিয়েছে, এবং এই রোগের প্রতিরোধের জন্য দ্রুত ও কঠোর দমনের পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাকে একটি গুরুদায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট যে আমি সর্বোত্তম ব্যবস্থা নিয়েছি এবং এক্ষুণি এই প্রাথমিক বিদ্রোহকে উড়িতে দিতে হবে।' *পার্লিমেটারি পেপারস অন দ্য কুকা আউটব্রেক*, পৃ-১১।

কমিশনার টি.ডি. ফরসিথ। যিনি প্রথমে কোয়ানকে হঠকারী না হতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার ডেপুটির কাজে সমর্থন প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন 'প্রিয় কোয়ান, তুমি যা করেছ আমি তাতে পুরো সমর্থন ও নিশ্চিত প্রকাশ করছি, তুমি প্রশংসার্যোগ্য কাজ করেছ। আমি খুব খুশি।' ১৮৭২-এর ১৮ জানুয়ারির পত্র, *ইবিদ*, পৃ-৫৩।

২০. ফরসিথ লেখেন 'রাম সিং-এর বদরাগী শিষ্যরা মালোষ্ঠে যে সমস্যার তৈরি করে এবং মালের কোটলাতে যা এখনও ভালও মতো তদন্ত হয়নি; এবং এটা একটা ব্যাপার যে সে পুলিশে রিপোর্ট লেখায় লেহনা সিং ও হেরা সিং-এর নামে। যারা বিদ্রোহের জন্য এ কেসের প্রধান নায়ক। কিন্তু তার নিজের জন্যই ভক্তরা তার নাম ব্যবহার করে এবং তাদের মাঝে তার উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে খুন করে এবং রাহাজানি তৈরি করে।' ১৮ জানুয়ারি ১৮৭২-এর পত্র, *ইবিদ*, পৃ-১২।

তারপর ফরসিখ মালের কোটলায় কোয়ানের সাথে যুক্ত হন। যেখানে আরও ১৬ জন কুকাকে কামানের গোলা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে, দলটি মালাউধে যায়, যেখানে আইনের হেফাজতে চারজন কুকা ছিল, ফরসিখ নরম হলেন এবং তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন।^{২১}

নামধারীদের চলাচলের জন্য যে শিখদের কিছুটা সহানুভূতি ছিল তা গরীব মুসলমানের সাথে হিংস্রতা ও প্রশাসনের অবাধ্যতার কারণে পরিবর্তিত হয়ে গেল। গোষ্ঠীটি দৃঢ়ভাবে ব্রিটিশদের সমর্থক ছিল, এবং শিখ নেতারা তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণের প্রথম সুযোগটি হাত ছাড়া করতে চায়নি। পাটিয়ালা মহারাজা তার রাজ্যের সকল কুকাকে গ্রেফতার করার আদেশ দেন।^{২২} অমৃতসরে শিখ সর্দারদের বৈঠকে লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে একটি ঠিকানা দিয়ে বলা হয় কুকারা একটি ‘দুষ্ট ও অবাধ্য ভাগ’ যারা তাদের ‘খারাপ ব্যবহার ও শয়তানী পরিকল্পনা’ দিয়ে সরকারের চোখে শিখদের সম্মান নষ্ট করছে, ‘এবং যে ভাল কাজ আমরা (শিখরা) সরকারের জন্য করি, যেমনটি ১৮৫৭ সালে করা হয়েছিল....’^{২৩}

কারাগারে কয়েক বছর থাকার পর রাম সিংকে দর্শনার্থীদের প্রবেশের এবং তার ভক্তদের সাথে যোগাযোগ করার অনুমতি দেয়া হলো। আবারও তিনি পাঞ্জাবে বিদ্রোহ তৈরির খেলার কথা ভাবলেন। তার ভক্তরা সৌ সখীর^{২৪} অনেক কপিতে আবিষ্কার করে যে ভারতে রাশিয়ানদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং রাম সিং-এর শাসন স্থাপিত হয়েছে। রাম সিং একটি দলকে রাশিয়ায় সাহায্যের জন্য পাঠান,^{২৫} কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে শিখরা তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে যেতে অনিচ্ছুক ছিল। রাম সিং আশা ছেড়ে দিলেন এবং পরবর্তীদিনগুলোতে তার ভক্তদের উৎসাহী ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেললেন। কারাগার থেকে পরবর্তীতে চিঠিগুলোতে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজেকে গুরু নয় বরং গুরুর রাপাটি (মুখপাত্র) বলে মনে করেন। মাঝেমধ্যে তার রাগের কারণ ঘটলে, তিনি তার গুরুর সাহায্য চান (এবং অবাক করার মতোই

২১. কোয়ানের নিষ্ঠুর পদক্ষেপের জন্য ইংরেজ-ভারতীয় প্রেস কঠোর সমালোচনা করে। ভারতীয় সরকার তদন্তের নির্দেশ দেয়, ফলস্বরূপ কোয়ানকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং ফরসিখকে পাঞ্জাবের বাইরের পদে স্থানান্তর করা হয়। ভাইসরয়ের মতামত নিম্নোক্তভাবে বলা যায় : ‘জনাব কোয়ান যে পথে চলেছেন, তা অনৈতিক, যাতে জনতার কোন প্রয়োজন ছিল না, এবং এটাতে বর্বরের মতো নিষ্ঠুর আচরণের জন্ম হয়।’ ৩০ এপ্রিল ১৮৭২ সালে পাঞ্জাব সরকারকে লেখা ই.সি বেলের পত্র, ইবিদ, পৃ-৫৪-৮।

২২. মহারাজার ফরমান (ঘোষণা) ১৯ জানুয়ারি ১৮৭২ এর।

২৩. দ্য ইংলিশম্যান, ২৩ মার্চ ১৮৭২।

২৪. সৌ সখীগুলো সারসার কাছে একটি ট্যাংকে পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হয়। লেফটেন্যান্ট গভর্নর, রবার্ট এগারটনের নির্দেশে, এগুলো ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়। (ডি.ই. ম্যাকব্রগাকেনের চিরকূট দেখুন, পুলিশের সহকারী ইন্সপেক্টর জেনারেল, পাঞ্জাব হোম ডিপার্টমেন্ট, জুরিসিয়াল প্রসিডিংস, আগস্ট ১৮৮২, নস ২১৭-২১৮বি)।

২৫. দেখুন পি.সি. রয়, গুরুচরণ সিংস মিশন ইন সেন্ট্রাল এশিয়া, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত লিপি।

ধ্বংসের হিন্দু দেবীদের শক্তি, ভগবতী, জগদম্মা) ^{২৬} নোংরা গরুখাদক সাদা চামড়াদের থেকে ভূমিকে মুক্ত করার জন্য।

রাম সিং ১৮৮৫ সালে রেঙ্গুনে মারা যান এবং তার ছোটভাই হরি সিং উত্তরাধিকারী হয়। গুরু অবস্থায় হরি সিং-কে ২১ বছর ভৈনীর বাইরে যেতে দেয়া হয়নি। ১৯০৬ সালে তার মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রতাপ সিং (মৃত্যু ১৯৬১) গুরু হয়, যিনি বর্তমান প্রধান জগজিৎ সিং-এর পূর্বসূরী ছিলেন।^{২৭}

কুকার সংখ্যার কোনো বিশ্বাসযোগ্য সংকলন হয়নি।^{২৮} তাদের দুইটা কেন্দ্র ছিল, একটা ভৈনীতে এবং অন্যটি হিসার জেলার সারসার কাছে জীয়ন নগরে। তারা চারটি পত্রিকা বের করত, যার মধ্যে গুরুমুখীর সাপ্তাহিক সাতযুগ সবচেয়ে পুরনো এবং বেশি প্রকাশিত ছিল।^{২৯}

কুকা একটি আলাদা দল ছিল যারা তাদের আদি গোষ্ঠীর সাথে খুব কমই যোগাযোগ রাখত। তাদের নিজস্ব গুরুদুয়ারা ছিল এবং কোনো বিরল অনুষ্ঠানে শিখ ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিত। তারা শিখদের মাঝে বিবাহ করত না যতক্ষণ না তাদের দাবি শিখরা মেনে নিত।

কুকার গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের উপর শক্ত, পবিত্র বিশ্বাস ছিল অন্যান্য শিখদের চেয়ে। তাদের গুরুদুয়ারা আড়ম্বরপূর্ণ ছিল না এবং তারা স্মৃতিপূজা করত না (দামি চাদর ও আবরণ গ্রন্থের উপর রাখা হতো, পুস্তক দিয়ে বাতাস, প্রভৃতি) যেগুলো গোঁড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ প্রথা ছিল। এবং কুকারা নিজেরা সাধাসিধে জীবনযাপন করত; তারা সাধারণতম পোশাকি পরত এবং কঠোর সংযম পালন করত; গুরুদুয়ারাতে তাদের কাজের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তী ছিল এবং খাদ্য, পানীয় ও ব্যক্তিগত স্বলনের নিষেধাজ্ঞা মানত। ভারতে স্বাধীনভাবে চলাচলের ইতিহাসও তাদের ছিল। রাম সিং সর্বপ্রথম অসহযোগ ও স্বদেশী (দেশি পণ্য) ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। যে ব্রিটিশ পণ্য, সরকারি বিদ্যালয়, আদালত এবং ডাক ব্যবস্থা বর্জন করেন এবং হাতে সেলাইকৃত কাপড় (খদ্দর) পরিধানে রাম সিং ১৮৬০ সালে প্রণোদিত করেন তা ষাট বছর পর মহাত্মা গান্ধী আবার শুরু করেন।

২৬. দেখুন গান্ধা সিং-এ প্রকাশিত কারাগার থেকে রাম সিং-এর পত্র, কুকিয়ান দি ভিথিয়া, পৃ-২১৩-১৪।

২৭. জগজিৎ সিং-এর কোনো পুত্র ছিল না এবং তাই তার ছোট ভাই বীর সিং বা বীর সিং-এর পুত্র দালিপ সিং-এর উত্তরাধিকারী হওয়াটাই স্বাভাবিক।

২৮. ১৮৭১ সালে, কুকারদের সংখ্যা প্রায় দশ লাখ ছিল। ১৮৯১-এর আদমশুমারি মতে, ১০,৫৪১ জন ছিল এবং ১৯০১ সালে তা ১৩,৭৮৮-তে পৌঁছায়। বর্তমানে কুকারা ৫-১০ লাখের মতো ভক্তের দাবি করে, যাতে বেশিরভাগ জাট, রামগড়িয়া, অরোরা এবং মাজহাবি শিখ ছিল। তারা হিসার, অমৃতসর ও লুধিয়ানা জেলায় একত্র হয় (গুরু জগজিৎ সিং-এর সাথে লেখকের সাক্ষাৎকার)।

২৯. অন্যান্য কুকা পত্রিকাগুলো হল নাওয়ান হিন্দুস্তান, একটি প্রাত্যহিক গুরুমুখী যা নয়াদিল্লিতে প্রকাশিত হতো; নামধারী সমাচার, একটি পাক্ষিক পত্রিকা যা দিল্লিতে প্রকাশিত হতো; সাকামার্গ, একটি গুরুমুখী সাপ্তাহিক যা সামান্যতে প্রকাশিত হতো।

সিং সভা ও সামাজিক পুনর্গঠন

পেছনের ঘটনা : খ্রিস্টান ও হিন্দু মিশনারী কার্যক্রম

নিরাকারী, রাধা স্বামী ও নামধারীদের গতিবিধি শিখ সম্প্রদায়ের উপর অল্পই প্রভাব ফেলেছিল। প্রথমটি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের শহরে গোষ্ঠীতে যুক্ত ছিল; দ্বিতীয় দলটি মূলত আন্তিকতাজনিত সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল; তৃতীয়টির অস্তিত্ব আপাতভাবে মারের কোটলা কুচকাওয়াজ মাঠে উড়ে গিয়েছিল। এই তিনটি দল নিজ নিজ কোটায় তাদের নির্দিষ্ট গুরুর সাথে উন্নতি করছিল এবং নিজস্ব আচার-ব্যবস্থা পালন করছিল। যে হিংস্রতা তারা গুরু করেছিল তা অপ্রকাশিতই থেকে যায়। নিম্নবর্ণের শিখরা বর্ণবৈষম্যের স্বীকার হয়। ধনীদেব দ্বারা পানীয় ও লাম্পটের দ্বারা ব্রাহ্মণীয় হিন্দুত্ব, দেব ও দেবী দ্বারা, সংস্কৃত মন্ত্র আওড়ানোতে, ভবিষ্যৎবক্তা ও জ্যোতিষীদের উপর, বিভিন্ন রাশি দিয়েও যা পূর্ব হতেই চলে আসছে। এমনকি শিখরা যারা গুরুদের প্রার্থনা করার জন্য সমালোচনা করে তাদেরকে দলের ভিতর থেকে আলাদা করেছে। তারা নানক ও গোবিন্দের বেদী ও সোধী শিষ্যের সামনে ভূমিতে শায়িত হতে পারে না বা কিছু সাধুর প্রতি ভক্তি করতে পারে না বা যে গুরু হলে অন্যদের প্রতি তাই করত। নৈতিক মূল্যবোধের অবনতির সাথে সাথে শিখদের সংখ্যাও কমতে থাকে। যখন খালসারা অনুসারী হয়, বেশিরভাগ হিন্দুরা তাদের চুল ও দাড়ি বড় করা গুরু করে এবং শিখ গুরুদের প্রতি মৌখিক পূজা করে। জয়ের পরে, এসব সুসময়ের মাছিরা হিন্দুদের দলে ফেরত চায়। প্রকৃত শিখ পরিবার যাদের সাথে এসব হিন্দুদের সুসম্পর্ক ছিল হয় তারা তাদের অনুসরণ করে বা চুলদাড়ি ছেঁটে সহজধারীতে পরিণত হয়। শিখরা, যাদের কয়েক প্রজন্ম পূর্বে হিন্দু ছিল তারা কখনোই হিন্দুদের সাথে সামাজিক সম্পর্ক ত্যাগ করেনি। বর্তমানে হিন্দুত্বে বিলীন হওয়ার চেষ্টা করছে এবং আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বেঁচে থাকতে চায়।^১ শিখ রাজনীতির জন্মগত দুর্বলতাই ছিল

১. এটা ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিদ্বানদের মতামত যেমন স্যার রিচার্ড টেম্পল ও ডেনজিল ইবেটসন যারা ১৮৮১-এর আদমশুমারি রিপোর্ট লেখেন ‘...শিখরা হচ্ছে পাঞ্জাবের সবচেয়ে অশিক্ষিত শ্রেণী...সবমিলিয়ে মনে করার কারণ-কাবুল ক্যাম্পেনের উত্তেজনা প্রশমিত না হওয়ায় (শিখ সৈন্যদের বীরত্ব উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের প্রচারণায় অনেক জনপ্রিয়তা পায়), শিখ ধর্ম-হ্রাসের দিকে।’

বিভাগের একমাত্র কারণ; আরও তিনটি ছিল : খ্রিস্টান মিশনের কার্যক্রম, নতুন হিন্দু প্রতিষ্ঠান যা আর্থ সমাজ নামে পরিচিত তার প্রচলন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পরিচিতির সাথে যে ভিন্নতা এসেছে তা।

১৮৩৫ সালে একটি আমেরিকান প্রেসবাইটেরিয়ান মিশন লুধিয়ানায় প্রতিষ্ঠিত হয়। জয়ের পরপরই এটা এর কাজ মালওয়া থেকে মাঝা পর্যন্ত বিস্তৃত করে;^২ চার্চ মিশনারী সোসাইটি অমৃতসর ও লাহোরের চারপাশে এবং পাহাড়ি জেলাগুলোতে কেন্দ্র খোলে। গসপেলের, ম্যালভেশন আর্মি, প্রক্রিয়াবিদ, ইপিস্কোপালিয়ান, মোরাজিয়ান এবং বিভিন্ন রোমান ক্যাথলিকদের জন্য সমাজের আদেশে তারা একে-অপরের রূপান্তর অর্জন করে।^৩ ইংরেজ কর্মকর্তারা খ্রিস্টান মিশনারীর একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল।^৪

১৮৫৩ সালে সর্বপ্রথম মহারাজা দালিপ সিং খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত হয় এবং শিখরা প্রচণ্ড দুঃখ পায়। একই বছর অমৃতসরে একটি খ্রিস্টান মিশনারী বিদ্যালয় খোলা হয়। নতুন রূপান্তরিতদের আগ্রহ দেখে মহারাজা এটা সমর্থনের প্রস্তাব দেন।

মহারাজা দালিপ সিং বাদে বেশিরভাগ শিখ যারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে তারা অস্পৃশ্য বর্ণের ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে ইসাই, শব্দার্থ হলো খ্রিস্টান, যা অভিজাত্যের অনুভূতির জন্য দেয় এবং কুহরার সাথে একই অর্থ প্রকাশ করে, একটি পাঞ্জাবি শব্দ যা অচ্ছুতদের জন্য ব্যবহৃত হয়। তখন তার সময়ে নতুনরা বুঝতে পারল যে, না পাদরির সম্মান আর না সোলা টুপীর গুরুত্ব তাদের অচ্ছুতার অভিশাপ মোচন করতে পারবে না। তাই নিম্নবর্ণের ধর্মীয় রূপান্তর কমে আসতে লাগল। খ্রিস্টান মিশনারীগুলো ভালো জাত ও ক্ষত্রিয় বর্ণের দিকে তাদের মনোযোগ দিল। অনেক শিখ পরিবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।^৫ অচ্ছুত ভ্রাতৃবর্গ হারানোর চাইতে শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ধর্মীয় রূপান্তর শিখ নেতাদের পীড়া দেয়।^৬

২. রেভ. জান নিউটন ও রেভ. সি.-ডব্লিউ ফরমান ১৮৪৯ সালে লাহোর পরিদর্শন করেন। ম্যাকোনাকি, রোল্যান্ড বেটম্যান।

৩. ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়াল অফ ইন্ডিয়া ১৯০৮, XX, ২৯১-২।

৪. বেটম্যানের আত্মজীবনীর লেখক ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৫২-তে লাহোরে একটি আলোচনা সভার রেকর্ড রাখেন, চেয়ারে কলকাতার আর্কডিকন প্র্যাটসহ, যেখানে বলা হয়েছে 'হেনরি ও জন লরেন্স, রবার্ট মন্টগোমেরি, ডোনাল্ড ম্যাকলিওর, হার্বার্ট এডওয়ার্ডস, রিনিল টেইলর, রবার্ট কাস্ট, আর্থার রবার্টস, উইলিয়াম মার্টিন, সি.আর. সোন্দারস ও অন্যান্য, সবাই পাঞ্জাবে চার্চ মিশনারী অ্যাসোসিয়েশন শুরু করতে ইচ্ছুক।' ম্যাকোনাকি, রোল্যান্ড বেটম্যান, পৃ-১২-১৩।

আদমশুমারিতে পাঞ্জাবের খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা ১৮৮১-৩৭৯৬; ১৮৯১-১৯, ৫৪৭; ১৯০১-৩৭, ৯৮০; ১৯১১-১৬৩, ৯৯৪; ১৯২১-৩১৫, ৯৩১; ১৯৩১-৪১৪, ৭৮৮।

৫. এসব পরিবারের সবচেয়ে পরিচিত ছিল রাজা হরনাম সিংহ, যিনি কাপুর থালার মহারাজার ভাই ছিলেন। রাজা হরনাম সিং-এর পুত্র ও কন্যা ক্ষমতার জন্য উঠেপড়ে লাগল। অমৃতকৌর, মহাত্মা গান্ধীর একজন বন্ধু, কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন; মহারাজ সিং বোম্বের গভর্নর হন; দালিপ সিং হন পাঞ্জাব হাইকোর্টের বিচারক।

খ্রিস্টান মিশনারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আর্থ সমাজ থেকে হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনা।

আর্থ সমাজ স্বামী দয়ানন্দ^১ স্বরসতী কর্তৃক স্থাপিত হয় যার লক্ষ্য ছিল ‘বেদের দিকে ফিরে চলা’। তার মতে, বেদ একক দৈবশক্তিতে কিম্ব অদৃশ্য ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং মানবজাতির সমতুল্য; তাই তিনি মূর্তিপূজা ও বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন। দয়ানন্দ একজন জোরালো বক্তা ছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যে পুরো ভারতে তার আওয়াজ শোনা গেল। তার একেশ্বর মতবাদ ও সুসাহিত্য শিখদের জন্য বিশেষ কিছু ছিল।

১৮৭৭-এর গ্রীষ্মে, দয়ানন্দ পাঞ্জাবে আসেন যেখানে হিন্দু ও শিখদের থেকে তিনি বিশাল অভ্যর্থনা পান। তিনি লাহোরে আর্থ সমাজের একটি শাখা খোলেন। বিশুদ্ধকরণ (শুদ্ধি পবিত্রকরণ) ছিল তার কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এটা অনেক হিন্দু ও শিখদের একত্র করে।

গোঁড়া শিখদের এই ব্যাপারে প্রশংসা করতে দেরি হয়নি যে বেদের প্রতি দয়ানন্দের গভীর বিশ্বাস ছিল মুসলমানদের কোরানের মতো^২ গ্রন্থ তার কাছে দ্বিতীয় বই হিসেবে গুরুত্ব পেত এবং অল্পজ্ঞানের শিখ গুরুরা; নানক দস্তী (ভগ্ন) হিসেবে পরিচয় দিল। দয়ানন্দ শিখ তত্ত্ব নিয়ে ক্ষিপ্ত ছিলেন, কারণ সংস্কৃতে তাদের অজ্ঞতা : যারা তার মনমতো হতে পারেনি তাদের জন্য তার প্রিয় উক্তি ছিল ‘মহা মূর্থ (বিরিট বোকা)। দয়ানন্দ ভাষা গুছিয়ে নেন; তার হিংসুক প্রতিপক্ষরা আফসোস করে।’^৩

সাধু সুন্দর সিং (জন্ম ১৮৮৯) রামপুরের জাট শিখ (পাতিয়ালা রাজ্যের) সবচেয়ে খ্যাতিমান ভারতীয় ছিলেন যিনি খ্রিস্টত্ব গ্রহণ করেন। তিনি রহস্যময় ছিলেন। তার জীবনের বেশিরভাগ বছর তিনি হিন্দুস্তান-তিব্বত রাস্তায় আসা-যাওয়ার মাধ্যমে পার করেন। তাকে ১৯৩৫-এর পর থেকে আর দেখা যায়নি।

৬. ১৮৭৩-এ যখন অমৃতসরের মিশন স্কুলের চারজন শিখ ছেলে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ঘোষণা দেয়, তার বিরুদ্ধে পুরো পাঞ্জাবে আলোচনা সভা হয়। শিখ নেতারা ছেলেদের সাথে কথা বলেন এবং তাদেরকে পূর্বের বিশ্বাস ত্যাগ করা থেকে বিরত রাখেন।
৭. দয়ানন্দ (১৮২৪-৮৩) ছিলেন কাঠিয়ারের সৈবাত ব্রাহ্মণের পুত্র। দয়ানন্দ ২১ বছর বয়সে ঘর ছাড়েন এবং পরবর্তী আঠারো বছর একজন অন্ধ বিদ্বান, স্বামী বিরজানন্দের কাছ থেকে সংস্কৃত ভাষায় ধর্মীয় শিক্ষা অধ্যয়ন করেন। তিনি তার জীবনের বাকি বিশ বছর উত্তর ভারতে ধর্মপ্রচারে ব্যয় করেন।
৮. ‘আমি বেদকে স্বসাক্ষ্য সত্য বলে মনে করি, কোনো সন্দেহ ছাড়াই এবং অন্য কোনো বইয়ের লেখকের উপর নির্ভর করা ছাড়া; প্রাকৃতিকভাবেই ভগবানের রাজ্যে প্রকাশিত দয়ানন্দ, হ্যান্ডবুক অফ দ্য আর্থ সমাজ, পৃ-৩৫।

বেদের প্রতি দয়ানন্দের ব্যবহারের ব্যাপারে ম্যাক্স মুলারের মতামত আশাব্যঞ্জক; ‘অনেক অবিশ্বাস্য গণনার মাধ্যমে স্বামী দয়ানন্দ নিজেকে ও অন্যদের প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন যে সবকিছুই বিশ্বাসের উপর, এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক নতুন আবিষ্কারও বেদে বলা আছে। বাম্প চালিত ইঞ্জিন, রেলপথ ও বাম্পচালিত নৌকা, সবই পূর্বে জানা ছিল, অন্তত বেদের কবিদের প্রতি : বেদের জন্য, তিনি তর্ক করেন মানে জ্ঞান এবং এ থেকে কোনোকিছু কীভাবে লুকিয়ে রাখা যায়?’
বায়োগ্রাফিকার এসেস, II, ১৭০।

৯. সমাজের একটি অঙ্গ, আর্থ সমাচার নিম্নোক্ত কথা প্রকাশ করে।

শিখরা দয়ানন্দ থেকে সরে আসে; এমনকি তারা মুসলিম ও খ্রিস্টানদের দলে দয়ানন্দের বই বন্ধের দাবিতে যোগদান করে, সত্যর্থ প্রকাশ,^{১০} যাতে তাদের তিনটি বিশ্বাসের কথা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে। খ্রিস্টান ও আর্য সমাজপতিদের কাজের পাশাপাশি, প্রদেশে অন্যান্য পরিবর্তনের হাওয়া বইতে লাগল। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা জেগে উঠল, যারা তাদের সাথে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭১-১৮৩৩) স্বাধীন হিন্দুধর্ম পালন এবং ব্রাহ্ম সমাজের বার্তা বয়ে আনে। তারা ১৮৬৪ সালে লাহোরে একটি শাখা খোলে এবং দয়াল সিং মাজিথিয়ায় উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়।^{১১}

সমভাবে উৎসাহী ছিল তত্ত্বাবাদীরা, যাদের মধ্যে অনেকেই (ডঃ অ্যানি বিস্যান্টসহ) পাঞ্জাবে ভাষণ দেন। ভারত ও হিন্দুসমাজের প্রতি আগ্রহ তৈরির জন্য প্রচারণা চালায় ম্যাক্স মুলার, স্যার এডউইন আর্নল্ড এবং ডঃ মনিয়ার উইলিয়ামকে পাঞ্জাবে অনেক কাজের প্রকাশনা করতে হয়।^{১২} শিখরা আবারও তাদের ইউরোপীয় ভবিষ্যৎ বক্তার জন্য দুর্ভাগ্য হিসেবে সাব্যস্ত হলো। একজন জার্মান ভাষা তত্ত্ববিদ, ডঃ আর্নেস্ট ট্রাম্প ভারত অফিসে গ্রন্থকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য নিয়োজিত হন। ট্রাম্প প্রথম কয়েক পাতা চেষ্টা করেন এবং বাকি অনুবাদ ছেড়ে দেন কারণ,

নানক শাহ ফাকির নে নায়া কালায়া পাছ
ইধার উধার যে জোর কে লিখ মারা ইক গ্রাছ
পেহলে চালে কার লিয়ে, পিছে বাদলা ভেস
সার পার সাফা বান্ধকে, রাখ লাইন সাব কেস।

নানক, ফকিরদের রাজা, একটি নতুন গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি লেখার উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং একটি খণ্ডে তাদের রাখেন। তিনি কিছু শিষ্য একত্রিত করেন এবং পরে তার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটান; তিনি তার মাথায় পাগড়ি পরেন এবং তার চুল লম্বা করেন। *গান্দা সিং, এ হিস্টোরি অফ দ্য খালসা কলেজ, পৃ-৭।*

১০. ১৮৭৪ সালে সত্যর্থ প্রকাশ প্রকাশিত হয়। পাঞ্জাব সরকার এটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কারণ রাসূল মোহাম্মদের প্রতি কটুক্তি করা হয়। নতুনভাবে সংকলিত করে ছাপা হয় বর্তমানে।
১১. দয়াল সিং মাজিথিয়া (মৃত্যু-১৮৯৮) ছিলেন বিখ্যাত লেহনা সিং-এর পুত্র, যিনি মহারাজ রনজিত সিং-এর মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হন, যা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ট্রিবিউনে আর্থিক সাহায্য করেন এবং তিনি সাহায্য সংস্থা গঠন করেন যা দয়াল সিং কলেজ ও একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮১ থেকে ট্রিবিউনে প্রকাশ করা শুরু হয়। এটা এখন পর্যন্ত প্রচলিত যা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পাঞ্জাবি চক্রের কাছে পৌঁছায়।
১২. এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্যার রিচার্ড টেম্পলের *লিজেভস অফ দ্য পাঞ্জাব, নেমস অ্যান্ড নেম প্রেসেস এবং মাসিক পত্রিকা, পাঞ্জাব নোটস অ্যান্ড কুয়েরিস; বসওয়ার্থ স্মিথের লাইফ অফ লর্ড লরেন্স; রসের ল্যান্ড অফ ফাইভ রিবারস;* এবং সবার উপরে ছিল রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর গল্প সমগ্র, যেগুলোর অনেকগুলোর পিছের ঘটনা হিসেবে পাঞ্জাবের সেনানিবাস ছিল। পাঞ্জাবে পাশ্চাত্য আগ্রহের একটি বড় ভূমিকা ছিল পাঞ্জাবিদের নিজেদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে পুনরায় আগ্রহ তৈরি করা। যা মনিয়ার উইলিয়ামস ভারতের জন্য করেছেন, ডঃ লেইটনার তা পাঞ্জাবের জন্য করেছেন। তিনি ছিলেন লাহোরে প্রকাশিত *আজ্জমানই পাঞ্জাব ও পাঞ্জাব আকবারের মূল চালিকাশক্তি*। তিনি লন্ডনের কাছে ওকিং-এ একটি পাঞ্জাব প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

ভাষণটি সংস্কৃত ব্যাকরণের সাথে মিল ছিল না, এবং শিখ তত্ত্ববিদরা তাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ট্রাম্পের রচনা যখন প্রকাশিত হয় তখন সামান্য অসন্তোষও তৈরি হয়নি। তার মুখবন্ধে গ্রন্থ পাঠ্যবই সম্পর্কে কটুক্তি ছিল; এবং তার অনুবাদ ছিল বৈঠক, রসকষহীন ও ক্লান্তিকর। তথাপি নিজেদের ছাড়া শিখরা আর কাকে দোষ দিবে?

সাহিত্য ও শিক্ষাগত ব্যাপারে গতির তৈরি হয়। ১৮৭০ ও ১৮৮০-তে একটি সাধারণ কলেজ একটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাদুঘর, শিল্পের বিদ্যালয়, বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং একটি মেডিক্যাল কলেজ পাঞ্জাবে খোলা হয়। হিন্দু ও মুসলিমরা তাদের নিজস্ব স্কুল ও কলেজ চালু করে; শুধু শিখরা পিছে পড়ে থাকে।^{১৩}

অমৃতসর ও লাহোরের সিং সভা

আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠার চার বছর আগে, অমৃতসরের শিখ সম্প্রদায় বৈঠক করে একজন হিন্দু বক্তার বিরুদ্ধে যিনি শিখ গুরুদের সম্পর্কে অপমানজনক কথা বলেছেন। এই প্রতিবাদ বৈঠক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কটুক্তি হয় যা সিং সভা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা ধনী সম্প্রদায়, জমিদার সম্প্রদায় ও গোঁড়াদের সমর্থন লাভ করেছিল।^{১৪} এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল গুরুদের পাঠদান পুনর্জাগরণ করা, পাঞ্জাবিভাষায় ধর্মীয় সাহিত্য তৈরি করা এবং অশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো। প্রতিষ্ঠাতারা আরও খোঁজে উঠে ইংরেজদের মধ্যে আগ্রহ, এবং তাদের সংগঠনকে নিশ্চিত করে সিং সভার শিক্ষামূলক কার্যক্রম দিয়ে।^{১৫} সরকারের আস্থা অর্জনের জন্য সভা সিদ্ধান্ত নেয় 'মুকুটের প্রতি যথাযথ বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতে হবে।'^{১৬} অমৃতসর শ্রীগুরু সিং সভায় প্রেসিডেন্ট ছিলেন ঠাকার সিং

১৩. 'এতে (গ্রন্থে) যে ক্যাথোলিক নিয়ম আছে তা কয়েকজনের কাছে পরিচিত ছিল এবং শিখ সম্প্রদায়ে গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের মেঘ ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় সিং সভা গজিয়ে উঠেছে এবং গোষ্ঠীর নেতারা তাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জাঘত হয়েছে; এবং এখন আশা করা যায় যে শিখদের পুনর্জাগরণ হবে।' ট্রিবিউটন, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫।

১৪. অমৃতসর সিং সভার নেতারা ছিলেন খেম সিং বেদী, কাপুর থালার বিক্রম সিং আহলুওয়ালিয়া, ও ঠাকার সিং সন্ধ্যাওয়ালিয়া। বিভিন্ন শিখ তত্ত্ববিদের সাথে খ্যাতিমান জ্ঞানী জ্ঞান সিং সক্রিয় আগ্রহ দেখান।

১৫. ব্রিটিশদের প্রতি মোসাহেবী বিশ্বস্ততার মনোভাব বিদায়বার্তা থেকেই বোঝা যায় যা শ্রী গুরু সিং ও মান সিং হয়ে লর্ড রিপনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। যিনি গোল্ডেন টেম্পল কমিটির প্রেসিডেন্ট : 'আমাদের দলের ব্রিটিশদের প্রতি অনেক সম্মান আছে। আমরা তার আদেশ পালনে পুরোপুরি ও ধর্মীয়ভাবে বাধ্য; এই কর্তব্যে বিরতি নেয়ার কারণ হিসেবে আছে আমাদের মহান গুরুর ইচ্ছা, অবিনশ্বর স্রষ্টা এবং যে যখন আমাদের দরকার তখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়, আমরা আপনার বিষয়ে সকল কর্তব্য করতে চাই, মুকুটের সম্মান উজ্জ্বল করতে ও তা বজায় রাখতে চাই; যেন আমরা দেশমাতৃকার প্রিয়

সন্ধ্যাওয়ালিয়া এবং সেক্রেটারি ছিলেন জ্ঞানী জ্ঞান সিং। সরকার এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষামূলক অভিযানে পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি করে।^{১৬}

১৮৭৯ সালে লাহোরে আরেকটি সিং সভা তৈরি করা হয়। এই সভায় নেতারা ছিল শিক্ষিত ও উদ্যমী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দল।^{১৭} পাঞ্জাবের গভর্নর, স্যার রবার্ট এগারটন, এর পৃষ্ঠপোষক হতে রাজি হন এবং ভাইসরয় লর্ড ল্যান্ডাউনকে সমর্থনের জন্য প্ররোচিত করেন।^{১৮} লাহোর সিং সভা অনেক শহরে শাখা খোলে, গ্রামে মিশনারী পাঠায়, শিখ রেজিমেন্টের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, এবং পাঞ্জাবি ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করে।

১৮৮৩ সালে লাহোর ও অমৃতসর সভা সম্পূর্ণ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল, কিন্তু সভাটি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। অমৃতসরের সভা পরিচালনা করে একটি সহজলভ্য দল যারা রক্ষণশীল ও পুরুষ দ্বারা শাসিত যেমন খেম সিং বেদী, নানকের শেখানো পথে চলে, গুরু থাকার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করে না। লাহোর দলটি পূর্ণ ও শক্তিশালীভাবে ‘গুরু আশ্রমের’ বিরোধিতা করে। অচ্যুত শিখদের সামনে দুই দলের সংঘর্ষ হয় গুরুদুওয়ারাতে প্রার্থনা নিয়ে; রক্ষণশীলদের দলে পাদুরিরা ছিল যারা অচ্যুতদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পূজাবিহীন অবস্থায় প্রবেশের অনুমতি দিল। তর্কযুদ্ধ বাড়তেই থাকল। রক্ষণশীলরা গমন থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তারপর প্রকাশ্যেই শত্রুতা করে।^{১৯}

পুত্র হিসেবে নিজেদের ভাবতে পারি, যদিও আপনার চরণ হতে অনেক দূরে অবস্থান করি এবং ইংল্যান্ডের মানুষকে আমরা দয়ালু ভ্রাতৃবর্গ বলে মনে করি।’ ট্রিবিউন, ১৫ নভেম্বর ১৮৮৯।

১৬. জমিদার বংশীয়দের শিক্ষিত করার ও প্রশিক্ষণ দেয়ার কৌশল নেতৃত্ব দেয়ার জন্য শুরু হয়। লেফটেন্যান্ট গভর্নর, স্যার চার্লস অ্যাটকিনসন কর্তৃক (১৮৮২-৭) লাহোরের অ্যাটকিনসন চিফ কলেজে শুধুমাত্র রাজপুত্র ও ধনী জমিদারের পুত্রদের ভর্তি করা হতো যা হ্রিফিনের রাজাস অফ দ্য পাঞ্জাব-এ তালিকাভুক্ত আছে। একই কৌশলের বৃদ্ধি করা হল, প্রথমদিকে সিং সভার নেতাদের সাথে (যারা ধনী ও শিখ বিশ্বস্ত শ্রেণীতে অনুপস্থিত) এবং ইংরেজ শাসকদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।
১৭. তারা ছিল গুরুমুখ সিং চাকুর, দিত সিং এবং জওহার সিং কাপুর। গুরুমুখ সিং চাকুর (১৮৪৯-৯৮)কে কাপুরথালয় রাজার রন্ধনশালায় পাচকের চাকরি দেয়া হয়েছিল। রাজা তাকে ভাতা দিতেন এবং তার শিক্ষা সম্পন্ন করার পরে তিনি পাঞ্জাবি ভাষায় প্রথম অধ্যাপক হিসেবে অরিয়েন্টাল কলেজে (১৮৮৫) প্রবেশ করেন। তিনি পাঞ্জাবি ভাষায় অনেক বই রচনা করেন। এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়াসহ। দিত সিং (১৮৫৩-১৯০১) ছিলেন পার্টিয়ালার একজন মাজহাবি। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে যারা দয়ানন্দকে অভ্যর্থনা জানাতে ইচ্ছুক এবং পরে তার কঠোর সমালোচনা করে। জওহার সিং কাপুর (১৮৫৯-১৯০১), একজন ক্ষত্রিয় শিখ, যাকে উত্তর-পশ্চিমের রেল পথে একজন কোরানীপদে নিয়োগ দেয়া হয়।
১৮. পার্টিয়ালার এক অনুষ্ঠানে ভাইসরয় বলেন ‘এসব পদক্ষেপের সাথে ভারত সরকার সমব্যথি। আমরা শিখ সম্প্রদায়ের অনেক প্রশংসাযোগ্য চরিত্রের প্রশংসা করি, এবং এটা জেনে আমরা খুশি হই যে, বিগত দিনে আমরা তাদের সাহসী ও ভয়ঙ্কর শত্রু ভেবেছিলাম, আজ আমরা তাদের সত্যবাদী ও বিশ্বস্ততার কাতারে মহারানীর সাম্রাজ্যে স্থান দিতে পারি।’ ট্রিবিউন, ২৩ অক্টোবর ১৮৯০।
১৯. ১৮৮৭-তে উদয় সিং বেদী, খেম সিং বেদীর ভাতিজা, লাহোর সভার মাধ্যমে খালসা আখবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ নথিভুক্ত করে। পত্রিকাটিতে বেদীকে ‘সতীনের গুরু’ বলা হয়েছে। সম্পাদককে

আর্য সমাজের^{২০} দ্রুত বর্ধন ও এর নেতাদের শিখবিরোধী মনোভাব সিং সভার কার্যক্রমের প্রতি হুমকি ছুঁড়ে দেয়। সমাজ ও তার কিছু শিখ সমর্থকদের মাঝে এটা চূড়ান্ত ফাটল তৈরি করে।^{২১}

দুটো সিং সভা আবার একত্রিত হয় এবং দ্বিগুণ কর্মোদ্যমে তাদের নিজেদের কলেজ শুরু করে।^{২২} লাহোরে অনেক মানুষ মিলে একটি পরিকল্পনা করে; গোল্ডেন টেম্পল থেকে হুকুমনামা নিয়ে শিখদের জিজ্ঞাসা করা হয় কলেজ নির্মাণের জন্য তাদের আয়ের দশভাগ দেয়ার (দশমাংশ) জন্য। ইংরেজ হিতৈষীরা লন্ডনে একটি কমিটি গঠন করে ইংল্যান্ড থেকে আর্থিক সহায়তা পাবার জন্য।^{২৩} শিখ রাজপুত্ররা ভাইসরয় ও কমান্ডার-ইন-চিফের কথায় উৎসাহিত হয়ে মোটা অংক দান করে। ইংরেজ— ভারতীয় সিভিল ও মিলিটারি গেজেট উৎসাহের সাথে কারণটিকে সমর্থন করে। পুরো প্রদেশ জুড়ে টাকা উঠানো হলো। ৫ মার্চ ১৮৯২-তে লেফটেন্যান্ট গভর্নর, স্যার জেমস লায়াল, যিনি দানে ব্যক্তিগত ইচ্ছা দেখিয়েছেন, তিনি অমৃতসরের খালসা কলেজে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।^{২৪}

জরিমানা করা হল এবং কিছু সময়ের জন্য লাহোর সভার প্রকাশনা সংস্থা বন্ধ রাখা হল। ট্রিবিউন, ৭ মার্চ ১৮৮৮।

২০. প্রদেশে আর্য সমাজ অনেক বিদ্যালয় চালু করে। ১৮৮৬-তে, লাহোরে ডিএভি (দয়ানন্দ অ্যাংলো-ভেদিক) কলেজ চালু হয়।

২১. ১৮৮৮-এর নভেম্বরের আর্য সমাজের পাঞ্জাব শাখার এগারোতম বার্ষিক সম্মেলনে বজারা আবারও শিখত্বের অপমান করে। অধ্যাপক গুরু দত্তা বলেন, ‘স্বামী মুন্সি একজন জেনারেল হতে চান, তাকে বোনাপার্টের চেয়ে হাজারগুণে গুণান্বিত বলে প্রমাণ করতে হবে...হ্যাঁ, এমনকি কেশর চন্দর (সেন) এবং গুরু গোবিন্দ সিং আমাদের স্বামী দয়ানন্দ স্বরসতীজীর এক শতাংশও ছিলেন না। শিখদের নিজস্ব কিছু ধর্ম অবশ্যই আছে, কিন্তু তাদের গুরুর কোনো শিক্ষা নেই যদিও...যদি স্বামী দয়ানন্দ স্বরসতীজী মহারাজ গুরু নানককে একজন দস্তীভেও, (প্রতারক) বলেন, সেহেতু এতে ক্ষতিটা কি? তিনি (স্বামীজী) তার হাতে বেদের শিক্ষার আলো পেয়েছেন...তিনি কারও দ্বারা দমনের পাত্র নন।’ গান্দা সিং, হিন্দি অফ দ্য খালসা কলেজ, পৃ-৮।

২২. জওহার সিং কাপুল অমৃতসরে সভা ডেকে তার শিখ শ্রোতাদের বলেন যে, আর্য সমাজের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আছে সংস্কৃত ও বেদ শিক্ষার জন্য, মুসলমানরা আলীগড়ে কোরান শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, কিন্তু গুরুমুখী ও গ্রন্থ শিক্ষার জন্য শিখদের কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। ট্রিবিউন, ১৫ আগস্ট ১৮৯০।

২৩. কলেজ কমিটির ট্রাস্টিতে শিখ ও ইংরেজ উভয়ই ছিল। তারা ছিলেন নাভার মহারাজা প্রতাপ সিং, ভাদৌরের স্যার আন্তার সিং, গুরুদয়াল সিং, ধরম সিং, দেওয়ান গুরুমুখ সিং পাটিয়ালার, জনাব বেল, কর্নেল হলরয়েড ও জেনারেল ব্ল্যাক, সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট, মে ৯, ১৮৯০।

২৪. প্রধান শিক্ষক হিসেবে একজন ইংরেজ, ডা. এস.সি. গুমানকে নিয়োগ দেয়া হয়। পাঞ্জাব উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারক, ডব্লিউ. এইচ. রাটিগানকে কলেজ প্রতিষ্ঠা কমিটির প্রেসিডেন্ট বানানো হয়, যা ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাদৌরের স্যার আন্তার সিং এবং সেক্রেটারি জওহার সিং কাপুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের কৃতজ্ঞতা বোঝা যায় কলেজের নামকরণের প্রস্তাবে। নাভার মহারাজা চান নাম ‘লয়েল লায়াল খালসা কলেজ’ (গুরুমুখ সিংকে ২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯-এর পত্রে) হোক; প্রতিষ্ঠাতা

এটা একটি অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠান যেমনটি সিং সভা যেগুলোর নিজস্ব রাজনীতির পাশাপাশি অনেক ভিন্নধর্মী কাজ করে থাকে। এগুলো ১৯০২-এ গঠিত হয়। প্রধান খালসা দিওয়ানের 'মুকুটের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।' শিখ ও সাথে সাথে অন্যান্য গোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চয়তার জন্য এবং শিখদের সংখ্যা কাজের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা নির্দিষ্টভাবে সেনাবাহিনীর জন্য। এসবের মধ্যে যোগ্য নেতা ছিলেন সুন্দর সিং মাজিথিয়া।^{২৫}

সিং সভার কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল শিক্ষা ও সাহিত্য। ১৯০৮ থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিবছর একটি শিক্ষাসভা বসে গোষ্ঠীতে সাহিত্যের উন্নতি দেখার জন্য এবং আরও বিদ্যালয় তৈরি ও টাকা সংগ্রহের জন্য। গুরুমুখী ও শিখ ধর্মগ্রন্থ পড়া এসব খালসা বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ছিল।^{২৬}

শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কারণে বই প্রকাশনা,^{২৭} পত্রিকা, নিবন্ধ ও সংবাদপত্র বেশি প্রকাশিত হওয়া শুরু করে। পাঞ্জাবি সাংবাদিকতার সবচেয়ে প্রথম বিপজ্জনক কাজ ছিল সাপ্তাহিক খালসা আখবার। ১৮৯৯ সালে খালসা সমাচার-এর প্রচলন হয় এবং দ্রুতই গোষ্ঠীর নামে প্রধান পত্রিকায় পরিণত হয়।^{২৮} বীর সিং-এর

কমিটি নাম রাখতে চান শুধু লায়েল খালসা কলেজ। শুধুমাত্র স্যার জেমসের অলসেমিতে কলেজটি লায়েল বা লায়েল নাম হতে বেঁচে যায়।

২৫. স্যার সুন্দর সিং (১৮৭২-১৯৪১) মাজিথিয়ার একজন শিষ্য, যিনি মহারাজা রনজিত সিং-এর কাজ করতেন, ছিলেন অমৃতসরের কাছে মাজিথিয়া গ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ জাট। তিনি ব্রিটিশ রাজত্বের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। তিনি ১৯০২ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত চিফ খালসা দেওয়ানের সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯২০ থেকে আমৃত্যু তিনি খালসা কলেজ কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি প্রাদেশীয় সভার ও কেন্দ্রীয় সম্মেলনের একজন সদস্য ছিলেন এবং অসংখ্য মন্ত্রীত্বপদ দেখভাল করেন। মাজিথিয়া ছিলেন বিত্তশালী জমিদার ও একজন চিনি ব্যবসায়ী। তার কথা উল্লেখিত পৃষ্ঠাগুলোতে অনেকবার আসবে।

সুন্দর সিং মাজিথিয়ার ঊর্ধ্বতন সহকর্মীরা ছিলেন আন্তারিক হার্বনস সিং (সাবাওনের নেতার পৌত্র) এবং অর্জন সিং বাগারিয়ান, যার পরিবার শিখ অভিজাত্যে ধর্মীয়দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল।

২৬. ১৮৫৬ সালে পাঞ্জাব সরকারের শিক্ষা বিভাগ তৈরি হয় এবং বিদ্যালয় তৈরির সাথে স্বাধীনভাবে মসজিদ, মন্দির বা গুরুদুওয়ারা তৈরি করা হয়। যার সাথে তারা তখন পর্যন্ত ছিল। উত্তর-পশ্চিম পাঞ্জাবে স্যার খেম সিং বেদী খালসা স্কুল তৈরিতে মূল ভূমিকা রাখেন। আরও শিখ বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। অমৃতসরে, লাহোরে, ফিরোজপুরে এবং কিছু গ্রামে যেমন-কাইরন, ঠরজাখ, চুহারচাক এবং ভাসৌরে। একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল ফিরোজপুরের শিখ কন্যা মহাবিদ্যালয় যা তখত সিং প্রতিষ্ঠা করেন।

২৭. আঞ্জমান-ই-পাঞ্জাব (১৮৬৫-তে প্রতিষ্ঠিত) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইংরেজি বই পাঞ্জাবি ভাষায় অনুবাদ করায় দায়ী ছিল। ১৮৭৭ সালে লাহোরের অরিয়েন্টাল কলেজে পাঞ্জাবি নামে একটি বিষয় চালু হয়; পাঞ্জাবি ভাষাকে জনপ্রিয় করার জন্য ১৮৮২ সালে সিং সভা একটি পাঞ্জাবি প্রকারিণী সভা স্থাপন করে।

২৮. বারোটিরও বেশি কাগজপত্র সিং সভার কার্যকলাপে তাদের ভূমিকা রাখে। সুকবী সুবোধিনী, অমৃতসর (১৮৭৫); অকাল প্রকাশ, অমৃতসর (১৮৭৬); গুরুমুখী আখবার, লাহোর (১৮৫০); খালসা প্রকাশ, লাহোর (১৮৮৪); শ্রী গুরমাত প্রকাশ, রাওয়ালপিন্ডি (১৮৮৫); পাঞ্জাব দর্পণ, অমৃতসর (১৮৮৫); খালসা আখবার পুনরায় লাহোরে ১৮৮৬ থেকে শুরু হয়; এবং দ্য বিদ্যারাক,

সম্পাদনার অধীনে থাকায় এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যিনি উঠতি গল্পকার, কবি এবং পাণ্ডুলিপিলেখার বক্তা^{২৯} ছিলেন। বীর সিং আরও খালসা ট্রাস্ট সোসাইটি শুরু করেন এবং শিখ ইতিহাস ও ধর্মের বিভিন্ন দিক সাহিত্যে তুলে ধরেন।

শিখত্ব, গুরুমুখী ও ইংরেজি উভয়ই বিষয়ে অনেক বই প্রকাশিত হয়। গুরুমুখীদের মধ্যে জ্ঞানী জ্ঞান সিং-এর পাছ প্রকাশ ও তাওয়ারিখ গুরু খালসা এবং কাহান সিং-এর খণ্ডে বিভক্ত শিখ সাহিত্যের এনসাইক্লোপেডিয়া (গুরু শব্দরত্নাকর মহাকোষ) অনেকদিন গুরুত্ব পায়। এম.এ. ম্যাকৌলিফের জীবন সম্পর্কে ও শিখ গুরুর^{৩০} শিক্ষাদান সম্পর্কেও একটি স্মৃতিমালা এইসময় প্রকাশিত হয়।

শিখ সভার কাজ শুধু হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত শিখকেই খুঁজে বের করা নয় বরং হিন্দু ক্যাম্পে ধর্মান্তরিত করা। উত্তর ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অনেক হিন্দুরাই এবং সিন্ধুরা সহজধারী শিখে পরিণত হয় এবং সহজধারীরা খালসা নাম ধারণ করে^{৩১}। পাঞ্জাবে আর্থ সমাজের গড়ে ওঠা ও বর্ধিতকরণের ফলে হিন্দু-শিখ সম্পর্ক চূড়ান্ত হয় এবং প্রদেশে ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক সক্রিয়তা শুরু হয়। সমাজের দ্বারা যে সুধী ধর্মবিরুদ্ধ অভিযান শুরু হয়েছিল শিখরা তা হিংস্রভাবে প্রতিবাদ করে। যত বেশি সমাজপতিরা দাবি করে যে শিখধর্ম হিন্দুধর্মের শাখা, ততই শিখরা জোর দিয়ে বলে যে তারা ভিন্ন ও আলাদা সম্প্রদায়। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ঘনিষ্ঠ সামাজিক সম্পর্ক ভেঙে দেয় যা দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে ছিল। একটি বইয়ের প্রকাশনার দেখা যায়—হাম হিন্দু নেহি হে—আমরা হিন্দু নই—যা বিদ্বান কাহান সিং লিখেছেন। যিনি তখনকার নাভার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। যদিও ১৯২০ সালে সিং সভার কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে তবু এটা বৈধতা হারায় হিন্দুদের প্রতি সমানে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

দয়ানন্দের শিক্ষার মাঝেও দৃঢ় রাজনৈতিক গন্ধ ছিল। বেদ পরবর্তী পরিবৃদ্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের শুদ্ধিকরণের তিনি দাবি করেন, তিনি হিন্দু নয় সমাজের প্রাধান্য থেকে হিন্দু সমাজকে পৃথক করার ইচ্ছা পোষণ করেন। ইসলাম ও

লাহোর (১৮৮৬); দ্য খালসা গেজেট ও লয়াল গেজেট (যেটা পরবর্তীতে শের-ই-পাঞ্জাব হয়) উর্দুতে প্রকাশিত হয়।

২৯. পরিশিষ্ট ১ দেখুন।

৩০. দ্য শিখ রিলিজিওন ছয় খণ্ডে ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয় অক্সফোর্ড মহাবিদ্যালয় প্রেস কর্তৃক।

৩১. নিম্নোক্ত হিসাব দ্বারা শিখ জনতার বৃদ্ধি দেখানো যায়।

বর্ষ	শিখদের প্রকৃত সংখ্যা	ভিন্নতার শতাংশ শিখ	মোট জনসংখ্যা
১৮৮১	১,৭০৬,১৬৫		
১৮৯১	১,৮৪৯,৩৭১	+৮.৪	+১০.১
১৯০১	২,১০২,৮৯৬	+১৩.৭	+৬.৩
১৯১১	২,৮৮৩,৭২৯	+৩৭.১	+২.২
১৯২১	৩,১১০,০৬০	+৭.৮	+৫.৭

পাঞ্জাব আদমশুমারি রিপোর্ট, ১৯২১।

খ্রিস্টানধর্মের প্রতি তার সমালোচনার প্রভাব ভারতীয় মুসলিম ও ইংরেজদের উপর পড়ে। পাশাপাশি আর্য সমাজ কর্তৃক হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ় মুসলিমবিরোধী ও ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব ছিল যা প্রায়ই পাঞ্জাবি হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মুখে উচ্চারিত হতো, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিল আর্য সমাজপতিরা, যেমন— লাজপাত রায়,^{৩২} অজিত সিং, হংস রাজ এবং বেশিরভাগ পাঞ্জাবি হিন্দু সন্ত্রাসীরা, আর্য সমাজপতিদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি কর্তৃত্ব থাকার কারণে হিন্দু পুনরুত্থানের জন্য স্বাধীনভাবে চলাচলের অনুমতি দেয় এবং এটাই মুসলিম ও শিখদের আলাদাকরণের মূল কারণ ছিল।^{৩৩}

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

৩২. লালা লাজপাত রায় (১৮৬৫-১৯২৮), পাঞ্জাবের অন্যতম বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তিনি হিন্দু-শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সক্রিয় সমাজপতি ও কিছুদিনের জন্য হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন।

৩৩. ড. গ্রিসওন্ডের কার্যকলাপ আলো ছড়ালো। 'পণ্ডিত দয়ানন্দের শ্লোগান বেদে ফেরত এলো। এই ধর্মীয় শ্লোগানের সাথে সাথে, অন্য অন্তর্গত শ্লোগান, বর্হিগত নয় বরণযুক্ত হল, যাকে ভারতীয়দের জন্য ভারত বলা হতো। এই দুটোর মিলনের ফলে আমরা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় আদর্শই পেয়েছি, ধর্মের পাশাপাশি ভারতের সার্বভৌমত্বও ভারতের জনগণের সম্পদ, অন্যভাবে বলা যায়, ভারতীয়দের জন্য হিন্দুধর্ম এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব।' ইন্ডিয়ান ইভান জেলিকাল রিভিউ, জানুয়ারি ১৮৯২, ফারকুহার কর্তৃক উদ্ধৃত, মর্ডান রিলিজিয়াস মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া, পৃ-১১১-১২।

ଚତୁର୍ଥ ପର୍ବ

রাজনৈতিক আন্দোলন, মার্কসবাদী, জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা

নদীঘেরা মরুভূমির প্রচারণা, চাকরিক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যব্যবস্থার প্রবর্তন শিখ সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছে। এইসকল পরিবর্তন ভূমির উপর চাপ কমিয়ে কৃষক সমাজকে উন্নতির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। কয়েক বছরের মধ্যে জমি বিভক্ত হয়ে যায় এবং কোন অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে না। গ্রামে ঋণপ্রথা বৃদ্ধি পায়। যে সকল পরিবার আয় করতে সক্ষম তারা তাদের সন্তানদের অন্য চাকরিতে নিয়োগ করে অথবা ভবিষ্যৎ ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় বিদেশে পাঠায়। এভাবে শিখ সমাজ বার্মা, মালয়, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন এবং চীনে বসতি স্থাপন করে। তারা এশিয়ান উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে কানাডা এবং আমেরিকায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় দেশগুলোয় ব্যবসা শুরু করে। আমেরিকায় শিখরা জাতিগত বিভেদ উপেক্ষা করে বসতি স্থাপন করে। এর ফলে তাদের মনে বিদেশীদের সম্পর্কে অহেতুক ভয়ের সৃষ্টি হয়। এ থেকেই হয় মার্কসবাদের সূত্রপাত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ রাজাদের নিয়ে উত্তেজনা কমে আসে। কানাডিয়ান এবং আমেরিকানদের বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের বিরুদ্ধে সরকারের অসহযোগিতা, সাংবিধানিক অপব্যবহার, অমৃতসরে গুলিবর্ষণ এবং সর্বোপরি শিখ পণ্ডিতদের ক্ষমতা হ্রাস ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ বাড়ায়। এর ফলে তিনটি দলের আবির্ভাব হয়—সাম্যবাদী, জাতীয়তাবাদী এবং আকালি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কার্যক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এই তিনটি রাজনৈতিক দল এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল আকালি।

গ্রামীণ ঋণগ্রস্ততা এবং বিক্ষুব্ধ কৃষক সমাজ

পাঞ্জাব কৃষকদের উন্নয়ন এবং ঋণসমস্যা

মরু অঞ্চলে খাল খনন এবং কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা পাঞ্জাবকে উন্নতির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। কিন্তু এই উন্নতির এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক পরিবর্তন পাঞ্জাবের সমাজে পরিবর্তন আনে। এর মধ্যে একটি হলো জমির দাম বৃদ্ধি। ১৮৭০ সালে প্রতি একর জমি ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি হয়ে শত টাকা প্রতি একরে পরিণত হয়।^১ জমি সবচেয়ে দামি পণ্যে পরিণত হয় এবং প্রান্তিক কৃষকরা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়।^২

১৮৬৯^৩ সালের দুর্ভিক্ষে উচ্চ মৃত্যুহার এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কৃষিবিদরা কর দিতে ব্যর্থ হন এবং ধার করতে বাধ্য হন।

১৮৭০ সালে দেশে অভূতপূর্ব ‘কৃষক ঋণগ্রস্ততা’ দেখা যায়। ১৮৭৭ সালে— আরেকটি দুর্ভিক্ষের বছর—এটি বিপজ্জনকভাবে সামনে আসে। ব্রিটিশ আইন সংস্থা কৃষকদের এই দুরবস্থাকে আরও ত্বরান্বিত করে, কিন্তু জোতদার এবং আইনবিদরা^৪

১. এইচ কালভার্ট-দ্য ওয়েলস এন্ড ওয়েলফেয়ার অফ পাঞ্জাব, পৃষ্ঠা-২১৯। জমির দাম বাড়তেই থাকে। ১৯২৫ সালে এটি ছিল ৪৩৮ টাকা প্রতি একর। ১৯৩৩-১৯৩৪ সালে তা দাঁড়ায় ৪৭৭ টাকা প্রতি একর।
২. ‘ক্রমেই কৃষকেরা মনে করে তারা সীমাহীন সম্পদের অধিকারী এবং তা ব্যবহার করে।’ -রিপোর্ট অন পিজ্যান্ট ইনডেবটনেস এন্ড ল্যান্ড এ্যালিয়েনেশন। পৃষ্ঠা-১০।
যখনই কৃষকরা ঋণ নেয়া শুরু করে তারা স্বনির্ভরতা হারায় এবং অভ্যাসে পরিণত করে। যখন তারা পর্বত প্রমাণ ঋণে নিমজ্জিত হয় তখন সব ভয় তুচ্ছ করে এক টাকা সুদে এক পয়সা ঋণ নিতেও দ্বিধা করে না।
৩. ১৮৬৯ সালের দুর্ভিক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাবের চারটি শহরে প্রায় ৬০,০০০ গবাদি পশু হারিয়ে যায়। ১৮৭৭ সালে একটি পশু মহামারী আঘালার দুই-তৃতীয়াংশ জীবন কেড়ে নেয়। সিরসায়, ১৯১৯-২১ সালে ছয়টির মাঝে পাঁচটি ফসল উৎপাদনই নষ্ট হয়। এর ফলে গবাদিপশু আরও প্রায় ৪০ শতাংশ কমে যায়। এম. ডার্লিং, দ্য পাঞ্জাব পিজ্যান্ট ইন প্রসপেরিটি এ্যান্ড ডেবট-পৃষ্ঠা-৯৭।
৪. ১৮৫৯ সালে নতুন পদ্ধতি চালু হয়। ধার শোধ করার জন্য তিন বছর নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু এর কোন দলিল ছিল না। এর ফলে জোতদাররা আরও দ্রুত আইনি আশ্রয় নেয়। ১৮৬৬ সালে লাহোরের

হয় আরও সমৃদ্ধ। ‘পশুপালনের লভ্যাংশ জোতদারদের অধিকরণের জন্য ইন্ডিয়ান অসহনীয় বাজে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।’ —থর্বান লিখেন ‘এবং এখন পর্যন্ত এই পদ্ধতিই প্রচলিত।’^৫

পাঞ্জাবে জমিদারদের তিনটা সংগঠন— পশ্চিমে আরোরা। কেন্দ্রে খাতাব এবং দক্ষিণে বানিয়া। প্রথম দুই সংঘে হিন্দু এবং শিখ দুটি পাওয়া যায়, কিন্তু তৃতীয়টিতে শুধুই হিন্দু। মুসলিম এবং জাটদের মাঝে জোতদার দেখাই যেত না।

আগে যেখানে জোতদাররা জমির জন্য টাকা ধার দিত না^৬, সেখানে তারা এখন মালিকের সাথে পরিচিত না হয়েও ধার দিতে আগ্রহী। অধিকাংশক্ষেত্রে নকল কাগজ এবং উচ্চ সুদের হার নির্ধারিত হয়। এর ফলে কৃষকরা আরও ঋণে নিমজ্জিত হয়।^৭ তাদের তুলনায় কৃষিবিদরা অনেক কম শোষণ করত। শিখ জাটদের ঐতিহ্যবাহী মদ্যপান প্রথা বিশেষ করে আফিম সমাজে অন্যায়ে সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে।^৮ এছাড়া সকলের জন্য উন্মুক্ত খালগুলোর পানির ব্যবহার নিয়েও ঝগড়াবিবাদ লেগেই থাকত। এভাবে শিখ জাটরা নৃশংসতায় জড়িয়ে পড়ে এবং কোর্টে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণের জন্য আরও টাকার দরকার হয়।

ঋণ গ্রহণের আরও অনেক কারণ ছিল— উৎসবে অতিরিক্ত খরচ; যেটুকু প্রথা, এমনকি যেখানে নারী সংকট সেখানে পণপ্রথাও চালু ছিল।^৯ ভারতের অন্যান্য জাতির চেয়ে পাঞ্জাবিরা অনেক বেশি কলহপ্রিয়।^{১০} অর্ধেকের বেশি মানুষ প্রতিবছর আদালতে হাজিরা দেয় এবং ৩-৪ কোটি রুপি খরচ করে। এছাড়া অতিরিক্ত

প্রধান আদালতে এভিডেন্স অ্যাক্ট এবং কন্ট্রাস্ট অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইন উকিল এবং তাদের মক্কেলদের মামলা করার প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দেয়। ১৮৭৪-৭৫ সালে মানসিক আদালতে ঋণ অধিগ্রহণ কৃষকদের আরও দুর্বল করে দেয়। তার আগে জেলা কর্মকর্তাগণ কৃষকদের সমস্যা এবং কর সংক্রান্ত ব্যাপার সস্তা, সাধারণ ও সমানভাবে সমাধান করত। মানসিক অবস্থা শহুরে হওয়ায় তারা গ্রাম্যকার্যবলী সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। কঠোর এবং দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে তারা এসব সমস্যা সমাধান করত। রিপোর্ট অন পিজ্যান্ট ইনডেবটনেস এ্যান্ড ল্যান্ড অ্যালিয়েনেশন। পৃষ্ঠা-৪৭।

৫. ইবিদ পৃষ্ঠা-১১।

৬. ১৯০২ থেকে ১৯১৭ সালের মাঝে জোতদারদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়। ১৯০২ সালে পাঞ্জাবে ৮,৪০০ নিবন্ধিত জোতদার ছিল। ১৯১৭ সালে তাদের সংখ্যা ১৫,০০০-এর বেশিতে পরিণত হয়। এইচ কালভার্ট, দ্য ওয়েলথ এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পাঞ্জাব পৃষ্ঠা-২৫৫।

৭. জোতদারদের নির্মম হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। থর্বান লিখেন, একজন সং জোতদারও একজন স্বচ্ছল কৃষককে তিন বছরের মধ্যে নিঃশ্ব করতে পারে। রিপোর্ট অন পিজ্যান্ট ইনডেবটনেস এ্যান্ড ল্যান্ড অ্যালিয়েনেশন। পৃ-৭।

সুদের হার ছিল ৫০ শতাংশ এবং শস্য দ্বিগুণ।

৮. ফিরোজপুরের শিখরা মদ্যপান, আফিম, অন্যায়ে ও নৃশংসতার জন্য কুখ্যাত।

৯. ১৯২৫ সালে প্রকাশিত সিভিল জাস্টিস কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, সংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে পাঞ্জাবিরা মামলা করে। প্রায় ৪০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজিরা দেয়। দ্য ওয়েলথ এ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফ পাঞ্জাব, পৃ-৩৭২।

জনসংখ্যাও এই সময়ের জন্য দায়ী। ১৮৫৫ থেকে ১৮৮১ সালে প্রায় ২০ শতাংশ^{১০} জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।^{১১} জমির প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। আবাসন সমস্যাও দেখা দেয়। খাল খনন ও ব্যবহারের মাধ্যমে যে সুখ-শান্তির সময় আসছিল তা শীঘ্রই শেষ হয়ে গেল।

জমি বিচ্ছিন্নতাকরণ আইন ১৯৯০

পশ্চিমের জেলাগুলোতে শোষিত কৃষকেরা হিন্দু এবং শিখ জোতদারদের গণহারে হত্যা শুরু করে।^{১২}

এখন সরকার হতাশ কৃষক সমাজের বিপদ বুঝতে পারল—বিশেষ করে এখান থেকে আর্মি—যারা নিরাপত্তাকার্যে^{১৩} নিয়োজিত ছিল—সেই খরচ উঠে আসত। জমি

১০. প্রথম (১৮৫৫) এবং তৃতীয় (১৮৮১) সালের আদম শুমারীর সঠিক তুলনা করতে প্রায় দু'টি তথ্যের সংযুক্তি প্রয়োজন। দিল্লি অঞ্চল—দিল্লি, গুরগাঁও, কর্ণালের অংশবিশেষ, হিসার এবং রহটক—এর আদম শুমারী এন.ডব্লিউ সরকার ১ম জানুয়ারি ১৮৫৩ সালে পরিচালনা করে। সেখানে ভাটিয়ালা বা সিরমা উপনিবেশে গ্রাম থেকে গ্রামে ১৮৫২ থেকে ১৮৬৩ সালে পরিচালনা করা হয়। ইবেটসন'স রিপোর্ট অন পাঞ্জাব সেনসাস ১৮৮১।

১১. ১৮৯৬ সালে শিয়ালকোটের একটি গ্রামের উপর ভিত্তি করে তথ্য লিখেন— “বিচ্ছিন্নতা এত বেড়ে গিয়েছিল যে স্বচ্ছল পরিবারগুলোর পাঁচ একরের কম চাষযোগ্য জমি ছিল। জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট হলেও, খরার বছরগুলোতে যথেষ্ট ছিল না। পিজ্যান্ট ইনডেন্টিনেস এন্ড ল্যান্ড অ্যালিয়েনেশন পৃ. ২। কালভার্টের মতে, মাথাপিছু ৭-৮ একর জমি বরাদ্দ ছিল এভাবে— শতকরা ১৭.৯ ভাগ লোকের এক একরেরও কম জমি ছিল, অর্থাৎ মোট জমির এক শতাংশ। শতকরা ৪০.৪ জন লোক ১-৫ একর জমির মালিক ছিল, মোট জমির ১১ শতাংশ। শতকরা ২৬.২ ভাগ লোক ৫-১৫ একর জমির মালিক ছিল, মোট জমির ২৬.৬ শতাংশ। শতকরা ১১.৮ ভাগ লোক ১৫-৫০ একর জমির মালিক ছিল, মোট জমির ৩৫.৬ শতাংশ। শতকরা ৩.৭ ভাগ লোক ৫০ একরের বেশি জমির মালিক, মোট জমির ২৫.৭ শতাংশ। এইচ. কালভার্ট, দ্য ওয়েলথ এন্ড ওয়েলফেয়ার অফ দ্য পাঞ্জাব, পৃ. ১৭২-৩।

১২. মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মুসলমান ছিল। তারা কমপক্ষে ৫০-৬০ কোটি রুপি ঋণগ্রস্ত ছিল। দ্য পাঞ্জাব পিজ্যান্ট ইন প্রসপেরিটি এ্যান্ড ডেবট পৃ. ১৯-২০। ১৯২১ সালের আদম শুমারী প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিতে পারে না। কিন্তু তিন সম্প্রদায়ের কৃষিজীবীদের অনুপাত এরকম ছিল।

	কৃষিজীবী	অ-কৃষিজীবী	মোট
মুসলিম	৬,৭২৮,০০০	৪,৭১৬,০০০	১,১৪৪,০০০
হিন্দু	২,২১১,০০০	৪,৩৬৮,০০০	৬,৫৭৯,০০০
শিখ	১,৫৩৮,০০০	৭৮৪,০০০	২,২৯২,০০০
	১,০৪৪,৭০০০	৯,৮৬৮,০০০	২,০৩১,৫০০০

কালভার্ট, ওয়েলথ এন্ড ওয়েলফেয়ার অফ পাঞ্জাব পৃ-২৬৯।

১৩. লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ডি ফিটসপ্যাট্রিক বলেন, “যদি জমির মালিকরা শ্রমিকে পরিণত হয় তবে তারা রাজনৈতিক বিপদের কারণ হবে। অ্যাগ্রিকালচার ইনডেন্টিনেস এন্ড ল্যান্ড ট্রান্সফারস ওও পাঞ্জাব করেশনপনডেন্স পৃ-২।

বিচ্ছিন্নতাকরণ আইন জোতদারদের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচানোর একটি প্রয়াস ছিল। এটি বেআইনি জমি বন্ধক নিষিদ্ধ করে। এটি অন্য পেশার মানুষের কাছে জমি বিক্রি নিষিদ্ধ করে। এই নিয়মগুলোর যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জমি লিজের সময় কমিয়ে পাঁচ বছরে আনা হয়।

যদিও এই আইন কৃষকদের নিরাপত্তা দিতে সক্ষম হয়, কিন্তু এতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে। কৃষিজীবী নাকি অন্য পেশার—এটি পেশা নয় বরং সম্প্রদায় দ্বারা নির্ণয় করা হয়। তাই জাট, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায় কৃষিজীবী বলে চিহ্নিত হলেও সংখ্যালঘু ক্ষত্রিয়, অরোরা এবং বেনিয়ারা এই ভাগে পড়ে না। তাই, জাট জোতদার এবং কৃষক অরোরাদের জন্য এটি কোন সমাধান আনে না। জনসংখ্যার এই সাম্প্রদায়িকতাকরণের থেকে গুরুতর আর কিছুই ছিল না। কোন শ্রেণীবিভাজন নেই বলে মুসলমানেরা এত আক্রান্ত ছিল না, যতটা না ছিল হিন্দুরা।

হিন্দীভাষী হিন্দু জাটের সংখ্যা হরিয়ানায় বেশি হলেও, পাঞ্জাবি ভাষী ক্ষত্রিয় এবং অরোরা হিন্দুরা কম ছিল। সাম্প্রদায়িক বিভেদ কাটাতে তাদের অনেক সময় লাগে। কিছু ক্ষত্রিয় এবং অরোরা শিখ কৃষিজীবী হওয়ায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাটদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। জমি বিচ্ছিন্নতাকরণ আইন জাট এবং জাট নয় এমন সম্প্রদায়ের মাঝে মারাত্মক সংঘাতের সৃষ্টি করে। তাই জাট শিখরা জাট মুসলমান ও হিন্দুদের সংস্পর্শে আসলেও ক্ষত্রিয় ও অরোরা শিখরা হিন্দুদের সাথেই সম্পর্ক গড়ে তোলে।

রাজনৈতিক জীবনে অর্থনৈতিক ফায়দা লোটার জন্য জাট শিখরা জাট নয় এমন শিখদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিভেদ সামাজিক জীবনেও প্রভাব ফেলে। শিখ জাটরা হিন্দু জাট পরিবারে বিয়ে করতে আগ্রহী, সেখানে ক্ষত্রিয় এবং অরোরারা নিজেদের মাঝে সম্পর্ক করতে ইচ্ছুক। শিখদের মাঝে তৃতীয় একটি সমাজের আবির্ভাব হয়—অস্পৃশ্য। শিখ অস্পৃশ্যদের কাছে উচ্চবংশীয় শিখদের চেয়ে হিন্দু অস্পৃশ্যরাই বেশি আপন বলে মনে হয়। মোট কথা, জমি বিচ্ছিন্নতাকরণ আইনে ধর্মের চেয়ে সম্প্রদায় বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। শিখ সমাজ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়—জাট, জাট নয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) এবং অস্পৃশ্য (মাসহাবি, রামদাসী, কবির পত্নী, প্রভৃতি)।

কৃষক সংগ্রাম ১৯০৭

জমি বিচ্ছিন্নতাকরণ আইন জোতদারদের হাত থেকে কৃষিযোগ্য জমি বাঁচালেও তারা পল্লী সুদ সমস্যার কোন সমাধান করতে পারে না। পাঞ্জাবে দুর্যোগ দেখা দেয়। কিছু জেলায় খরা দেখা দেয়। পুরো পাঞ্জাবে প্লেগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে এবং চার মিলিয়নের উপরে মানুষ মারা যায়। কিন্তু প্রশাসন এই ব্যাপারে

নিশ্চুপ থাকে। বরং নতুন ব্যবস্থায়^{১৪} কর আরও বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং কর প্রদানে ব্যর্থদের জন্য কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়।

চেনাব খালকে ঘিরে একটি নতুন কলোনী গড়ে ওঠে। কিন্তু একে ঘিরে অসন্তোষ দেখা দেয়। কারণ নতুন বিলে দেখা যায় সরকার এই সকল জমির মালিক এবং কৃষকেরা সামান্য চাষী ছাড়া কিছু না। জমির^{১৫} অধিপতিদের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার উপর গাছ কাটা নির্ভর করে। বাসস্থান এবং পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা নয়, প্রশাসনের ব্যর্থদের শাস্তিপ্রদান বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।^{১৬}

এই আইনের ফলে সবচেয়ে প্রভাবিত জেলা হলো লায়ালপুর (শিখ অধ্যুষিত) এবং রাওয়ালপিন্ডি।

শোষিত কৃষকরা পাঞ্জাবকে আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত করে। এই আন্দোলন পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পাঞ্জাবি অধিপতিরা, যারা ইউরোপীয়ানদের মা-বাপ মনে করত, তারা এই নিচু কালো জাতের উপর আধিপত্য চালাত। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জনগণের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়। ভারতে দাদাভাই এবং রানাডের রাজনীতি তিলক এবং সন্ত্রাসীদের অন্যরকম দীক্ষায় দীক্ষিত করে। “স্বরাজ আমাদের জন্ম অধিকার” তিলক ঘোষণা দেয়। “তোমরা যদি আমাদের স্বরাজ থেকে বঞ্চিত কর আমরা তোমাদের ধুলায় পরিণত করব”—তিলক ঘোষণা দেয়। ভারতের উপর দিয়ে যে ক্ষোভ আর অসন্তোষের ধারা চলছিল তা যেন পাঞ্জাবকে স্পর্শ করে যায়।

শহরে রাজনীতিবিদরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। জাতীয়তাবাদী প্রচার মাধ্যমগুলো একে সমর্থন করে। কলোপ্রাইজেশন বিল সাদা-কালোর বিভেদ আরও বাড়িয়ে তোলে।

ভারতীয় প্রচার মাধ্যম এবং পাঞ্জাব আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই আইনের কঠোর সমালোচনা করে। শিখদের পক্ষে প্রতাপ সিং আউলিয়া বলেন, আইন সরকারকে জমিদার এবং প্রশাসন দু’টোতেই পরিণত করে^{১৭} এবং কৃষকদের কোন আইনি সহায়তা দেয় না। তার এই কথা আমলেই নেয়া হয় না।

যখন কলোমাইজেশন আইন তুমুল আলোড়ন তুলছে তখন রাওয়ালপিন্ডিতে একটা নতুন আইন পাস হয়।^{১৮} বারি দোয়াব থেকে পানির জন্য যে কর নেয়া হতো তা বাড়িয়ে দেয়া হয়।

১৪. ১৮৯১ সালে পাঞ্জাবে ১,৫০০,০০০ টাকার কর জমি থেকে আদায় করা হয়। ১৯০৬ সালে তা ৩০ শতাংশ বেড়ে ১,৯২৫,০০০ টাকায় পরিণত হয়। ও’ডনেল, দ্য কজেস অফ প্রেজেন্ট ডিসকনটেন্ট ইন ইন্ডিয়া পৃ. ৯৪।

১৫. এই বিলে কমপক্ষে প্রতি ক্ষয়ারে ৫৫ গাছ রোপণের প্রয়োজন, কিন্তু অনুমতি ছাড়া কাটা নিষিদ্ধ।

১৬. জে এম দ্যুই, সেটেলমেন্ট কমিশনার, পিএলসিডি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭।

১৭. পিএলসিডি ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ পৃ. ১৩-১৫।

১৮. জমি কর ২৭,৫০০ থেকে বেড়ে ১৮৮৪-তে ৩৬,৪০০-তে এবং ১৯০৪-এ ৪৫০০-এ পরিণত হয়। ও ডেনেল দ্য কজেস অফ প্রেজেন্ট ডিসকনটেন্ট ইন ইন্ডিয়া, পৃ. ১০১।

পাঞ্জাবিদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানোর দায়ে দায়ী করা হয়। ইন্ডিয়া ও হিন্দুস্তানকে প্রজাবিদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত করা হয়।

১৯০৭-এর মার্চ মাসে শহর এবং আক্রান্ত কলোনীগুলোতে আরও উত্তেজনা দেখা দেয়। একটি নতুন গান সবার মুখেমুখে—“পাগড়ি সামাল জাটটা”। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার চার্লস রিভাজ-এর জন্য খালসা কলেজের ছাত্ররা বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।^{১৯} আর্য সমাজ এবং উকিলেরা বড় শহরগুলোতে বিক্ষোভ সভা করে।

সিপাহী বিদ্রোহের ১৫তম বার্ষিকীতে দেশব্যাপী বিক্ষোভের দিন হিসেবে নির্ধারিত করা হয়। কোন জায়গায় বিশেষ করে লায়ালপুরে নেতাদের আত্মগোপন করতে হয়। লাজপত রায়, অজিত সিং প্রমুখ উকিলদের গ্রেপ্তার করা হয়।^{২০} প্রথম দু'জনকে বার্মায় নির্বাসন দেয়া হয়।

এতকিছুর পরও আইনটির সমালোচনা চলতেই থাকে। শিখ সৈন্য^{২১}, যাদের কলোনীতে আত্মীয় আছে—তাদের মাঝে অসন্তোষ দেখা দেয়। লর্ডমিন্টো বিলটিতে ভেটো দেন। জমির কর এবং পানির দাম কমিয়ে আনা হয়।^{২২}

সম্রাটের জন্মদিনকে রাজক্ষমার দিন হিসেবে নির্বাচন করা হয়। পাঞ্জাব নেতারা ছয়মাস নির্বাসনের পর দেশে ফিরে আসেন।^{২৩}

১৯. শিখ রাজনীতির উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব তারা সিং এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম।

২০. ভারত মাতা সমাজের লাজপত রায়, সূফী আমবা প্রাসাদ এবং অজিত সিং এবং ইন্ডিয়ান এডিটর পিভি দাস নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে।

২১. জনাব মোর্লে ভারত সাম্রাজ্যের একজন সচিব বলেন, এই বিক্ষোভের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। হাউস জানেন, শিখরা ভারতের শ্রেষ্ঠ সৈন্য। তাদের সহানুভূতি পেতে এবং শিখ অসন্তোষ প্রশমিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া দরকার। তাই শিখ বসতি কম এমন জেলাগুলোতেই বিদ্রোহ কেন্দ্রীভূত করা উচিত। *ইন্ডিয়ান ডেবেট সেশন ১৯০৭, হাউস অফ কমন্স, ৬ জুন ১৯০৭ পৃ. ১৭৭।*

২২. পানির উপর আবার কর প্রয়োগ অতি গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাবের খালগুলোর উপর ১৯০৬-৭ সালে ৭ মিলিয়ন মূলধন ধরা হয় যা শতকরা ১০.৫ ভাগ লভ্যাংশ আনে। চেনাব খালের উপর এটি প্রায় ২২ শতাংশ। এই জন্যই এত জোরালো বিক্ষোভ দানা বাঁধে। *ও'ডনেল, দ্য কজেস অফ প্রেজেন্ট ডিজকনটেন্ট ইন ইন্ডিয়া পৃ. ৯৮।*

২৩. গ্রেপ্তারকৃত উকিলদের জামিন প্রদানের পূর্বে তাদের পাঁচ মাসের জন্য গাওল এ রাখা হয়। কয়দিন পর জজ জনাব মার্টিনি তাদের ছেড়ে দেয়। কারণ বিচার প্রক্রিয়া ছিল বিশ্বাসের অযোগ্য এবং ষড়যন্ত্রমূলক, *ইবিদ পৃ. ১০০।*

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী প্রক্রিয়া

যুদ্ধে শিখদের অবদান (১৯১৪-১৮)

১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আর্মির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিখদের নিয়ে গঠিত ছিল। যুদ্ধ শুরুর সাথে সাথে শিখদের অংশগ্রহণ বাড়ে। শুরুতে ১৯১৫ সালে ৩৫,০০০ থেকে বেড়ে ১০০,০০০-এর বেশিতে গিয়ে দাঁড়ায়।^১ তারা আর্মির প্রায় এক পঞ্চমাংশ গঠন করে।

ব্রিটিশ ইন্ডিয়া থেকে আশেপাশের অঙ্গরাজ্যের অংশগ্রহণ ছিল আরও বেশি কৌতূহলদীপক। ৬০,০০০-এর বেশি লোক পাটিয়ালা (যে কোন ব্রিটিশ জেলা থেকে বেশি), জিন্ড, কাপুরথাল, নাভা, ফরিদকোট এবং কালসিয়া থেকে যায়। এই জেলার মহারাজা এবং রাজপুত্রদের বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অর্থ ও বিলাসদ্রব্যের ব্যবস্থা করা হয়।

শিখসেনারা ইউরোপে সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সাহসের জন্য তারা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য সম্মান বয়ে আনে। ২২ জন ভারতীয়কে বিশেষভাবে ভূষিত করা হয়, যাদের মধ্যে শিখ ছিল ১৪ জন। এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের একজন দাপ্তরিক কর্মকর্তা বলেন, “এটা সত্যি শিখরা শক্তি ও শৌর্যে স্বল্প সামনে এগিয়ে আছে, যেখানে সমালোচনার কোন অবকাশ নেই।”^২

যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা

যুদ্ধে মানুষ এবং যন্ত্রে শিখদের অবদান সবচেয়ে বেশি। তাই তারা যুদ্ধ জয়ে উল্লসিত এবং তাদের পুরস্কার প্রাপ্তির আশা করতেই পারে। কিন্তু দেখলো আঞ্চলিক কর্মকর্তা এবং পুলিশেরা তাদের নায়কের বদলে খুব সামান্য হিসেবেই ব্যবহার করেছে। প্রথমবারের মতো তারা কানাডিয়ান এবং আমেরিকানদের অসৌজন্যমূলক^৩

১. এম. এস. লে. দ্য পাঞ্জাব এন্ড দ্য ওয়ার, পৃ.৪৪।

২. ইবিদ পৃ ১০৭-৯

শত্রুতার অবসানে শিখ উপদেষ্টারা এগিয়ে আসেন। গজন সিং বলেন, “মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায় থেকে অনেক বেশি লোক আমার সম্প্রদায় থেকে যুদ্ধে গেছে। সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই, কিন্তু প্রায় এক-তৃতীয়াংশ, চার লাখ বীর পাঞ্জাবি ব্রিটিশ সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করেছে। আমরা এই নিয়ে গর্বিত।” পি.এল.সি.ডি. ২০ নভেম্বর ১৯১৮ পৃ. ৩৮৭-৮।

৩. চ্যান্টার ১২-তে আলোচিত।

আচরণের কথা জানতে পারে। সেই সাথে সদরের প্রায় ৫,০০০ লোকের মৃত্যুদণ্ড ও নির্বাসন-এর কথাও জানা যায়। তাদের গ্রাম্য সহযোগীরা তাদেরকে প্রশাসনের ষড়যন্ত্র, যুদ্ধের জন্য জোরপূর্বক চাঁদা আদায় প্রভৃতি শোষণের কথাও জানায়।^৪

আরও কিছু কারণ যেন আঙুনে ঘি ঢালে^৫। গ্রীষ্ম চলে গেল, রবি শস্যের ফসল ভাল হলো না। জীবন ধারণ আরও কঠিন হয়ে পড়ে।^৬ শহুরে নাগরিকরা প্রায় ১০০-২০০ ভাগ বেশি আয়কর দিতে বাধ্য হয়।^৭ তার উপর সারা দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বছর শেষে (১৯১৮) ১০০,০০০-এর উপর পাঞ্জাবি ফুতে আক্রান্ত হয়। ক্ষোভ আর হতাশা সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। যখন জনগণকে স্বস্তি দিতে সরকারের উপযুক্ত সহযোগিতা প্রদান দরকার ছিল, তখন যেন তারা ঘায়ে নুন ছিটায়।

যুদ্ধের সময় প্রযুক্তআইন তুলে না নিয়ে বরং আরও নির্মম আইন প্রণয়ন করা হয়। পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার মাইকেল ও'ডইয়ার শহুরে বাবু এবং উকিলদেরকে তাদের সরকারের অংশ বলে ঘোষণা করেন।^৮ তিনি জাতীয়তাবাদী নেতাদের রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। রাওলাট বিলকে কেন্দ্র করে^৯ বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছিল তাও তিনি শক্তহাতে দমন করেন। পাঞ্জাবে স্যার সিডনি রাওলাট “রাওলা” নামে পরিচিত হন। শ্লোগান তৈরি হয়, “দিল্লি নয়, উকিল নয়, আপিল নয়।” যাই হোক, ১৯১৯ সালের মার্চে বিলটি প্রকাশিত হয়।^{১০}

মহাত্মা গান্ধী, যিনি রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। দাঙ্গার কারণে পুলিশ বিভিন্ন শহরে গুলিবর্ষণ করতে বাধ্য হতো। মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হলেন।

৪. যুদ্ধের শেষ দুই বছরে মানুষের চাহিদা বেড়ে যায়। রাশিয়ার পতন, মাসুদ, মোহাম্মদ, মারি প্রভৃতি জাতির উত্থান এর জন্য দায়ী।
৫. বম্বের গভর্নর লর্ড উইলিংডন এই জোরপূর্বক শোষণ প্রথা চালু করেন। যতক্ষণ না গ্রামবাসী চাঁদা প্রদান করত ততক্ষণ পুলিশ কুয়া বন্ধ করে রাখত। বি.জি. হরনিরাম, অমৃতসর এন্ড আওয়ার ডিউটি টু ইন্ডিয়া পৃ. ২৪।
৬. ১৯১৪তে গমের দাম ৪৭ শতাংশ, বিদেশী কাপড় ১৭৫ শতাংশ, ভারতীয় কাপড় ১০০ শতাংশ, চিনি ৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ড্যামনি সাবমেরিন রণতানী বন্ধ করে। কয়লা সংকটের জন্য রেলযোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।
৭. হান্টার কমিটি রিপোর্ট, ডিজ অর্ডার ইনকয়ারী কমিটি রিপোর্ট, পৃ. ১৫২।
৮. “যদি দেখা যায় অধিকাংশ জনগণ নয়, বরং কিছু মানুষের শক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে এসব দাবী আসছে, তবে আমরা জনগণের পক্ষে রাজনীতিবিদদের সামনে এসব দাবী উত্থাপন করব।” স্যার মাইকেল ও'ডইয়ার কংগ্রেস পাঞ্জাব ইনকয়ারী রিপোর্ট ১৯১৯-২০এ বলেন।
৯. ১৯০৭ থেকে ভারতে স্যার সিডনী রাওলাটের অধীনে একটি কমিটি অন্যান্য-রাহাজানির একটি রিপোর্ট দেয়। এসব নৃশংস রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রশমনের জন্য তারা কতগুলো প্রস্তাব পেশ করেন।
১০. এগুলো ছিল ইন্ডিয়ান ক্রিমিনাল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এবং দ্য ক্রিমিনাল ল' বিল। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রস্তাবিত বিলটি একমাসের ভিতরে পাস হয়।

পাঞ্জাবে এই আন্দোলন বেশ শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। কিন্তু পুলিশ ব্যাপারটি নষ্ট করে দেয়। “হিন্দু-মুসলমান অসহযোগ সমর্থক”-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা: সাইফুদ্দিন কিচলু এবং সত্যপালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারের খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ে।^{১১} জনগণ এটির বিরোধিতা করতে ডেপুটি কমিশনারের বাংলা অবরোধ করে। তাদের থামাতে পুলিশের নির্বিশেষ গুলিবর্ষণে বেশকিছু লোক নিহত এবং তিরিশের বেশি লোক আহত হন। অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং বেশকিছু শ্বেতাঙ্গ লাক্ষিত হন। ইংরেজ অধীনস্থ ব্যাংক চার্চ, খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস এবং টাউন হলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই দাঙ্গায় পাঁচজন ইংরেজ মারা যান।^{১২} কিন্তু ডেপুটি কমিশনারের বোকামির জন্য এই জাতিগত বিদ্বেষ আরও বেড়ে যায়।

জালান্দার থেকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর.ই.এইচ. ডায়ের^{১৩} ট্রুপস্ এবং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হন।

পরদিন বিকেলে যখন তিনি নিজের বাহিনী নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন স্লোগান দেয়া হয় “হিন্দু মুসলমানের জয়”। ‘মহাত্মা গান্ধীর জয়’। সন্ধ্যায় তিনি টেলিগ্রাফ তার কর্তন এবং রেলওয়ে প্লট নষ্ট করার খবর পান। জেনারেল জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং সব ধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু আঞ্চলিক কংগ্রেস বৈশাখী মেলা উপলক্ষে আগেই সভা আহ্বান করে। শিখ, যাদের জন্য পহেলা বৈশাখ খালসার জন্মদিন, সকাল থেকেই জমা হতে শুরু করে। দূরদুরান্তের গ্রাম থেকে আসা গ্রামবাসী যারা জরুরী আইনের কথা শুনে জালিয়ানওয়ালাবাগে সময় কাটানোর জন্য জমায়েত হয়। আঞ্চলিক কংগ্রেস তাদের আগেরদিনের ঘটনা সম্বন্ধে জানানোর সুযোগ পায়। শিখ গ্রামবাসীদের জন্য এটি ছিল শুধুই একটি তামাশা।

জেনারেল ডায়ের সমাবেশের সংবাদ পাওয়ার সাথে জালিয়ানওয়ালার সৈন্য পাঠান। প্রবেশ এবং বাইরের পথ বন্ধ করে দিয়ে কোন প্রস্তুতি ছাড়াই গুলিবর্ষণ শুরু হয়। ৩৭৯ জন নিহত হন এবং ২০০০ মানুষ আহত হন। শহরে কারফিউ জারি করা হয় এবং মুমূর্ষুদের মৃতদের কাছে ফেলে রেখে কোন সাহায্যের ব্যবস্থা না করেই ক্যাম্পে ফিরে যান। স্যার মাইকেল ও’ডয়ার ক্যাম্পে খবরটি পৌঁছালে তিনি সম্পূর্ণ একমত প্রকাশ করেন।^{১৪}

১১. হান্টার কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ডিজঅর্ডারস ইনকয়ারী কমিটি রিপোর্ট পৃ. ৯, “মুসলমান এবং হিন্দুরা একত্রিত। আমি আশা করছি সত্যি কিছু হবে।” কনভিন, লাইফ অফ জেনারেল ডায়ের। পৃ: ১৬৩।

১২. কংগ্রেস পাঞ্জাব ইনকয়ারী রিপোর্ট অনুসারে ২০ জন মারা যান এবং অনেকে আহত হন। পৃ: ৪৮।

১৩. উত্তর ভারতের বিখ্যাত পরিবার ডায়ের মিকিন এবং কোম্পানীর একজন সদস্য আর. ই. এইচ. ডায়ের (১৮৬৪-১৯২৭)। তিনি প্রথমে শিমলায় এবং পরে স্যানটুরেস্ট-এ পড়াশুনা করেন। ১৮৮৬ সালে কমিশনপ্রাপ্ত হন এবং অধিকাংশ সময় ভারতে কাজ করেন।

১৪. আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষের বিপক্ষে দুর্যোগ ঠেকাতে জেনারেল ডায়েরের কার্যক্রমের সমর্থন জানাচ্ছি। আমার কোন দ্বিধা নাই এটা জানাতে যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেনারেল ডায়েরের পদক্ষেপ সঠিক ছিল। হান্টার কমিটি রিপোর্ট ডিজঅর্ডারস ইনকয়ারী কমিটি রিপোর্ট পৃ:৪৮।

অমৃতসরে মার্শাল ল' জারি করা হয় এবং অন্যান্য জেলায় তা (লাহোর, গুজরানওয়ালা, লায়ালপুর এবং গুজরাট) ছড়িয়ে পড়ে।

পাঞ্জাবে মার্শাল ল'

পাঞ্জাবের অধিকাংশ শহরে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে হরতাল ডাকা হয়। পুলিশ কিছু কিছু জায়গায় গুলিবর্ষণও করে। জালিয়ানওয়ালার পর এই বিদ্রোহ চরম রূপ নেয়। ব্রিজ, চার্চ, পোস্ট অফিস এবং বিল্ডিং-এ আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয়া হয়, রেললাইন উপড়ে ফেলা হয়। শ্বেতাঙ্গরা লাঞ্চিত হন। আর্মি-প্রশাসনকে হাতে নেয় এবং যাও সরকার ছিল তাও অদৃশ্য হয়।

অমৃতসরে জেনারেল ডায়েরের এই কাজ অন্য প্রদেশগুলোর জন্য আইনের অনুপস্থিতি হিসেবে দাঁড়ায়। শহরের পানি এবং বিদ্যুৎ লাইন কেটে দেয়া হয়। একটি রাস্তায়, যেখানে একজন মিশনারী ইংরেজ মহিলা লাঞ্চিত হয়েছিলেন, সেখানে পথচারীদের দিয়ে হামাগুড়ি দেয়ানো হয়। উকিলদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। আদালতে প্রায় ৩০০ জনের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। এর মধ্যে ৫১ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ৩০০ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়।

লাহোরের অবস্থা ছিল অমৃতসর থেকে আরও খারাপ। আর্মির গুলির ভয়েও দোকানদারদের দোকান খুলতে বাধ্য করা হয়, স্বেচ্ছাক্রমে তাদের দোকান লুটে নিয়ে যায়, ফুটপাথে দুইজনের বেশি একসাথে চলা নিষিদ্ধ, ভারতীয়রা যেসব বৈদ্যুতিক পাখা ও বাতি ব্যবহার করত তা ইংরেজদের ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। বাদশাহী মসজিদ যেখানে সভা হতো, শুধুমাত্র শুক্রবার ছাড়া বন্ধ করে দেয়া হয়। শিক্ষিত শ্রেণীর দিকে বিশেষ নজর দেয়া হয়। লাহোর কলেজের ছাত্রদের দৈনিক চারবার রিপোর্ট প্রদানের আদেশ দেয়া হয়, কখনও চার মাইল দূর থেকেও।

কাসুর, যেখানে দুইজন ইংরেজ খুন হয়েছিল, সেখানকার অবস্থা আরও খারাপ। একজন ভারতীয় এক ইংরেজকে সালাম জানাতে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে নাকে খত দেয়ানো হয়। মার্শাল ল' এবং প্রশাসনের গুণগান গেয়ে কবিতা লেখার জন্য একজন কবিকে নির্দেশ দেয়া হয়।

গুজরানওয়ালা এবং আশপাশের গ্রামগুলো বোমাবর্ষণ এবং গুলিবর্ষণের লক্ষ্যে পরিণত হয়। একটি বোমা খালসা হাইস্কুলে পড়লে অনেক লোক মারা যায় এবং আহত হয়।

মার্শাল ল'র নিপীড়নের শিকার হয় ওয়াজিরবাদ, নিজামাবাদ, আকালগড়, রামনগর, হাফিজবাদ, শিখপুড়া, চুহাডকালা, সাংলা, মোমান, মানিয়ানওয়ালা,

লায়ালপুর এবং চক নং ১৪৯ (শিখদের কলোনী) সাত সপ্তাহের মধ্যে পাঞ্জাবে ১২০০ মানুষ মারা যায় এবং কমপক্ষে ৩৬০০ জন আহত হয়।^{১৫}

জালিয়ানওয়ালা এবং পাঞ্জাবে মার্শাল ল'র প্রভাব জনগণের উপর প্রবল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এতই কঠিন হয় যে প্রতি শ্বেতাঙ্গই কালো লোকদের শত্রু মনে করা শুরু করে। এমনকি বিশ্বাসভাজন, যারা আর্মিতে কাজ করত তারা এর শিকার হয়। সাম্রাজ্য রক্ষার দাবিদার স্যার মাইকেল ও'ডায়ের প্রায় সকল ভারতীয়কেই ত্যাগ করতেন।^{১৬}

জেনারেল ডায়ের শিখদের মন জয় করার জন্য সকল চেষ্টাই করেন। স্বর্ণ মন্দির-এর সুন্দর সিং মাজিথিয়ার ম্যানেজারকে ডেকে তাদের প্রভাব ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। তিনি গ্রামগুলোতে দুঃকৃতকারীদের বিরুদ্ধে নিজের ঘোষণাপত্র পাঠান এবং বলেন সরকার এখনও শক্তিশালী। স্বর্ণ মন্দিরের পুরোহিত জেনারেলকে আমন্ত্রণ জানান এবং শিরোপা (চাদর এবং বস্ত্র) উপহার দেন।

মহাত্মা গান্ধী পরে জালিয়ানওয়ালা পরিদর্শন করেন। তিনি এক জমায়েতে বলেন, জনগণের দেশপ্রেম হচ্ছে ভীত না হওয়া। তাঁর উৎসাহে কেন্দ্রীয় শিখ লীগ সংগঠিত হয়।

BanglaBook.org

১৫. জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্বে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে সরকারও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এতে ছিলেন লর্ড হান্টার এবং আরও সাতজন সদস্য। এই ইস্যুতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় কমিটি ভিন্নমত পোষণ করে। ব্রিটিশ সংসদেও এই নিয়ে আলোচনা হয়। উইনস্টন চার্চিল স্যার মাইকেল ডায়েরের তীব্র সমালোচনা করেন এবং আধুনিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য ন্যাকারজনক বলে ঘোষণা দেন। *আরব ফার্নেস্স, ম্যাসাকার এ্যাট অমৃতসর* পৃ. ১৫৩।

জেনারেল ডায়েরের সমর্থকও ছিল। মর্নিং পোস্ট চাঁদা তুলে তাকে “সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা” পদকে ভূষিত করে। তিনি প্রায় ২৬,৩১৭ ডলার পুরস্কার পান।

১৬. ১৯৪০ সালের ১৩ মার্চ একজন শিখ উধম সিং-এর হাতে স্যার মাইকেল ও'ডায়ার নিহত হন। ১৩ জুন ১৯৪০-এ উধম সিং-এর ফাঁসি কার্যকর হয়।

কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেটসে শিখদের অভিভাষণ

এই শতাব্দীর শুরুর দিকে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনার জন্য শিখরা কানাডা' এবং ইউনাইটেড স্টেটসে যাওয়া শুরু করে। কানাডিয়ান রেলওয়ে লাম্বার মিল এবং কয়লাখনিতে তারা কাজ খুঁজে পায়। শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের থেকে বেতন কম হওয়া সত্ত্বেও তারা বাড়িতে টাকা পাঠায়। ফলে তাদের বন্ধুরাও আসতে উৎসাহী হয়। ১৯০৬ সালে ভ্যানকুভারের কাছে ১৫০০ শিখ আসে। পরের ৫ বছরে প্রায় ৫০০০ শিখ কলম্বিয়ায় পৌঁছায়। জাপানিজ এবং চাইনিজদের আগমন কানাডিয়ানদের মনে আগেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল। তাই শিখদের সাথেও তাদের আচরণ ভাল ছিল না।^২ কয়েকদিনের মাঝেই শিখরা তাদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়।^৩

১. কানাডিয়ান ও আমেরিকানদের কাছে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে হিন্দু ছিল। ১৯০৪ সালের আদম শুমারীতে ২৫৮ জন হিন্দু তালিকাভুক্ত হয়। এর মাঝে ৯০ শতাংশ ছিল শিখ। এদের মাঝে অধিকাংশই কানাডা ও আমেরিকায় বসবাস করা শুরু করে।
২. বিভিন্ন রটনা, পাঞ্জাবিরা বহুবিবাহে বিশ্বাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অপরিষ্কার, রোষাক্রান্ত সাম্প্রদায়িকতা বাড়িয়ে তোলে। একটি গান “সাদা কানাডা, চিরদিন” জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

“পশ্চিমের কর্তৃ বলছে দুনিয়াকে
আমাদের পূর্বপুরুষ যে অধিকার দেয়
পালন করব শক্তি এবং সামর্থ্যে
সকল শ্বেতাঙ্গ ভাইকে জানাই স্বাগত
কিন্তু নোংরা হলুদ জাতি
যারা মিথ্যুক ও দুর্বল
আমাদের জায়গা থেকে দূরে থাকুক।
সমস্বরে, চল সবাই একত্রে দাঁড়াই
পূর্বপুরুষের শক্তির পরিচয় দেই।
আমাদের ঘরকে আমরা জয় করব
প্রাচ্যের লোভের কাছে করব না মাথা নত।
আমরা মাথা নিচু করব না, কখনো না
আমরা বলব, ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন।”
সাদা কানাডা সর্বদা বিরাজ করুক।

৩. মেয়রের আপত্তির কারণে ভ্যানকুভারে বন্দরে ভারতীয় বহনকারী একটি জাহাজ ভিক্টোরিয়ায় ফেরত যায়। ১৮ অক্টোবর ১৯০৬ সালে ভ্যানকুভার টাউন হলে ভারতীয় স্থানান্তরের বিরুদ্ধে আইন পাস হয়। শিখদের পক্ষ থেকেও কিছু প্রতিবাদ উঠে। ১৫ বছর ইন্ডিয়ায় কর্মরত হেনরী

ভ্যানকুভরের^৪ প্রতিদিনের জীবনে পাঞ্জাবিদের অপমান একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। কালোদের বের করে দেয়ার জন্য শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা চাপ দেয়। এর ফলে ১৯০৯ সালে মাত্র ছয়জন ভারতীয় কানাডায় প্রবেশ করেন।

আসলে শিখ সমস্যা ছিল ব্রিটিশদের তৈরিকৃত। ব্রিটিশ কলম্বিয়ানদের ফেডারেল সরকার তৈরি দরকার ছিল। ফেডারেল সরকার ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে। প্রায় সকল সরকার একমত ছিলেন যে ভারতীয়দের বের করে দেওয়া ব্রিটিশ কলম্বিয়ান সরকারের অধিকার। তাদের একমাত্র সচেতনতা ছিল সাম্প্রদায়িকতা যেন এতে স্থান না নেয়।^৫

১৯০৭ সাল থেকে ভারতীয়দের আগমন এবং কর্মক্ষেত্রে যোগদান ঠেকাতে আইন পাস হয়। এইসব আইন আদালত কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ভারতীয় সরকারকেও এব্যাপারে দৃষ্টি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়।^৬

১৯০৮ সালে কানাডিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরার জন্য জনাব রাজা ম্যাকেলিজ^৭ লন্ডন এবং কলকাতা ভ্রমণ করেন। এর ফলে সরকার জাহাজ কোম্পানিগুলোকে ভ্রমণ সুবিধা এবং কানাডায় স্থানান্তরিত হওয়া বন্ধ করার আদেশ দেয়। এর ফলে ইমিগ্রেশন আইন ১৮৮৩^৮ পাস হয়। স্বয়ং কানাডিয়ান সরকার এই ব্যাপারে দু'টি বিল পাস করে। একটি ইমিগ্র্যান্টদের কাছ থেকে ২৫-২০০ টাকা তোলার ব্যাপারে, অন্যটিতে দেশে অনুপ্রবেশের ব্যাপারে।

এইচ. গ্যাডস্টোন জানান, “শিখরা খুবই পরিষ্কার এবং স্মৃতিশীল জাতি”। *প্যাসিফিক মাসলি ভল্যুম ১৭, ১৯০৭।*

ডাঃ এস. এইচ. লাউসন লেখেন, “হংকং-এ আসা প্রত্যেকের ডাক্তারি পরীক্ষার দায়িত্ব আমার। আমি হাজার মানুষকে পরীক্ষা করেছি। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না যে তারা ইউরোপীয়ানদের চেয়ে পরিষ্কার ও রোগমুক্ত। কয়লাখনিতে কাজ করা শিখরা তাদের প্রতি আমার সম্মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। *দ্য ইন্ডিয়ানস আপিল টু কানাডা, পৃ: ১১, আর. কে. দাস হিন্দুস্তানী ওয়ার্কার অন দ্য প্যাসিফিক কোস্ট পৃ. ৭৫।*

৪. ১৯০৭ সালের জুলাইয়ে ভ্যানকুভারে এশিয়ানবিরোধী দাঙ্গা হয়। জাপানিজ ও চায়নিজরা এতে বেশি আক্রান্ত হন।

৫. প্রথমে স্বেচ্ছায় কানাডা ত্যাগ ও হন্দুরায় স্থানান্তরের চেষ্টা করা হয়। একটি শিখ পর্যবেক্ষক দল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে জানায় বেতন অত্যন্ত কম এবং আবহাওয়া অনুকূল না হওয়ায় এটি সম্ভব নয়।

৬. স্যার উইলফ্রেড লরিয়ের বলেন “ভারতীয়রা ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় বসবাসের অনুপযোগী এবং শিল্প ও আর্থিকক্ষেত্রে হুমকিস্বরূপ।” *অর্ডার ইন কাউন্সিল ২ মার্চ ১৯০৮।*

ভাইসরয়ের একটি চিঠিতে তিনি লেখেন, “জাপানিজদের থেকে শিখরা বেশি বেশি বৈষম্যের শিকার। অন্যান্য জাতির থেকে তারা আমাদের কাছে কম সহ্যশীল। মর্স তার অপ্রকাশিত থিসিসে বলেন। “*ইমিগ্রেশন এ্যান্ড স্ট্যাটাস অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানস ইন কানাডা। ২৭*

৭. ১৯০৭ সালে তিনি রয়্যাল কমিশনার প্রদানের দায়িত্ব নেন এবং কানাডায় অভিবাসনের প্রক্রিয়া তদন্ত করেন।

৮. ইমিগ্রেশন এ্যাক্ট ১৮৮৩ সালে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ করে। অভিবাসীদের অধিকার সংরক্ষণ করবে এমন দেশেই অভিবাসন করাবেন। কানাডা এই তালিকায় ছিল না।

এইসকল বিল ভারতীয়দের বিপক্ষে ছিল। চাইনিজ এবং জাপানিজরা মাত্র ২০০ ডলারের বিনিময়ে এই আইন থেকে মুক্ত ছিল। যদিও ইন্ডিয়া থেকে কানাডায় সরাসরি কোন জাহাজ ছিল না তবুও ভারতীয়দের জন্য “কনটিনুয়্যাস প্যাসাজ” বাতিল করা হয়। ভারতের নিজস্ব কোন জাহাজ ছিল না।^{১১} এই সকল বৈষম্যকারী আইনের ফলে অনেক ভারতীয় কানাডা ছাড়তে বাধ্য হয়। ১৯০৮ সালে যেখানে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল ৫০০০ বেশি সেখানে ১৯১১ সালে তা অর্ধেকের এসে দাঁড়ায়।^{১২}

ভারতীয় অভিবাসন বন্ধ করে কানাডিয়ান সরকার যারা আগেই এসেছিল তাদের দিকে নজর দেয়। এক্ষেত্রে ২০০ ডলার আইন তাদের স্ত্রী এবং সন্তানদের তাদের স্বামী এবং বাবার সাথে যোগদানের জন্য প্রযোজ্য ছিল না।^{১৩}

১৯১০ সালের অভিবাসন আইন ১৯১৩ সালে সুপ্রিম কোর্টের সামনে পরীক্ষা হয়ে দাড়ায়। জাপানী জাহাজ পানামা মারু, ৩৯ জন ভারতীয় বহনকারী, অভিবাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্যাগের নির্দেশপ্রাপ্ত হলেও অন্তরীণ থাকার আদেশ লাভে সফল হয়।^{১৪} পনেরো দিনের মধ্যে কানাডিয়ান সরকার শিল্প বা শ্রমিক, দক্ষ বা অদক্ষ ভারতীয় অভিবাসনের বিরুদ্ধে আইন পাস করে।^{১৫} এক মাস পরে “কনটিনুয়্যাস প্যাসাজ এবং ২০০ ডলার আইন” আবারও পরিচিত করা হয়। যেন কানাডিয়ান দরজা “ভারতীয়দের জন্য নিষিদ্ধ ছিল অথবা ভারতীয়দের প্রবেশ নিষেধ।”

শিখরা কানাডা থেকে ইউনাইটেড স্টেটসে আসা শুরু করে। ১৯০৪ থেকে ১৯০৬ সালে ৬০০ বেশি ভারতীয় (অধিকাংশ শিখ) অভিবাসিত হয়। কানাডিয়ান

৯. জনাব এইচ. এইচ. স্টিভেন, কানাডায় ভারতীয় অভিবাসনবিষয়ী বলেন, তিনি এবং তার সরকার জানতেন ভারতের সাথে কানাডার সরাসরি যোগাযোগ কঠিন নেই। কিন্তু এই আইন একই সাথে হিন্দুদের দূরে রাখবে এবং কানাডাকে “হিন্দু বিরুদ্ধবাদী” এই কথা থেকে মুক্তি দেবে। *হাউস অফ কমন্স ডিবেটস্ ১৯১৪. নং ১২৩৩।*

এই আইনের সর্বপ্রথম শিকার ছিল ভ্যানকুভারে আসা ২০০ জন ভারতীয় (অধিকাংশ শিখ)। ১৮ জন সরাসরি না আসার জন্য মুক্তি দেয়া হয়, তারা হংকং নৌকার জন্য অপেক্ষা করে। বাকি ১০৫ জনকে ফেরত পাঠানো হয়। *মর্স, ইমিগ্রেশন এ্যান্ড স্ট্যাটাস অফ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়ান্স ইন কানাডা পৃ: ৩৬।*

১০. ১৯১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ২৩৪২ জন হিন্দু, এর মাঝে ২৭ জন ছিল ব্রিটিশ কলম্বিয়ায়।
১১. ১৯১২ সালে ভ্যানকুভারবাসী বাগ সিং এবং বলবন্ত সিং (ভ্যানকুভার গুরুদয়ার-এর সভাপতি ও পুরোহিত)-এর স্ত্রী ও পরিবার সর্বপ্রথম আসে। পুরুষের আসাতে সফল হলেও তাদের স্ত্রীদের ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। ভারতীয় আপিলের বিপক্ষে রায় দেয়ায় আগেই অভিবাসন কমিটি মানবীয় কারণে তাদের থাকার নির্দেশ দেয়। *হাউস অফ কমন্স ডিবেট ১৯১২, নং ২৪৫৭।*
১২. ব্রিটিশ কলম্বিয়া ল’ রিপোর্ট ১৯১৩। প্রধান বিচারক হান্টার ভারতের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তার আগেই অভিবাসন কমিটি চায়না উপকূলে বসবাসরত ভাগওয়ার সিং জ্ঞানীর পক্ষে পাসকৃত আইন অমান্য করে তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য করে।
১৩. পিসি ২৩৬২৪, ১৯১৪ এবং পিসি ২৬৪২, ১৯১৩। শুধু প্রাচ্যদেশীয়রা ব্রিটিশ কলম্বিয়া দিয়ে কানাডায় প্রবেশ করে। এর মধ্যে জাপানীজরা তাদের সরকারের মাধ্যমে কানাডিয়ানদের সাথে “অদ্রলোকের চুক্তি”তে শর্তাধীন ছিল। এভাবে কানাডিয়ানরা আবারও ভারতের সাথে বৈষম্য সৃষ্টিতে সমর্থ হয়।

অভিবাসন কঠিন হওয়ায় ইউনাইটেড স্টেটসে বেশি মানুষ আসা শুরু করে।^{১৪} খামারবাড়ি এবং লাম্বারজ্যাক, ওয়াশিংটন ও ক্যালিফোর্নিয়ায় তারা কাজ পায়। স্যান জোয়াকিন এবং স্যাক্রামেন্টো ভ্যালিতে শিখ সংঘ গড়ে ওঠে। কেউ কেউ পাঞ্জাবের মতো আবহাওয়া সম্পন্ন ইমপেরিয়াল ভ্যালিতেও যায়। অনুকূল হওয়ায় শিখরা সরাসরি ক্যালিফোর্নিয়ায় আসা শুরু করে। কিন্তু আমেরিকান শ্বেতাঙ্গরা কানাডীয়ানদের থেকেও নৃশংসভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। ১৯০৮ সালে প্রাচ্যদেশীয়দের বিরুদ্ধে সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দুই বছরে অল্প কিছু ভারতীয় প্রবেশে সক্ষম হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিছুটা শান্ত হলে আরও ভারতীয় ১৯১০ সালের শেষে কানাডা থেকে স্টেটসে আসে। আঞ্চলিক কিছু সংবাদ মাধ্যমের জন্য সাম্প্রদায়িকতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ইউনাইটেড স্টেটস আইনি ঝামেলায় না গিয়ে তিনটি কারণ দেখিয়ে ভারতীয়দের ফিরিয়ে দেয়া শুরু করে। “জনসাধারণের জন্য বিপদজনক, খারাপ রোগাক্রান্ত শ্রমিক আইন বিরোধী”।^{১৫} এভাবে ভারতীয়দের জন্য আমেরিকার দরজাও বন্ধ হয়ে যায়। যারা আগে থেকেই ছিল তাদেরও পুলিশ ও সাম্প্রদায়িক শ্বেতাঙ্গদের কাছে অপমানিত হতে হয়।

গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা

ভারতীয় অভিবাসনকারীদের অধিকাংশই ছিল শিখ। এই পরবর্তী সংঘগুলো গুরুদুয়ারাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ সালে খালসা দিওয়ান সংঘ ভ্যানকুভার, ভিক্টোরিয়া, অ্যাবোটসফোর্ড, নিউ ওয়েস্ট মিনস্টার এবং ওশান ফলস-এ তাদের শাখা খুলে। এই সংঘ ১৯০৯ সালে ভ্যানকুভারতে প্রথম স্থাপিত হয়। তিন বছর পর ভিক্টোরিয়ায় মন্দির স্থাপিত হয় এবং পরে ছোট শহরগুলোতে। পরবর্তীতে খালসা দিওয়ান সংঘ স্টকটনে গুরুদুয়ারা প্রতিষ্ঠা করে। যদিও এর লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কিন্তু তারপরও অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্যাও তারা দেখত। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কিছুটা হলেও কমে আসে।

অভিবাসী কমিটির বিরুদ্ধে আইনি এবং অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের জন্য আরও কিছু ভারতীয় সংঘ গড়ে উঠে। জাতীয় ভারতীয় লীগ ভ্যানকুভারে, হিন্দুস্তানী সংঘ প্রশান্ত উপকূলে এ্যাস্টরিয়ায় গড়ে ওঠে। যদিও ভারতীয়রা শুধুমাত্র গুরুদুয়ারাতেই মিলিত হতে পারত কিন্তু এসব সংঘ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত হয়। গুরুমুখি, উর্দু এবং ইংরেজীতে শিখ দিওয়ান এবং সংঘগুলো সংবাদ প্রকাশ করে।^{১৬}

১৪. ১৯০৭-এ ১০৭২ এবং ১৯০৮-এ ১৭১০। ১৯১৯-২০ সালের ইমিগ্রেশনের জন্য।

১৫. প্যাসিফিক মাসিক ভনিয়ুখ ১৭, পি. ৫৮৪

১৬. এই সকল প্রকাশনা বেশি সময়ের জন্য ছিল না। প্রথম প্রকাশনা ছিল একজন বাঙালী তারক নাথ দাশ-এর তত্ত্বাবধানে। তার মৃত্যুর সাথে এটি বন্ধ হয়ে যায়। বার্কলী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে এই

শিখ অভিবাসীদের মধ্যে অনেকেই সৈন্য এবং পুলিশ ছিল। কিন্তু তারা বাকিংহাম অথবা ভাইসারগাল লজ থেকে প্রতিক্রিয়া পেতে ব্যর্থ হন। লাজপত রায় যিনি কানাডা এবং ইউনাইটেড স্টেটসে তাদের দেখতে এসেছিলেন, তাই তারা তার কথাই শোনে।

নতুন নেতারা সামনে আসেন। ক্যালিফোর্নিয়া, স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক অভিবাসীদের নেতায় পরিণত হয়। দ্বৈত নেতৃত্ব গড়ে উঠে।^{১৭} অশিক্ষিত শিখ শ্রমিকদের হাতে থাকে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতা।^{১৮} যেহেতু উকিলদের শ্রমিকদের সাথে কথা বলা প্রয়োজন ছিল—তাই তাদের ইংরেজি জানা লোকের দরকার।^{১৯} কাজেই হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং শিখ সমাজের মাঝে সংঘাতও আবশ্যিক ছিল। শিখদের কাছে হিন্দুরা শুধুই ইংরেজ বলিয়ে বাবু। অপরদিকে হিন্দুরাও শিখদের সাথে দুব্যবহার করত।

স্টকটোনে জয়ালা সিং-এর হরদয়াল অভিবাসীদের সংগঠিত করে এবং প্রশান্ত উপকূলীয় হিন্দুস্তানী শ্রমিক সংঘ গঠন করে। ওরিগনে লাম্বার মিলে কর্মরত সোহান সিং বাকনা এবং হরদয়াল সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। (জয়ালা সিং পর্দার পিছনে থেকে অভিবাসী, বিশেষ করে ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন)। এই সংঘ গদর নামে পত্রিকা (বিদ্রোহ) প্রথমে উর্দুতে পরে অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়। এর ফলে এই সংঘ গদর সংঘ নামে পরিচিত হয়। তাই এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশে কমিটির কিছু লক্ষ্য লেখা থাকে। “আজ আমাদের ভাষায় ব্রিটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ। আমাদের নাম কি? গদর। আমাদের কাজ কি? গদর। গদর কখন হবে? ইন্ডিয়ায়। কলম এবং কালির জায়গা দখল করে নিবে রাইফেল এবং রক্ত।^{২০}

সকল প্রকাশনা সংরক্ষিত আছে। গুরুমুখি প্রকাশিত দেশসেবক, ভ্যানকুভারে হারনাম সিং এবং গুরুদত্ত প্রকাশিত উর্দু, কর্তার সিং আকালি কর্তৃক ১৯১১ সালে ভ্যানকুভারে প্রকাশিত খালসা হেরাল্ড, কয়েকটি সাহায্যকৃত ডাঃ সুন্দর সিং কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক আরিয়ান সংসার (১৯১২), সম্পাদনা করেন শেঠ হুসেইন রহিম। পরে ডঃ সুন্দর সিং কানাডা এবং ইন্ডিয়া সম্পাদনা করেন। কাটরি সিং আকালি পরে টরন্টোতে যান এবং “দ্য থিওসফিকাল নিউজ” সম্পাদনা করেন। ইউনাইটেড স্টেটসে অভিবাসীদের মধ্যে গদর ছাড়া অন্য কোন প্রকাশনার খবর পাওয়া সম্ভব হয়নি।

১৭. দিল্লির এক কায়স্থ পরিবারের একজন সদস্য হরদয়াল অভূতপূর্ব স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং অনেক পরীক্ষার রেকর্ড ভঙ্গ করেন। তিনি মহান হরদয়াল নামে পরিচিত হন। তার বই “হিস্টস অন সেল্ফ কালচার” তার বুদ্ধিমত্তারই প্রমাণ দেখায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি সুইডেনে বাস করেন। উপসালায় ভারতীয় দর্শন শেখান এবং ব্রিটিশ শাসনের জন্য ক্ষমা চান।
১৮. ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় কিছু মানুষ যেমন ভাগ সিং, ক্যালিফোর্নিয়ায় জোয়ালা সিং, সানটোখ সিং, সোহান সিং ডাকনা এবং ভাগওয়াল সিং জ্ঞানী কর্তৃক পরিবেশিত।
১৯. ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় তারক নাথ দাস এবং যুগন লাল ভারমা অ্যালিয়াস সেঠ হুসেইন রহিম থেকে এবং ক্যালিফোর্নিয়ায় হরদয়াল থেকে তারা নেতৃত্ব পান।
২০. গদর, ১ নভেম্বর ১৯১৩

পত্রিকার নামে নিচে প্রথম পাতায় একটি উক্তি ছিল, “ব্রিটিশ সরকারের শত্রু।” তৃতীয় প্রকাশনায় লেখা ছিল, জার্মানরা আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। কারণ তারা ও আমরা নিজেরা সাধারণ শত্রু। পরবর্তীতে জার্মানরা আমাদের সাহায্য করতে পারে।^{২১}

কানাডা, জাপান এবং ফিলিপাইন, হংকং, চায়না, জুয়ানা, মালয়, ত্রিনিদাদ, হন্ডুরাস, দক্ষিণ পূর্ব আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশগুলো বসবাসরত ভারতীয়দের কাছে গদর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। হাজার কপি ভারতেও পাঠানো যায়।^{২২} কমাগাতা মারুর কানাডিয়ান উপকূলে ভেড়ার সাথে সাথে সারা পৃথিবীর নজর এদিকে পড়ে।

কমাগাতা মারু

১৯১৪ সালের ২৩ মে ভ্যানকুভারে জাপানী জাহাজ কমাগাতা মারু নোঙ্গর ফেলে। এতে ছিল ৩৭৬ জন ভারতীয়, যাদের মধ্যে ৩০ জন শিখ। সিঙ্গাপুরে অবসারত গুরদিত সিং তাদের নেতা ছিল। গুরদিত সিং ছয় মাস ধরে যাত্রী সংগ্রহ করে এবং হংকং, সাংহাই, কোব এবং ইয়োকোহামা হয়ে আসে।

“প্রাচ্যদেশীয় ছড়িয়ে পড়া” হিসেবে কমাগাতা মারুর আগমনের রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কানাডিয়ান জলসীমায় পৌঁছানোর পর মারু ২২ জনকে নামতে দেয়া হয়। বাকিদের চলে যেতে বলা হয়। বিল পরিশোধের জন্য গুরদিত সিং-এর উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি বলেন যাত্রীদের কানাডায় ঢুকতে দেয়ার মাধ্যমে চুক্তিপূর্ণ এবং কার্গো বিক্রি করতে পারলেই সে বিল শোধ করতে পারবে।

শিখ শ্রমিকরা চাঁদা পরিশোধের জন্য ২২,০০০ ডলার চাঁদা তোলে। তারা কানাডিয়ান সরকার ও জনগণের কাছে ন্যায়ের জন্য আবেদন করে, রাজাকে চিঠি পাঠান, ভারতীয় এবং ইংল্যান্ডের রাজাকেও জানানো হয়। পাঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় যাত্রীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে সভা হয়। ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যমে মিসেস অ্যানি এই ঘটনা তুলে আনে।^{২৩} ব্রিটিশ, কানাডিয়ান এবং ভারতীয় সরকার

২১. ইবিদ, ১৫ নভেম্বর ১৯১৩

২২. গদর থেকে অনেক প্রবন্ধ এবং কবিতা বিভিন্ন পুস্তিকায় প্রকাশিত হয়, যার মধ্যে চারটি ভীষণ জনপ্রিয় হয়। ১) গদর ডি গুনজ ২) ইলান-ই-জাং ৩) নয়া জামানা ৪) দ্য ব্যালাস শিট অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া।

২৩. দ্য টাইমস (লন্ডন) বরাবরের মতোই প্রতিক্রিয়া দেখায়। ব্রিটিশ নাগরিকত্বের তত্ত্ব এই ব্যাপারে ব্যবহৃত হতে পারে না। তথ্য ও যুক্তি, কথা অথবা বই পড়া কোনটিই তার কাজে সাহায্য করতে পারবে না। কমাগাতা মারুর মতো ছোট এন্টারপ্রাইজ থেকেও সে খুব বেশি সুবিধা পাবে না।

৯ জুলাই ১৯১৪তে টাইমস লেখে, “পূর্ব পূর্বই, পশ্চিম পশ্চিমই। যতই খারাপ লাগুক এই তথ্য আমাদের মানতেই হবে। তাদের মাঝের এই পার্থক্য দূর করা কোনভাবেই সম্ভব নয়।

এর জন্য সামান্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।^{২৪} স্যার রিচার্ড ম্যাকব্রাইড ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, “প্রাচ্যদেশীয়দের প্রবেশের অনুমতি দেয়া মানে শ্বেতাঙ্গদের নির্বাসন। আমরা সবসময় এই দেশকে সাদাদের জন্যই রাখতে চাই।”^{২৫}

কামাগাতা মারুর এই মামলা ‘শোর কমিটি’ আদালত পর্যন্ত নিয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ রায় দেয় যে, তারা অভিবাসন কমিটির আইনের ভঙ্গ করতে পারবে না।^{২৬} অন্যদিকে যাত্রীরা জাপানিজ ক্রুদের হাত থেকে জাহাজ নিজের হাতে নিয়ে নেয়। একজনকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে এই হুমকি দেয়ার আগ পর্যন্ত তারা জাহাজ ত্যাগে আপত্তি জানায় দুই মাস পর কামাগাতা মারু প্রশান্ত মহাসাগর ত্যাগ করে।^{২৭}

কামাগাতা মারুর কাহিনী এখানেই শেষ নয়। এর যাত্রীদের হংকং বা সিঙ্গাপুরেও নামতে দেয়া হয়নি। অবশেষে নৌকাটি হুগলীতে বাগবাগ বন্দরে নোঙ্গর করে। পুলিশ নৌকাটি অনুসন্ধান করেও কোন অস্ত্র পায়নি।^{২৮} এই সময়েই পানিপথে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সরকার নৌকার যাত্রীদের ফিরিয়ে দেয়ার অধিকার পায়। একটি ট্রেন ঠিক করা হয় যা তাদের পাঞ্জাব নিয়ে যাবে। কিন্তু শিখরা তা মানতে রাজি হয়নি।^{২৯} শিখরা সকল অবরোধের বিপরীতে গিয়ে জাহাজ ত্যাগ

২৪. লর্ড হার্ডিঞ্জের কথাবার্তায় পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি অভিবাসীদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন না। ১৯১৪ সালের ৮ ডিসেম্বর একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন কামাগাতা মারু ভারত সরকারের অনুমতি ছাড়াই রওনা দেয়। এটি কানাডিয়ান অভিবাসী আইন ভঙ্গ করে। রাজ্যের প্রায় ৪,০০০ ডলার দেয়ার মাধ্যমে কানাডিয়ান জনগণের হৃদয়তা প্রকাশ পায়।

২৫. দ্য টাইমস, লন্ডন ২৩ মে ১৯১৪।

২৬. রি. মুঙ্গী সিং নং ২০, ১৯১৪ ব্রিটিশ কলম্বিয়া ল’ রিপোর্টস পৃ. ২৪৫ ঠিক করা হয় ৭ জুলাই ১৯১৪।

২৭. ভ্যানকুভারে কামাগাতা মারু ত্যাগের পর সহিংসতা শুরু হয়। গদর সংঘ ভাঙ্গার জন্য অভিবাসী ডিপার্টমেন্ট ইউরেশিয়ান পুলিশ উইলিয়াম হপকিনসনকে নিয়োগ করে। হপকিনসনের প্রধান সহকারী ছিলেন বেলা সিং। বেলা সিং-এর দু’জন প্রহরী খুন হয়। গুরুদুয়ারাতে এদের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে বেলা সিং দু’জনকে নিহত এবং ছয়জনকে আহত করেন। উইলিয়াম হপকিনসন বেলা সিং-এর বিচারে সাক্ষ্য দেন। ১৯১৪ সালের ২১ অক্টোবর মেওয়া সিং-এর হাতে গুরুদুয়ারার প্রধান পুরোহিত নিহত হন। মেওয়া সিং-এর ফাঁসি হয়। মৃত্যুদণ্ডের আগে তিনি তার এক বিবৃতিতে বলেন, আমার ধর্ম কারও সাথে কোন শত্রুতা করতে শিখায় না। উইলিয়াম হপকিনসনের সাথে আমার কোন বিরোধ নেই। আমি শুনেছি হপকিনসন দরিদ্র লোকদের শোষণ করছিল। একজন সৎ শিখ হওয়ায় আমি তা কিছুতেই মানতে পারি না। ঈশ্বরের নামে দড়ি গলায় পরতে আমার একটুও কষ্ট হবে না।

২৮. পুলিশ দাবী করে কামাগাতা মারুর যাত্রীরা অস্ত্র ব্যবহার করে। মেসার্স এফ. সি. ইসেমনগার, সিনিয়র সিআইডি অফিসার এবং স্যুটারী দাবি করেন, “মালামাল তল্লাশী করার পরেও এরকম ঘটনা ঘটার কোন কারণ নেই।”

এ্যান একাউন্ট অফ দ্য গদর কনসপারেসী পৃ : ৮১।

২৯. গুরদিত সিং পুলিশ অফিসারদের জানায়, কামাগাতা মারু যে কার্গো বহন করে তা তার সম্পত্তি ছিল। তিনি যাত্রীদের কাছ থেকে প্রায় ২৫,০০০ ডলার নেন। তারা আত্মীয় ও বন্ধুর কাছ থেকে টাকা পায়। একে অপরের সাথে প্রায় ছয় মাস কাটায়। গ্রাম, যেখানে তাদের কোন জমি নেই, সেখান থেকে কলকাতায় থাকা তাদের জন্য বেশি জরুরি।

করে। একদল পুলিশ ও আর্মি তাদের অগ্রগতি রোধ করে। পুলিশের গুলিবর্ষণে ১৮ জন নিহত এবং ২৫ জন আহত হয়।^{৩০} গুরদিত সিংও তার ২৮ জন সাথী পালিয়ে যায়। বাকিদের ফেরত পাঠানো হয়।

পাঞ্জাবে বিদ্রোহ

ইউরোপের বিদ্রোহের জন্য গদর পার্টির নেতারা নিজেদের প্রস্তুত করে। কানাডা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় তারা তা আমেরিকাতে স্থানান্তরিত করে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর স্যাক্রামেন্টোতে ভারতীয়দের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার লোক ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করতে, চাঁদা তুলতে এবং ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে প্রস্তুত হয়।^{৩১} এই কঠিন সময়ে গদর পার্টিতে কোন নেতা ছিল না। জয়ালা সিং ও সোহান সিং বাকনা ভারতে ছিলেন। হরদায়াল জামিনে থেকে সুইজারল্যান্ডে পালিয়ে যান। তাদের অনুপস্থিতিতে পেশোয়ারের এক ব্রাহ্মণ রাম চন্দ্র নেতৃত্ব দেন।

জয়ালা সিং-এর নেতৃত্বে প্রথমে বিপ্লবীরা ১৯১৪ সালের আগস্টে সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। রাম চন্দ্র তাদের উদ্দেশ্যে এভাবে ভাষণ দেন—

তোমাদের দায়িত্ব পরিষ্কার। ভারত যাও। প্রতিটি কোণায় বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দাও। ধন লুট করে গরিবদের বিলাও। এভাবে বিশ্বের সহানুভূতি পাও। ভারতে গেলে তোমাদের অস্ত্র দেয়া হবে। না হলে পুলিশ স্টেশন লুট কর। নেতাদের নেতৃত্ব মেনে চল।^{৩২}

ক্যান্টনে আরও ৯০ জন স্বেচ্ছাসেবক কোরিয়ায় যোগ দেয়। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা গদরদের সকল পরিকল্পনার খবর পান। যখনই জোয়ালা সিং কলকাতায় পৌঁছায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। যারা পালাতে সক্ষম হয় তারা শান্তিতে গ্রামে ফিরে যায়।

কানাডা, ইউনাইটেড স্টেটস, হংকং, সাংহাই, চায়না, বর্নেও, জাপান এবং ফিলিপাইন থেকে বিদ্রোহীরা আসতে থাকে। ইন্ডিয়ায় যাওয়ার পথে তারা বিদেশে অবস্থানরত মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করে। ২৬ জন পাঞ্জাবির সাথে হংকং-এ, মালয় স্টেট গাইডের সাথে সিঙ্গাপুরে এবং ৫ম পদাতিক-এর সাথে পেনাং-এ-একদল শিখ সেপাই-এর সাথে।

৩০. তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সরকার সকল ঘটনার জন্য কামাগাতা মার্ক্সর যাত্রীদের দায়ী করে। তিনজন ইংরেজ এবং দু'জন ভারতীয়, স্যার বিজয় চান, বুরদয়ান্দ-এর মহারাজা এবং কাপুরঠালার দালজিত সিং। তিনি পরে নাইট পদবীতে ভূষিত হন।

৩১. ৭ আগস্ট ১৯১৪তে পোর্টল্যান্ড টেলিগ্রাম অফ অরিজিন লেখে, হিন্দুরা বিদ্রোহের জন্য ঘরে ফিরে যাও।

৩২. সনদপত্র দেন নওয়াব খান, *এ্যান একাউন্ট অফ দ্য গদর কনসপারেসী*।

ভারতীয় বহনকারী জাপানি জাহাজগুলোর মাঝে তোসা মারু, অক্টোবরে কলকাতায় আসে এবং মিশিমা মারু কলম্বোয় আসে। তোসা মারুতে অনুসন্ধান করে চারজন নেতাকে গ্রেপ্তার এবং ১৭৯ জন যাত্রীকে পাঞ্জাবে ফেরত পাঠানো হয়।

দক্ষিণের বন্দর দিয়ে বিদ্রোহীদের ঢোকার ব্যাপারে পুলিশ আমল দেয় না। তাই অনেকেই পাঞ্জাবে ঢুকতে পারে। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরের প্রথমদিকে প্রায় ১,০০০ জন বিপ্লবী ভারতে আসেন। ১৯১৪ সালের ১৯ মার্চ ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট পাস হয়। এই আইনমতে জনগণের নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ যে কোন মানুষের বিরুদ্ধে পুলিশ এবং আর্মির যে কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে। সন্দেহজনক চরিত্রের জন্য পাঞ্জাবের ২৩ জেলার মধ্যে ১৬টি জেলায় এই আইন বাস্তবায়ন করা হয়।

গাদরিস্টরা আবিষ্কার করেন যে ভারতের আবহাওয়া বিদ্রোহের অনুকূল নয়।^{৩৩} জাতীয় কংগ্রেসও ব্রিটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসাক্ষেত্রে স্বৈচ্ছাসেবক দেন। এমনকি বিজি তিলক পরিবেশ নষ্টকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। পাঞ্জাব যুদ্ধক্ষেত্রে আরও মানুষ পাঠায়। গুরুত্বপূর্ণ প্রধান খিলসা দিওয়ান বারবার মুকুটের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুরোহিত গাদরিস্টদের স্বধর্মত্যাগী বা গুণ্ডা বলে জানায়।^{৩৪} বিদ্রোহীরা কৃষকদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করার জন্য খুবই চেষ্টা চালায়। অমৃতসর, নানকানা সাহেব এবং তার্ন তারণের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে গিয়ে তারা জনগণকে সচেতন করতে চায়। কিন্তু প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই অল্প। বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। তারা সরকারি কোষাগার লুটের পরিকল্পনা চালায়। কিন্তু ১৯১৪-এর শেষের দিকে সামান্য ডাকাতি, পুলিশ এবং গ্রাম্য অফিসার হত্যা ছাড়া তারা আর কিছুই করতে পারেনি।^{৩৫}

১৯১৫ সালের শুরুর দিকে গাদরিস্টরা দেশের অন্যান্য বিদ্রোহী দলগুলোর সাথে যোগাযোগ শুরু করে। জানুয়ারিতে রাসবিহারী বোস (১৯১২ তে লর্ড হার্ডিঞ্জকে হত্যা প্রচেষ্টা দলের নেতা) পাঞ্জাবে আসে এবং বিদ্রোহ সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেয়। লাহোরে ২৩তম ক্যাভালরি, ফিরোজপুরের ২৬ জন পাঞ্জাবি, ২৮তম পাইওনিয়ারস এবং ১২তম ক্যাভালরি ও তার কাছে উৎসাহজনক ছিল।

৩৩. ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন তারা ফেরত আসতে শুরু করে তখন আশা করে পাঞ্জাবে বিদ্রোহ না হলেও অসন্তোষ থাকবে। কিন্তু তারা মনক্ষুণ্ণ হয়। *এ্যান অ্যাকাউন্ট অন গদর কনসপারেসী*।

৩৪. কৃষকরা তাদের মাঝে কিছুই আকর্ষণীয় দেখেনি। তাদের কাছে গদরিস্টরা ছিল শুধু খুনি এবং সং মানুষের জন্য ভয়ের কারণ। ইবিদ

৩৫. নিম্নোক্ত অন্যান্যগুলো রাওলাট কমিশন লিপিবদ্ধ করে—

ক. ১৬ অক্টোবর ১৯১৪ ফিরোজপুর-লুধিয়ানা লাইনে টোকিমান রেলওয়ে স্টেশনে আক্রমণ হয়।

খ. ২৭ নভেম্বর ১৯১৪, ফিরোজপুর জেলায় লুটতরাজ হয় এবং একজন পুলিশ নিহত হয়।

গ. ১৭ ডিসেম্বর ১৯১৪, একজন জমিদারের বাড়িতে ডাকাতি হয়।

ঘ. ২৪ এবং ২৫ ডিসেম্বর ১৯১৪, ফিরোজপুর জেলায় ডাকাতি হয়।

আম্বালা, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বানারস, ফয়জাবাদ, লক্ষৌ, মুলতরি, কোহাট, জেলুম, রাওয়ালপিন্ডি এবং পেশোয়ারেও সে তার এজেন্ট পাঠায়।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ ভারতীয় ফৌজের নবজাগরণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। অমৃতসর, জাবেওয়াল এবং লোহাটবাড়িতে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়। বিদ্রোহীরা টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয় এবং রেলওয়ে লাইন উপড়ে ফেলে। তেরঙ্গা পতাকা তৈরি হয়, যুদ্ধ ঘোষণাপত্র বিলি করা হয়।

পুলিশ এক গ্রেপ্তারকৃত বিপ্লবীর কাছ থেকে খবর পেয়ে সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারিতে তারিখ পরিবর্তন করে আনা হয়। বোসের নিজস্ব উপদেষ্টামণ্ডলীর এক গুপ্তচর তারিখ বদলের এই তথ্যও পুলিশকে জানিয়ে দেয়। সকলকে নিরস্ত্র করা হয়, সন্দেহভাজনের কোর্ট মার্শালের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্রোহীরা ফৌজ থেকে বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। একসময় তাদেরও পুলিশের কাছে ধরা দেয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। এই পরিস্থিতিতে রাসবিহারী বোস পাঞ্জাব ত্যাগ করে।

১৯১৫-এর গ্রীষ্মে গদর বিদ্রোহ একেবারেই শেষ হয়ে যায়। শুধু কিছু দুঃসাহসী লোক গুপ্তচর, পুলিশের সাহায্যকারী এমন কিছু লোকের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। শরতের শেষে এগুলোও বন্ধ হয়ে যায়।^{৩৬}

মানদি রাজ্যে অন্য কিছু পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু এটিও ব্যর্থ হয়। ছয়জনকে গ্রেপ্তার এবং বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়।

সিঙ্গাপুরে জাগরণ

সিঙ্গাপুরের একটি মুসলিম সংঘের সাথে স্টেট এবং কানাডা ফেরত গাদরিস্টরা যোগাযোগ করে।^{৩৭} ১৯১৫ সালে ১৫ ফেব্রুয়ারি মিলিটারী কারাগার দখল করে নেয় কিছু লোকাল বিদ্রোহী। এমডেন-এর নিকটবর্তী কয়লাখনি থেকে জার্মান নাবিকদের মুক্ত করে দেয়া হয়। জনগণের উত্থান ঘটানোর জন্য তারা শহরের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু পথে মালয় ও স্টেটসের শিখ, এবং কিছু শিখ পাহারাদারের সংঘাত হয়। এর ফলে নতুন একটি সমস্যা শুরু হয় শিখ ও মুসলিম। লোকাল মিলিশিয়া, পুলিশ এবং ব্রিটিশ “ক্যাডমাস” এসে এই সংঘাত থামায়। ৪৮ ঘণ্টার এই সংঘাতে ৪৪ জন মারা যায়। যার মধ্যে ৮ জন ছিল ব্রিটিশ কর্মকর্তা। পরে ১২৬ জনকে কোর্ট মার্শাল,

৩৬. ১৯১৫ সালের আগস্টের মাঝে গদরের বিদ্রোহ প্রশমিত করে। প্রায় সকল নেতা বিচারের অপেক্ষায় আমাদের কাছে বন্দি ছিল। শিখ সমাজ আবারও তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করে। স্যার মাইকেল ও'ডয়ার, ইন্ডিয়া এ্যাজ আই নিউ টি, পৃ. ২০৬।

৩৭. মান্দি দুর্নীতি মামলা এ্যান একাউন্ট অফ দ্য গদর কনসপারেসী।

৩৮. গদর পার্টি এবং সিঙ্গাপুর বিদ্রোহের মাঝে কোন তথ্য নেই। কিন্তু সন্দেহ করা হয় জগজিৎ সিং এই সকল কিছুতেই সংযোগ স্থাপন করে। একজন ব্যবসায়ী কাসিম মানসুর ৫ম লাইট ইনফ্যান্ট্রি-র মুসলমানদের প্রভাবিত করে। অপ্রকাশিত থিসিস, আর. ডব্লিউ. মসকরণ, সিপাহি বিদ্রোহ।

৩৭ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, ৪১৬ জনকে নির্বাসন এবং অন্যদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়। সিঙ্গাপুরে জনসম্মুখে তাদের সাজা দেয়া হয়।^{৩৯}

গদরে জার্মানদের অংশগ্রহণ

গদর পার্টি স্থাপিত হওয়ার কমপক্ষে একযুগ আগে থেকে লন্ডন, প্যারিস এবং বার্লিনে ভারতীয় বিদ্রোহীদের কার্যক্রম শুরু হয়। জার্মানির সাথে গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ চূড়ান্ত হওয়ায় ভারতীয় বিদ্রোহীরা তাদের কার্যক্রম লন্ডন এবং প্যারিস থেকে বার্লিনে সরিয়ে নেয়। ১৯১৪-এর বসন্তের শেষে হরদয়াল জার্মানীতে আসে এবং গদর পার্টি এবং তার প্রায় ১,০০০ সক্রিয় সদস্য সম্পর্কে জানায়। বার্লিন-ইন্ডিয়া কমিটি জার্মান সরকারের কাছে আবেদন জানায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিয়ারম্যান ইউনাইটেড স্টেটসে তাদের দূতকে গদর বিদ্রোহীদের অস্ত্র এবং চাঁদা জোগান দেয়ার নির্দেশ পাঠান। স্যান ফ্রান্সিসকো, সাংহাই এবং ব্যাংককেও বিদ্রোহীদের সাহায্য করার আদেশ দেয়া হয়।

জার্মানদের এই অংশগ্রহণ গদর সংঘে দ্বিমত দেখা যায়।^{৪০} রামচন্দ্র, যিনি শিখদের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত ছিলেন না, তার হাতে দলের সকল ক্ষমতা চলে আসে। বার্লিন-ইন্ডিয়া কমিটির অন্যান্য নির্দেশক হারাম্বা লাল গুপ্তার কাছে সকল টাকা আসে। বিপক্ষীয় ভারতীয় দল এবং ভারতীয় ও জার্মান দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দেখা দেয়।

আমেরিকা থেকে ভারতে অস্ত্র পাচারের প্রথম প্রচেষ্টা বিফলে যায়। পাঁচ হাজার রিভলভার একটি চার্টার্ড জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু জাহাজটি তার যাত্রীসহ ব্রিটিশ নৌবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এরপর হারাম্বা লাল গুপ্তা জাপান গিয়ে অস্ত্র কেনার চেষ্টা চালান। ব্রিটিশ গোয়েন্দাবাহিনী জাপান সরকারকে সতর্ক করে দেয়। ফলে হারাম্বা লাল গুপ্তাকে কয়েক বছর লুকিয়ে থাকতে হয়। কোন কিছু না নিয়েই তিনি আমেরিকাতে ফিরে যান।

গুপ্তা যখন জাপানে ছিলেন তখন ভারতে অস্ত্র পাচারের আরও কিছু ব্যবস্থা নেয়া হয়। ১৯১৫-এর মার্চে অ্যানি লার্সেন যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ হয়ে সাগরে ভাসে। পরেরদিন ম্যাভরিক, একটি ট্যাংকার, ওয়েটার বেশে সজ্জিত পাঁচজন বিদ্রোহীকে নিয়ে আমেরিকা ত্যাগ করে। কথা ছিল সমুদ্রে মিলিত হবার পর তারা অস্ত্র এবং যুদ্ধ সামগ্রী নিয়ে পূর্ববাংলার কোন দুর্গম অঞ্চলে বিদ্রোহীদের অস্ত্র যোগান দিবে। কিন্তু তা হলো না। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ ম্যাভরিক অনুসন্ধান করে বিদ্রোহীদের সকল কাগজপত্র জালিয়ে দিতে হয়। প্রথমে ট্যাংকারটি ডাচরা অন্তরীণ

করে, পরে ব্রিটিশরা। অ্যানি লার্সেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে ধরা পড়ে এবং নিষিদ্ধ জিনিস বহনের দায়ে অভিযুক্ত হয়।

জার্মানরা আরও পাঁচটি যুদ্ধজাহাজ ভারতে পাঠানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু হেনরি এস, অ্যানি লার্সেন, ম্যাডরিকের পরিণতি এবং ভারতীয় ও জার্মানদের দ্বন্দ্ব সকল কিছু নষ্ট করে দেয়। সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা তো আরও পরে আসে। জার্মান পররাষ্ট্র অফিস থেকে অনুমোদন নিয়ে বার্লিন-ইন্ডিয়া কমিটি ১৯১৬-এর ফেব্রুয়ারিতে একজন বাঙ্গালী ডাঃ চন্দ্র কান্ত চৌধুরীকে গদর বিদ্রোহ পরিচালনা এবং অনেক টাকা চাঁদা প্রদানের জন্য পাঠায়।

চক্রবর্তী এই টাকা নিজের কাজে ব্যয় করে এবং নিজের কাজ সম্পর্কে কাল্পনিক রিপোর্ট পাঠান। ঘটনা জানার পর জার্মানরা গদর পার্টি থেকে তাদের অংশগ্রহণ সরিয়ে নেয়। ভারতীয়দের সাথেও তারা খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করে। গদর বিদ্রোহীরা ১৯১৭ সালটিকে তাদের হীরকজয়ন্তী হিসেবে পালন করার পরিকল্পনা করে।

গদরিস্টদের মাঝে সংঘাত বাড়তে থাকে। জার্মানদের দেয়া অধিকাংশ টাকাই চক্রবর্তী লুট করে নিয়ে যায়। অভিবাসী, পার্টি জার্নাল এবং হেডকোয়ার্টার থেকে প্রাপ্ত চাঁদা রামচন্দ্র এবং তার বন্ধুরা নিয়ন্ত্রণ করে। সর্বহারার দলে অধিকাংশই ছিল শিখ, বাকিরা ছিল হিন্দু। এভাবেই ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি হয়।

৬ এপ্রিল ১৯১৭ সালে আমেরিকা যুদ্ধে অংশগ্রহণ শুরু করে। ব্রিটিশ সরকারের মদদে ১৮ জার্মানীর সাথে ১৭ ভারতীয় বিদ্রোহীকে প্রেরণ করা হয়। আমেরিকার নিরপেক্ষতা ভাঙ্গার জন্য তাদের দায়ী করা হয়।^{৪০} সকল দোষীদের হয় মৃত্যুদণ্ড নতুবা বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। নাটকীয়ভাবে এই ঘটনার শেষ হয়। শেষ দিন একজন হঠাৎ রিভলবার বের করে এবং রামচন্দ্রকে গুলি করে। হত্যাকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে মার্শাল কোর্টের মাধ্যমে হত্যা করা হয়।^{৪১}

৪০. ইউনাইটেড স্টেটসের ইতিহাসের ইউ.এস.এ এবং ফ্রান্সের মধ্যকার সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিচার। এটি পাঁচ মাস ধরে চলে, পৃথিবীর সকল স্থান থেকে সাক্ষী আসে। খরচ পড়ে প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার, *সানফ্রান্সিসকো ক্রনিকল* ২২ এপ্রিল ১৯১৮।

৪১. গদরিস্টদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে এই সকল খুন হয়। সান ফ্রান্সিসকো ক্রনিকল (২৪-৪-১৯১৪) এই ব্যাপারে বিবৃতি দেয়, “সিংদের কাজ এখন একেবারে পরিষ্কার। ভাগরবান সিংদের মতে, রাম সিং (রামচন্দ্রের খুনি) কানাডায় অনেক জমির মালিক ছিল এবং ধনী বলে পরিচিত ছিল। নিজেদের মাঝে বচসায় তারা রামচন্দ্রকে বিশ্বাসঘাতক বলে এবং তাদের মতে হিন্দুদের প্রাপ্য অধিকাংশ ডলার রামচন্দ্র ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে। লাজপত রাজ তার “আন-আমেরিকান ভার্সন, সেভেন্থ রিপোর্টে লেখেন, “প্রচারণা এবং চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাঙ্গালিরা নীতিহীন ছিল। পাঞ্জাবিদের মাঝে সবচেয়ে খারাপ ছিল রামচন্দ্র এবং হরিশচন্দ্র। শিখরা সবচেয়ে স্বার্থহীন এবং নিয়মমুখক।” অটোবায়োগ্রাফিকাল রাইটিং পৃ. ২৮৪। রামচন্দ্রের নাম জাতীয় কংগ্রেসে বিপ্লবের নায়ক বলে চিহ্নিত।

ব্রিটিশ ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ১৯১৫ প্রাদেশিক সরকারকে টাইবুর্নাল গঠন করায়। এর নির্দেশই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। গদর বিদ্রোহীদের বিচারের জন্য তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি কমিটি ঠিক হয়। লাহোর, মান্দি, বেনারস এবং মান্দালয় ও সিঙ্গাপুরে শত শত বিপ্লবীকে শাস্তি দেয়া হয়। পাঞ্জাবে ৪৬ জনকে ফাঁসি এবং ১৯৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়।^{৪২} এছাড়াও অনেক সৈন্যকে কোর্ট মার্শাল এবং গুলি করা হয়।

গদর বিদ্রোহ বিভিন্ন কারণে ব্যর্থ হয়। অস্ত্রের, পরিকল্পনার, সঠিক নেতৃত্বের অভাব, বিদ্রোহীদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে না পারা।^{৪৩} জার্মান এবং বিদ্রোহীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার দক্ষতা, তাদের গুপ্তচর প্রথা, ভারত সরকারের কর্মকাণ্ড, পাঞ্জাব পুলিশের হিংস্রতা, যা নেতাদের তাদের সহকর্মী সম্পর্কে তথ্য প্রদানে বাধ্য করে। এর ব্যর্থতার সর্বপ্রধান কারণ পাঞ্জাবিরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। ধনী জমিদাররা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা প্রমাণেই ব্যস্ত ছিল। জমিদাররা ফেরত অভিবাসীদের উপর নজর রাখার জন্য কমিটি গঠন করেন। তারা তাদের বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের পথে ফেরত আনানোর চেষ্টা করেন। এমনকি একজন কৃষকও বিপ্লব থেকে যুদ্ধ সম্পর্কে বেশি জানত। কমিউনিস্ট এবং আমেরিকার^{৪৪} জাতিগত দাঙ্গার প্রতিটি বিষয় থেকে শিখ ব্যাটারিয়ার তুর্কিদের বিরুদ্ধে নায়কোচিত আচরণ তরুণ সমাজকে বেশি আকর্ষণ করে।

গদররা ভারত থেকে ইংরেজ তাড়াতে চায়। কিন্তু কোন্ ইংরেজ তাদের হাতে মারা যায়নি, অথবা তারাও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়নি। তারপরও এই আন্দোলন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অস্ত্রের সাহায্যে ভারত মুক্তির এটি সর্বপ্রথম আন্দোলন। মহারাষ্ট্র এবং বাংলায় এটি ছিল হিন্দুত্ববাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। গদর পার্টির অধিকাংশ শিখ গদর পার্টি হিন্দু এবং মুসলিমদের আকর্ষণ করে এবং পরে অন্যান্য বিদ্রোহী দল গঠনের অনুপ্রেরণা দেয়।

গদর আন্দোলন শিখ সমাজে অন্যরকম পরিবর্তন আনে। ব্রিটিশরাজের প্রতি প্রায় তিন দশকের বিশ্বস্ততার উপর এটি প্রশ্ন আনে। যদিও কিছুদিন পরেই বিদ্রোহ দমিত হয়ে যায় তারপরও আকালি বিদ্রোহের সময় এটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আকালি বিদ্রোহের অধিকাংশই গদর পার্টির সদস্য ছিল।

যুদ্ধের পরে গদর পার্টির সাম্যবাদিতা এবং জাতীয়তাবাদিতা সামনে আসে। ১৯২৪ সালের আমেরিকার সাম্যবাদী দল আমেরিকা ও কানাডার গদর পার্টির সাথে

৪২. এ্যান একাউন্ট অফ দ্য গদর কনসপারেসী।

৪৩. এ্যান একাউন্ট অফ দ্য গদর কনসপারেসী।

৪৪. স্যার মাইকেল ও'ডয়ার লেখেন, “এরপর শিখদের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। চার বছরের যুদ্ধে শিখরা, যারা ব্রিটিশ ভারতে শতকরা ১ ভাগ জনগণ, তারা ৯০ হাজারের উপর যুদ্ধ দল গঠন করে যা পুরো ভারতের এক-অষ্টমাংশ। তাদের অংশগ্রহণ এতই প্রাণবন্ত ও উৎসাহদায়ক ছিল যে অনেকেই মনে করে তারাই যুদ্ধ জয় করেছে। ও'ডয়ার, ইন্ডিয়া এ্যাজ আই নিউ ইট, পৃ. ২০৭।

যোগাযোগ করে। ১৯২৫ সালে একদল বিদ্রোহীকে রাশিয়ায় পাঠানো হয়। দুই বছর পর এদেরকে ভারতে পাঠানো হয়। তখন গদরিস্টরা পুনরায় একত্রিত হয় এবং পুরনো সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করে। রাজনৈতিক ভুক্তভোগীরা ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সহযোগিতা পায়। এই সাহায্য করে “দেশ ভগত পরিবার এবং সহায়ক সভা।” মাসকুভাইটের গদরিস্টরা বাকাদের সাথে হাত মেলায়। “কীর্তি” নামক একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৯২৬ সালে তারা “কীর্তি কিশাণ” সংগঠন নামে পরিচিত হয়। এর প্রকাশনার শিরোনাম ছিল, “কম্যুনিষ্ট পার্টি অফিসিয়াল অংশ। যা আন্তর্জাতিকভাবে তৃতীয়।”^{৪৫} কয়েক বছরের জন্য কীর্তির ছিল, তেজ সিং স্বতন্ত্ররা।^{৪৬} কীর্তি এবং অফিশিয়াল কম্যুনিষ্ট পার্টিকে পাঞ্জাবে সমন্বয় সাধন করে সোহান সিং জোশ।^{৪৭} মস্কো এবং কানাডা থেকে তারা সাহায্য পায়। কেন্দ্রীয় পাঞ্জাবে শিখ কৃষকদের মাঝে অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে দেয়।

সাম্যবাদের অনুপ্রেরণা গদর পার্টিতে ছড়িয়ে যায়। আমেরিকা এবং কানাডার অধিকাংশ গদরিস্টরা সাম্যবাদের বিপক্ষে চলে যায়। তাদের ঝগড়া হিংস্রতায় রূপ নেয়। ক্যালিফোর্নিয়ায় প্রায় দুই ডজন হিন্দু খুন হয়।^{৪৮} এই সমস্যা ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত চলে। ১৯৪৮ সালে গদর পার্টির সকল সম্পত্তি আমেরিকার ভারত দূতাবাসের হাতে তুলে দেয়া হয়। এভাবে এর ৩০ বছরের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে।

৪৫. ডা: জে এস বেইনস্ “স্প্যাকস্ম্যান”-এ ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫, “থট”-এর তিলক রাজ চন্দ, ১৪ জুন ১৯৫২।

৪৬. আনুনা গ্রামের একজন জাট শিখ তেজা সিং স্বতন্ত্র আকালি এবং কংগ্রেস আন্দোলনের সময় স্বক্রিয় ছিলেন। তুরস্কের এক মিলিটারী স্কুলে তিনি ৫ বছর কাটান। তারপর ক্যালিফোর্নিয়ার গদরিস্টদের সাথে যোগাযোগ করেন ১৯২৯ সালে। ভারত ফেরার আগে দু’বছর তিনি রাশিয়ায় কাটান। ১৯৩৬ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং গাওলে ৬ বছর কাটান। গাওলে থাকাকালীন সময় ১৯৩৭ সালে পাঞ্জাব সভার জন্য নির্বাচিত হন। মুক্তির পর ১৯৪২ সালে কিশাণ সভার সভাপতি এবং ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি তার অফিসিয়াল পার্টি থেকে বরখাস্ত হন এবং নিজস্ব লাল পার্টি (কম্যুনিষ্ট) গঠন করেন। বহু বছর ধরে তাকে ডাকাতি এবং খুনের সাথে জড়িত বলে সন্দেহ করা হয়। পলাতক থাকার পর ১৯৬২ সালের শীতে তিনি আবার দেখা দেন এবং তার উপর আনা সকল মামলা খারিজ করা হয়।

৪৭. চেতনপুর গ্রামের একজাট শিখ সোহান সিং জোশ আকালি আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে টেক্সটাইল মিলে এবং আদম গুমারী অফিসে কাজ করতেন। ১৯২২ সালে তিনি আকালির সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯২৫-৬ সালের আকালি দুর্নীতি মামলায় কারাবরণ করেন। মুক্তির পর কীর্তির সম্পাদনা কাজে সাহায্য করেন এবং ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন। মীরাট দুর্নীতি মামলায় কারাবরণ করে চার বছর কাটান। ১৯৩৪-৫০ পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪৩-৫৩ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের একজন অন্যতম কম্যুনিষ্ট নেতা।

৪৯. আন-আমেরিকান অ্যাকটিভিটিস রিপোর্ট তালিকাভুক্ত।

গুরুদুয়ারা পুনস্থাপন আকালি বিদ্রোহীদের পুনরুত্থান

সিং সভা আন্দোলন শিখদের তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। শিক্ষিতরা যেখানে তাদের প্রশাসনিক ও চাকরিক্ষেত্রে অধিকার আদায়ে সচেষ্ট ছিল সেখানে সাধারণরা তাদের গুরুদুয়ারা নিয়ে চিন্তিত ছিল। কিছু গুরুদুয়ারা যেমন অমৃতসর এবং গুরুনানকের জন্মস্থান নানকানার আয় কয়েক লাখ টাকা পার হয়ে যেত। কয়েক বছর ধরে শিখরা মহাত্মাদের বিরোধী ছিল। গদর বিদ্রোহের ফলে যে অশান্ত ব্যবস্থা দেখা যায় তা শিখদের আরও করুণ অবস্থায় নিয়ে যায়। পাঞ্জাবি হিন্দুদের সাথেও সংঘর্ষ শুরু হয়। ফলে আকালি (অমরত্ব) উদ্ভব হয়। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে একজনকে অবশ্যই গুরুদুয়ারা এবং শিখ জীবনে এর অবদান সম্পর্কে জানতে হবে।

গুরুদুয়ারা

এর আয় ও ব্যবস্থাপনা : ভ্রমণ শেষে নানকের ফেরার পর কার্তপুরে প্রথম গুরুদুয়ারা স্থাপিত হয়। এই সাধারণ ধর্মশালায় সবাই তার উপদেশ ও ধর্মগীত শোনার জন্য মিলিত হতো। শুধু ধর্ম নয়, বরং জন্মদিন, বিয়ে, স্মৃতিজন্ম এবং সামাজিক অনুষ্ঠান পালনের জন্য একটি সামাজিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। একটি উন্মুক্ত রান্নাঘর ছিল যা গুরুকা লঙ্গর বলে অভিহিত। “পঞ্চায়েত ঘর” যেখানে বয়স্করা বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার সমাধান করেন। ছোট থেকে বড় সকল গুরুদুয়ারাতে এগুলো হয়। গরীব কৃষকরা এসব গুরুদুয়ারা নির্মাণ করে কিন্তু বিশাল পরিমাণ টাকা মন্দির ভোগ পায়। বিশেষ করে ধর্মীয় উৎসবে লঙ্গরে ৫০,০০০০ পিলিগ্রাম খাবার খায়। এসকল পালন করত মিসলের সরদাররা। পরে মহারাজা রনজিত সিং ও তার পরিবার এবং শিখ রাজকুমার বিশাল পরিমাণ জায়গা দান করেন। কিছু যেমন স্বর্ণমন্দির, নানকানার মন্দির এবং পানজা সাহিব এর সাথে জায়গীরও ছিল। খাল খননের সাথে গুরুদুয়ারা জমি থেকে প্রাপ্ত আয়ও আনুপাতিকহারে বেড়ে চলে।

গুরুদুয়ারা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন ব্যবস্থাপনা অথবা রক্ষণাবেক্ষণকারীর জন্য কোন দক্ষতা আবশ্যিক ছিল না। মুঘল আমলে গ্রন্থীদের কাজ ছিল সবচেয়ে

ঝামেলাপূর্ণ। তাদেরকে পরিষ্কারভাবে থাকতে হবে। যে কোন সময় শিখবাদীদের সংস্পর্শ তাদের এড়িয়ে চলতে সুবিধা হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের পরেও উদাসীরা মন্দির দেখাশুনা করত এবং গ্রন্থীর পদ বাবা থেকে ছেলেরা পেত। যে সকল মানুষ তাদের জীবন প্রার্থনায় কাটাতে এবং সমাজ সেবায় উৎসর্গ করতে চাইত তারা কম গুরুত্বপূর্ণ গুরুদুয়ারাগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করত।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নতুন রেকর্ড স্থাপিত হলো। বিভিন্ন গুরুদুয়ারার প্রাপ্য জমি এবং সম্পত্তি মহাত্মাদের নামে লিপিবদ্ধ করা হলো।^১

যখন পুরোহিতরা এগুলো পাওয়ার সুবিধা পায় তখন তারা এর মালিক হিসেবে লিপিবদ্ধ হন এবং এগুলো ইচ্ছামত ভোগ করা শুরু করেন। উদাসীরা যেমন শিখ তেমন হিন্দু বলে পরিচিত। হিন্দু পূজারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি গুরুদুয়ারায় ঝোলানো থাকত। এসব পবিত্র ছবির অপব্যবহারের কিছু ঘটনাও ঘটে।^২

স্বর্ণমন্দিরের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমাজের কিছু আত্মহ ছিল। জরুরী ব্যাপারগুলো প্রথমে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার এবং পরে পুরোহিত দেখতেন। শিখ সরদাররা মন্দিরগুলোর নতুন ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারকে বাধ্য করে। ২২ ডিসেম্বরের ১৮৫৯ সালে ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে এসভায় নয় সদস্যবিশিষ্ট এক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির উদাসীনতায় ডেপুটি কমিশনারের তত্ত্বাবধানে পুরোহিতরাই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকেন।^৩

সিং সভা সর্বপ্রথম অস্পৃশ্য জাতিদের বড় বড় মন্দির থেকে দূরে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। নানদাদ-এর হজুর সাহেবের পুরোহিতরা সিং সভা বেতন দিত এবং অন্য মন্দিরের পুরোহিতদেরও তা করত বলে হয়। পাঞ্জাবে সিং সভা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের চাপে স্বর্ণমন্দির থেকে সকল মূর্তি সরিয়ে নেয়া হয় ১৯০৫ সালে। একবছর পর ম্যানেজার মাঁরা যাওয়ায় সিং সভা ডেপুটি কমিশনারকে চাপ প্রয়োগ করে।

১. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের “দখল” শব্দটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। মালিকের দখল এবং ধর্মীয় কার্যাবলীর জন্য দখলে পার্থক্য আছে। এর ফলে রক্ষণাবেক্ষণকারীরা মন্দিরের সম্পত্তির যথেষ্ট ব্যবহার শুরু করে। এভাবে তাদের চারিত্রিক অধঃপতন হয়। শিখরা নিজেদের এই অধিকার হারানোয় খুবই ক্ষুব্ধ হয়। *মেহতাব সিং এলসিডি, ১৪ মার্চ ১৯২১ পৃ. ৩৬০।*
২. খাল খনন এবং প্রাসাদ বৃদ্ধির সাথে সাথে মন্দিরের আয় এবং সম্পত্তি যতই বৃদ্ধি পায় মহাত্মাদের লোভ ততই বাড়ে। খারাপ চরিত্রের জন্য তারা সহজেই অনৈতিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের এইসব কর্মকাণ্ড পবিত্র গুরুদুয়ারাকে পতিতালয় এবং জুয়া, মাতাল, চোর ডাকাতদের আড্ডাখানায় পরিণত করে। কোন লোকের সম্মান বা কোন মহিলার ধর্ম সুরক্ষিত ছিল না। অনেক উচ্চবংশীয় মহিলা ধ্বংসের পথে চলে যান এবং অনৈতিক সন্তান জন্মদানে বাধ্য হন। পতিতার মহাত্মাদের পুত্রের জননী হত এবং তাদের তারা গুরুদুয়ারার সম্পত্তি থেকে কোটি টাকা দান করত। ইবিড।
৩. গ্রন্থি বা পুরোহিত হওয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। নানদাদ শাসন করার সময় নিজাম সরকার সচরিত্র যারা মদ খায় না তাদের পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দিত। নারায়ণ সিং এবং ভগত সিং-এর (সিভিল স্যুট ৮০৭, ৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬) ঘটনায় আদালত ঘোষণা করে ৩৫ বছরের বেশি অবিবাহিত কুমার স্বর্ণমন্দিরের পুরোহিত হতে পারবে। *ট্রিবিউন ২০ জুন ১৮৮৬।*

সিং সভার নেতারা অফিসিয়াল অথবা প্রাতিষ্ঠানিক কাজের জন্য নিজেদের উপস্থাপন করে। গুরুদুয়ারায় সম্পত্তির অপব্যবহার রোধে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দরকার। ১৯১২ সালে নতুন রাজধানী গঠনের সময় সরকার দিল্লির রিকাবগঞ্জের কাছে গুরুদুয়ারা কিছু জমি নিয়ে নেয় এবং একটি সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে। মর্কা অর্থাৎ সম্মুখ যুদ্ধে একটা রক্ষীবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা থাকলেও যুদ্ধের কারণে তা পিছিয়ে যায়।

১৯১৮ সালে এসব ব্যাপার আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মনটেগুকেমসফোর্ড সাংবিধানিক প্রস্তাবের পর সন্ত্রাসী কার্যক্রম বেড়ে যায়। এর ফলে শিখ জনগণ সরকারের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। লাহোরে একটি সভায় ব্রিটিশদের সাথে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রিকাবগঞ্জের জমি দখলের জন্য স্বেচ্ছাসেবী পাঠানো হয়। এটি আরও দাবী করে খালসা কলেজের ব্যবস্থাপনা অফিসিয়াল নিয়ন্ত্রণ থেকে সরিয়ে শিখ কমিটির হাতে দেয়া হোক।

সরকার শিখদের বোঝানোর চেষ্টা করে। গুরুদুয়ারার ভেঙ্গে যাওয়া দেওয়াল আবার পূর্ননির্মাণ করা হয়। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণকারী কমিটির কাছে জমি ফেরত দেয়া হয়। শিখদের অন্যান্য ছোটখাট দাবীও মানা হয়। অস্ত্র আইন থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের কিরপান রাখার অনুমতি দেয়া হয়। শিখ কারাবন্দিদের ধর্মীয় কার্যাবলী পালন করতে দেয়া হয়। অন্যদের থেকে আলাদা করে তারা নিজস্ব পাগড়ি পরিধান করার ব্যবস্থা করা হয়।

এই সকল কাজ মন্দিরের উপর নিয়ন্ত্রণকে নিয়ে অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন করে। এই ব্যাপারে শিখদের দাবীর প্রেক্ষিতে সরকার কম সাড়া দেয়। যাদের নামে জমি রেজিস্ট্রি করা তারা জমি দখলের জন্য আদালতে যেতে পারে। চার্চের মতো মহাত্মারা কোন জমি অধিগ্রহণ করতে পারত না। অনেক শিখ কমিটি চেষ্টা করেও এর কোন ফল বের করতে পারেনি। জমির উপর ভিত্তি করে আদালতে ফি দিতে হয়। হতাশা এবং রাগ বেড়েই চলছিল। কিছুদিন পর শিখরা নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ সমিতি গঠনের পরিকল্পনা করে। ১৯২০ সালের ১৫ নভেম্বর আকাল তাখ্ত সকল শিখ মন্দির ব্যবস্থাপনার জন্য শিরোমনি গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটি গঠন করে। সুন্দর সিং মাজিথিয়া, হারবান সিং, ভাই যোধ সিং ক্রমান্বয়ে সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। “আকালি দল” নামক একটি আধামিলিটারী দল গঠন করা হয়। তারা গুরুদুয়ারা পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়। একটি পত্রিকা “আকালি” প্রকাশনা শুরু হয়।^৪

৪. সম্পাদক মংগল সিং এবং হিরা সিং পরে শিখ রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। আকালিতে লেখার জন্য লুধিয়ানার গিল গ্রামের এক জাট শিখ মঙ্গল সিং পাঁচ বছর কারাদণ্ড ভোগ করে। পরে তিনি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সকলের সামনে শিখদের সুবিধা অসুবিধা তুলে ধরেন। ১৯৩৪-৪৫ সালে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন।

শিখদের চাহিদার জোরে অবশেষে মহাত্মা গুরুদুয়ারার দায়িত্ব নির্বাচিত কমিটির হাতে দিয়ে বেতনভুক্ত গ্রন্থিতে পরিণত হতে রাজি হন। তারন তারান-এর গুরুদুয়ারায় সহিংসতায় দুইজন আকালি নিহত এবং ছয়জন আহত হয়, তারন তারান গুরু ছিল মাত্র।

গুরু নানকের জন্মস্থান সবচেয়ে বেশি মন্দিরে সমৃদ্ধ। সেইসময় একজন উদাসী মহাত, নারায়ণ দাস তার স্ত্রীকে নিয়ে গুরুদুয়ারায় থাকতেন। কথিত আছে যে, তিনি পবিত্র মন্দিরে পতিতাদের নাচ উপভোগ করতেন। শিখরা তাকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়।^৫ কিন্তু সে পুলিশের সাহায্য নেয় এবং ৪০০ জনকে নিজের জীবন ও স্বার্থরক্ষায় নিয়োগ করে।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এর সকালে লছমন সিং ধারোভালিয়ার নেতৃত্বে আকালিদের একদল জাট গুরুদুয়ারায় প্রবেশ করে। মন্দিরের দরজা তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নারায়ণ দাসের লোকেরা তলোয়ার হাতে জাটদের আক্রমণ করে। জাটরা তখন লগ জুলিয়ে দেয়। এই সময় পুলিশ এবং শিখরা উপস্থিত হয়। ১৩০ জন অগ্নিদগ্ধ হয়।^৬

এই খবর চারদিকে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আকালিরা দলে দলে আসতে থাকে। লাহোরের কমিশনার^৭ এই জায়গায় উপস্থিত হন এবং এসজিপিসি-এর হাতে মন্দিরের চাবি তুলে দেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগ ঘটনার পর পাঞ্জাবের অবস্থা আরও খারাপের দিকে যায়। লাহোর, অমৃতসর, শেখপুরা প্রভৃতি জেলাকে সভা আইনের অধীনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রখ্যাত নেতারা গ্রেপ্তার হন।

কিছু কিছু দল সরকারকে অসহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।^৮

১৯২১ সালের গ্রীষ্মে সারা ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। মালবায়ে মোফালদের উত্থান হয়। ওয়েলসের রাজার দমনে হরতাল আহ্বান করা হয়।

হিরা সিং বিভিন্ন সময় কারাদণ্ড ভোগ করে জাতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ফুলেশ্বরী সম্পাদনার সাথে তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান।

৫. নানকানার উপর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি সবার আগে পড়ে। সরকার আকালিদের সভাপতিত্ব করার জন্য শেখ আসগর আলী ও মহাত্মা সাধু ও পূজারীদের জন্য লেফটেন্যান্ট কর্তার সিং বেদীর নাম ঘোষণা করা হয়।
৬. পিএলসিডি ১৯২১ পৃ. ৩০৪ ১৩০ জন আকালিকে হত্যা করার জন্য তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং নারায়ণ দাসসহ দু'জনকে নির্বাসন দেয়া হয়। রাজার বিপক্ষে নারায়ণ দাস এবং অন্যরা ট্রিবিউন ৩ মার্চ ১৯২২।
৭. কমিশনার জনাব কিং আইন পরিষদে ব্যক্তিগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, “দুর্ভাগ্যবশত একদল লোকের বিরূপ কার্যকলাপের জন্য সমস্ত হিসাব পাল্টে যায়। নানকানায় লছমন সিং-এর দলকে আটকানোর মতো কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। ১৫ মার্চ ১৯২১, পৃ. ৩৮০-৩।
৮. মহাত্মা গান্ধী নানকানা দর্শন করেন। তিনি বলেন, সবকিছু মৃত্যুরই অপর নাম। জালিয়ানওয়ালাবাগ-এর থেকেও বর্বর। দ্য টাইমস, ১১ মার্চ ১৯২১।

বিদেশী পণ্যের দোকান লুট এবং ব্রিটিশ মালামালে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

অর্থনৈতিক মন্দা পাঞ্জাব বিদ্রোহ আরও ত্বরান্বিত করে।^৯ বিভিন্ন নেতৃত্ব বিভিন্ন রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করে। বাবা খারক সিং,^{১০} মেহতা সিং^{১১} এবং তেজা সিং সামুন্দবী ধর্মীয় মতবাদের অনুসারী হন। মাস্টার তারা সিং^{১২} এবং তার তিন ভাই অমর সিং, সারমুখ সিং এবং জসবন্ত সিং ধর্মীয় এবং জাতীয়তাবাদ উভয়ের অনুসারী ছিলেন। বিভিন্ন দল নিজেদের সন্তানবাদী দল হিসেবে পরিচয় দেয়।

অনেক নেতারা জনগণের অনুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করেন। নানকানার শহীদদের সম্মানার্থে শিখদের কালো পোশাক পরতে বলা হয়। শহীদদের পরিবারকে সাহায্য প্রদান, বিদ্যালয়, কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনের জন্য একটি ফান্ড গঠন করা হয়। পুরো প্রদেশ থেকে এই উদ্দেশ্যে চাঁদা তোলা হয়। এর ফল নানকের জন্মদিনে দেখা যায়। নানাকানায় জমা হওয়া ৫০,০০০ শিখ-এর মধ্যে ২০,০০০ আকালি এবং ১২-১৫,০০০ জাট হওয়ার শপথ নেয়।^{১৩}

দ্য কি এ্যাক্শ্যার

এই পরিস্থিতিতে ডেপুটি কমিশনার যেন ঘিয়ে আগুন লাগলেন। বাবা খারক সিংকে সন্দেহ করে এসজিপিটির ডেপুটি কমিশনার স্বর্ণ মন্দিরের চাবি নিয়ে নেন এবং নিজের লোকের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি সজি আইন দমন করেন এবং ১৯৩

৯. মন্দির এবং গুরুদুয়ারার অব্যবস্থাপনার জন্য অসন্তুষ্টি এবং অস্থিরতা জাতীয়তাবোধ জাগরণের জন্য দায়ী। *মিয়া ফজলে-ই-হোসাইন, ১৪ মার্চ ১৯২১, পৃ. ৩৫০।*
১০. খারক সিং (১৮৬৭-১৯৬৩) আহলুওয়ালিয়া শিয়ালকোটের এক আর্মি কন্ট্রাস্টরের ছেলে। কয়েক বছরের জন্য তিনি ছিলেন শিয়ালকোটের অবিসংবাদিত নেতা-বেতাজ বাদশাহ্। সাম্যবাদীদের সাথে তাঁর কোন যোগাযোগ ছিল না।
১১. শাহপুর জেলার একজন তারোরা মেহতা সিং (১৮৭৯-১৯৩৮) ছিলেন একজন উকিল।
১২. হরিয়াল গ্রামের মালহোত্রা গোত্রের এক হিন্দুর ছেলে ছিলেন তারা সিং। স্কুলে তিনি শিখ শিক্ষায় শিক্ষিত হন। প্রথমে রাওয়ালপিন্ডি এবং পরে খালসা কলেজ, অমৃতসর-এ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালে পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর তিনি শিক্ষকতার উপর ডিপ্লোমা করেন। লায়লপুর-এ খালসা হাই স্কুল-এর শিক্ষক হয়। সবসময় তাকে সবাই মাস্টার বলে ভূষিত করে। তিনি আকালি আন্দোলনে যোগদান করেন এবং একজন উল্লেখযোগ্য নেতায় পরিণত হন। মাস্টার তারা সিং ধর্ম, রাজনীতি এবং কাল্পনিক বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে বাবা তেজা সিং এবং প্রেমলগন উল্লেখযোগ্য। উর্দুতে “প্রভাত” এবং গুরুমুখীতে “জাটেদার” নামক দু’টি পত্রিকা প্রকাশ হয়।
১৩. একজন পুলিশ বলেন, “শক্তিশালী জাতীয়গত এবং কর্তৃপক্ষ বিদ্বেষ এই সভায় প্রেরণা জোগায়। দ্য আকালি ডল।

কামাগাতা মার্কস গুরুদিত সিং-এর উত্থান এই মেলাকে স্মরণীয় করে। তিনি আত্মসমর্পণ করেন। সশস্ত্র আকালিদের সঙ্গে নিয়ে মাস্টার মোটা সিং উদয় হন এবং গায়েব হয়ে যান।

জন আকালিকে খেপ্তার করেন। নেতাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড এবং জরিমানা দেয়া হয়।

এই ঘটনা ভারতে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সরকার উপলব্ধি করতে পারে অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার বোলতার চাকে ঢিল দিয়েছে। কারাদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর পাঞ্জাবের গভর্নর তাদের মুক্তি দেন এবং চাবি খারক সিং-এর কমিটিতে ফিরিয়ে দেন। মহাত্মা গান্ধী একে প্রথম জয় বলে অভিহিত করেন।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকল্যাগান গুরুদুয়ারার স্বত্বাধিকারী শিখদের কাছে হস্তান্তর করার চেষ্টা করেন। ১৯২১ সালের মার্চ মাসে শিক্ষামন্ত্রী মিয়া ফজল-ই হাসান গুরুদুয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কমিশনারদের বোর্ড গঠন করেন। শিখ নয় এরকম মানুষের বোর্ডে অধীন হওয়ার বিরোধিতা করেন।^{১৪} মিয়া ফজল-ই হাসান শিখ গুরুদুয়ার আইন পাস করেন। কিন্তু শিখরা এটি অবহেলা করেন।

এসজিপিএস সরকারকে অসহযোগিতা এবং ব্রিটিশ পণ্য না কেনার আহ্বান জানায়। এই সময়ে মেহতাব সিং ডেপুটি প্রেসিডেন্ট থেকে পদত্যাগ করেন। যেসব জেলা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সিদ্ধান্তে বিরক্ত হয় তারা আকালিদের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। রাজ্যের ১৩ জেলায় ১,২০০-এর উপরে মানুষ খেপ্তার হয়।^{১৫} তাদের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার।

গুরুর বাগান

অমৃতসর থেকে ১৩ মাইল দূরে “গুরুর বাগান” নামক মন্দিরে গুরু অর্জুন সাক্ষাৎ করেন। উদাসী মহাত্মা ব্যাপ্তিজম ধারণ করেন এবং নির্বাচিত কমিটির একজন হিসেবে দাখিল করেন। ১৯২১ সালের আগস্টে তিনি অভিযোগ করেন আকালিরা গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ আকালিদের খেপ্তার করে। আকালিরা সভা আইন ভঙ্গ করে গুরুর বাগানে সভা ডাকে। পুলিশ মিটিং ভঙ্গ করে তাদের খেপ্তার করে। মেহতাব সিং এবং মাস্টার তারা সিং খেপ্তার হয়। এসজিপিএস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে।

আকালিদের মাঝে ১০০ জন তৈরি হয়। প্রথমে সহিংস হওয়ার শপথ নেয়, তারা গুরুর বাগানের দিকে অগ্রসর হয়। পুলিশ তাদেরকে থামিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। লাথি, জুতা এবং ঘুষি দিয়ে আঘাত করে। উনিশ দিন ধরে এই ধ্বংসযজ্ঞ

১৪. মেহতাব সিং মহাত্মাদের বিদ্বেষপূর্ণ সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, “তারা একধরনের জীবাণু। পূজারীদের অতিরিক্ত আয় তাদের বিষের মতো সংক্রমিত করে এবং এটিই তাদের শয়তানে রূপ দেয়। সরকার যদি আমাদের সাহায্য করতে চায় আমরা করব। কিন্তু নির্মাণ বা উদাসীদের সাধুদের আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দিব না।

১৫. স্যার জন মেনার্ড ১,২৮৬ জনকে খেপ্তার এবং মুক্তি দেয়। পিএলসিডি ৯ আগস্ট ১৯২২. পৃ. ১৬৯৮।

চলে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে।^{১৬} সি.এফ. এ্যান্ড্রুজ জায়গা পরিদর্শনে আসলে আকালিদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি পুলিশের হিংস্রতা সম্পর্কেও অবহিত হন। স্যার এডওয়ার্ড ম্যাকলাগন-এর নির্দেশে চারদিন পর পুলিশ স্থানভ্রাগ করে। ৫,৬০৫ জন আকালি গ্রেপ্তার এবং ৯৩৬^{১৭} জন হাসপাতালে ভর্তি হন। দখল হলে যাওয়া জমিসহ আকালিরা গুরুর বাগানের দখল নেয়।^{১৮} দ্বিতীয় যুদ্ধও যেন জয় হলো।^{১৯}

গুরুর বাগানের এই ঘটনা শিখদের মাঝে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। নেতাদের বিচার কার্যক্রম অসীম উৎসাহের সাথে নীরিক্ষণ করা হয়। যখন তাদের শাস্তিপ্রদানের জন্য কারাগারে নেয়া হয় জনতা তাদের অভিনন্দিত করে।^{২০}

বাক্সর আকালি চরমপন্থী

এসজিপি-এর অহিংস আন্দোলন সকল শিখ সমর্থন করেনি। গুরুর বাগানে পুলিশের ব্যবহার আরও কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্ম দেয়।^{২১} গদর পার্টি এবং অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের থেকেই এই দল গঠিত হয়। এদের মাঝে হারিলদার মেজর রিশেন সিং বিদাং এবং মাস্টার মোটা সিং ছিল সবচেয়ে কার্যক্ষম। অস্ত্র যোগানের জন্য বাক্সররা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং অন্যান্য দেশে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠায়। তারা সৈন্যদের অস্ত্র চুরি করতে প্ররোচিত করে। “বাক্সর আকালি দোয়াবা” নামক একটি কাগজও তারা বের করে।

বাক্সররা গদর পার্টি থেকে বেশি সফল ছিল। গদর পার্টির মতোই কথা গোপন রাখতে না পারা এবং ব্যক্তিগত হিংসা চরিতার্থ করা তাদেরকে অসফলতার দিকে নিয়ে যায়। পাঞ্জাব সিআইডির বাক্সরদের খুঁজে পেতে বেশি কষ্টের দরকার হয়নি।

১৬. কমিটি জানায়, আমাদের সবার মতামত এই যে, সবচেয়ে বেশি এবং হিংস্র পুলিশ বাহিনী ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবহার পাঞ্জাব সরকারের উপর প্রভাব ফেলে। কমিটিতে একজন আমেরিকান মিশনারী এস.ই. স্টোকস কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১০০ জনের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং ৩ জানুয়ারি ১৯২৪-এ রিপোর্ট জমা দেয়া হয়। কংগ্রেস ইনকয়ারী রিপোর্ট অন দ্য গুরু কা বাগ।
১৭. এইচ. ডি. ক্রেইক পাঞ্জাব আইন পরিষদে ১৬৫০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করে। পিএলসিডি ১ নভেম্বর ১৯২২, পৃ. ৪৬৮।
১৮. হিন্দু হিতৈষী স্যার গঙ্গা রাম গুরুর বাগানের জমি গুরুদুয়ারাকে দিয়ে দেন। সরকারের মান বাঁচানোর এটি একটি চাল।
১৯. ডিসেম্বর জানুয়ারিতে গয়ায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একটি আইন পাস করে। আকালি শহীদদের এই আত্মত্যাগ সমস্ত জাতির জন্য সম্মান বয়ে আনে।
২০. ১৯২৯ সালের ৩০ অক্টোবর নাওশেরা কারাগারে নিয়ে যাওয়ার সময় কারাবন্দিদের আপ্যায়ন করার জন্য হাজার হাজার নারী-পুরুষ রেললাইনের কাছে জমা হয়। রেলচাপা পড়ে দুইজন নিহত হন।
২১. একটি সন্ত্রাসবাদী দল আগেই তৈরি হয়। ১৯২১ সালের মার্চে হুশিয়ারপুরে শিখ শিক্ষা কনফারেন্সে তারা নানাকা ঘটনার জন্য যাদের দায়ী মনে করত তাদের আক্রমণ করে। সাতজনকে মৃত্যুদণ্ড এবং পাঁচজনকে শাস্তি দেয়া হয়।

বাকবরদের সময়কাল অল্প হলেও চরম ছিল। কয়েকমাস ধরে জালানদার দাওব ও হুশিয়ারপুরে তারা তাণ্ডব চালায়। পুলিশের তৎপরতা তাদের কার্যক্রম মন্থর করে দেয়।^{২২} ১৯২৩ সালে যেন এই তৎপরতা আরও ছড়িয়ে যায়। ৬২ জনকে বিচার এবং ২২ জন রাজসাক্ষীতে রূপ নেয়। লাহোর কারাগারে ক্যামেরার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া চলে। একজন ইংরেজ জজ এর সভাপতিত্ব করেন। কিষণ সিং বেদীসহ ছয়জন মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেয়া হয়।^{২৩}

আকালি এবং সরকার উভয় পক্ষই দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। আকালিরা জোরপূর্বক গুরুদুয়ারা দখল করে। এর মধ্যে মুক্তাসার দখল উল্লেখযোগ্য। আকালি কারাবন্দিদের সাথে পুলিশরা খারাপ ব্যবহার শুরু করে। তাদের বড় চুলা টানা,^{২৪} প্রহার, ক্ষুধার্ত রাখা এবং বাইরে শীতে রাত্রিযাপন প্রভৃতি অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়।^{২৫}

আকালি কারাবন্দিদের দ্রুত মুক্তি দেয়ার জন্য আইন পরিষদে আইন পাস হয়। অফিসিয়ালরা জানায় ১৯২৩ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় আকালিরা দাঙ্গা প্রশমনে সাহায্য করে। আগস্টে গুরুর বাগানে গ্রেপ্তারকৃত আকালিদের মুক্তির আদেশ দেয়া হয়।^{২৬}

আকালিদের স্বর্ণমন্দিরের পুকুর পরিষ্কার করার মহান দায়িত্ব নেয়া হয়। কয়েক যুগ ধরে পুণ্যার্থীদের গোসল করার কারণে যে ময়লা জমা হয় তা পরিষ্কার করতে একমাস সময় লাগে। এই সময় হাজারো শিখ পাঞ্জাব থেকে ভ্রমতসরে আসে। আকালিরা সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে এই সুযোগ কাজে লাগায়।^{২৭} এস.জি.পি.সি.-এর যে কোন সিদ্ধান্ত গুরুর আদেশের মতো।

২২. এখানে দু'টি ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। ৩১ আগস্ট ১৯৩৩ সালে বাকবর আকালি দোয়াবার উপ-সম্পাদক করম সিং একদল সশস্ত্র পুলিশ দ্বারা ঘেরাও হয়। বাকবররা গ্রেপ্তার হতে অস্বীকার জানালে পুলিশরা গুলিতে আশ্রয় লাগিয়ে দেয়। তারা খোলা হাতিয়ার নিয়ে বের হয়ে এলে গুলি করে হত্যা করা হয়।
- ২৫ অক্টোবর ১৯২৩ সালে বেহালপুরের ধন্য সিংকে ধরার কাহিনী আরও রোমাঞ্চকর। একজন সাথীর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। তিনি নিজের হাতে ২টি গ্রেনেড ছুড়েন এবং নিহত হন।
২৩. পরবর্তী বছরগুলোর কিছু দুঃসাহসিক কাজের জন্য বাকবর এবং গদরদের মিলিত শক্তি দায়ী। ১৯৩৩ সালে খুন এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য জাইনার বেলা সিংকে তার গ্রামেই হত্যা করা হয়।
২৪. পিএলসিডি ৯ নভেম্বর ১৯২২ পৃ. ৫৭-৯।
২৫. পাঞ্জাব কাউন্সিলের দু'জন সদস্য রাজা নরেন্দ্র নাথ এবং সেবাক রাও কারাগার তদন্ত করেন। ৮৩ জনের উপরে আকালি কারাবন্দি ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া ও হাঁপানিতে হাসপাতালে ভর্তি হয়। পি.এল.সি.ডি. ৬ মার্চ ১৯২৩ পৃ. ৯৮৯।
২৬. আকালিদের মুক্তি দেয়ার জন্য দ্বিতীয় প্রচেষ্টা চালু করা হয়। সরকারের সমর্থকদের প্রচেষ্টায় প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পিএলসিডি ৮ মার্চ ১৯২৩ পৃ. ১১০০। সরকারি মতে ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি সালে ৩,৫৯৭ জন আকালি কারাবন্দি ছিল। এদের মাঝে ৩১৪৮ জন ছিল গুরুর বাগানের আসামি। স্যার জন ফেনার্ড বলেন, গুরুর বাগানে বন্দি ছিল ৪,৪০০ জন। সর্বশেষ সংখ্যাটি ছিল ৫,৫৫৪ জন। পিএলসিডি ২ জানুয়ারি ১৯২৪, পৃ. ১২৪।
২৭. বিশ্বাস করা হত স্বর্ণমন্দিরের উপর যে চিল এসে বসত তা ছিল গুরু গোবিন্দ সিং-এর দূত। পরবর্তীতে আকালিদের ধর্মীয়ভাবে এবং জনপ্রিয়তা বাড়াতে এটি সাহায্য করে।

এই সময় কেন্দ্রীয় শিখ পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় অমৃতসরে। গুজব ওঠে সরকার মহারাজা বিপু দামাল সিংকে তার রাজ্য থেকে সরিয়ে দেবে। কয়দিন পর জানা যায় মহারাজকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

জাইটো

নাভার মহারাজার দ্বন্দ্ব ছিল পাটিয়ালার মহারাজার সাথে, ভারত সরকারের সাথে নয়। কিন্তু তিনি সমাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সরকারও এব্যাপারে অবগত ছিল।^{২৮} সরকার এলাহাবাদের বিচারক স্টুয়ার্টকে তদন্তের ভার দেয়। নাভার রাজার জন্য এটি অমঙ্গল বয়ে আনে। এসজিপি.সি ৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-কে “নাভাদিবস” হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়। নাভার শিখেরা গুরুদুয়ারায় অবিরাম গ্রন্থপাঠের আয়োজন করে। গঙ্গাসর গ্রামে এরকম একটি উৎসবে পুলিশ বাধা দেয়। বাধাদানকারীরা দলে দলে এই গ্রামে আসতে থাকে। এস.জি.পি.সি. এবং আকালি দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ৫৯ জন আকালিকে গ্রেপ্তার করা হয়।^{২৯} রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। লাহোর আদালতে বিচারকার্যের জন্য তাদের নিয়ে যাওয়া হয়।

নেতাদের গ্রেপ্তার এই আন্দোলন প্রশমিত নয় বরং আরও বৃহৎ পরিসরে পরিণত করে। জাইটোতে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ২৫ থেকে ১০০ এবং পরে ১০০ থেকে ৫০০ তে রূপ নেয়। যে গ্রামই তারা অতিক্রম করে আসছে, সে গ্রামেই অভিনন্দিত হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও তাদের পূর্ণ সমর্থন জানান। এইজন্য জওহরলাল নেহরু গ্রেপ্তার হন।

এই সময়ই লাহোরের ভাইফেরুতে অন্য যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। আকালিদের উপর অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ দিয়ে মহাত্মা স্বস্থানে ফিরে গেছে। প্রায় ২৫ জন করে আকালি প্রতিদিন গ্রেপ্তার হয়।

জাইটো এবং ভাইফেরুতে জনগণের এই অংশগ্রহণ সরকারকে আরও খারাপ পরিস্থিতিতে নিয়ে যায়। ১৯২৪-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পুলিশ আকালি তান্ত্র

২৮. এই ঘটনার পূর্ণতদন্ত করার জন্য শিরোমনি কমিটি হাজারও অনুরোধ জানায়। ভাইসরয় এর কাছে এই সংক্রান্ত টেলিগ্রাম পাঠানো হয়। মহারাজা গুরুদুয়ারা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এবং রিকাবগঞ্জের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২৯. এদের মাঝে ছিলেন মেহতাব সিং, তেজা সিং সমুদ্রী, তেজা সিং আকারপুরী, ভাগত জাসওয়ান্ত সিং, মাস্টার তারা সিং, বাওয়া হরি কিশাণ সিং, জ্ঞানী শের সিং, অধ্যাপক তেজা সিং, অধ্যাপক নারিঞ্জন সিং, সারমুখ সিং, জাবাল, সোহান সিং জোশ, গোপাল সিং কাওমী এবং সেবা সিং। পরবর্তী শিখ রাজনীতিতে এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। দুই বছর তিন মাস ধরে কোন ফল ছাড়াই এটি চলতে থাকে।

অবরোধ করে এস.জি.পি.সি.-এর কাগজ জব্দ করে এবং ৬২ জনকে গ্রেপ্তার করে। পাঞ্জাব পুলিশের এই পদক্ষেপ নাভার কর্তৃপক্ষকেও সাহসী করে তোলে। ইংরেজ প্রশাসন আকালিদের সম্পদ আয়ত্ব করে, হাজার হাজার গ্রাম অবরোধ করে এবং জাইটোতে আগমনরত জাটদের প্রতিরোধ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪-এ ৫০০ আকালি জাইটোতে আসার পর তাদের প্রস্থান করতে বললে অস্বীকৃতি জানায়। এতে গুলিবর্ষণ হয়ে কয়েকজন নিহত হয়।^{৩০} এই গুলিবর্ষণ পুরো ভারতে তাদের প্রতি সহানুভূতির সৃষ্টি করে।^{৩১} শিখরা যেন স্বাধীনতার আরও নিকটবর্তী হচ্ছিল।

সরকার আকালিদের একঘরে পরিণত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। এমনকি শিখ, যারা নিজেদেরকে এই আন্দোলন থেকে দূরে রেখেছিল, তারাও এই আন্দোলনে নিজেদের অংশ নেয়া দায়িত্ব মনে করে। তখন থেকে শিখ নেতা এবং কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। জাটরাও তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।

শিখ গুরুদুয়ারা আইন

আর্মি কর্তৃপক্ষ আকালিদের প্রতি এই সহানুভূতিতে আরও আস্থা হ্রাস হয়ে ওঠে। ১৯২৪ সালের মার্চে জেনারেল স্যার উইলিয়াম বার্ডউড আকালি নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন। এই সময় এস.জি.পি.সি. ঘোষণা করে রিপুদামান সিং-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নয় বরং ধর্মীয় উৎসব পালনের অধিকারই এই আন্দোলনের কারণ।^{৩২} স্যার ম্যালকম হ্যালে লেফটেন্যান্ট হওয়ার পর জেনারেল বার্ডউড-এর এই আলোচনা ফল বয়ে আনে। একই জেলায় শিখদের কমিটি গঠনে তিনি আগ্রহী হন। তিনি শিখদের গ্রামে গ্রামে ঘুরেন এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় বলেন, এই আন্দোলন তাদের ভবিষ্যতকে ক্ষতির মুখে ফেলবে।

৩০. সরকারি মতে ২১ জন নিহত এবং ৩৩ জন আহত হয়। আকালিদের মতে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১০০ এবং ২০০-এর উপর।

জনমতের চাপে সরকার জাইটো ঘটনার জন্য তদন্ত কমিটি গঠনে বাধ্য হয়। প্রাদেশিক একজন ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশকে সকল অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয় ইন্ডিয়া ইন ১৯২৩-২৪ পৃ. ৩২৫-৩১।

৩১. ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ সালে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ জাইটো ঘটনার উপর আলোচনায় বসেন। আসল হোতা ছিল এম.এ. জিল্লাহ এবং মদনমোহন মালভায়া। একদিন পর মাওলানা মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আলোচনায় বসে এবং জাইটো ও ঘটনার শিকারদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। অমৃতসরে কংগ্রেস আকালি ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩২. আইন নং ১৫৪১। প্রধান খলসা দিওয়ান দৃঢ়সংকল্প ছিলেন যে আকালিরা মর্কাকে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করেন। খলসা উকিল লিখেন, “শিখদের একটি অংশ গুরুদুয়ারাকে শিখদের প্রভাবিত করতে ব্যবহার করছে।” আকালিদের কথা ২৬ মার্চ ১৯২৪।

তার এই বুদ্ধি কাজে লাগে। যদিও জাটরা তখনও দলে দলে যাচ্ছিল কিন্তু তারপরও সমাজের একতা ভেঙ্গে পড়ে। একদল শিখ শিখ কমিটি গঠন করে। তারা জাইটোর গুরুদুয়ারায় প্রবেশ করে এবং আকন্দ গ্রন্থ পাঠ করে। এভাবে হেইলী প্রমাণ করেন এটি একটি ধর্মীয় উৎসব ছিল। আকালিদের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ থাকলেও হেইলী গুরুদুয়ারায় নিজস্ব বিল লাহোর দুর্গে পাঠান। এই বিল আকালিদের সকল দাবী পূরণ করে এবং ১৯২৫ সালে আইন হিসেবে পাস হয়।^{৩৩} হ্যানী দেখান যে যারা অতীতের কাজের জন্য অনুতপ্ত তারা মুক্তি পাবে।^{৩৪} মেহতাব সিং-এর একটি দল রাজি হয় এবং মুক্তি পায়। কিন্তু বাবা খারক সিং ও মাস্টার তারা সিং এবং অধিকাংশ শিখ যেকোন ধরনের ত্যাগ স্বীকারকে আত্মমর্যাদাহানিকর মনে করেন। তারা দাবি করে যেকোন কাজের পূর্বে সকল আকালিকে মুক্তি দিতে হবে। আকালি একতা ভেঙ্গে পড়ে এবং জাইটো আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।^{৩৫} যেসব আকালি মন্দিরের মহাত্মাদের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জয় পেয়েছিল তারা এখন একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে বিষ ঢালে।

কতজন আকালি নারী-পুরুষ কারাদণ্ড পায় অথবা প্রাণ হারায় তা সরকার বা আকালিরা নির্দিষ্টভাবে বলতে পারে না। ফিরোজপুরের তারা সিং আইন পরিষদের বিতর্কে অংশ নেয়ার সময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তিনি বলেন, সংক্ষেপে প্রায় ৩০,০০০ মানুষ গ্রেপ্তার, ৪০০ জন নিহত এবং ২,০০০ জন আহত, ১৫ লাখ জরিমানার টাকা দিতে হয়। এছাড়া সাধারণ এবং মিলিটারী শিখদের বিরুদ্ধে এটি নিষিদ্ধ ঘোষণাও করা হয়।^{৩৬}

এই চার বছরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল আকালিদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অবস্থান যা তাদের দূরত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে। হিন্দুত্ববাদিতা ভাগতে নাভার কাহান সিং জোর প্রচারণা চালান। আমরা হিন্দু নই—গুরুদুয়ারা আইনে মেহতাব সিং জোরের সাথে উচ্চারণ করেন।

“আমি বলতে চাই যদি শিখরা হিন্দু থাকতে না চায়, তাহলে কেন হিন্দুরা তাদের জোর করবে? এতে তাদের কি লাভ? হিন্দুরা বলে, যেহেতু গুরুদুয়ারা

৩৩. শিখ গুরুদুয়ারা আইন ১৯৩৫-এর দু'টি ভাগ আছে, প্রথমে ২৩২টি মন্দির তালিকাভুক্ত হয়। অন্য ২৮টি পরবর্তীতে কোন তদন্ত ছাড়াই তালিকাভুক্ত হয়। অন্য ভাগে ২২৪টি উদাসী এবং নির্মলাদের আড্ডা তালিকাভুক্ত হয়, যারা কিছু শর্ত পূরণ হলে গুরুদুয়ারা বলে গৃহীত হবে।

৩৪. “আমাদের সিদ্ধান্তের শর্তগুলো আমি পড়ে শুনাচ্ছি। শিখ সমাজকে আন্দোলনে উৎসাহ বা অপরাধী আইনে যাদের বিচার হয়েছে তাদেরকে মুচলেকা অথবা শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দিতে হবে। পি.এল.সি.ডি. ৯ জুলাই ১৯২৫, পৃ. ১৩০৪।

৩৫. বাবা খারক সিং শিয়ালকোটের ডাস্কায়ে মর্কা চালু করেন। গুরুদুয়ারার সম্পত্তি নিয়ে হিন্দুদের সাথে বিবাদ থেকে এর সূত্রপাত।

৩৬. পি.এল.সি.ডি., ৭মে ১৯২৫ পৃ. ১১০৫ ডা: বি আর আমবেদকরের মতে আকালি বিদ্রোহের জন্য সেনাবাহিনীতে শিখদের সংখ্যা ২০ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশতে নেমে আসে, কিন্তু পাঞ্জাবি মুসলমান এবং পাঠানদের সংখ্যা ২৬ শতাংশ থেকে ৩৪ শতাংশতে দাঁড়ায়। বি আর আমবেদকর, পাকিস্তান এবং ভারত বিভাগ। পৃ. ৮৪।

তোমাদের এবং আমাদের আমরা ব্যাপারটা দেখব। আমরা বলি আমাদের ব্যাপার আমরাই দেখব এবং গুরুদুয়ার রক্ষণাবেক্ষণ করব দৃঢ়তার সাথে।”^{৩৭}

হিন্দুরা আকালিদের বিরুদ্ধে বারবার বলতে থাকে শিখরা হিন্দু। একজন পাঞ্জাব হিন্দু নেতা বলেন আমার মনে হয় শিখবাদিতা উচ্চমাত্রীয় হিন্দুবাদিতা।^{৩৮} গুরুদুয়ারা আইনের একজন অন্যতম সমর্থক বলেন শিখরা আমাদের দেহেরই অংশ।^{৩৯} শিখ ও হিন্দু সেই বছরের সবচেয়ে বড় প্রশ্নে পরিণত হয়।

এস.জি.পি.সি. শিখদের সংসদে পরিণত হয়। গুরুমাতার সিদ্ধান্ত অনুসারে এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, দল-এর আর্মিতে পরিণত হয় এবং গুরুদুয়ারার আয় থেকে এটি আর্থিকভাবে সহায়তা পায়। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ গ্রন্থিদের ও সেবাদাসদের নিয়োগ, স্কুল ও কলেজের জন্য শিক্ষক ও অধ্যাপক নিয়োগ এস.জি.পি.সি.কে সরকারের ভিতরে সরকার-এ পরিণত করে। এর নিয়ন্ত্রণ শিখ রাজনীতির মূলকেন্দ্রে পরিণত হয়। আকালিরা নিজেই এই নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ে নেয়। পার্টির বিভিন্ন ভাগের মাঝে ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। চারযুগ ধরে এরই মাঝে মাস্টার তারা সিংয়ের প্রতাপ চলতে থাকে।

আকালি আন্দোলনের জন্য রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয়। গুরুদুয়ারা আইন ঠিক করার পর আকালিরা বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষমতা অপব্যবহারকারী মহারাজা বিশেষ করে পাটিয়ালা ভূপেন্দ্র সিং-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে। শক্তিশালী নেতা সেবা সিংকে লাহোর থেকে পাটিয়ালা কালিগারে এনে ভূপেন্দ্র সিং আন্দোলন প্রশমন করার চেষ্টা করে। আকালি তবু এই পলায়নপর পাশবিক মনোভাবকে জনগণের সামনে তুলে ধরে। মহারাজারা আকালিদের দমন করলেও পাঞ্জাবি বা উর্দু প্রেসকে চূপ করাতে পারেনি।^{৪০}

১৯২৮ সালে আকালিরা হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের সাথে যোগ দেয় এবং প্রজা মণ্ডল আবিষ্কার করে। পরে সর্বভারত জাতীয় কংগ্রেস থেকে মণ্ডল নির্বাচিত হতো। সেবা সিং মণ্ডলদের উৎসাহ ছিলেন। বিভিন্ন সময় তিনি গ্রেপ্তার হন। মহারাজার কারারক্ষীদের হাতে তিনি সর্বোচ্চ অত্যাচারের শিকার হন। সিকরিভালাকে^{৪১} হত্যার পর মহারাজা ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সমগ্র ভারতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

৩৭. পি.এল.সি.ডি. ৮ এপ্রিল ১৯২১ পৃ. ৫৮৩।

৩৮. পি.এল.সি.ডি. ৫ এপ্রিল ১৯২১ পৃ. ৫৩৯।

৩৯. পি.এল.সি.ডি. ৬ জুলাই ১৯২৫, পৃ. ১৯১৪ স্যার গোকুল চন্দ্র নাবং পাঞ্জাব সরকারে মন্ত্রী এবং “ট্রান্সফরমেশন অফ শিখজম” গ্রন্থের লেখক।

৪০. জ্ঞানী শের সিং এবং জশবন্ত সিং জাবালা পাটিয়ালা দলটি পরিচালনা করে। তারা ভূপেন্দ্র সিং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

৪১. প্রাসাদের যাওয়ার পথে সেবা সিং শিকরিভালার একটি মূর্তি ছিল। শিকরিভালার আরও যারা সাথী ছিলেন তারা হলেন ভাগওয়ান সিং, জ্ঞানী জেইল সিং, প্রিতম সিং এবং জাগির সিং।

সংবিধান পরিবর্তন এবং শিখ

স্ব-সরকার গঠনের পরিকল্পনায় পাঞ্জাব অন্য সকল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে কম প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং শিখরা দেখায় আরও দেরীতে। পাঞ্জাবি হিন্দু এবং মুসলিমদের পথ দেখানোর জন্য অন্য রাজ্যের শিক্ষিত হিন্দু এবং মুসলিম ছিল। কিন্তু শিখদের কোন রাজনৈতিক শিক্ষক ছিল না।

১৮৫৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং ১৮৮৭ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদের দেশপ্রেমিক সংঘ গঠনের পর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র তৈরি হয়। একই সময় মুসলিম সংঘ কিছু অধিকার এবং উর্দুরক্ষা, হিন্দু সংঘগুলো গুরু হত্যা এবং হিন্দীকে জাতীয় ভাষা হিসেবে সম্মান প্রদানের জন্য আন্দোলন শুরু করে। প্রধান খালসা দি ওয়ানের শিক্ষিত সদস্যরা অনুভব করেন শিখদেরও শিক্ষা, অধিকার ও ভাষা সংরক্ষণের জন্য পৃথক সংগঠন প্রয়োজন।

পাঞ্জাব আইন পরিষদ ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।^১ নহাজিন লেফটেন্যান্ট গভর্নর সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং কোন প্রতিনিধি সংস্থা থেকে দূরবার বলেই মনে হতো বেশি। গভর্নর জমিদার বা ধর্মীয় সংঘের বিশ্বস্ত প্রধানদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতে পছন্দ করতেন। প্রথম কয়েক বছর শিখ দূরবারীরা শিখ সমাজের উচ্চস্তরের বিবেচিত হতো।^২ এই ভদ্রলোকেরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে নিজেদের পৃথক ভাবে ভালবাসতেন।^৩

১. যদিও ভারত কাউন্সিল আইন ১৮৬১ সালে রাজ্যে প্রাদেশিক আইন স্থাপন করে তারপরও ৩৬ বছর পর্যন্ত পাঞ্জাবে এমন কিছু ছিল না। শহর এবং জেলাগুলোতে একই অবস্থা বিরাজ করছিল। ১৮৬২ সালে মিউনিসিপ্যাল আইন ও ১৮৮৩ সালে জেলা আইন পাস হলেও মানুষ নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না। ট্রিবিউন বলে, বিশ্বস্ততা প্রমাণ ছাড়া পাঞ্জাব প্রধানদের আর কোন কাজ ছিল না। ট্রিবিউন ১৪ এপ্রিল ১৮৮৩।
২. গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যরা ছিলেন বাবা স্যার খেম সিং বেদী, ভগত সিং, কাপুরবালার প্রধান সম্পাদক, স্যার রনবীর সিং এবং প্রতাপ সিং, নাভার যুবরাজ রিপুদামান সিং এবং অর্জুন সিং। এই সময় রাজপুত্র আনন্দ বিবাহ আইন পাস করার জন্য চাপ দেন। ১৫০৯ সালে এটি পাস হয়েছিল।
৩. প্রতাপ সিং ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ সালে কলোনাইজেশন বিল সম্পর্কে বলেন। পিএলসিডি. ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৭।

মর্লে মিন্টো পুনর্গঠন, ১৯০৯

গভর্নর জেনারেল এবং ১৯০৯ সালে পুনর্গঠিত মিন্টো মর্লের সম্পাদকের নামে আইন পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন। ততদিনে মুসলিমরা মিন্টোকে রাজি করিয়ে ফেলেছে যে, মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব শুধু পৃথক নির্বাচন যেখানে মুসলমানরাই মুসলমানদের ভোট দেবে। প্রধান খালসা দিওয়ানও একই দাবী তোলে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর তাদের সমর্থনে ভাইসরয়ের কাছে চিঠি লেখেন, “পাঞ্জাবের শিখরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য যা করা দরকার সব করা হোক।”

খালসা দিওয়ান বা লেফটেন্যান্ট গভর্নরের চিঠির উপর কোন নজর দেয়া হয়নি। মর্লে মিন্টো পরিকল্পনায় মুসলমানদের পৃথক গুরুত্ব দেয়া হয়, একই সুবিধা হিন্দু বা শিখদের দেয়া হয়নি। পরবর্তী নির্বাচনে মুসলমান ও হিন্দুদের দ্বারা শিখরা একবারে হারে^৪ এবং শিখ কোটা পূরণের জন্য আরম্ভ হয়।^৫

লক্ষ্মী : মন্টেগু-ক্রেমসফোর্ড পুনর্গঠন এবং ভারত সরকার আইন ১৯১৯

পরবর্তী সাংবিধানিক পরিবর্তন আলোচিত হচ্ছিল যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল অজানা। যুদ্ধের ফলাফলের সাথে শিখদের ভাগ্যও জড়িত ছিল। এর মাঝে লক্ষ্মীতে জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সভা বসে। সূত্রিত হয় সংখ্যালঘু হিসেবে সাতটি রাজ্যে তারা পৃথক প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এদের মাঝে পাঞ্জাবে অর্ধেক আসন এবং এক-তৃতীয়াংশ আসন (সম্পূর্ণ মুসলমান দ্বারা মনোনয়নপ্রাপ্ত) হয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের যাবে।^৬ কোন শিখ অথবা শিখদের মনোভাব তাদের সিদ্ধান্তে রাখার প্রয়োজনবোধ করেনি। এর উপর ভিত্তি করে প্রধান খালসা দিওয়ান জানান জাতীয় প্রশাসনে তাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া না হলে তারা ঐকমত্যে যাবে না। তারা শুধু পাঞ্জাব নয়, অন্যান্য রাজ্যেও যথেষ্ট আসন দাবি করে। ভাইসরয় এবং সেক্রেটারী পরিষদেরও নীতির ভিত্তিতে গঠিত ন্যায়বিচার চায়।^৭

১৯১৭ সালে আগস্টে রাষ্ট্রের সম্পাদক মন্টেগু ঘোষণা দেন ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিটি অংশে ভারতীয়দের সাথে সখ্যতা বৃদ্ধি করা এবং সচেতন

৪. ১৯০৯ সালে তিনটি আসনেই মুসলমানরা জয়লাভ করে, ১৯১২ সালে ছয়টির মধ্যে চারটি হিন্দু, একটি মুসলমান এবং একটি শিখ, ১৯১৬ সালে এগারটির মধ্যে হিন্দু মুসলমান ৫টি করে, ইউরোপীয়ানরা একটি করে জয়লাভ করে। শিখরা কোনটিই জিততে পারেনি।

৫. প্রতাপ সিং ও গুরুবকস সিং-এর সাথে সুন্দর সিং মাজিখিয়া মনোনীত হন।

৬. জাতীয় সংসদের কয়েকজন সদস্য ভাইসরয়ের কাছে সাংবিধানিক পুনর্গঠনের কথা বলেন। এখানে শিখদের রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অনেকটা লক্ষ্মী আইনের মতোই এটা ছিল।

৭. ২৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ সালে প্রধান খালসা দিওয়ান পাঞ্জাব সরকারের সম্পাদকের সাথে কথা বলেন।

সরকারের পরিচয় দেয়া। মন্টেগুর ভারত সফরের সময় মহারাজা ভূপেন্দ্র সিং শিখদের মনোভাব তার কাছে তুলে ধরেন। শিখ নেতারাও যুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের দাবী পেশ করেন।

১৯১৮ সালে মন্টেগু ক্রেমসফোর্ড রিপোর্ট পেশ হলে শিখরা সন্তুষ্ট হন। রিপোর্টে মুসলমানদের সাথে মতভেদ দেখা দেয়। তারা লিখে, “পাঞ্জাবের শিখরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আর্মিতে যথেষ্ট পরিমাণ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেছে। তাই আমরা আশা করব শিখরাও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতনতার সাথে তাদের কর্তব্য স্থির করবে।”^৮

পাঞ্জাব আইন পরিষদে এই প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক হয়। মিয়া ফজল-ই-হুসাইন লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত অনুসারে পাঞ্জাব আইন পরিষদে মুসলমানদের আসন বরাদ্দ দেয়ার চেষ্টা করেন। গজ্জন সিং বলেন, “শিখদের প্রতি ন্যায় বিচার।” এটিও আইনে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, হিন্দু ও মুসলমানরা এর বিরোধিতা করে। সভাপতি শিখদের অবিচারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বলেন, “আমাদের নিজেদের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান করতে হবে। একতা না থাকার কারণে আমরা কখনোই ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না। যাই হোক না কেন তা ন্যায় ও পরিষ্কার হওয়া উচিত।”

এই আইন ভোটের জন্য রাখা হলে ছয় ভোটে দু’টিতে হারে। গজ্জন সিং তখন বলেন, এক-তৃতীয়াংশ আসন শিখদের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু হিন্দু মুসলিমরা এর বিপক্ষে ভোট দেয়। প্রধান খলসা দিওয়ান শিখদের অধিকার-আদায়ের জন্য চাপ দিয়ে যান।^৯ শুধু পাঞ্জাব সরকারই তাদের সমর্থন জানান। আর্মিতে শিখের সংখ্যা প্রায় ৮০,০০০ এর উপর ছিল। ভূমিকর এবং খাল জরিমানাও তাদেরকে আরও শক্তিশালী করে।

পাঞ্জাব সরকারের মত অনুসারে শিখরা সর্বোচ্চ ভোটের প্রায় ১৯ শতাংশ। বলা হচ্ছিল শিখরা অ-দাপ্তরিক আসনের ৫৪টির মাঝে ৮টি প্রতিনিধিত্ব করে, প্রায় ১৫ শতাংশ।

৮. সি.কে.ডি আইন, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১৮, পিএলসিডি এ গজ্জন সিং কর্তৃক উদ্ধৃত ২১ নভেম্বর ১৯১৮ পৃ. ৫২৭।

৯. গজ্জন সিং শুধু দাবি বলতে কি বুঝিয়েছেন তা তিনি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, ১৯১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী শিখরা পাঞ্জাবের জনসংখ্যার প্রায় ১২%। দেশে আমাদের অবস্থান ও প্রয়োজনীয়তা ও সাম্রাজ্যের প্রতি অবদান ও বিসর্জনের প্রেক্ষিতে আমরা অনন্য অবস্থানের অধিকারী যা ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট এ অবস্থান অর্জন অসম্ভব। সমগ্র ভারত সেক্টরে ২০ ভাগ আমাদের লোকবল যেখানে পাঞ্জাবে অবস্থিত সেনাসংঘগুলো যা রাজার সেনার ৬০% ভারতীয় যোদ্ধারা সরবরাহ করে আমরা সেখানে তাদের এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ করি। বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক দেয়া পুরস্কারও এক-তৃতীয়াংশ আমরাই পেয়েছি। এটা আমাদের স্বভাব নয় আমরা আমাদের দাবি উচ্চস্বরে পেশ করব। পিএলসিডি ২১ নভেম্বর ১৯১৮, পৃ. ৫২৮।

১০. মিয়া ফজল ই হুসাইন শিখদের জবাব দেন এইভাবে যে তারা নিজেদের অধিকার নয় বরং বিশ্বস্ত তার উপর বিশ্বাস রাখে।

১১. সিকেডি আইন ৭৫৭৫, ২৪ নভেম্বর ১৯১৮।

কিন্তু ১৯১৯ সালে ভারত সরকার আইনের মধ্যে শিখদের তাদের চাহিদা মতো ৩৩ শতাংশ দেয়া হয়নি। বরং পাঞ্জাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের এই অধিকার দেয়া হয়। নতুন সংবিধান অনুসারে পাঞ্জাব আইন পরিষদে ৯৩ জনের মাঝে ১৫ জন শিখ নির্বাচিত হতো, জাতীয় সংসদে ১৪৫ জনের মধ্যে ৩ জন, রাজ্য উপদেষ্টাদের ৬০ জনের মধ্যে একজন শিখ ছিল।

প্রধান খালসা দিওয়ান ব্রিটিশ সরকারের মতো পরিবর্তনের জন্য শেষ চেষ্টা করেন। চারজন শিখ যুগ্ম সংসদীয় কমিটির রিপোর্টের আগে লন্ডনে এসে পৌছান। কিন্তু পাঞ্জাব প্রতিনিধিদলে দু'জন শিখ এর অন্তর্ভুক্তি—এই নিয়েই তাদের সম্বন্ধ থাকতে হয়।

নতুন আইনের আলোকে ১৯২০ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। গদরিস্টদের চিকিৎসা, জালিয়ানওয়ালায় গুলিবর্ষণ এবং মার্শাল ল' তখনও মানুষের মনে চিরসবুজ। জাতীয়তাবাদীরা নির্বাচন বয়কট করেন। শিখদের কাছে প্রধান খালসা দিওয়ানের ভাবমূর্তি হারাতে থাকে। অল্প কিছু স্বচ্ছল ব্যক্তিই ভোট দেয়া ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পান। তারা অনেকাংশেই স্বাধীন ছিলেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর তিনজনকে মনোনয়ন করেন। প্রধান খালসা দিওয়ান-এর প্রতিনিধিস্বরূপ সুন্দর সিং মাজিথিয়াও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাজিথিয়া গভর্নর কাউন্সিলের জন্য মনোনয়ন পান। তিনজন শিখের কেউই কেন্দ্রীয় সংসদে নির্বাচিত হননি। যোগেন্দ্র সিং নামের একজন অদলীয় লোক কেন্দ্রীয় সংসদে নির্বাচিত হন।

মিয়া ফজল-ই-হুসাইন এবং চৌধুরী ছুট রায় ১৯২০-এর নির্বাচনের সময় ইউনিয়নিস্ট দলের নেতৃত্ব দেন। এই দলের অধিকাংশ ছিল মুসলমান এবং হরিয়ানার হিন্দু জাট। এদের প্রায় সবাই কৃষিবিদ ছিলেন এবং কৃষিকে এগিয়ে নেয়াই এদের মূল লক্ষ্য ছিল। অধিকাংশ শিখ কৃষিবিদ হওয়া সত্ত্বেও প্রধান খালসা দিওয়ান এতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। কয়েক বছর পর শিখরা লক্ষ্য করে খাতরি এবং অরোরারা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে ভালো চাকরি নিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে। ইউনিয়নিস্টদের সাথে থেকে কোনরকম উন্নতি করা সম্ভব নয়। ১৯২৩ সালে শিখ আকালি এবং জাতীয়তাবাদীরা পাঞ্জাবের আইন পরিষদে আসন পায়।

গোল টেবিল বৈঠক এবং ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ সাইমন কমিশন এবং নেহরু রিপোর্ট

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ পর্যবেক্ষণ করতে স্যার জন সাইমনকে প্রধান করে একটি কমিশন ভারত পাঠানো হবে। কোন ভারতীয় এতে অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কংগ্রেসও মুসলিম লীগ এটি বয়কট করেন। তাই তারা আসলে কালো পতাকা এবং সাইমন ফেরত যাও এই স্লোগানে অভিনন্দিত হয়।

সিকান্দার হায়াৎ খান ও উজ্জ্বল সিং-এর সভাপতিত্বে পাঞ্জাব আইন পরিষদ নির্বাচিত হয়।^{২২} শিখ প্রতিনিধিত্ব নিয়ে কমিশনে আলোচনা হয়। তারা বলে, অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাহায্য করতে তারা সদা প্রস্তুত। দেশের সরকারের অসাম্প্রদায়িক নীতিকে তারা সবার আগে অভিনন্দন জানাবে। দরকার হলে তারা এই ব্যাপারে একাই সরকারকে সাহায্য করবে। কমিশনের কাজের সময় আবার কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের কাছে সংবিধান প্রণয়নের চেষ্টা করে। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তারা সকল দলের সমন্বয়ে কনফারেন্স ডাকে। এই কনফারেন্সের পিছনে উৎসাহ দেন সভাপতি মতিলাল নেহরু এবং তার ছেলে জওহরলাল নেহরু। মঙ্গল সিং গিল শিখদের প্রতিনিধিত্ব করেন। মুসলমানদের জন্য পৃথক আসন বরাদ্দ হয়। কিন্তু মঙ্গল সিং কখনোই তার সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়ে কোন কথা বলেননি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেহরুর রিপোর্ট অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু রিপোর্ট যেন জাতীয় কংগ্রেসের আর্কাইভেই স্থান পায়। ভারতের প্রাদেশিক সুবিধা পেতে ব্রিটিশ ভারত এবং ভারত রাজার মাঝে আলোচনা হবে বলে লর্ড আরউইন ঘোষণা দেন। জাতীয় কংগ্রেস দাবী করে প্রাদেশিক সংবিধানের ঘোষণা আসবে। তাই কংগ্রেস কনফারেন্স বর্জন করে স্বাধীন ভারতের সংবিধান পাসের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৩০ সালের মে'তে সাইমন কমিশন দু'টি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সিদ্ধান্তসহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গঠনের রিপোর্ট নেয়। কিন্তু এই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতায়নের উপর জোর দেয়া হয়নি। এই রিপোর্টে আরও বলা হয় ছয়টি প্রদেশেই মুসলমানদের সুবিধা দেয়া ঠিক না। এতে হিন্দু এবং শিখ বিরোধিতার আশঙ্কা বাড়ে।

ভারত বা ইংল্যান্ড দু'জায়গাতেই আশানুরূপ মতামত লাভে ব্যর্থ হয়। সেপ্টেম্বরে ভাইসরয় ৬৬ জন ভারতীয়কে লন্ডনে আনেন। শিখদের পক্ষ থেকে আসেন সমপূরাণ সিং ও উজ্জ্বল সিং। কিন্তু আকালিদের জাটরা সংবিধানের এই প্রয়োগ দেখাতে পারেনি।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

১৯৩০ সালের নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ড এর সভাপতিত্বে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ফেডারেল ভারত গঠনের জন্য সাইমন প্রস্তাব পর্যালোচনা করেন। শিখরা সংখ্যালঘুর সাথে যুক্ত নির্বাচনে রাজি হলেও সংখ্যাগুরুদের সাথে পৃথক নির্বাচনে রাজি হয়নি। মুসলমানরাও কোনভাবেই যুক্ত নির্বাচনে রাজি হয়নি। পৃথক নির্বাচনের পক্ষে মুসলিম, শিখ, ভারতীয় খৃস্টান, এ্যাংলো ইন্ডিয়ান এবং অস্পৃশ্যরা রায় দেয়।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠক

নভেম্বরে রামসে ম্যাকডোনাল্ডের প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়। এটি মহাত্মার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে লর্ড আরউইনকে উৎসাহ দেয়। ১৯৩১ সালের মার্চে একটি রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হয় যেখানে জাতীয়তাবাদীরা কারাগার থেকে মুক্ত হবে, অবরোধ আন্দোলন তুলে নেয়া হবে এবং মহাত্মা গান্ধী ও লন্ডনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন বলে উল্লেখ আছে। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক আরও খারাপ সময়ে হয়। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে বৈঠক বানচাল হয়। মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু জিন্মাহর জেদের কারণে সকল চেষ্টাই নষ্ট হয়ে যায়। শিখদের পক্ষে উজ্জল সিং যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে থাকলেও পৃথক নির্বাচন অন্য সম্প্রদায় বিশেষ করে মুসলমানদের কাম্য ছিল। উজ্জল সিং এবং সম্পূর্ণ সিং পাক্সাবে ৩০ শতাংশ এবং কেন্দ্রে ৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। তিনি প্রস্তাব করেন রাওয়ালপিন্ডিকে পাক্সাব থেকে আলাদা করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে জুড়ে দেয়া হলে পাক্সাবে ৪৩.৩ শতকরা মুসলিম, ৪২.৩ শতাংশ হিন্দু এবং ১৪.৪ শতাংশ শিখ থাকবে। এই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়া হয় এর সাথে এস. ডব্লিউ করবেন এর আম্বালা পৃথকীকরণ প্রস্তাবও নাকচ হয়ে যায়।

মহাত্মা দেশে ফিরে তার অনেক সহকর্মীকে জেলে পান। একত্রিত প্রদেশগুলোয় “কোন ভাড়া নয়” আন্দোলন শুরু হয়, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে লাল জামা আন্দোলন শুরু হয়। বিদ্রোহীরা আবার পুনর্জাগ্রত হয়। উইলিংডনের মতের বিরুদ্ধে মহাত্মা প্রতিবাদ করেন। উইলিংডন মহাত্মাকে কারাগারে নিক্ষেপ করে।

কম্যুনালা পুরস্কার—সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের জন্য রামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৬ এপ্রিল ১৯৩২ এ পুরস্কার ঘোষণা করেন। সকল সংখ্যাগুরুর জন্য পৃথক নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রে ৩৩.১/৩ শতাংশ এবং পাক্সাবে ১৭৫ আসন মুসলমানদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়। শিখদের মুসলমানদের মতো সুবিধা দেয়া হয়নি। পাক্সাবে ১৭৫ এর মধ্যে ৩৩, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ৫০টির মধ্যে ৩টি, ফেডারেল আইন সমাবেশ-এর মধ্যে ২৫০টির মধ্যে ৬টি, প্রাদেশিক সমিতির ১৪০টির মধ্যে ৪টি আসন শিখরা পায়। কিন্তু যুক্ত প্রদেশ ও সিন্ধু-এ কোন আসন তারা পায়নি।

তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক

বিগত মাসগুলোর রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার জন্য তৃতীয় বৈঠক ডাকা হয়। শুধু ৪৬ জন ভারতীয় এতে আমন্ত্রিত হন। পাঞ্জাবে মুসলিম সংখ্যাগুরুর বিরুদ্ধে শিখ প্রতিনিধি তারা সিং বিদ্রোহ করেন। তিনি চাকরিক্ষেত্রে অগ্রাধিকার, ৫ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধুতে শিখ প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন।^{৩২}

১৯৩৩ সালের মার্চে কনফারেন্স-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়। ভবিষ্যৎ ভারত চালাতে ব্রিটিশ সংসদের একটি যুগ্ম কমিটি লর্ড লিনলিথগৌ এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারত সরকার আইন ১৯৩৫

১৯৩৫ সালের ৪ আগস্ট ভারত সরকার আইন রাজার অনুমতি পায়। এখানে ভারত স্বাধিকার, দু'টি কেন্দ্রীয় সংসদ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং রাজ্য পরিষদ ছিল। ছয়টি রাজ্যের মধ্যে দু'টির নিজস্ব আইন পরিষদ আছে, বাকিগুলো পাঞ্জাবসহ মাত্র একটি। প্রায় ১১.৫ শতাংশকে চাকরি, ৩০ মিলিয়ন মানুষকে ভোটার অধিকার দেয়া হয়। প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র ব্যাপারগুলোও পুনর্গঠিত করা হয়। ভারত কংগ্রেস ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ প্রত্যাখ্যান করে। কারণ ডায়েরকীকে কেন্দ্রে এবং গভর্নরকে প্রদেশে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মুসলমানরা তাদের অধিকার বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করে যায়। শিখ রাজনৈতিক দলগুলো কম্যুনালা পুরস্কারে পুরস্কৃত ছিল। তারাও এর বিরুদ্ধে গলা মেলায়। তাই এই আইন কোন সুফল বয়ে আনেনি।

বাংলা, সিদ্ধু এবং পাঞ্জাব ছাড়া সকল প্রদেশেই কংগ্রেস ভোটে ভেসে যায়। পাঞ্জাবে মাত্র ১০ শতাংশ ভোট পায়। ১৭৫ আসনের মধ্যে ইউনিয়নিস্টরা ৯৬, খালসা ১৫-৩৩ এবং বাকিগুলো কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ভাগ করে নেয়। কিন্তু এগুলো সহজ ছিল না। জার্মানিতে যুদ্ধের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক পরিবর্তনের সময় আসে। মানুষ মনে করে শীঘ্রই ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু কারা পাঞ্জাবের প্রধান হবে— মুসলিম নাকি শিখ?

দেশ বিভাগের রাজনীতি : স্বাধীনতা এবং শিখ মাতৃভূমির দাবি

১৯৪০ সালের মার্চে মুসলীম লীগ পৃথক মুসলিম স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী করে। শিখরা এতে অসন্তুষ্ট হয়। যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের সাথে শিখদের বিরোধ চলে আসছে।

১৭৮ ॥ এ হিস্টি অব শিখ

শিখদের মনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস জন্মে। তাই শিখদের ভারত জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান এবং মুসলমানদের নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনে বাধা দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না।

যুদ্ধের বছরগুলোতে শিখ রাজনীতিবিদরা পাকিস্তান জৈরির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। মুসলিমরা জয়লাভ করলে শিখদের তাদের বাড়ি, জমি, মন্দির ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয়। ভারত সরকারের অসহযোগিতা এবং হিন্দুত্ববাদিতা তাদের মনে শিখ জন্মভূমির দাবি আরও বাড়িয়ে তোলে।

পঞ্চম পর্ব

শিখ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫)

যুদ্ধকালীন সময়ে ভারত রাজনীতি

১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেট ব্রিটেন জার্মানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভাইসরয়ও ভারতের পক্ষে একই ঘোষণা দেন। যদিও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসিজম প্রকাশ করে তবুও ভারতের এই ঘোষণার তারা বিরোধিতা করে। মুসলিম লীগও ভাইসরয়ের বিরোধিতা করে। কিন্তু লীগের সদস্য স্যার সেকান্দার হায়াৎ খান এবং মুসলিম সাম্যবাদীরা তার সমর্থন করে। শিখ নেতাদের জন্য এই যুদ্ধ আরও সমস্যার সৃষ্টি করে। ব্রিটিশদের আনুগত্যও তারা অস্বীকার করতে পারে না। শিখ নেতাদের এক্ষেত্রে রাজনৈতিক পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়।

প্রধান খালসা দিওয়ান দ্রুত ব্রিটিশদের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। কংগ্রেসবাদী শিখরা সহানুভূতি প্রকাশ করলেও সমর্থন করেননি। কিন্তু সাম্যবাদীরা শিখ সৈন্যদের মাঝে যুদ্ধবিরোধী কথাবার্তা ছড়ান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকালিরা সবচেয়ে দোনোমোনায় ভুগছিলেন। গুরুদুয়ারা আন্দোলনের সময় যেসব নেতা কারাদণ্ড ভোগ করেন তারা ব্রিটিশদের অনুগত ছিল না। এমনকি মুসলিম লীগ এবং ব্রিটিশ সাম্যবাদীদের প্রতিও তারা শত্রুভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু খালসার নিজস্ব সৈন্য গঠনে তারা আগ্রহী ছিল। শিখদের কিছু সুবিধা দেয়ার বিনিময়ে তারা সরকারকে সমর্থন জানায়। এছাড়া কিছু প্রশাসনিক কাজেও তারা হস্তক্ষেপ করে।

কিছু ক্ষেত্রে শিখ কৃষকদের উপর আকালিদের উৎসাহহীন সমর্থন এবং সাম্যবাদীদের বিরোধিতা প্রভাব ফেলে। একদল শিখ সমুদ্রপার হতে অস্বীকার করলে তাদের কোর্ট মার্শাল এবং অনেক নিরীহ মানুষকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হয়। রয়েল ভারতীয় আর্মিতে শিখরা রসদ জোগায়, আফ্রিকায় কাজ করে, কিন্তু গুদামে মাল ভরতে অস্বীকার করে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্তে দেখা যায় এর পেছনে সাম্যবাদী প্রেরণা কাজ করে। পাটিয়ালা মহারাজার অধীনে খালসা প্রতিরোধ কমিটি শুরু হয়। শিখদের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।^১

১. পাঞ্জাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্যার চার্লস ও'জিলভি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে তদন্ত কমিটি গঠন করে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ.ই. বার্সটো, মেজর এ.জে.এম কিলরয়, মেজর এ.ই. ফারওয়েল

ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টা আরও সমস্যার সৃষ্টি করে। মুসলিম রাষ্ট্রের সমর্থক হিন্দু এবং মুসলিমদের সাথে শিখদের ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা দরকার। কংগ্রেস মন্ত্রণালয়ের পদত্যাগের জন্য সরকার সাতটি প্রদেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেয়। শুধুমাত্র চারটি রাজ্যে মুসলীম লীগ নিজেদের নির্বাচিত প্রার্থী দ্বারা শাসনভার চালাতে সক্ষম হয়। যখন মুসলিম লীগ এভাবে শক্তি যোগান দিচ্ছিল, তখন কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দেয়। সুভাষ চন্দ্র বোস এবং সাদুল সিং ক্যাভিশের নতুন দল গঠন করে আন্দোলনকে নতুন মোড় দেয়। কয়দিন পর লাহোরে মুসলিম লীগের দেয়া নতুন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব পাস হয়।^২

এতে এটাই বোঝায় যে, মুসলিম লীগ পুরো পাঞ্জাব চায় না। বরং পাঞ্জাবের পূর্বাংশকে পৃথক রাখতে চায়। জনাব জিন্নাহ শিখদের সান্ত্বনা জানান দেন যে ভয়ের কিছু নেই। লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক স্যার সিকান্দার হায়াত খান অমুসলিমদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, “আমি বলি নাই মুসলিম রাজ্য অথবা হিন্দু রাজ্য হবে। আমি বলছি যেখানে প্রতিটি সম্প্রদায় তার উপযুক্ত অধিকার থাকবে। অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তারা সমঅধিকারী পাবে। তা পাকিস্তান নয়, পাঞ্জাব হবে। পঞ্চনদীর দেশ পাঞ্জাব, আমি আমার রাজ্যের জন্য এমন স্বপ্নই দেখি।”^৩

এই বক্তব্য শিখদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। মুসলীম লীগের অন্য নেতাদের মতই স্যার সিকান্দার হায়াত খান একজন দুই মুখো নেতা ছাড়া আর কিছু না। শিখরা নিজেদের এক কৌশলগত পরিস্থিতিতে আবদ্ধ করেন। দু’টি বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন— জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা পুরো দেশে এবং মুসলীম লীগের মুসলিম রাজ্য গঠনের জন্য যা পাঞ্জাবকে মাঝখান থেকে ভাগ করে দেবে। কংগ্রেস নেতারা শিখ নেতাদের নিজের দিকে চাইলেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বরাদ্দকৃত সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। লীগদের ওয়াদা ছিল কম, এতই কম যে শিখরা তাদের বিশ্বাস করেনি। শিখরা কাদের পক্ষে থাকবে? কংগ্রেসকে সমর্থন করে মুক্ত একত্রিত ভারত সমর্থন করবে? নাকি কংগ্রেস অথবা মুসলীম লীগ উভয়কেই ত্যাগ করবে? অথবা কোনদিকেই না গিয়ে নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র করবে? কেউ এ ব্যাপারে একমত হলেও অন্যরা একেবারে ভিন্নমত পোষণ করে।

(লুধিয়ানা শিখ), মেজর বিলি শর্ট, ক্যাপ্টেন নারিন জন সিং জিল- পরবর্তীতে ভারত জাতীয় আর্মিতে যোগ দেন। জেলায় জেলায় ঘুরে তারা শিখ অফিসারদের সাথে আলাপ করেন। পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতাদের সাথেও সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান শব্দটি সরাসরি ব্যবহার না হলেও এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার ছিল। ভৌগোলিক অঞ্চলগুলো বিভিন্ন রাজ্যে ভাগ করা হয় যাতে কিছু ব্যবস্থা নেয়া যায়, যেমন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা একত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হবে যেখানে এগুলো সার্বভৌমত্ব বজায় রাখবে।

৩. পি.এল.সি.ডি., ১১ মার্চ, ১৯৪১।

এইসকল রাজনৈতিক টানাহেচড়া ইউরোপের “ফোনি যুদ্ধ”-এর সাথে সমাপ্ত হয়ে যায়। ১৯৪০ সালের এপ্রিলে নাথসি নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যান্ড, বেলজিয়াম-এর উপর দিয়ে যায় এবং ফ্রান্সো—ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা ধ্বংস করে ফেলে। ফ্রান্সের প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ে। ব্রিটিশরা ডানক্রিকের আসন্ন দুর্যোগ এড়িয়ে যায়। মে মাসে উইনস্টন চার্চিল ভারত রাজ্যের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়।

ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য লর্ড লিনলিথগৌ চেষ্টা চালান। আগস্টে তিনি কার্যকরী পরিষদ বর্ধনের প্রস্তাব দেন এবং ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে যুদ্ধ উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এতে একমত প্রকাশ করেনি। কংগ্রেস পরবর্তীতে পৃথক আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে সুভাষ চন্দ্র বোস তার নিজের বাড়ি কলকাতা থেকে নিখোঁজ হন। দেশের মানুষকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়ে পরে বার্লিন রেডিওতে তার কণ্ঠ শোনা যায়।

১৯৪১-এর গ্রীষ্মে যুদ্ধ জটিল পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। ফ্যাসিস্ট শক্তি যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মানী রাশিয়ায় আক্রমণ করে এবং নাথসি মস্কো একেবারে গুড়িয়ে দেয়। জেনারেল রোমেল মধ্যপ্রাচ্যে হুমকি দেন।

ভারতে বিপক্ষ দলীয় সাফল্য অন্যরকম আবহাওয়া ছড়ায়। কতদিন ধরে ব্রিটিশরা ভারত দখল করে থাকবে? হিন্দু ও মুসলিমদের মাঝে কি যুদ্ধ লাগবে? এধরনের প্রশ্ন লোকেরা একে অপরকে করত? বিভিন্ন ধরনের গুজবও খালসা ও ইউনিয়নিস্টদের মধ্যে শোনা যায়। অমৃতসরে অনুষ্ঠিত এক সভায় পৃথক মুসলিম রাজ্য গঠনের প্রস্তাব পাশ হয়। এই পরিস্থিতিতে নেতারা দ্বিধাবিহীন হয়ে নিশ্চয় থাকেন।

লর্ড লিনলিথগৌ কংগ্রেস ও লীগকে একত্রিত করতে ব্যর্থ হন। ১৯৪১ সালের জুলাই-এ কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা সাত থেকে এগারতে বর্ধিত করা হয় যার মধ্যে আটজন ছিল ভারতীয়। ৩০ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়। দুইজন শিখ^৪ এর জন্য মনোনীত হয়। এক বছর পর স্যার যোগেন্দ্র সিং কার্যকরী পরিষদের শিক্ষা বিভাগ পরিচালনার জন্য মনোনীত হন।

এশিয়ার যুদ্ধে শিখদের দৃষ্টিভঙ্গি : ভারতের জাতীয় সৈন্যদল

পার্ল হারবারের (৭ ডিসেম্বর ১৯৪১) পূর্বে জাপানিজরা থাইল্যান্ড, চায়না, হংকং, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, বার্মা, মালয় এবং সিঙ্গাপুরে বসবাসরত ভারতীয় নেতাদের সাথে যোগাযোগ করেন। এখানে প্রায় দুই মিলিয়নের উপরে লোক বাস করে। দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের কাছে রাসবিহারী বোসের নাম একটি জয়ে আহ্বান। গদর বিদ্রোহে জড়িত থাকার জন্য শিখদের কাছেও স্মরণীয়। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি

৪. পাটিয়ালার মহারাজা এবং নউনিহাল সিং মান প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের জন্য মনোনীত হন।

জাপানে বাস করেন এবং ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির প্রধান-এর মেয়েকে বিয়ে করেন। রাসবিহারী জাপানকে রাজি করায় ইংল্যান্ড-এর সাথে যুদ্ধে ভারতীয়দের শত্রু হিসেবে গণ্য করা হবে না এবং ধরা হলেও ফেরত দেয়া হবে। মেজর ফুজিয়ানাকে জাপানের গোয়েন্দা সংস্থার লিয়াজো অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। রাসবিহারী বোস শিখদের প্রাধান্য দেন।^৬ তিনি থাইল্যান্ডে শিখ অঙ্গসংস্থাগুলোর মাঝে যোগাযোগ স্থাপন করেন।^৭ জাপানিজ আর্মিরা থাই-মালায়ান বর্ডার দিয়ে ভিতরে ঢুকে এবং ব্রিটিশ-ভারত বাহনীকে হারিয়ে দেয়। প্রথম ১৪তম রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন মোহান সিং^৮ এতে ধরা পড়েন এবং জাপানের প্রতি অধীনতা স্বীকার করেন।

সিঙ্গাপুরে ৪৫,০০০ ভারতীয় যুদ্ধবন্দিকে রাখা হয়। ২০,০০০ আই.এন.এ. যোগদানকৃত অধিকাংশ ভারতীয় ছিল শিখ।^৯ ফুজিওয়ারা কিকান-এর অফিস-এর পাশে জেনারেল মোহান সিং তার সদর দপ্তর স্থাপন করেন। জাপানীদের আই.এন.এ সম্পর্কে মনোভাব জানার জন্য তিনি সাইগন-এ ফিল্ড মার্শাল কাউন্ট টেরোচিকে আহ্বান করেন। তাকে বলা হয় রাসবিহারী বোস টোকিওতে সভা আহ্বান করেছেন ওখানেই এ ব্যাপারে আলোচনা করা হবে-।

টোকিও কনফারেন্সে^{১০} স্বাধীনতা, বিদেশী শক্তি থেকে সম্পূর্ণ বিন্যস্ত মুক্তিই হবে আন্দোলনের উদ্দেশ্য। অন্য প্রস্তাবে বলা হয় মিলিটারী নৌবাহিনী এবং আকাশবাহিনীর সহায়তায় আইএনএ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে। জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখান। কুটনীতিবিদরা আবার ব্যাংককে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

এশিয়ান দেশগুলোর প্রতিনিধিরা ব্যাংকক কনফারেন্সে উপস্থিত ছিল। জেনারেল মোহন সিং ৩০ জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে আসেন। কেন্দ্রীয় শক্তির প্রতিনিধি এবং থাই পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত ছিল। এই সম্মেলনে জাপানিজ সরকার ভারতের প্রতি তার মনোভাব দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে।

৫. থাইল্যান্ডে তার সহযোগীরা ছিলেন অমর সিং, জ্ঞানী প্রিতম সিং এবং চন্দ্র সিং। স্বামী সত্যানন্দ পুরী পরিচালিত “ভারত কালচার লজের” তারা সদস্য। মালয় এ বোস-এর প্রধান সমর্থক বুধ সিং, যাকে মালয়ান গান্ধী বলে সবাই চেনে।
৬. সাংহাই বিদ্রোহী পার্টি হংকং-এর শিখ রেজিমেন্ট এর সকলকে গ্রহি দলভুক্ত করেন। ১৯৪১ সালে এরকম তিনটি দল ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।
৭. শিয়ালকোটের উগোক গ্রামের মোহন সিং ১৯২৭ সালের সাধারণ সেপাই হিসেবে আর্মিতে যোগ দেয়।
৮. তাদের মাঝে শিখ অফিসার ছিলেন কর্নেল নারিঞ্জন সিং গিল, মেজর মহাবীর সিং, মেজর নৃপেন্দ্র সিং ভগাট, ক্যাপ্টেন গুরুবাকস সিং এবং ক্যাপ্টেন থাকর সিং। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী ইশার সিং-এর মতে মাত্র ৫০ শতাংশ আই.এন.এ. শিখ। মোহান সিং-এর মতে এক-তৃতীয়াংশ। বাকিরা পাঠান, ভগরাস, হিন্দু জাট। (২৪ জুন, ১৯৬২)।
৯. সম্মেলনের একটি অন্তত শুরু হয়। স্বামী সত্যানন্দ পুরী এবং জ্ঞানী প্রিতম সিংকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্ত হয়ে সকলে মারা যায়।

ব্যাংকক প্রস্তাবের প্রতি জাপানিজ সরকার আশ্বাসমূলক মনোভাব দেখায়নি। অন্যদিকে কর্নেল ফুজিয়ারার সফল লিয়াজো অফিসার কর্নেল ইওয়াগুবো কোন বিবৃতি দিতে রাজি হননি। আরও কিছু ব্যাপার নিয়ে মোহান সিং-এর সন্দেহ জাগে, তারা আইএনএ রেডিও সম্প্রচারে সেন্সর করত, ভারতীয় কারাবন্দিদের প্রতি তাদের ব্যবহার খারাপ ছিল। বার্মাতে ভারতীয় সম্পত্তি তারা দখল করে নেয়। এবং মোহান সিং এবং রাসবিহারীর সম্পর্ক খারাপ করার চেষ্টা করে।

অবিশ্বাস দু'দিকেই বেড়ে চলে। মোহান সিং-এর সহকর্মী বিশেষ করে নারিঞ্জন সিং গিল-এর প্রতি তাদের সন্দেহ ঘনীভূত হয়। ১৯৪২ সালের ডিসেম্বরে গিলকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোহান সিং আই.এন.এ. থেকে পদত্যাগ করে। তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।^{১০} এদের সাথে আই.এন.এ. নিয়ে শিখ উত্তেজনাও প্রশমিত হয়ে যায়।

রাস বিহারী বোস আইএনএ পুনর্গঠনের চেষ্টা চালান। ১৯৪৩ সালের জুনে সুভাষ চন্দ্র বোস জার্মানী থেকে আসলে তিনি সরে দাঁড়ান। সুভাষ ভারত স্বাধীনতা লীগ-এর সভাপতিত্ব এবং আইএনএর নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়।

সুভাষ বোস^{১১} সিঙ্গাপুরে র্যালি করেন। সেখানে মুক্ত ভারতের এবং তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান, আরও চারজন মন্ত্রী এবং আটজন প্রতিনিধিকে আমড ফোর্সের নেতা হিসেবে ঘোষণা করেন।^{১২}

যুদ্ধের পট পরিবর্তনের সাথে সাথে জাপানীরা আই.এন.এ.'র প্রতি আরও মনোযোগী হয়। ১৯৪৩-এর নভেম্বরে পূর্ব এশিয়া জাতীয় কনফারেন্সে তাকে নেতাজী বলে সম্বোধন করা হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ মুক্ত হিন্দু সরকারের কাছে বদল করা হয়।

সুভাষ বোস তার প্রধান কার্যালয় বার্মাতে সরিয়ে নেয়। আই.এন.এ.কে বার্মা-ভারত ফ্রন্টে আনা হয়। ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ শক্তির সাথে যুদ্ধ হলে তারা ভারত প্রবেশে সক্ষম হয়। পরবর্তী দুইমাস ভারতে আই.এন.এ. তার কাজ চালিয়ে যায় ও ইমফাল দখল করে। মৌসুম গুরু হওয়ার সাথে সাথে ব্রিটিশরা

১০. দুইমাস গৃহবন্দি রাখার পর জেনারেল দ্বীপে ১৯৪৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত রাখা হয়। পরে ব্রিটিশরা তাকে গ্রেপ্তার করে। ১৯৪৫-এর নভেম্বরে তাকে দিল্লিতে আনা হয় এবং ১৯৪৬ সালের মে'তে শর্তমুক্তভাবে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে তিনি রাজ্য সভার প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন।

১১. সুভাষ চন্দ্র বোস (১৮৯৭-১৯৪৫) সালে উড়িষ্যার কটকে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নেন। পরে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তিনি ভারতে ফিরে পদত্যাগ করে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসে সভাপতি এবং ১৯৩৯-এ গান্ধীর মতের বিরুদ্ধে আবার নির্বাচিত হন। তিনি মহাত্মার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিপক্ষে ছিলেন। ১৯৪০ সালের জুলাই তিনি গ্রেপ্তার হন। বাড়ি থেকে পালিয়ে পরে জার্মানীতে আত্মগোপন করেন। দ্য স্প্রিংগিং টাইগার

১২. রাজ্য সরকারে দুইজন কর্মকর্তা নৃপেন্দ্র সিং ভগত এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল গুলজারা সিং একজন সাধারণ ইশার সিং নবুলা ছিলেন শিখ।

আবার পূর্নরুদ্যমে শুরু করে। জাপানীরা কোন অস্ত্র, সম্পদ বা আকাশবাহিনীর সমর্থনও যোগায়নি। ৬,০০০ জনের জন্য ইমফাল দখল করতে ১,৫০০ এর উপরে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পন করে, ৪০০-এর উপরে যুদ্ধে মারা যায়, ১,৫০০ অনাহারে মারা যায়। যারা ফিরে আসে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আই.এন.এ.'র কার্যক্রম নেতাজীকে হতাশ করলেও তিনি আশা ছাড়েননি। মৌসুম শেষ হয়ে গেলে তিনি আরও দু'টো দলকে প্রশিক্ষণ দেন। ১৯৪৫-এর জানুয়ারিতে তারা দ্বিতীয়বারের মতো ব্রিটিশদের সাথে লড়ে। কিন্তু এর ফল ছিল আরও খারাপ। মে মাসের মাঝামাঝি আই.এন.এ.'র কার্যক্রম শেষ হয়।

নেতাজী রেঙ্গুন থেকে সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর থেকে ব্যাংকক যান। ১৮ আগস্ট ১৯৪৫-এ তাকে বহনকারী বিমানটি টোকিওতে যাওয়ার সময় বিধ্বস্ত হয়। এভাবে তার গৌরবময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

ক্রিপস মিশন মার্চ-এপ্রিল ১৯৪২

জাপানী সৈন্যদের ঝড় ঝড়লেও ভারতের রাজনীতিতে কোন পরিবর্তন আসেনি। ভাইসরয় কংগ্রেস মুক্ত করলেও নেতাদের মন জয় করতে ব্যর্থ হন। এমনকি ১৯৪২-এর বসন্তে জাপানীরা কলকাতায় বোমাবর্ষণ করলেও কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কেউই দৃষ্টিপাত করেনি। ব্রিটিশরা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতীয়দের রাজি করতে ভারত পাঠান।

মাস্টার তারা সিং, বালজেভ সিং,^{১৩} স্যার যোগেন্দ্র সিং এবং উজ্জল সিং শিখদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন। সকল দলের শিখদের দিল্লিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। স্যার স্ট্যাফোর্ডের প্রস্তাব প্রচার করা হয়। বলা হয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথে নির্বাচিত ভারতীয়রা সংবিধান প্রণয়ন করবে। কিন্তু কংগ্রেস এতে অসম্মতি প্রকাশ করে। পাকিস্তানকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি বলে জিন্মাহও ত্যাগ করে।

শিখরা কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাস হারাতে শুরু করে। তারা কখনোই অনাগরিকত্ব বহন করতে রাজি না। স্যার ক্রিপোর্ডের ভারত ত্যাগের পর তাদের বিশ্বাস দারুণভাবে নাড়া খায়। কংগ্রেস পার্টির মাদ্রাজ আইন পরিষদ মুসলিমদের ভিন্ন

১৩. দুমানা গ্রামের চোকার উপজাতির বলদেব সিং ধনী ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। ১৯৩৭ সালে তিনি শিখ রাজনীতিতে পাঞ্জাবের পক্ষে নির্বাচিত হন। আকালি দলের বহু কাজে তিনি অর্থসাহায্য করেন। এমনকি লাহোরের শিখ জাতীয় কলেজেও। সিকান্দার হায়াৎ সরকারের বিরুদ্ধে কাজ বন্ধের জন্য তিনি 'সিকান্দার-বলদেব' চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ হন। চুক্তিমেতে দাসাউনদা সিংকে প্রতিস্থাপন করা হয়। বলদেব সিং নেহরু সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত তিনি শিখ কার্যাবলীর সাথে যুক্ত হন। পরে তাকে স্মরণ সিং দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়।

রাষ্ট্রের দাবী যুক্তিযুক্ত বলে মেনে নেয়। এদের নেতা রাজাগোলাচাচারী গান্ধীর বিশ্বাসভাজন পুরাতন নেতা। তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। ভারতের একতা ভাঙতে মুসলিম লীগের কাজই যথেষ্ট।

মহাত্মা গান্ধীর আদেশে ব্রিটিশবিরোধী ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধী এবং সকল কংগ্রেস নেতা ঘোঁড়ার হন। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা দেয়া হয়। পশ্চিমাঞ্চলের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে রেললাইন উত্তোলনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আন্দোলন ঠেকাতে সরকারকে বিশেষ কঠিন হতে হয়। পাঞ্জাব শান্তিপূর্ণ থাকে। কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। শিখরা লাহোরের বড় দালানগুলো দখল করে পৃথক মুসলমান রাষ্ট্রের পক্ষে প্রচারণা চালায়।

মুসলিম লীগেরই এখন সময়। স্যার সিকান্দার হায়াৎ খানের মৃত্যুর পর মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণের শেষ কাঁটাও জিন্নাহর সামনে থেকে সরে যায়। ১৯৪৩-এর গ্রীষ্মে মুসলিম লীগ উত্তর-পশ্চিম ফ্রন্টে নতুন দল স্থাপনে সফল হন।^{১৪} পাঞ্জাবে স্যার খিজর হায়াত খান তিওয়ানা সংযুক্ত পাঞ্জাবের মুসলিম লীগ ধারণা স্থাপন করতে সক্ষম হন। জিন্নাহ সাহেব লাহোর আসেন এবং খিজর সাহেবকে ইউনিয়নিস্ট উপাধি ত্যাগ করার দাবি করেন। খিজর অস্বীকৃতি জানান। তার মুসলিম সমর্থন কমা শুরু হয় যখন ইউনিয়নিস্টদের সমর্থন কংগ্রেস ও আকালিদের প্রতি কমতে থাকে।

সি. রাজগোপালচারী পাকিস্তানী পরিবর্তনকে সংযুক্ত ভারতের কেন্দ্রে রাখেন। ১০ জুলাই ১৯৪৪ সালে তার প্রখ্যাত তত্ত্বমতে যদি মুসলিম লীগ ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন করে তাহলে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে ভাগ করা হবে। অধিবাসীরা ঠিক করবে তারা কোথায় থাকবে। রাজগোপালচারী দাবি করেন মহাত্মা গান্ধী তার সাথে একমত। তাদের পদের দিকে খেয়াল করে শিখরা মনে করে কংগ্রেস তাদের পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়েছে।

শিখরা এর প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখায়। অমৃতসরে ২০ আগস্ট ১৯৪৪ সালের এক সভায় শিখ পার্টির এক মিটিং-এ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠে।^{১৫} মাস্টার তারা সিং বলেন, শিখরা পৃথক জাতি।^{১৬} তারপরও শিখদের পৃথক

১৪. ১২ মার্চ ১৯৪৫-এ কংগ্রেস লীগকে ত্যাগ করে। কিন্তু তার অবস্থান নিরাপদ ছিল না।

১৫. 'যদি পাকিস্তানকে শিখদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় তবে শুরু গোবিন্দ সিং যেভাবে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্ন করেন আমরাও সেভাবে পাকিস্তান ছিন্ন করব।' জ্ঞানী কর্তাব সিং 'সিভিল এবং মিলিটারি গ্যাজেট' ২১ আগস্ট ১৯৪৪।

১৬. ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর এবং ১৯৪৩-এর মার্চে আকালি সম্মেলনে 'মুক্ত পাঞ্জাবের' কথা বলা হয়। মাস্টার তারা সিং বলেন, 'মুক্ত পাঞ্জাবের সীমানা জনসংখ্যা, সম্পদ ঐতিহ্য প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে। তা হলে মুক্ত পাঞ্জাব আম্বালা, জালান্দর, লাহোর, লায়ালপুর জেল, মন্টেগুমারীর কিছু অংশ এবং মুলতান নিয়ে গঠিত হবে। ভারতীয় বার্ষিক রেজিস্ট্রার ১৯৪৩, ভল্যুম-১, পৃ-২৯৮।

রাষ্ট্র অসম্ভব বলে নাকচ করা হয়। উজ্জ্বল সিং এবং জ্ঞানী কর্তার সিং মুক্ত পাঞ্জাব দাবি করেন। তারা পাঞ্জাব বিভক্তিকরণের বিরোধিতা করে এবং ৩ সেপ্টেম্বর বিদ্রোহ দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।^{১৭} তারা সিং অন্যান্য শিখ দলগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করেন।^{১৮}

যুদ্ধের পরিসমাপ্তি

৭ মে ১৯৪৫-এ নাৎসির জার্মানী অস্ত্রসমর্পণ করে। জাপানীরা সকল ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনা করে। ভারত সরকার রাজনীতিবিদদের মন জয় করার শেষ চেষ্টা চালায়। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। মাস্টার তারা সিং সহ লর্ড ওরাভেল ২১ জন নেতাকে দাওয়াত দেন। তাৎক্ষণিকভাবে সর্বভারতীয় কাউন্সিল গঠনের প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৯৪৫-এর জুনে নেতারা শিমলায় দেখা করেন। কিন্তু লীগ শুধু মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে—জিন্নাহর এ দাবিতে কাউন্সিল ভেঙে যায়।

জিন্নাহর এরকম অবস্থান মুসলিম লীগের সাথে কংগ্রেসের সম্পর্ক আরও খারাপ করে। এছাড়াও মুসলিম লীগকে তাদের পক্ষে যুক্তি দিতে হয়। যারা চায় না তারা কেন এরকম করবে।^{১৯} অন্য কথায় পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করা হবে। আর এই ভাগ শিখদের উপরই সবচেয়ে আঘাত হানবে।

১৭. সিভিল এবং মিলিটারি গ্যাজেট ২১ আগস্ট ১৯৪৪।

১৮. স্যার তেজ বাহাদুর সাপরু এবং জনাব জয়াকার কমুনাখ সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা চালান। মুসলিমরা সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯. জওহরলাল নেহরু ২৯ আগস্ট ১৯৪৫ এক সংবাদ সম্মেলন। ট্রিবিউন ৩০ আগস্ট ১৯৪৫।

১৬. ভারতবিভাগের প্রস্তাবনা

সাধারণ নির্বাচন ১৯৪৫-৬

১৯৪৫-৬-এর নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে স্মরণীয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতকে মুক্ত করে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী ছিল। কিন্তু বর্তমান আইন পরিষদ জনসাধারণের মতের উপযুক্ত সম্মান দিতে পারেনি। তাই তারা ক্ষমতা পাওয়ার যোগ্যও না। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করে মুক্ত ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করে।

কংগ্রেস এ নির্বাচনের গুরুত্ব বুঝতে পারে। সংযুক্ত ভারতের পক্ষে তারা প্রচারণা চালায়। তারা অমুসলিমদের মনে-জয়ে দৃঢ় ছিল, কিন্তু কোনো সুযোগ নিতে চায়নি। জনাব নেহরু সুভাষ চন্দ্র বোসের সাথে অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও আইএনএ-দের মুক্তিসেনা বলে সম্বোধন করে।^১ ১৮৫৭ সালে দিল্লি লাল কেলায় সরকার জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে রাখার জন্য একজন হিন্দু, মুসলমান ও শিখ দিয়ে কমিটি তৈরি করে। নেহরু ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরক্ষা কমিটি গঠন করে এবং দেশভ্রমণে বের হয়। যেখানে যাওয়া হোক না কেন, 'জয়হিন্দ' ধ্বনি আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে। কয়েকদিন পরই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করলেও মুসলমানদের উপর মুসলিম লীগের প্রভাব কমাতে সক্ষম হয়নি। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে মুসলিম লীগ প্রতিটি মুসলমানের ভোট পায়। অবস্থাতে বোঝা যায়— অমুসলিমরা সংযুক্ত ভারত চাইলেও মুসলমানরা পৃথক পাকিস্তান চায়।

শিখরা তাদের প্রতিবাদ জানাতে উপস্থিত হয়। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পন্থিক প্রতিনিধি দল উপস্থিত হয়। তারা শিখদের সমর্থন পায়।^২ সমাজতান্ত্রিক, পাকিস্তান সমর্থনকারী একমাত্র শিখদল পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১. আমি আগেও বিশ্বাস করতাম এখনও করি এই সৈন্যদলের নেতা আমাদের ভুল পথনির্দেশনা দিয়েছে। জওহরলাল নেহরু— স্টেটসম্যান ২০ আগস্ট ১৯৪৫।

২. নির্বাচিত মানুষেরা পান্ডাব সংসদে পন্থিক পার্টি তৈরি করেন। বলদেব সিং ছিলেন নির্বাচিত নেতা। উজ্জ্বল সিং, স্মরণ সিং ছিলেন উপনেতা এবং অজিত সিং ছিলেন সম্পাদক।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ— মুসলিম লীগ ৭৯, কংগ্রেস ৫১টি, পব্লিক পার্টি ২২, ইউনিয়নিস্ট এবং মুক্তবাদীরা ১০টি করে আসন পায়। পাকিস্তান নিয়ে এদের মাঝে আলোচনা ব্যর্থ হয়। পরে কংগ্রেস ও পব্লিক সমর্থনে স্যার খিজির হায়াত খান সরকার গঠন করেন।

ক্যাবিনেট মিশন

১৯৪৬ সালের বসন্তে জনাব আটলী ঘোষণা দেন ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনায় কয়েকজন মন্ত্রী ভারত ভ্রমণে আসবেন। কয়েকমাস পরে এক বিতর্কে তিনি বলেন, আমরা সংখ্যালঘু সম্পর্কে অবহিত। তারা যেন ভয়মুক্তভাবে বাস করতে পারে সেদিকেও আমি দেখব। কিন্তু সংখ্যাগুরুদের এগিয়ে যাওয়াতে সংখ্যালঘুদের বাধা আমরা সমর্থন করব না (জিন্নাহ বলেন, মুসলমানরা সংখ্যালঘু নয় তারা জাতি)। ক্যাবিনেট মিশনের ঘোষণার পর লর্ড প্যাথিক লরেন্স, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার নয়াদিল্লি পৌঁছান। মেজর শর্ট শিখদের বন্ধু হিসেবে সম্মান অর্জন করেন।

ক্যাবিনেট মিশন সর্বপ্রথম ভারতীয় নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে মুসলমান প্রতিক্রিয়া জানান।^৩ মাস্টার তারা সিং, জ্ঞানী কর্তার সিং, হরনাথ সিং এবং পরে বলদেব সিং পাঞ্জাব সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।^৪

শিখরা পাকিস্তানের বিরোধিতায় একত্রিত হয়। মুসলমান অধ্যুষিত এমন কোনো এলাকাতে নিজেদের বসবাসের বিরুদ্ধে তারা তীব্র প্রতিবাদ জানায়। মাস্টার তারা সিং বলেন, তিনি সংযুক্ত ভারতের পক্ষে। কিন্তু যদি পাকিস্তান গঠিত হয়, তবে শিখদের আলাদা ধরে ভারত বা পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা দিতে হবে। এই প্রদেশ জালাদার, লাহোর এবং হিস্যাব কেনেলি এবং সিমলা, মটেগুমারী ও লায়ালপুর নিয়ে গঠিত। বলদেব সিং শিখ প্রদেশকে এভাবে ব্যাখ্যা করেন, ‘চেনাব-এর সীমানা ধরে আম্বালা, জালাদার এবং লাহোর জেলা ধরে।’^৫ শিখরা

৩. ৭-৯ এপ্রিল ১৯৪৬ একটি সভায় পাকিস্তান না হলে মুসলমানদের পরিণতি সম্পর্কে বারবার বলা হয়। ফিরোজ খান নুন বলেন, হিন্দু অথবা মুসলিম কেউ জানে না আমরা এর জন্য কতদূর যেতে পারি। যদি আমাদের অঞ্চল ভারতের কথা বলা হয় তবে মুসলমানদের কাজ চেঙ্গিস অথবা হালাকু খানকেও হার মানাবে। এরজন্য দায়ী হবে ব্রিটিশ। *ক্যাবিনেট মিশন এবং পরবর্তী পৃ-৩২-৪*।

৪. কেন্দ্রীয় আকালি দল তাদের দলের পক্ষে পৃথক ঘোষণা দেয়। পাঞ্জাবের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা শীর্ষক ভুল পরিসংখ্যানে দৃষ্টিপাত করে। পাঞ্জাব ভাঙার বিরোধিতা করা হয়। কেন্দ্রীয় আকালি ডাল স্মরণিকা— ব্রিটিশদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

৫. *ভি.পি. মেনন-ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া, পৃ-২৪২*।

আসলে পৃথক রাজ্য নয় বরং পাকিস্তানকে বিরোধিতা করার জন্যই এই চেষ্টায় কেউ গুরুত্ব দেয়নি। ফলশ্রুতিতে মুক্ত পাঞ্জাব, পাকিস্তান অথবা খালিস্তানকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। শিখদের রাগ মুসলমান পক্ষপাতিত্বের অজুহাতে আরও বেড়ে যায়।

ভারত নেতাদের সাথে আলোচনার পরে ক্যাবিনেট মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হয়। এই প্রস্তাবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগসহ দুটি প্রদেশ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যেহেতু দুই দলের মধ্যে বিরোধ বেড়েই চলে তাই ক্যাবিনেট বৃহৎ পরিসরে সিদ্ধান্ত দেয় যাতে ভারতের জনগণ নিজেই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিখদের পাকিস্তান বিরোধিতা তারা মাথায় রাখে।^৬ তারা সংবিধানের একটি সহজ এবং কয়েকটি প্রদেশের প্রস্তাব রাখে। প্রদেশগুলো দশ বছর পর পুনরায় সংবিধান গঠনের আহ্বান জানাতে পারবে।

১৬ মে প্রস্তাবগুলো নির্বাচিত সদস্যদের পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়। কয়েকদিন পর সংসদ ভেঙে কয়েকভাগে বিভক্ত হয়—১. অমুসলিমদের প্রতিনিধি, ২. পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম যুদ্ধাঞ্চল ও সিন্ধু প্রদেশের প্রতিনিধি এবং ৩. বেঙ্গল ও আসাম-এর প্রতিনিধি।

নতুন প্রস্তাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত হয়। জিন্নাহ পাকিস্তান গঠনে আশাবাদী হন। শিখরা এর বিরোধিতা জানায়।^৭ এবং প্রস্তাবের গাফিলতি নিয়েও মত প্রকাশ করে।^৮ ১৩ জুন অমৃতসরে শিখ রাজনৈতিক দলগুলোর সভা অনুষ্ঠিত হয়। ননিরঞ্জন সিং গিল একনায়ক^৯ হিসেবে ক্যাবিনেটে শিখ প্রতিনিধিত্ব করেন। বলদেব সিং প্রধানমন্ত্রী আটলীকে শিখদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে বলে জানান। মি. আটলী বলেন, শিখদের জন্য প্রস্তাব বদলানো^{১০} সম্ভব না। তারা নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে সংসদে যোগ দিয়ে সংবিধান গঠনে অংশ নেয়।

-
৬. তিনি বলেন আমরা কোনো ন্যায়বিচার দেখতে পাই না। পাকিস্তানে পাঞ্জাব, বাংলা এবং আসাম অধিকাংশই অমুসলিম। পাকিস্তানের পক্ষে সকল যুক্তি অমুসলিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষ যুক্তি হিসেবে আসতে পারে। *ভিপি মেনন-ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া*, পৃ-৪৬৮।
 ৭. মহাত্মা গান্ধী এবার শিখদের সমর্থন জানান। হরিজন-এ তিনি লিখেন, পাঞ্জাবই শিখদের একমাত্র থাকার জায়গা? তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিন্ধু, বালুচিস্তান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কাজ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে।
 ৮. একটি সভায় শিখদের এই মনোভাব প্রকাশ করা হয়। শিখদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ব্রিটিশদের দায়ী করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ আইন অক্ষুণ্ণ রাখতে তাদের হাত শক্তিশালী করার প্রস্তাব দেয়া হয়।
 ৯. কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন মাস্টার তারা সিং, বলদেব সিং, বাসান্ত সিং, উজ্জল সিং, ইন্দ্র সিং, দর্মণ সিং, অজিত সিং, প্রিতম সিং, ইশার সিং, ভাই সৌধ সিং, সারমুখ সিং, নিধান সিং এবং হরকিষণ সিং।
 ১০. ১৮ জুলাই ১৯৪৬-এ স্যার স্ট্যাফোর্ড সিং ব্রিটিশ সংসদে ক্যাবিনেট মিশনের কাজের উপর প্রতিবেদন জমা দেয়। শিখ সম্পর্কে বলা হয়, অতীব দুঃখের সাথে আমরা জানাচ্ছি শিখরা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু কাউকে ছোট হিসেবে দেখা হয়নি। ভৌগোলিক সীমানা অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে। *স্টেটসম্যান ১৯ জুলাই ১৯৪৬*।

কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশনের সাথে কাজ করতে আগ্রহী ছিল। প্রেসিডেন্ট নেহরু জানান, কংগ্রেস ১৬ মে'র ব্যাপারে কাজ করতে রাজি হলেও প্রদেশে ভাগ করতে রাজি না। তিনি সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে বেশি চিন্তিত ছিলেন। তিনি একটি মধ্যবর্তী সরকার গঠনের কথা বলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ এতে রাজি ছিলেন না। তারা সরাসরি আন্দোলনে নামে।^{১১} দেশের বিভিন্ন জায়গায় হিংস্রতা ছড়িয়ে পড়ে।

এরমধ্যেই ভাইসরয় কংগ্রেসকে সরকার গঠনের আহ্বান জানায়। জিন্নাহকে জয় করতে না পারলেও শিখদের তাদের বিরোধিতা ত্যাগে বাধ্য হন।^{১২} ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এ নেহরুর কেবিনেট বদল হয়। বলদেব সিং প্রতিরক্ষা কমিটি হাতে নেয়।

কয়েকদিন পর হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়লে মুসলিম লীগ সরকারে যোগ দেয়ার ঘোষণা দেয়। ২৬ অক্টোবর ১৯৪৬-এ পুনরায় গঠিত হয়। কংগ্রেসের নেতা, বলদেব সিং ও মুসলিম লীগ লন্ডনে আমন্ত্রিত হন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকার গঠনে সকল দলের অংশগ্রহণ। রাজ্য গঠনে প্রদেশের অবস্থান— এ সংক্রান্ত নিয়মাবলীই ছিল সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়। মুসলিম লীগ এগুলো মেনে নিলেও কংগ্রেস তা নেয়নি। পরে ব্রিটিশরা বলে এই নিয়মগুলো প্রস্তাবের অন্যতম অংশ এবং মুসলিম লীগ সরকার গঠনে অংশ নেবে। কিন্তু সংসদ সদস্যরা তিনদিন পর মিলিত হলে সেখানে কোনো মুসলিম লীগের সদস্য ছিল না। এই ঘটনা সংখ্যালঘুদের অস্থিরতা বাড়ায়। আসাম, বাংলা, পাঞ্জাবে তারা সংগঠিত হতে থাকে। শিখরা পাঞ্জাবের নিরাপত্তা চায় এবং তাদের প্রদেশকে নতুনভাবে ভাগের দাবি জানায়।

কয়দিন পর ৫ জানুয়ারি ১৯৪৭-এর উপর কংগ্রেস-এর কার্যকরী কমিটি আইন পাস করে। উপযুক্ত শর্তাবলী মুসলিম লীগকে বিশ্বাস করাতে বাধ্য করায় যে কংগ্রেসের শর্তভঙ্গের কোনো ইচ্ছা নেই। একটি ব্যর্থ সংসদ গঠনের জন্য লীগ কংগ্রেসকে দায়ী করে। লর্ড ওয়াডেল নেতাদের সতর্ক করেন যে সামাজিক হিংস্রতা এ পর্যায়ে গেছে যে আর্মি অথবা পুলিশ কেউই পক্ষপাতহীন নয়।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ আটলী ঘোষণা করেন ১৯৪৮-এর জুনের মধ্যে ব্রিটিশরা ক্ষমতা ছেড়ে দেবে। ভাইসরয় হিসেবে লর্ড ওয়াডেল-এর বদলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন আসবেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করবেন। আটলী আশা করেন জরুরি অবস্থায় দলগুলো শত্রুতা ভুলে কাছাকাছি আসবে। যখন এভাবে রাজনৈতিক মূল্যমূলি চলছিল তখন সামাজিক হিংস্রতা ক্রমেই বেড়ে চলছে। আমাদের অবশ্যই পেছন ফিরে দেখা উচিত।

১১. জিন্নাহ বলেন, 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' বলতে আমরা বুঝি— আমরা সব সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বাদ দিয়েছি। দরকার হলে পিস্তল ব্যবহার করব। ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

১২. ১৪ আগস্ট ১৯৪৬-এর এক সভায় বলা হয় ১৬ মে'র প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য কংগ্রেসের কাছে আবেদন জানানো হবে। বোর্ড পাঞ্জাব সংসদের জন্য সদস্য নির্বাচনের আহ্বান জানায়।

১৭. সামাজিক সংঘাত ও সংস্কার

সূচনা

ভারতের মতো গরিব এবং জনপূর্ণ দেশে যেখানে লোকজন বিশ্বাস, সংস্কৃতি দিয়ে বিভক্ত সেখানে এরকম অশান্ত অবস্থা স্বাভাবিক। উত্তরে ইসলামী সাম্রাজ্যের গুরু থেকেই ধর্মপ্রচারক এবং আদীবাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলেই আসছে। কিছু সম্রাট এই পার্থক্য কমানোর চেষ্টা করেন এবং অল্প কিছু যেমন রনজিত সিং সফল হন। কিন্তু অন্যরা ব্রিটিশদের মতোই লোভের বস্তু হিসেবে ভারতকে ভোগ করেন। যদিও মুসলমানরা কুরবানীর ঈদে গরুর বদলে ভেড়া বা ছাগল কুরবানী দেয় হিন্দু এবং শিখরা তার হিংস্র প্রতিবাদ করেনি এটাই ছিল সৌভাগ্যের ব্যাপার।

মুসলমানদের বিরক্ত করার জন্য তারা ইট ছুঁড়ত। এ নিয়েও সূত্রপাত হতো দাঙ্গার।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ পাঞ্জাবে সামাজিক সংঘাতের কালো সময় মুসলমানরা শহীদগঞ্জকে মসজিদ এবং শিখরা গুরুদুয়ারা বলে দাবি করায় তাদের মাঝে সম্পর্ক আরও খারাপ হয়ে যায়। শিখরা জয়লাভ করে এবং পুরাতন মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়। কিরপাল পরিধানে বাধ্যতা মুসলমানদের আরও খারাপ পরিস্থিতিতে ফেলে। এই যুগে কম্যুনাল মিলিশিয়া, হিন্দু আরএমএসএস, মুসলিম খাকসার এবং শিখ ভালের সূত্রপাত হয়।

সামাজিক সংঘাত গ্রামের থেকে শহরেই বেশি ছিল। গ্রামগুলোর মাঝে একতা ছিল। গ্রামের খোলা প্রান্ত থেকে শহরের বাজার বেশি সংঘাতপূর্ণ ছিল। অবিশ্বাসের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও গ্রামের মানুষ শান্তিতে বাস করত। কিন্তু গ্রামের মানুষও অপরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহান ছিল। যেকোনো সংঘাতে ছুরির চমক ছিল অবশ্যম্ভাবী। জিন্মাহকে ভাবতে বাধ্য করে যে, ভারত আসলে দুটি জাতিতে বিভক্ত— মুসলিম ও অমুসলিম।

আগে হওয়া রায়টের থেকে ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা ভিন্নরকম। তার আগ পর্যন্ত রায়টের তেমন গুরুত্ব ছিল না— লাখি-গুঁতা, ছুরিকাঘাত, ব্যালকনি থেকে এসিড
এ হিন্দি অব শিখ-১৩

)

নিষ্ক্ষেপ। মাঝে মাঝে অগিকাণ্ড হয়। মানুষ আহত হতো। মহিলাদের উত্যক্ত করা হতো। বাচ্চা বা বুড়োদের হয়ত ছেড়ে দেয়া হতো। অতি হিংস্রতার পরে অন্যকে আর আহত না করার শপথ নেয়া হতো।

অপরদিকে ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা ছিল ভয়াবহ। বয়স, লিঙ্গ নির্বিশেষে অত্যাচার করা হতো। পূর্বে গুণ্ডারাই রায়টে অংশ নিত। ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গা রাজনীতিবিদদের চাল ছিল আর সমাজের সকল স্তরের দল আধুনিক অস্ত্র যেমন—স্টেনগান, হাতবোমায় সজ্জিত হয়ে আসত। এর ব্যাখ্যাও একইরকম ছিল। দাঙ্গা শুরুর জন্য তারা একে-অপরকে দোষ দিত?''

হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় শিখদের অবস্থান ছিল অদ্ভুত। তারা নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করলেও হিন্দু সামাজিক ব্যবস্থার অংশ ছিল। তারা পাঞ্জাব কৃষক সমাজে সবচেয়ে উজ্জল ছিল। তারা শান্তি আনয়নকারী হিসেবে কাজ করলেও যেহেতু তারা হিন্দু সমাজের অংশ তাই দাঙ্গা বাড়লে মুসলমানরা সন্দেহের চোখে দেখত। মুসলমানরা মনে করত পাকিস্তানের উন্নতি করতে হলে শিখদের উর্বর ভূমি নষ্ট করতে হবে। চৌধুরী রহমত আলী বলেন, “সংখ্যালঘুত্ব থামাও। যদিও ব্রিটিশ ও হিন্দুরা নিজেদের নিরাপদ বলেছে তারপরও আমরা সংখ্যালঘু। কারণ ও জন্যই আমরা জন্ম অধিকার হারাব না, এমনকি আমাদের ভূমিতে হিন্দু বা শিখদের সংখ্যালঘু হিসেবেও রাখব না। কারণ সাধারণ সময়ে তারা রাষ্ট্রগঠনে বাধা দেবে আর দরকারের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করে ধ্বংস ডেকে আনবে।”^২

পাকিস্তানের প্রতি শিখদের আচরণ ধ্বংসাত্মক ছিল। অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তান সমর্থন করত। তাই শিখদের এই আচরণ আসলেই শত্রুতাপূর্ণ ছিল।

১. ভবিষ্যৎ জনগণের কাছে দাঙ্গা সবসময় ধোঁয়াশা থাকবে। একমাত্র উৎস হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম বক্তব্য এবং অবশেষে নিরপেক্ষ ইংরেজ বক্তব্য। হিন্দু-শিখ বক্তব্য জানতে হলে-জি.ডি. খোসলা স্টার্ন রেকর্ডিং ‘মুসলিম লীগ অ্যাটাক অন শিখ অ্যান্ড হিন্দুস ইন দ্য পাঞ্জাব ১৯৪৭ প্রকাশিত হয় এস.জি.পি.এস.। মুসলিম-পাকিস্তান ভার্সনের জন্য ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট কনসার্নিং দ্য ট্রাইবাল রিপারকেশন অন দ্য ইভেন্ট ইন দ্য পাঞ্জাব, কাশ্মীর এ্যান্ড ইন্ডিয়া, নোট অন দ্য শিখ প্র্যান। দ্য শিখ ইন অ্যাকশন এবং দ্য আরএসএসএস। নিরপেক্ষ মতামতের জন্য ক্যাম্পবেল জনসন-এর মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পেনডেরেল মুন-এর ডিভাইস অ্যান্ড কুইট, লিওনার্ড মসলে’র দ্য লাস্ট ডে অফ ব্রিটিশরাও জেনারেল স্যার ডব্লিউ ফ্রাঙ্কিস-এর হোয়াইল মেমরি সারভস এবং আইয়ান স্টিফেন্স-এর পাকিস্তান।

২. রহমত আলী, দ্য মিল্লাত এ্যান্ড ইটস মিশন, মুসলিম লীগ অ্যাটাক অন শিখ এ্যান্ড হিন্দুস। পৃ-৮। মুসলিম লীগ শিখদের আত্মসম্মতি করতে অথবা তাদের জয় করতে কোনো চেষ্টাই করেনি। অন্যদিকে জিন্নাহ বলে পাকিস্তান হবে শুধুই মুসলমানদের রাজ্য। ১৯৪৬ সালে এক বক্তৃতায় বলেন, ‘হিন্দুরা কি হারাবে? মানচিত্র দেখ, তারা শ্রেষ্ঠ অংশগুলো নিয়েছে। ২০০,০০০,০০০-এর উপরে তাদের জনসংখ্যা। পাকিস্তান মোটেও ভারতের শ্রেষ্ঠ অংশ নয়। আমাদের ১০০,০০০,০০০-এর উপর মুসলিম আছে।’ মুসলিম লীগ অ্যাটাক অন শিখ অ্যান্ড হিন্দুজ। পৃ-১৩।

ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে এবং পরবর্তী

১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এ মুসলিম লীগ-এর আয়োজিত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' দিয়ে দাঙ্গার সূত্রপাত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এদিনকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। বিকেলে মুসলিম লীগের একটি সভা হয়। সভাফেরত মুসলমান এবং হিন্দুদের মাঝে সংঘাত ঘটে। চার-পাঁচদিন ধরে এই হিংস্রতা চলে। দাপ্তরিক হিসেবে ৫০০০ মানুষ মারা যায়, ১৫,০০০ আহত হয় এবং ১০০,০০০ আশ্রয়হীন হয়।^৭ দাঙ্গা কয়েক মাস ধরে চলে।

১৯৪৬-এ ১০-২০০০০ শিখ কলকাতায় ছিল। তাদের অধিকাংশ ছিল ট্যাক্সিচালক অথবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। যদিও মুসলমানদেরকে হিন্দুদের থেকে হিংস্র বলে মানা হতো তবুও শিখরা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মন জয় করতে সক্ষম হয়। তারা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে রক্ষা করে গুরুদুয়ারায় আশ্রয় দেয়। মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অ্যান্টি মুসলিম কাজের জন্য মুসলমানদের দায়ী করেন এবং তাদের উদ্ধারের জন্যও সাধুবাদ জানান।^৮

কলকাতার দাঙ্গা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করে বোম্বে ও আহমেদাবাদের জন্য সতর্ক সংকেত ছিল। মুসলিম লীগ এখন কংগ্রেসের একপাক্ষিক শক্তির কুফল এবং সরকার গঠনের কুফল বুঝতে পারবে। ১৫ অক্টোবর ১৯৪৬-এ চারজন মুসলিম লীগ এবং একজন নির্বাচিতকে নিয়ে সভা বসে। কিন্তু এটি হিংস্রতা কমায়নি। বরং পূর্ব বাংলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম সংখ্যাগুরুরা নোয়াখালী এবং টিপপেরায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিন্দু হত্যা অন্যান্য জেলাগুলোতে দাঙ্গা আরও বাড়িয়ে তোলে। বিশেষ করে হিন্দু অধ্যুষিত বিহারে আগুন জ্বলে ওঠে। বিহারে প্রায় ১০,০০০-এর উপর মুসলিম মারা যায়। গারমুখতেশ্বর-এ কয়েকশ মুসলমান কৃষক একদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কলকাতা, পূর্ববাংলা, বিহার, ইউপি বা কেন্দ্রীয় ভারতে অল্প কয়েকজন শিখ নিযুক্ত ছিল। ১৯৪৬-৭ সালে হাজারার শিখরা সর্বপ্রথম দাঙ্গায় নামে। এখানে ৯৫ ভাগ জনগণ ছিল মুসলমান। বিহারে আঘাতপ্রাপ্ত মুসলিমরা তাদের শোধ শিখদের উপর তোলে। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে হাজারা জেলার অনেকগুলো শিখ গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। খুন, ধর্ষণ, অত্যাচারের চিহ্ন নিয়ে শিখরা কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাক্সাবে আসতে শুরু করে।

৩. ব্রিটিশ পরিচালিত স্টেটসম্যান কলকাতার দাঙ্গার জন্য পুরোপুরি মুসলমানদের দায়ী করা হয়। মুসলিম লীগ কেবিনেটের উপর আইন রক্ষার ভার পড়ে, বিশেষ করে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী। এই মতামত একইভাবে সম্পাদক ইয়ান স্টিফেনস-এর 'পাকিস্তান' ১৯৬৩ সাথে প্রকাশিত, অধ্যায় VIII, -এ বর্ণিত নয়, ইংরেজ লেখক পেনডেরেল মুন ডিভাইড এবং কুইটএ, পৃ-৫৮, লিওনার্ড মসলের 'দ্য লাস্ট ডে অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ, পৃ-৩৩ এবং জেনারেল স্যার ফ্রান্সিস টুকার, যার 'হোয়াইল মেমরি সার্ভিস' পুরোপুরি ভারতবিরোধী।

৪. উপক্রমনিকা ৫।

শান্তি প্রতিষ্ঠা, সংসদ স্থাপন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আটলী মুখ্যমন্ত্রী নেহরু এবং জিন্মাহর সহযোগিতা চান। ভারতীয় নেতারা জনগণকে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি। অন্যদিকে ব্রিটেনের অনুপস্থিতিতে দাঙ্গায় যেন আরও আগুন ধরিয়ে দেয়।

পাঞ্জাবের সামাজিক সংঘাত

১৯৪৬ সালের আগ পর্যন্ত খিজর হায়াৎ খান (মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কৃত) সমাজতান্ত্রিক মুসলিম হিন্দু এবং অন্যদলের শিখদের নিয়ে চলতে সক্ষম হন। ২৪ জানুয়ারি ১৯৪৭-এ পাঞ্জাব সরকার ব্যক্তিগত অস্ত্র, হিন্দু আরএসএসএস, আকালি ডাল এবং মুসলিম লীগের দেহরক্ষকদেরও নিষিদ্ধ করে। লীগ এই সুযোগে এই আদেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। কয়েকদিন পর আদেশ বাতিল করা হলে বিদ্রোহী মুসলিম নেতাদের মুক্তি দেয়া হয়। ২ মার্চ ১৯৪৬, খিজর হায়াৎ খান নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। লাহোরে পাঞ্জাব আইন পরিষদ দস্তুরের বাইরে অনেক উত্তেজনা দেখা যায়। মাস্টার তারা সিং তার খোলা কিরপান হাতে নিয়ে ‘পাকিস্তান মুর্দাবাদ’ বলে শ্লোগান দেয়। রাত্তায় দুইদিন পরপর শিখ-হিন্দুদের সাথে মুসলিমদের সংঘাত হয়। রাজধানীতে দাঙ্গার খবর শ্রুতসর, রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাট, মুলতান এবং ক্যাম্বেলপুরে ছড়িয়ে পড়ে। এই দাঙ্গায় আঘাতপ্রাপ্ত ছিলেন শিখ। শিখদের বিশেষ পোশাকের কারণে সহজেই চিহ্নিত করা যেত এবং ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানদের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেখে নেয়া হতো তাদের মুসলমানী করা আছে কি না।^৫ মার্চের দাঙ্গা প্রমাণ করে তাদের আকালি ডাল, আকালি ফৌজি অথবা আকালি সেনা নামেমাত্র সংঘটন এবং তাদের নেতা নামেমাত্র বাঘ।

এই হত্যায়জ্ঞে পুলিশের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাঞ্জাবের ফোর্সের শতকরা ৭৪ ভাগ ছিল মুসলিম।^৬ নিয়মিতদের পাশাপাশি সিকান্দার হায়াৎ খান আরও ৬০০০ জনের দল গড়ে তোলে। অতিরিক্ত পুলিশ ছিল অস্ত্রসজ্জিত, মুসলমান। তাই অমুসলিমরা তাদের পাকিস্তান পুলিশের কেন্দ্র বলেই চিহ্নিত করত।

৫. রাওয়ালপিন্ডি জেলায় শিখদের সবচেয়ে খারাপ ধ্বংসযজ্ঞ হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এপ্রিলে এটি ভ্রমণ করেন। তার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘শহরের মধ্যদিয়ে যেতে যেতে দেখা যায়, ধ্বংসযজ্ঞ ছিল যেকোনো যুদ্ধে বোমাবর্ষণের মতোই। এই ঘটনা শিখদের জন্য ধ্বংস করার স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। মুসলমানদের নিজেদের জায়গায় আনন্দিত দেখা যায়। ক্যাম্পবেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃ-৭৯।

৬. পাঞ্জাবের মোট পুলিশ ফোর্স ছিল ২৪,০৯৫ যাদের মধ্যে ১৭৮৪৮ জন মুসলিম, ৬১৬৭ জন হিন্দু এবং শিখ ও ৮০ জন ইউরোপীয়ান বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

দাঙ্গা শিখদের জন্য একটি নির্ভর শিক্ষা ছিল। তাদের নামে উচ্চারিত ভয় এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ একনিমিষেই নেই হয়ে যায়। অপমানের জ্বালা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তার মনকে আরও বিষিয়ে তোলে। প্রধান সম্পাদক তার রিপোর্টে শিখদেরকে সংঘাতের জন্য প্রস্তুত বলে উল্লেখ করে। রিপোর্টে বলা হয়, ‘তাদের পরিকল্পনা পাঞ্জাবের সমস্ত সম্প্রদায়কে ঘিরে। শিখরা সংঘটিত হচ্ছে অস্ত্র নিয়ে। যারা অস্ত্র পায়নি তারা মৌখিক অথবা লিখিত শপথ নেয়। মুসলমানদের হাতে তাদের স্বধর্মের নির্যাতনের গল্প তাদেরকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। এটা জানা জরুরি নয় যে, শিখরা লড়াই করবে কি না, এটা জানা জরুরি তাদের নেতারা তাদেরকে নিয়মের অধীন আনবে কি না।’^৭

বৈশাখী দিনে ২৮০ জন জাট এবং মাস্টার তারা সিং নিজ সম্প্রদায়ের জন্য জীবনদানের শপথ নেয়। তখন থেকে শহর এবং গ্রামে শিখরা তরবারি, ছোরা এমনকি পিস্তল দিয়ে সজ্জিত হয়।^৮

নিহাং-এর সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যায়। আরএসএস এবং অন্যান্য নিখ প্রধান রাজ্যগুলোর সাথে যোগাযোগ করা হয়। গুরুদুয়ারা এবং অন্যান্য মন্দির দখলশোনা করার জন্য আইএনএকে ডাকা হয়। প্রতিরক্ষার জন্য ৫০ লাখ ফান্ড গঠন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। ২২ মার্চ ১৯৪৭ সালে ভাইসরয়ের দায়িত্ব লর্ড মাউন্টব্যাটেন থেকে লর্ড ওয়াভেল-এর হাতে যায়। তার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ থেকে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তর। দেশের বিভিন্ন নেতাদের সাথে তিনি সভা করা শুরু করেন এবং সংযুক্ত ভারত না পাকিস্তান-এর উপর মতামত দেন। রাজ্যগুলোর গভর্নরের সাথেও মতবিনিময় করেন। স্যার ইভান ভেনকিন্স সতর্ক করেন পাঞ্জাব দুর্যোগ ডেকে আনবে, কারণ এখন মুসলমান, হিন্দু এবং শিখ একত্রে বাস করে।

জনমত দেশ বিভাগের পক্ষে রায় দেয়। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের শিখ এবং পাঞ্জাবি হিন্দু সদস্য, পাঞ্জাব সংসদ দিল্লিতে মিলিত হয়ে সম্পদের ভিত্তির সঠিক বিভাগ দাবি করেন। আকালি এবং শিখরা পৃথক রাজ্য খালিস্তান দাবি করেন।

৭. নোট অন দ্য শিখ প্র্যান, পৃ-৭-৮।

৮. শিখ দুর্নীতির প্রধান নেতারা হলেন মাস্টার তারা সিং, জ্ঞানী কর্তার সিং, উদাম সিং, নাগোক, ইশার সিং, মাজহেইল, জাঠেদার মোহন সিং, সোহান সিং, জালাল উসমান, সারমুখ সিং চমক, অমর সিং দশাভ, জেনারেল মোহন্ত সিং, কর্নেল এনএস গিল। প্রথমদিকে শিখদলের সংগঠিত করতেন জ্ঞানী হারবানস সিং। পরে হত্যার অভিযোগে পলাতক থাকেন। পরে তাকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসি দেয়া হয়। অমৃতসরে সুরজিত সিং মাজিথবাড়ি ‘মাজিথা হাউস’-এ আইএনএ শিখ প্রধান দপ্তর স্থাপিত হয়। সুন্দর সিং মাজিথার পুত্র সুরজিৎ সিং পরে নেপালে ভারতের দূত, সংসদ সদস্য এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হন।

৯. আকালিরা ১০-১২ লাখ টাকা চাঁদা তোলে। বলদেব সিংকে লর্ড মানউন্টব্যাটেন পাঞ্জাব গভর্নরের উপস্থিতিতে শিখ প্রতিরক্ষা তহবিল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এইসব সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে জানান। মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃ-৬৬।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন তার সরকারকে ভারতের অবস্থা জানানোর জন্য ইংল্যান্ডে ফিরে যান। ব্রিটিশ সরকার জানায় ভারত রাজি থাকলে ভারত বিভাগ হবে। পাঞ্জাব এবং বাংলার জন্য নির্ধারণ করা হয়— তাদের আইন পরিষদ দুইভাগে বিভক্ত হবে। মুসলমান সংখ্যাগুরু এবং অবশিষ্ট। প্রতিটি দল পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে পারবে। যদি কোনো দল দেশভাগের কথা বলে তাহলে সীমানা টানা হবে।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতে ফিরে আসেন এবং ভারতীয় নেতাদের সামনে দেশভাগের পরিকল্পনা করেন। সূচনা বক্তব্যে তিনি শিখদের কথা উল্লেখ করেন যাদের ভবিষ্যৎ ব্রিটিশ সদস্যদের জন্য ভাবনার বিষয় ছিল।^{১০} ভাইসরয় শিখ নেতাদের কাছে জানতে চায় তারা কি বিভক্ত পাঞ্জাব চায় নাকি পাকিস্তানে বসবাস করতে চায়।

কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবে রাজি হয়। বলদেব সিং-এর মতামত এই ব্যাপারে আগে থেকেই জানা। সীমানা নির্ধারণী দলের কাছে শিখদের মত পৌঁছে দেয়াই এখন তার দায়িত্ব।^{১১}

৩ জুনের প্রচারণায় ভাইসরয় আবারও শিখদের ভাগ্য সম্পর্কে বলেন— ‘শিখদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা সতর্ক দৃষ্টি রাখছি। পাঞ্জাবের এক-অষ্টমাংশ এই সম্প্রদায় দ্বারা গঠিত, কিন্তু তারা এত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে পাঞ্জাব ভাগ করলে তারাও ভাগ হয়ে যাবে। আমাদের যাদের মনে শিখদের জন্য দুর্বলতা আছে তারা কেউই পাঞ্জাব বিভাগে রাজি নন, কিন্তু এটা এড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। শুধু বাউন্ডারি কমিশনই নির্ধারণ করবে কতটুকু বিভাগ হবে।’^{১২}

পরেরদিন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন—

“এই পকিল্লনায় দুটি দল আছে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ। কিন্তু আরেকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিখ সম্প্রদায়— তাদের কথাও আমাদের ভাবতে হবে। আমার মনে হয় শিখদের অনুরোধেই কংগ্রেস পাঞ্জাব ভাগের সংকল্প করে এবং সেই সংকল্পের অংশ ছিল মুসলিম এবং অমুসলিমের ভিত্তিতে পাঞ্জাবকে বিভক্তকরণ। শিখদের নিজেদের ইচ্ছাতেই এই বিভাগ হচ্ছে। আমি জানি না কখন এই পরামর্শ করা হলো। কিন্তু যখন আমি মানচিত্র পাঠাই তখন আশ্চর্য হয়ে দেখি তারা তাদেরকে সমান দু’ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। আমি

১০. শিখদের কষ্ট ব্রিটিশ সংসদে সহানুভূতি পায়। ১৫ জুলাই আরএ বাটলার বলেন, ‘ব্রিটিশদের সাথে শিখের অনেক ভালো সম্পর্ক। অন্য যেকোনো সম্প্রদায়ের চেয়ে শিখরা অনেক ভালো মনোভাব গড়ে তুলেছে। তাই বাউন্ডারী কমিশন অধিকাংশ শিখকে একত্রে রাখার জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবে।
ট্রিবিউন, ১৬ জুলাই ১৯৪৭।

১১. শিখ নেতারা একে-অপরের সাথে পরামর্শ চালিয়ে যায়। ২ জুন ১৯৪৭-এ দিল্লিতে আকালি ডাল-এর সভা বসে। জ্ঞানী কর্তার সিংয়ের সভাপতিত্বে মাস্টার তারা সিং, অমর সিং দেশান্ত, প্রিতম সিং গোজরান, মঙ্গল সিং গিল, স্মরণ সিং, উজ্জল সিং এবং বলদেব সিং। বলদেব সিং তার রিপোর্ট সম্পর্কে বলেন। নেতারা সংবাদ সম্মেলনে বিভক্ত হওয়ার কথা বললেও নিজেদের অটুট রাখতে তারা সীমানা চেনাব বরাবর টানতে বলে। হিন্দুস্তান টাইমস ও জুন ১৯৪৭। একই রকম সভা লাহোরে হয়।

১২. লর্ড মাউন্টব্যাটেনের প্রচার, অল ইন্ডিয়া রেডিও, ৩ জুন ১৯৪৭।

এখানে এবং ইংল্যান্ডে তাদের কীভাবে একা রাখা যায় সেই ব্যাপারে অনেক চিন্তা করেছি এবং আমি কোনো জাদুকর নই তাই কোনো সমাধানও পাইনি।”^{১৩}

লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে জিজ্ঞাসা করা হয় রাজ্যের বিভাগ ধর্মের উপর করা হবে নাকি সম্পদ, অর্থনীতি এইসব বিষয় আনা হবে। মাউন্টব্যাটেন জবাব দেন এক সরকারের কাছে সম্পদের ভিত্তিতে বিভাগ আশা করা বোকামী হবে।^{১৪}

ধারণা করা হয় শিখরা তাদের অধিভুক্ত জমি এবং প্রদানকৃত কর ফেরত দেয়া হবে। শিখরা তাদের ইচ্ছাকৃত ধারণা নিয়েই বসেছিল। কয়েকদিন পর সকল দলের শিখরা লাহোরে সম্মেলন করে এবং সংকল্প করে যা তাদের একতা এবং সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে এমন বিভাগ করবে না।^{১৫}

পাঞ্জাব এবং বাংলা বিভাগের সকল পদ্ধতি গ্রহণ করা শুরু হয়। পাঞ্জাব আইন পরিষদ আহ্বান করা হয় এবং সকল মুসলমান সদস্যরা বিরুদ্ধে গেলেও শিখ এবং হিন্দুরা রাজ্যের বিভাগের পক্ষে ভোট দেয়।^{১৬}

স্যার সাইরিল র্যাডক্লিফের সভাপতিত্বে বাউন্ডারি কমিশন নিয়োগ দেয়া হয়। প্রতি কমিশনের চারজন বিচারক থাকেন— দুইজন মুসলমান এবং দুইজন অন্য। পাঞ্জাব কমিশনের শিখ সদস্যরা ছিলেন, পাঞ্জাব উচ্চ আদালতের বিচারক তেজ সিং। এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলো চিহ্নিত করা এবং এরপর অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা।

কমিশন অন্য বিষয়গুলো হিসেবে মন্দির, বাড়ি এবং জমি আওতায় আনায় শিখরা আশাব্যিত হয়। ৩২ জন শিখের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি চিঠি পাঞ্জাব বাউন্ডারি কমিশনে জমা দেয়। আদম গুমারির ভুলের প্রতি এই চিঠিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মুসলমানদের একাংশ অস্থায়ী, দামি জমিগুলো শিখদের মালিকানাধীন এবং কিছু ঐতিহ্যবাহী মন্দিরের উপস্থিতি— এই বিষয়গুলোও তারা মাথায় আনে। তারা চেনাব সীমান্ত দিয়ে ভাগ করার দাবি করে যা শতকরা ৯০ শতাংশ শিখকে একত্রে রাখবে।^{১৭}

১৩. শিখদের যে কোনো একটি নিতে হবে— দেশ বিভাগ বা মুসলমান প্রতাপ।

১৪. ক্যাম্পবেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃ-১০৯।

১৫. এই পরিকল্পনার প্রতি শিখদের প্রতিক্রিয়া প্রধান সম্পাদকের রিপোর্টে জানা যায়। ‘এই পরিকল্পনা তাদের বিভক্ত করে দুই জায়গাতেই তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে। তারা তাদের শক্তিতে সঠিক মাত্রা দিতে চায়। শিখরা বাউন্ডারি কমিশন এবং কংগ্রেসের উপর নির্ভর করলেও তারা পাহাড়িদের উপর ভরসা হারায়নি। পাকিস্তান মানে শিখ পাহাড় সম্পূর্ণ মৃত্যু এবং সকল শিখ চেনাব এবং যমুনা সীমানা নিয়ে নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য দল এর পতাকার নিচে লড়বে। নোট অন শিখ প্ল্যান, পৃ-২৫।

১৬. প্রেনারী সভায় নতুন সংসদ গড়ার পক্ষে ৯১ ভোট এবং বিপক্ষে ৭৭ ভোট পড়ে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম পাকিস্তানের ৬৯-এর মধ্যে ২৭টি বিভাগের বিপক্ষে পড়ে। পূর্ব পাঞ্জাবসহ অমুসলিম জেলাগুলোতে বিভাগের পক্ষে ৫০ এবং বিপক্ষে ২২টি ভোট পড়ে।

১৭. দ্য শিখ মেমোরেন্ডাম টু বাউন্ডারি কমিশন, জুলাই ১৯৪৭। পাঞ্জাব বাউন্ডারি কমিশন ভারত জাতীয় কংগ্রেস-এ পৃথক পরিকল্পনা প্রকাশ করে।

মুসলমানরা শুধু লাহোরে নয়, বরং মুলতান, রাওয়ালপিন্ডি, জালাভার-এর তেহসিল এবং আমবালার কিছু অংশ দাবি করে।

সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে মুসলিম এবং মুসলিমের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে ১৩ জেলা পড়ে আমবালা এবং জালাভার বিভাগ, অমৃতসর, লাহোরের তেহসিল এবং গুরুদাসপুর। পূর্ব পাঞ্জাবে সুতলেজ, বিজ এবং রাঙিও দেয়া হয়। বাকি রাজ্যের ৬২ শতাংশ এবং জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ পাকিস্তানে দেয়া হয়।

র‍্যাডক্লিফ মুসলিম এবং হিন্দুদের প্রতি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টাই করেন। অন্যদের প্রতি অন্যায় না করে যাদের প্রতি ন্যায় করা যেত না তারা হচ্ছেন শিখ। তাদের সবচেয়ে দামি জমি, ১৫০ ঐতিহ্যবাহী মন্দির এবং জনসংখ্যার অর্ধেক পাকিস্তানে চলে যায়।

যখন মুসলমানরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে অস্ত্র সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল এবং শিখরা পাটিয়ালা, কাপুর থালা এবং ফরিদকোট থেকে তা করত। ঐতিহ্যবাহী কিরপান এবং বর্শা দিয়ে গ্রামগুলোর জাটারা এই দলগুলো গঠন করে।^{১৮} সীমানা টানলে সম্প্রদায়গুলো নিজেদের মাঝে অবশ্যই যুদ্ধে লিপ্ত হবে।^{১৯} দেশবিভাগের জন্য

১৮. ১৪ জুন ১৯৪৭-এ লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখেন, “আমরা শিখদেশের মধ্যমণি কিন্তু এখানে অস্থির পরিবেশ বিরাজ করে। ভারত বিভাগ হলে শিখদেরও বিভাগ হবে। মুসলমান উদ্দেশ্য এবং হিন্দুত্ববাদিতার জন্য তাদের আত্মত্যাগ করতে হবে। বাউন্ডারি কমিশন তাদের ভাগ করতে পারে না। তাদের প্রতিক্রিয়ায় নেতারা রাজনৈতিক সংগ্রামে আদি পদ্ধতি গ্রহণ করেন। মাস্টার তারা সিং, আইএনএ অফিসার হিংস্র হয়ে ওঠেন। সামনে ছিল কঠিন সময়।”

১৯. ১৯৪৭-এর ১০ জুলাই জ্ঞানী কর্তার সিং সম্পর্কে স্যার ইভান জেনকিন্সের একটি চিঠি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে আসে। “শিখদের সম্পর্কে জ্ঞানী সত্য কথা বলে। তার কথায় নিশ্চিত হয় যে যদি সিদ্ধান্ত তাদের পছন্দ অনুসারে না হয় তবে তারা সমস্যা তৈরি করবে।”

স্যার ইভান অন্য একটি চিঠিতে লিখেন, “জ্ঞানী কর্তার সিং আজ আমার সাথে দেখা করতে আসে। সে বলে ভারত স্বাধীনতা বিল এবং বাউন্ডারি কমিশন সম্পর্কে কথা বলতে সে আসছে। পাঞ্জাবে বিরাট সংখ্যক জনসংখ্যা বদল করতে হবে। ব্রিটিশরা কি এর জন্য প্রস্তুত। যদি এ ব্যাপারে ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া না হয় তবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। বছর ধরে ব্রিটিশরা বলেছে তারা সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আসছে। এখন কী হল? এই অবস্থা ব্রিটিশদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ।”

আমি বলি, শিখরা অসন্তুষ্টই হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা আসলে কাউকে না কাউকে ভুগতেই হবে। আমি ভেবেছিলাম শিখদের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য তারা তাদেরকে দোষী মানতে পারে। জ্ঞানী নিজে দেশবিভাগের পরিকল্পনা করে এবং বলদেব সিং এতে সফল হন।

জ্ঞানী তখন বলেন, শুধু জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিভাগ সম্ভব নয়। হিন্দু এবং মুসলমানদের মতো শিখদেরও নিজেদের জমি আছে। নানকানা সাহিবে মন্দির, কমপক্ষে একটি খাল খনন প্রক্রিয়াসহ কমপক্ষে তিন-চতুর্থাংশ জনগণকে পাঞ্জাবে ফিরিয়ে আনতে হবে। জনসংখ্যার পাশাপাশি সম্পদের হিসাবও করতে হবে। নেতাদের কাছে শিখরা প্রধান কারণ, সমস্যায় পড়লে তারা যুদ্ধ করে। বিদ্রোহের জন্য তারা কর্মকর্তাদেরকে হত্যা, রেলওয়ে লাইন উত্থান, খাল নষ্ট এবং আরও।’ আমি বলি এটি হবে বোকামী। জ্ঞানী বলে, ‘ব্রিটিশরা কথা না মানলে আমারও এটা ঠিক বলে মনে হবে। মুসলমানরা এখনও যদিও শিখদের পক্ষে কথা বলে যদিও তাদের ইচ্ছা শিকারের পূর্বে শিখদেরকে বিরক্ত না করা। সে বিশ্বাস করত মুসলমানরা পশ্চিম পাঞ্জাবের শিখদের নিরাপদ রাখবে।

একটি কমিটিও গঠিত হয়নি। শিয়ালকোট, লারালপুর, মন্টগোমেরী, লাহোর, অমৃতসর, গুরুদাসপুর, হুশিয়ারপুর, জালদার, ফিরোজপুর এবং লুধিয়ানার জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্রিগেডিয়ার দিগম্বর সিং ব্রার (ভারত) এবং কর্নেল আইয়ুব খান (পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী) সহযোগিতায় মেজর জেনারেল-এর নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয়।^১

১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে যখন ভারত স্বাধীনতা উদযাপন করছিল তখন ১০ মিলিয়ন পাঞ্জাবি নিজেদের গলা কাটতে ব্যস্ত ছিল। পূর্ব পাঞ্জাবে পুলিশ নিষিদ্ধ করে মুসলমানদের শিখদের দয়ার উপর ছেড়ে দেয়া হয়। ১৯৪৭-এ শিখদের হিংস্রতা চরমে উঠে।^{২০} জেনারেল রিস রিপোর্ট দেন, “২০ জন থেকে ৩০ জন শুরু করে পাঁচ থেকে ছয়শত মানুষ দিয়ে জাটরা সংঘটিত ছিল। অল্প সুযোগে কম সংখ্যক হলেও কোনো গ্রাম অথবা ট্রেন আক্রমণ করতে গ্রামবাসীরা যোগ দিয়ে তাদেরকে হাজার সংখ্যায় পরিণত করত। তারা নেতাদের চিনতে সক্ষম হয়। সংবাদ বাহকরা পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, অথবা মোটরযানে চড়ে যেত। আক্রমণের পদ্ধতি ছিল অ্যামবুশ। কনভয় অথবা ট্রেনে সংবাদ নেয়া সবচেয়ে সহজ ছিল। শাস্ত্রীয় উচ্চতা বেশি হওয়ায় শরণার্থীদের হামলা করাও সহজ। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণকারীরা নিশ্চুপ থাকত এবং বিপরীতদিক থেকে হত্যাকারীরা আক্রমণ করত। শরণার্থীরা ভয়ে ছড়িয়ে পড়লে তারা তরবারি এবং বর্শা দিয়ে আক্রমণ করত। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত মানুষ আলাদা করা অসম্ভব ছিল।^{২১}

ভারত এবং পাকিস্তান উভয়দিকে খুবই খারাপ অবস্থা ছিল। পায়ে চলা শরণার্থীরা রাস্তায়, এমনকি রেলগাড়িতেও আক্রমণ করা হতো। আক্রান্ত বগীগুলো হত্যাকৃত মানুষে ভর্তি থাকত। অসুস্থ বৃদ্ধ এবং বাচ্চাদের উপরও কোনো দয়া করা হতো। যুবতীরা তখনই প্রাণে বাঁচাত যখন তাদেরকে হরণ করে নেয়া হতো। বিশ্বের ইতিহাসে এত রক্তাক্ত অধ্যায় আর কখনও হয়নি।^{২২}

১৩ জুলাই জেনকিনস মাউন্টব্যাটেনকে আরেকটি চিঠি লিখেন—পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করে। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খুব খারাপ। শিখরা বিশ্বাস করত পশ্চিম-পাঞ্জাবের শিখদের ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং হিন্দু ও কংগ্রেস দ্বারা শিখদের শেষ করে ফেলা হবে। তারা শীঘ্রই হিংস্রতার কথা বলে।^১ দ্য লাস্ট ডে'জ অফ দ্য ব্রিটিশ রাজ্য, পৃ-২০৫-৭।

২০. মাউন্টব্যাটেন শিখদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চায় পৃথক রাজ্য স্থাপন তাদের উদ্দেশ্য? ভি.পি. মেনন বলেন, রাজনৈতিকভাবে তারা জালান্দারকেও হারিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিশোধ। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৭, ক্যাম্পবেল জনসন, মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃ. ১৯১।

২১. লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি আর স্টিভেনস। হিন্দি অফ ফোর্থ ইন্ডিয়ান ডিভিশন।

২২. এই দাঙ্গাগুলোয় মৃত লোকের সংখ্যা বিভিন্নজনের মতে বিভিন্নরকম। পেনডেরেল মুন তার দাবিমতে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য হিসাব হচ্ছে পাকিস্তানে ৬০,০০০ জন এবং পাঞ্জাবে তার থেকে একটু বেশি। দুইদিকে সব মিলিয়ে প্রায় ২,০০,০০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে বলে তিনি দাবি করেন। ডিভাইড এন্ড কুইট, পৃ-২৯৩।

মৌসুম আসে। নদীর উচ্চতা বাড়ে। রাস্তা ডুবে যায়, ব্রিজ ভেঙে পড়ে, রেললাইন ঢুকে যায়। শরণার্থী শিবিরে কলেরা ছড়িয়ে পড়ে। জমির বুক থেকে রক্তের দাগ মুছে যায়।

প্রস্থান এবং পূর্বপাঞ্জাব পুনর্গঠন

১৯৪৬-৭-এর শীতে শিখ শরণার্থীরা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের কেন্দ্রের দিকে আসতে থাকে। ১৯৪৭-এর মার্চে হিংস্রতার আরেকরূপে দেখা যায় মুসলমান ঠগরা কীভাবে হিন্দু এবং শিখদের আক্রমণ করেছে, এমনকি লাহোর এবং অমৃতসরেও। তারা পথ পরিবর্তন করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যায় যেখানে শিখরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিবে।

আগস্টে দাঙ্গা সামাজিক রূপ নেয়। মানুষ তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য নেতাদের আদেশের প্রতীক্ষা করে। মাস্টার তারা সিং এবং জ্ঞানী কর্তার সিং পশ্চিম পাঞ্জাবের শিখদের সেখানেই থাকতে বলে এবং পাকিস্তানের সাথে আলোচনায় বসে। মহাত্মা গান্ধী পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের ভারতে থাকার আবেদন জানায়। কিন্তু হিংসার বাতাস হিন্দু এবং শিখদের পাকিস্তান এবং মুসলমানদের ভারত ত্যাগে উৎসাহিত করে। এই উভয়মুখী প্রক্রিয়া ব্যাপক আকারে চলছিল।^{২৩} সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মিলিটারি সভা বসে। পাকিস্তান থেকে পাঞ্জাব এবং পাঞ্জাব থেকে পাকিস্তানে যাওয়ার চারটি রাস্তা আছে—নারওয়াল দেরাবাবা নানক, লাহোর-অমৃতসর, কেসার-ফিরোজপুর এবং মন্টগোমারী-ফাজিলকা। এমইও এবং বাউন্ডারি দল বিপরীতমুখী গাড়িদের সংঘর্ষ রোধ করার চেষ্টা করে। কুরুক্ষেত্রে অমুসলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় শরণার্থী শিবির খোলা হয়। ১৯৪৭-এর অক্টোবরে শরণার্থী সংখ্যা ৭২০,০০০-এর উপরে যায়।

সমস্যার আসল রূপ সম্পর্কে নতুন সরকার অবহিত ছিল না। এই অভিবাসন কী স্থায়ী? লোকজন কী তাদের বাড়ি ফিরিয়ে দেবে? ৮০০০ পাটওয়ারীর উপর পুনর্গঠন বিভাগ এবং গ্রাম্যকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। দুইজন যুবক শিখ তারলোক সিং এবং এমএস রানদাওয়াকে সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হয়। তারলোক সিং জমি পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করে। সরকার মুসলমানদের বাড়ি এবং জমি অধিগ্রহণ

২৩. ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস মুডি জিন্নাহকে লেখেন, “আমি সবাইকে বলেছি, শিখরা কীভাবে সীমানা পার হবে আমি তার পরোয়া করি না। শুধু জানি তাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে। এখনও লায়ালপুরে প্রায় তিন লাখ শিশু আছে। কিন্তু তাদেরও চলে যেতে হবে।” জি.ডি. খোসল স্টার্ন রেকর্ডিং, পৃ-৩১৪-১৬; মুসলিম লীগ অ্যাটাক অন শিখ অ্যান্ড হিন্দুস, পৃ-১৩৪।

করে। হিন্দু এবং শিখ শরণার্থীরা যুদ্ধক্ষেত্র এবং শরণার্থী শিবির ছেড়ে শহরে এবং গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়। প্রতিটি পরিবার, পাকিস্তানে যাই ছেড়ে আসুক না কেন দশ একর জমি এবং বীজ এবং কৃষিযন্ত্র কেনার জন্য টাকা ধার দেয়।

শীত আসলে বোঝা গেল এই অভিবাসন চিরস্থায়ী ছিল। অস্থায়ী বরাদ্দ স্থায়ী করা হয় এবং মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তিও তার অনেকাংশ পূরণ করে। এটা সহজ ছিল না। কারণ পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছেড়ে আসা শিখ-এর সংখ্যা মুসলমানদের সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল (৪,৩৫১,৪৭৭-এর বিপক্ষে ৪,২৮৬,৭৫৫)। কিন্তু শিখ এবং হিন্দুরা কৃষিযোগ্য প্রায় ৬৭ লাখ জমি ছেড়ে আসে, যেখানে মুসলমান ৪৭ লাখ একর প্রায় অনুর্বর জমি ছেড়ে আসে। এসব সমস্যার পাশাপাশি কর্নালের মতো জেলায় মুসলিম অধীনস্থ জমি হিন্দুরা দখল করে নেয়।

পুরোপুরি পুনর্গঠনের জন্য তারলোক সিং বিস্তৃত পরিকল্পনা করে। জমিগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা বিভিন্ন হওয়ায় উৎপাদনের ভিত্তিতে আদর্শ পরিমাপ করা হয়। ১০ থেকে ১১ মণ হবে এক একরের একক। তার হিসাব মতে হিন্দু-শিখ শরণার্থীরা প্রায় ৪,০০০,০০০ ইউনিট-এর বদলে মাত্র ২,৫০০,০০০ ইউনিটই নিয়েছে। এগুলো এড়ানোর জন্য যে পরিকল্পনা করা হয় সেই মতে ক্ষুদ্র জমি অধিকারীরা অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হলেও জমিদারেরা ভালোই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দেশবিভাগ প্রস্তাবের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। বিশাল সম্প্রদায় থেকে শিখ ভারতের অন্য সম্প্রদায়গুলোর কাতারে এসে দাঁড়ায়। ব্যবসায়ী থেকে কৃষক সকলের জন্যই এটা প্রযোজ্য। পশ্চিম পাঞ্জাবের বিশাল জমির অধিকারী শিখরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব পাঞ্জাবে ৩০ একরের বেশি জমি কাউকে দেয়া হয়নি। গ্রাম থেকে শহরের শিখরা আরও ভেঙে পড়ে। মুসলমানদের ছেড়ে দেয়া শহরে জমি পাকিস্তানে ছেড়ে আসা শিখদের তুলনায় কম ছিল। এছাড়াও শিখ ব্যবসায়ীদের হিন্দু শরণার্থী এবং ব্যবসায়ী উভয়ের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হতো।

শ্রেণীবিভেদ কমে আসে। ১৯৪৭-এর অস্থায়ী বরাদ্দ সুইপার, মুচি, কুমোর, কামার এদের উন্নতি ঘটে— জাট এবং রাজপুত কৃষকে। ৩০ একর জমির আবাদ এই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত করে।

এর আরও খারাপ দিক আছে। জমির পরিমাণ কম হওয়ায় জমি মালিকেরা বর্গাচাষীর বদলে নিজেই জমি চাষ করত। জমিদারী প্রথা বাতিল হয়ে যায়। কৃষকেরা তাদের সঞ্চয় দিয়ে আধুনিক চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর, টিউবওয়েল ক্রয় করে। কৃষক সমবায়, উন্নত বীজ এবং সার গ্রামগুলোর চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। পশুপালনেও আরও মনোযোগ দেয়া হয়। কৃত্রিম প্রসন, পশুপালনবিদ্যা এবং গবাদি পশুর খামার আয়ের উৎস হয়ে দাঁড়ায়। এতদিনের অবহেলিত হাসমুরগী খামারও উন্নতি করে। অতিথি পাখির ব্যবসাও শুরু হয়। এসকল ক্ষেত্রে শিখ কৃষকরা ছিল অগ্রগণ্য। কয়েক বছরের মধ্যে পূর্ব পাঞ্জাব উন্নত অঞ্চলে পরিণত হয়। কিন্তু অনেক

জায়গায় জমি হারানো মানুষদের ম্যালেরিয়া আক্রান্ত জঙ্গল এবং উত্তর প্রদেশের তেরাই-এ এবং আগাছাযুক্ত মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে বরাদ্দ দেয়া হয়। শিখ শরণার্থী কৃষকেরা জঙ্গল পরিষ্কার এবং জমি আবাদের জন্য সর্বোচ্চ পরিশ্রম করে। শিখ ব্যবসায়ীরাও কৃষকদের মতো চূড়ান্ত শ্রম দেয়। দারিদ্র্যের আঘাতে অনেকে মারা যায়। স্বচ্ছল ব্যবসায়ীদের রাস্তায় ফেরি করতে নামতে হয়। মেয়েরা ট্যাঙ্গা ঠেলে, তাদের ভাই জুতা পরিষ্কার করে। কিন্তু কম শিখ নারী, পুরুষ বা বাচ্চাদের ভিক্ষা করতে দেখা যায়। এভাবে তারা আবারও হারানো সম্মান ফিরে পায়।

শিখ রাজনীতিতে পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম পাঞ্জাবে শিখ নেতাদের ছড়িয়ে পড়া তাদের আরও দুর্বল করে তুলেছে। মাস্টার তারা সিং শরণার্থীদের পক্ষে কথা বলে আবার তার কৃতিত্ব ফিরে পান। কিন্তু জ্ঞানী কর্তার সিং এবং শহুরে জাট নয় উজ্জল সিং এবং হুকুম সিং^{২৪} তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে ক্ষমতাশীল দলকে সাহায্য করে। অন্যদিকে পূর্ব পাঞ্জাবে নেতারা শক্তি এবং সাহস পায়। স্বাধীনতার পরের বছরগুলোতে প্রতাপ সিং কাইরন,^{২৫} স্মরণ সিং^{২৬} এবং জ্ঞান সিং^{২৭} রারওয়ালার উত্থান হয়।

পূর্ব পাঞ্জাবের কিছু জেলায় অভিবাসনের একটি শিখ ঘনত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। যদিও শিখরা পুরো ভারতে এবং কিছু বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে কিন্তু তবু তারা অনেকে মালওয়ায় থাকে। এগুলোসহ আরও কিছু বিষয় আলাদা শিখ রাষ্ট্রের দাবি তোলে।^{২৮}

২৪. দেশবিভাগের পরে মন্টগোমেরীর একজন অরোরা আইনজীবী হুকুম সিং-এর উত্থান ঘটে। তিনি জ্ঞানী কর্তার সিং এবং তারা সিং প্রথমে পাঞ্জাবি সুবার দাবি তোলেন। লোকসভায় দু'বার নির্বাচিত হন। ১৯৬১ সালে তিনি সুবা থেকে প্রত্যক্ষ সমর্থন প্রত্যাহার করে নেন। ১৯৬২ সালে কংগ্রেস সমর্থনে লোক সভায় ডেপুটি স্পীকার হিসেবে নির্বাচিত হন।

২৫. প্রতাপ সিং কাইরন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনৈতিক বিদ্যার উপর ডিগ্রি নেন এবং ১৯২৯ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন। তিনি সংসদের একজন সদস্য ছিলেন।

১৯৩৬-এ পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ভাগওয়ারা কেবিনেটে ১৯৪৭-৯ এবং সাচার কেবিনেটে ১৯৫২-৬ সাল পর্যন্ত তিনি সদস্য ছিলেন। তিনি একজন অন্যরকম মানুষ ছিলেন। তার এবং তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে ১৯৬৪-এর জুনে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৬৫ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তাকে হত্যা করা হয়।

২৬. শংকর গ্রামের আইনজীবী স্মরণ সিং ১৯৪৬ সালে পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। পরে উন্নয়নমন্ত্রী হন। দেশভাগের পরেও তিনি নেহরুর আমলে ১৯৫২ সালে গৃহপূর্তমন্ত্রী, ১৯৪৭ সালে জ্বালানি ও খনিজ মন্ত্রী, ১৯৬২ সালে রেলওয়েমন্ত্রী এবং ১৯৬৩ সালে কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রী এবং ১৯৬৪ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সংসদে যোগ দেন।

২৭. পাটিয়ালার একজন জাট জ্ঞান সিং রারওয়ালার পিইপিএসইউ-এর একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৬২ পর্যন্ত কায়র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং পরে এর বিপক্ষে কাজ করেন।

২৮. সংসদের কাছে পূর্ব পাঞ্জাবের কিছু শিখ তেরোটি দাবি পেশ করেন। পূর্ব পাঞ্জাব আইন পরিষদে তারা ৫০ ভাগ প্রতিনিধিত্ব চান। গভর্নর এবং মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু এবং শিখ এভাবে ক্রমান্বয়ে আসবে,

শিমলায় পূর্ব পাঞ্জাবের অস্থায়ী সরকার ছিল। স্যার চান্দু লাল ত্রিবেদীকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আইনজ্ঞ দ্বারা গোপীচন্দ্র ভার্গাভা নিয়োগ পান।

১৯৪৮ সালে পাঞ্জাবের শিখ প্রদেশ, মালেরকোটলা এবং নালাগর পাটিয়ালা এবং ইস্ট পাঞ্জাব স্টেট ইউনিয়ন (পিইপিএসইউ) গঠন করে মহারাজা যাতভেন্দ্র সিং গভর্নর এবং জ্ঞান সিং রারওয়াল্লা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যোগ দেন। এখানে শিখরা সংখ্যালঘু ছিল।

আকালি এবং কংগ্রেসের তুলনায় পিইপিএসইউ দুর্বল ছিল। জ্ঞান সিং রারওয়ালার বদলে রাঘবীর সিং এবং তার মৃত্যুর পরে ব্রিশবান দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৬ সালে শিখ জনগোষ্ঠী এবং আকালি তৎপরতার জন্য এটি শেষ হয়ে যায়।

১৯৫২-এ পাঞ্জাবে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেয়। ভিম সিং সাচার মুখ্যমন্ত্রী হন। তার সময়ে হিমালয়ের পাদদেশে চণ্ডিগড়ে পাঞ্জাবের রাজধানী স্থাপিত হয়।^{২৯} ১৯৫৬ সালে প্রতাপ সিং কায়রন-এর বদলে সাচার আসেন। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২-তে আবারও কংগ্রেস নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং কায়রন ১৯৬৪-এর জুন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন।

BanglaBook.org

চাকরিক্ষেত্রে ৪০ ভাগ শিখ, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে ৫ ভাগ শিখ এবং কমপক্ষে একজন শিখ মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী কেন্দ্রীয় পরিষদে থাকবে। যদি এগুলো মানা না হয় তবে একে আলাদা রাজ্যের দাবি তোলা হবে। স্টেটসম্যান ৯ নভেম্বর ১৯৪৮।

২৯. লেফটেন্যান্ট করবুসির জেনারেট, ম্যাক্সওয়েল ফ্রাই এবং তার পত্নী জেন ড্রিউ চণ্ডিগড়ের পরিকল্পনা করেন।

১৮. তাদের নিজস্ব রাজ্য

স্বাধীন শিখ রাজ্যের স্বপ্ন শিখদের মন থেকে কখনও মুছে যায়নি। সেই গুরু গোবিন্দ সিং-এর আমল থেকে তারা প্রার্থনা শেষে বলে আসছে খালসারা শাসন করবে। অসংখ্য শিখ এই উদ্দেশ্যে তাদের প্রাণ দিয়েছে। মহারাজা রনজিৎ সিং-এর রাজত্ব এ ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসকে আরও মজবুত করে। রাজত্বের পতন তাদের কাছে ছিল অস্থায়ী সমস্যা। ভারতে যখন স্বশাসনের কথা উঠল তখন খালি একটা কথা উঠল, ‘পাঞ্জাবকে শিখদের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে, যা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে।’

শিখদের সরকার এবং হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের মতের সাথে নিজেদের পরিবর্তন করতে হয়েছে। সম্পদ নয় বরং সংখ্যাগুরুত্বের উপর শিখরা নজর দিয়েছে। এবং পাঞ্জাবে তাদের সংখ্যা ১২-১৩ ভাগ এবং ভারতে ১ ভাগ। সংখ্যার ভিত্তিতে শাসন করতে হলে ভারত হিন্দু বা মুসলিম দিয়ে শাসিত হবে এবং পাঞ্জাব মুসলিম দিয়ে। শিখ শক্তি পাঞ্জাবের মুসলমান শাসনের দিকেই ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল।

শিখ নেতার প্রথম আন্দোলন ছিল ‘মুসলমানদের’ বিরোধিতা করা। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিয়ে তারা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের অবসান কামনা করে। মুসলমানরা পৃথক নির্বাচন এবং অধিকার আদায়ে সক্ষম হলে তারাও একইরকম অধিকার চায় যাতে তারা শক্তিতে মুসলমানদের হারাতে পারে। ষোল বছর ধরে তারা এই চেষ্টা চালিয়ে যায়। একসময় তারা বুঝতে পারে কোনো সরকারই মুসলমান সংখ্যাগুরুকে সংখ্যালঘু করতে পারবে না। পাঞ্জাব আবার ভাগ করার কথা বলা হয় যাতে পশ্চিমের মুসলমান সংখ্যাগুরু এলাকা পূর্বে অমুসলমান এলাকা থেকে পৃথক হয়।^১ এই প্রস্তাবে আদৌ জ্রক্ষেপ আনা হয় না। ভারত সরকার আইন ১৯৩৫ শিখদের ভয়কে আরও দৃঢ় করে। অন্য রাজ্যগুলোর মধ্যে শিখরাও স্বায়ত্তশাসন পায়। সংখ্যা কম হওয়ার পরেও মুসলমান ইউনিয়নিস্ট পার্টি শিখদের প্রতিনিধিত্ব আরও কমিয়ে ফেলে।

আবারও শিখ রাজ্যের কথা উঠে। পাকিস্তান জন্মের কারণে এই কথা আরও শক্তি পায়। ব্রিটেনের ক্ষমতা হস্তান্তরের কঠিন সময়ে শিখরা কংগ্রেসের অধীনে ছিল। তারা শক্তভাবে স্বাধীন রাজ্যের কথা বলেনি। তাই মনে হয় তারা শুধু

১. ২য় গোলটেবিল কনফারেন্স ১৯৩১ সালে হয়। মাইনরিটিস কমিটি ওওও, অ্যাপেনডিক্স ওওও, পৃ- ১৪৩৫-৭।

মুসলমানদের বিরোধিতাই করেছে। সকল বিষয়— ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক— এগিয়ে দেয়া হয় যাতে পাকিস্তান বাহক না পায়। কেউ তাদের বিষয় সিরিয়াসলি নেয়নি।^২

পাঞ্জাব বিভাগের দিন যত এগিয়ে আসে শিখ নেতাদের ভাগ্য ততই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। জিন্নাহ বলেন যদি তারা পাকিস্তানে আসে তবে তাদেরকে জীবন, সম্পদ, ধর্ম এবং অধিকারের নিশ্চয়তা দেব। অন্যদিকে অধিক কাছের কংগ্রেস তাদের জানায় ভারত তাদেরকে নিজেদের ভূমি হিসেবেই ব্যবহার করবে। ১৯৩১-এর মার্চে সিসগঞ্জ গুরুদুয়ারায় বলেন, মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, “কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতা করবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। শিখরা মহান। তারা জানে কীভাবে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে হয়।”

যখন ব্রিটিশ থেকে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা চলছিল ১৯৪৬ সালের জুলাইয়ে জওহরলাল নেহরু বলেন, “পাঞ্জাবের সাহসী শিখরা বিশেষ দৃষ্টি পাবে। আমি উত্তরে শিখদের স্বাধীন এলাকা স্থাপনে কোনো ভুল দেখি না।”

শিখ নেতারা জিন্নাহর কথায় না ভুলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জিন্নাহর কথার পরও শতাব্দী ধরে চলে আসা শিখ-মুসলমান শত্রুতা প্রভাব ফেলে। শিখরা হিন্দুদের কাছে নিজেদের বেশি নিরাপদ মনে করে। সীমানা নির্ধারণের পর হাজার হাজার শিখ তাদের পাকিস্তানে সম্পদ-বাড়ি ছেড়ে ভারতের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায়। যারা পাকিস্তান ছাড়েনি তাদের হত্যা করা হয়।

দেশভাগের সময় আইনের কোনো বালাই ছিল না। কিছু শিখ পূর্ব পাঞ্জাবে নিজেদের সরকার স্থাপন করে। অন্য কথায় যাদেকেশ সিং মুকুট প্রত্যাশা করতেন। মোতিবাগ প্যালেস-এ বিখ্যাত বিষয় ছিল বৃহত্তর পাটিয়ালা। আইএনএর শিখদের অবস্থা ছিল সেইসব বাদকুমারের মতো যারা অনেক স্বপ্ন দেখত কিন্তু কিছু করার সামর্থ্য ছিল না।

দেশবিভাগের নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। শিখরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঘাগর নদীতে এসে থামে, পূর্ব পাঞ্জাবের তেহসিল থেকে আগত জনগণ বিশাল জনসমষ্টি গঠন করে। প্রথমবারের মতো শিখ রাজ্য গঠন বিশাল সমর্থন পায়। অনেক শিখ হিন্দুদের সাথে তাদের ভাগ্য বেঁধে দেওয়ায় সন্দেহ প্রকাশ করে। মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া জমি তাদের এবং হিন্দুদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে হরিয়ানার হিন্দুরা মুসলমানদের জমি দখল করে নেয়।

পুনর্বাসন ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা শিখদের বিরক্ত করে। শিখ ব্যবসায়ীরা প্রচণ্ডভাবে আঘাত পায়। তাদের মূলধন নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব পাঞ্জাবে এমন কোনো মুসলিম ব্যবসায়ী ছিল না যাদের জায়গা তারা দখল করতে পারবে।

২. যুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদীরা শিখ ভূমির পরিকল্পনা করে। ১৯৪৫-৬-এর নির্বাচনের শিখ জনগণ পাকিস্তানের সমর্থন চায়। জি অধিকারী শিখ মাতৃভূমির কথা বলে, যা দুই বছর আগে শিখ জাতীয়তাবাদীর প্রমাণ নয় বলে দাবি করা হয়।

সরকারও তাদের ব্যবসা শুরু করার মতো মূলধন দেয়নি। তাদের অহংকার অযোগ্য সরকারের সাথে তিক্ত হতে তাদের বাধা দেয়নি। এমনকি হিন্দুদের সাথেও না। তারা নিজেদের বলে, ‘মুসলমানরা পেল পাকিস্তান, হিন্দুরা পেল হিন্দুস্তান। আর আমরা কি পেলাম?’ এই অবস্থায় শিখদের তিক্ত ধারণা দূর করা কঠিন হয়।

শিখদের সাথে বোঝাপড়া করতে সরকার অল্প কল্পনাশক্তির পরিচয় দেয়। উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে শিখরা অচেনাদের সন্দেহের সাথে দেখত। কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু শরণার্থীদের জন্য ট্যাক্স এবং বাস সার্ভিস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। যুক্ত নির্বাচন বিলুপ্তি, অধিকার সংরক্ষণ এবং চাকরি ক্ষেত্রে এন্ট্রান্স পরীক্ষা শিখদের আরও কঠিন অবস্থায় ফেলে। সামরিক এবং বেসামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। অনেক শিখ দেখতে পায় এরকম রাজ্যে কেশাধারী হওয়ায় চাকরিতে তারা উন্নতি করতে পারবে না।

১৯৪৮ সালে সরকার শিখ রাজ্যের প্রতি দুই ধাপ এগিয়ে যায়। পাঞ্জাব মূলত একটি রাজ্যে পরিণত হয়— পাটিয়ালা এবং ইস্ট পাঞ্জাব স্টেটস ইউনিয়ন। পিইপিএসইউ-তে ছিলেন শিখ মহারাজা ইয়াদেবেন্দ্র সিং, রাজপ্রমুখ হিসেবে। শিখ অভিজান্য জ্ঞান সিং রারওয়ালা মুখ্যমন্ত্রী এবং অধিকাংশ জনগণই ছিল শিখ শুধুমাত্র শিখ সংখ্যাগুরু রাজ্যগুলোকে পিইপিএসইউ-এর সঙ্গে যোগ করাই বাকি ছিল।

১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় ধাপ শিখদের নিজেদের অনুরোধ করার সুযোগ দেয়। পাঞ্জাবি হিন্দু এবং হিন্দু ভাষাকে পাঞ্জাবের ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়। শিখরা ভাষার দাবিকে আরও সমুন্নত করে।^৭ তারা বলে হরিয়ানা ছাড়া পাঞ্জাবের সকল জায়গার ভাষা পাঞ্জাবি এবং অধিকাংশ সাহিত্য গুরুমুখী ভাষার লেখা। অনাবাদি বালিসমৃদ্ধ হরিয়ানা হিন্দুভাষীদের সাথে যোগ করা হোক এবং শুধুমাত্র পাঞ্জাবিকেই পাঞ্জাবের ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হোক। এটা এমন আর গোপন ছিল না যে, শিখরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠন করবে এবং পাঞ্জাবি ভাষা এবং সাহিত্য তাদের কাছে পবিত্র বলে বিবেচিত। তাই সুবার অন্যতম দাবি ছিল নিজেদের রাজ্যে ভাষা তো ছিল শুধু উপরের কথা।^৮ তেলেগুভাষী লোকদের করা অস্থিরতা এবং মারাঠী ভাষী লোকদের পৃথক রাজ্য দাবি তাদের দাবিকে আরও মজবুত করে।

৩. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিজেদেরকে প্রধানরূপে গড়ে তোলে। স্বাধীনতার পর পাঞ্জাব এবং শিখদের সাথে তাদের সম্পর্ক পরিবর্তন হয়ে যায়। বিচারপতি দর-এর নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয় যেখানে পুনরায় সীমানা নির্ধারণের কথা বলা হয়। কমিশনার পুনরায় বলে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য ভাষাভিত্তিক দল গঠনে বাধ্য করবে। শিখ, জাট এবং অন্যান্যরা এই দাবি তুলেছে এবং জীবনমরণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দর কমিশন রিপোর্ট পৃ-১২০।

সংসদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অন্য একটি কমিটিতে দর কমিশনের কথা বলা হয়। জওহরলাল, ভান্সনাই প্যাটেল এবং পান্ডাবী সিতারামায়া দর কমিশনের কথা পুনরাবৃত্তি করেন, ‘বর্তমান সময়ে কোনোভাবেই সীমানা পুনর্নির্ধারণ সম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি তাদের উপর কিছু শক্তি প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক।

৪. কিছু সময় ধরে আকালি এবং সরকার উভয়ই ব্যাপারটিকে শুধু ভাষার মাঝে সীমিত রাখে। গুরুমুখী লেখায় পাঞ্জাবি এবং দেবনাগ্রী লেখায় হিন্দী উভয়টিকেই গুরুত্ব দিয়ে সরকার স্কুল স্থাপন

টেবিল ১৮.১

উত্তর-পশ্চিম জেলা পাঞ্জাব	হিন্দু %	শিখ %	উত্তর এবং দক্ষিণ-পূর্ব জেলা পাঞ্জাব	হিন্দু %	শিখ %
হুশিয়ারপুর	৭৩.২	২৬.২	হিসার	৯১.৩	৭.৭
জালান্দার	৪২.৬	৫৬.৫	রোহটাক	৯৮.৫	০.৭
লুধিয়ানা	৩৭.৪	৬১.৭	গুরগাও	৮২.১	০.৭
অমৃতসর	২৭.৭	৭০.৭	করনাল	৯০.৩	৮.৯
ফিরোজপুর	৩৮.৭	৫৯.৬	আম্বালা	৭২.২	২৪.৬
গুরুদাসপুর	৪৫.৫	৪৬.৬			

পিইপিএসইউ	হিন্দু	শিখ	পিইপিএসইউ	হিন্দু	শিখ
পাটিয়ালা	৫২.১	৪৭.১	সংফর	৬৫.৪	৩৩.৪
বার্নালা	২১.০	৭১.০	মহিন্দরগর	৯৯.০	০.০
ভাটিন্দা	২১.৬	৭৮.১	কোহিস্তান	৮৯.০	৯.০
কাপুরথালা	৩৫.৫	৬৩.৬			
ফাতেহগর সাহেব	৩৩.৬	৬৫.২			

	হিন্দু	শিখ	অন্য
পাঞ্জাব	৬৩.৫	৩৩.৪	৩.১
পিইপিএসইউ	৪৮.৮	৪৮.৮	১.৯
পাঞ্জাব এবং পিইপিএসইউ	৬২.৩	৩৫.৫	২.৭

নোট- ভারত, সেনসাস কমিশনার, সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৫১, ভলিউম VIII পার্ট IIA, পৃ-২৯৮-৩০০। ১৯৫৬ সালে পাঞ্জাব এবং পিইপিএসইউ একত্র হয়ে যায়।

করে। কিন্তু পাঞ্জাবিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গণনা করা হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করে। পাঞ্জাবের একটি ভাষার দাবি নিয়ে আকালিরা মাঠে নামে। সাচার ফর্মুলায় পাঞ্জাবকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। পাঞ্জাবি ভাষী হিন্দী ভাষী এবং উভভাষী। প্রথমটি ছয়টি জেলা-অমৃতসর জালান্দার, গুরুদাসপুর, ফিরোজপুর, লুধিয়ানা ও হুশিয়ারপুর, এবং আম্বালার দুটি অঞ্চল (রুপার এবং খারার, চণ্ডিগড় বাদ); হিন্দুভাষী অঞ্চলে ছিল পাঁচটি জেলা (রোহটাক, গুরগাও, কর্নাল, কাংরা এবং হিস্যায়) এবং আম্বালার দুটি তেহসিল (জগধরি এবং নারায়নগড়) বাকি এলাকা যেমন শিমলা, আম্বালা, চণ্ডিগড় এবং সিরসাকে উভভাষী ঘোষণা দেয়া হয়।

বলা হয়, ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত এলাকার ভাষায় শিক্ষা দেয়া হবে এবং অন্য ভাষাগুলো বাধ্যতামূলক হিসেবে পড়ানো হবে। স্কুলে ৪০ জন এবং প্রতিষ্ঠানে ১০ জন ছাত্র হলে রাজ্যের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিক্ষা নিতে পারবে।

১৯৫৩ সালের শীতে ভারত সরকার সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন কমিটি গঠন করে। যদিও পাঞ্জাবের ইস্যু হওয়া সত্ত্বেও এতে কোনো শিখ অন্তর্ভুক্ত ছিল না।^৫ অনেক হিন্দু পাঞ্জাবকে মহাপাঞ্জাবে পরিণত করার বিরোধিতা করে। দুই বছর পর অবস্থাকে আর অস্থিতিশীল করা যাবে না এই বলে পাঞ্জাবি ভাষার আলাদা প্রদেশের চিন্তা ত্যাগ করা হয়।^৬

মাস্টার তারা সিং একে শিখদের অপমানের আরেকটি ধাপ বলে উল্লেখ করেন।^৭ যদি পাঞ্জাবে কোনো শিখ না থাকত তবে তাকে আলাদা রাজ্য হিসেবে প্রকাশ করা হতো, কিন্তু তা না করে শিখদের সাথে বৈষম্য করা হয়েছে। তিনি বিদ্রোহের হুমকি দেন। আর্থ সমাজ-জান সংঘ হিন্দি বাঁচাও আন্দোলন শুরু করে। হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে দাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।^৮

সরকার শিখদের পৃথক রাষ্ট্র দাবিকে অপ্রিয় সত্য বলে মেনে নেয়। পিইপিএসইউ এর কেন্দ্রে পরিণত হয়। পিইপিএসইউ এবং পাঞ্জাবকে একত্রে একটি প্রদেশে রূপ দেয়ার চিন্তা করা হয়। এখানে হিন্দু থাকবে শতকরা ৬৫ ভাগ এবং শিখ ৩৫ ভাগ। আকালিরা বিশ্বাস করত এটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের এক ধাপ।^৯ তারা কংগ্রেস-এ যোগ দেয়। সত্য কয়দিন পর তাদের সামনে উন্মোচিত হয়। পিইপিএসইউ-এর বিলোপ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

একত্রিত থাকার বদলে শিখ নেতারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাঞ্জাবি সুবা গঠনে মাস্টার তারা সিং-এর সমর্থক ছিলেন জ্ঞানী কর্তার সিং এবং হুকুম সিং। তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। দু'জনেই কংগ্রেসে যোগ দেয়। একজন পরে মন্ত্রী এবং অন্যজন লোকসভার স্পীকার হন। আকালিদের বিরোধিতা করার জন্য প্রতাপ সিং কায়রনকে পেয়ে তারা অত্যন্ত খুশি হয়।

পাঞ্জাবি সুবার জন্য মাস্টার তারা সিং একাই চেষ্টা করে যান। শিখ নির্বাচন তাদের সমর্থন জানায়। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।^{১০} তিন বছর পরে মাস্টার তারা সিং ১৪০ থেকে ১৩৬ আসনে জয়লাভ করে পাঞ্জাবি সুবার প্রতি শিখ সমর্থন প্রমাণ করে।

৫. এর সদস্যা ছিল এস ফজল আলী, এইচ এন কুণ্ডু এবং কে এম পানিক্কর।

৬. স্টেটস রিঅরগানাইজেশন কমিশন রিপোর্ট।

৭. দ্য স্পোকসম্যান ১৯ অক্টোবর ১৯৫৫।

৮. পাঞ্জাব সরকার প্রোগান দেয়া নিষিদ্ধ করে। আকালিরা একে সামাজিক অধিকার বিঘ্নিত হয়েছে বলে জানায়। ১২,০০০ এর উপর গ্রেপ্তার হয়।

৯. আঞ্চলিক ফর্মুলা পাঞ্জাব আইন পরিষদকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। পাঞ্জাবভাষী এলাকা থেকে নির্বাচিত এবং হিন্দীভাষী এলাকা থেকে নির্বাচিত। পিইপিএস-এর অবলুপ্তি পাঞ্জাবিরা বিজয় হিসেবে নিয়েছিল সাচার-প্রতি জেলা এবং অঞ্চলের ভাষা হবে। পাঞ্জাবে দুটি ভাষা পাঞ্জাব এবং হিন্দিকেই প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি করা হয়।

১০. আকালিরা সংসদে ১৯টি আসন পায়। শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তারা লাভ করে। পিইপিএসইউ-এর মুখ্যমন্ত্রী বিশ ভান আকালি দল-এর নেতা সন্ত হরচরণ সিং লাংওয়াল এর কাছে হারেন।

‘এখন নইলে কখনোই না’ এই শ্লোগান নিয়ে মাস্টার তারা সিং এগিয়ে চলেন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আগেই সরকার মাস্টার তারা সিংসহ নেতাদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। পাঞ্জাবি সুবার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য মাস্টার সন্ত ফাতেহ সিংকে নিয়োগ দেন। তিনি এই আন্দোলন বৃহৎ পর্যায়ে নিয়ে যান। এই আন্দোলনে ৫৭,০০০ লোক (সরকারি হিসেবে ২৩,০০০) লোক কারাবন্দি হয়। যখন ফাতেহ সিং আমৃত্যু অনশন করেন তখন সরকারের টনক নড়ে। সরকারি আশ্বাস পাওয়ার পর অনশন এবং আন্দোলন সমাপ্ত হয়।^{১১}

সরকারের সাথে আলোচনা কোনো ফল বয়ে আনে না। শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ নেহরু স্বীকার করেনি। সুবা না হওয়া পর্যন্ত তারা সিং আমৃত্যু অনশনের ঘোষণা দেন। স্বর্ণমন্দিরে তারা সিং ১৫ আগস্ট ১৯৬১-এ অনশন শুরু করেন।^{১২} ৪৩ দিন খাদ্যশূন্য থাকার পর বৃদ্ধ লোকটি ভেঙে পড়েন এবং নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন।

মাস্টার তারা সিং নিজের জীবন বাঁচালেও রাজনৈতিক জীবন নষ্ট হয়ে যায়। তিনি শপথ ভঙ্গের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন।^{১৩} তার সম্প্রদায় তাকে ক্ষমতা করেনি। কয়েকদিন পর এসজিপিসি এবং আকালি দল তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। সন্ত ফাতেহ সিং শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

সরকার শিখ রাষ্ট্রের সমর্থকদের উপর চাপ প্রয়োগ শুরু করে।^{১৪} এস আর দাস-এর নেতৃত্বে একটি দল পাঞ্জাবি শিখ দাবি শোনার জন্য নিযুক্ত হন।^{১৫} দাস কমিশন-এর সাথে অসহযোগিতা করে সাম্প্রদায়িক চরম ভুল করে।^{১৬}

১১. মাস্টার তারা সিং স্বীকার করেন শিখ ধর্মকে সমুন্নত রাখা মানে শিখদের উন্নতি। ভাষা তার পরে আসে। পাঞ্জাবিকে ভারতের ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার পর কি শিখদের পরিবর্তন হবে? শিখ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাদের অবস্থার উন্নতি করবে বলে তিনি দাবি করেন। এই অবস্থায় তারা সিং এবং ফাতেহ সিং-এর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন, ‘ফাতেহ সিং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, রাজনীতিবিদ নন।’ *দ্য স্পোকসম্যান*, ১৬ জানুয়ারি ১৯৬১।
১২. নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তারা সিং বক্তব্য দেন, যদি আমরা সমস্যার সম্মুখীন হই তা হলে তিনবাক্যে অবস্থা বর্ণনা করা যাবে। ১. মানুষকে মুক্তির স্বাদ দেয়ার জন্য রাষ্ট্র গঠিত হবে। একটি রাষ্ট্রে একটি ভাষা থাকবে। ২. এইসকল নীতিমালা পাঞ্জাবসহ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও থাকবে। ৩. পাঞ্জাবি ভাষী এলাকাকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয়া হচ্ছে না, কারণ হিন্দুরা তা চায় না।
১৩. তারা সিং আকৃতি জানায়, ‘যদি আমি ভুল করে থাকি আমাকে ঠিক করে দাও, ঠিক করলে আমার সাথে চল, আর অন্যায় করলে শাস্তি দাও।’ *দ্য স্পোকসম্যান*, ৬ নভেম্বর ১৯৬১।
১৪. পাঞ্জাব সংসদে মুখ্যমন্ত্রী কাওরন শিখ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলতে বাধ্য হন। সুবা পরিকল্পনাকারী, আর হুকুম সিং তার ভুল স্বীকার করে বলে, ‘যদি আসলেই কোনো খলনায়ক থাকে তবে তা আমি। যদি কাউকে শাস্তি দিতে হয় তবে তা আমি।’ *দ্য স্পোকসম্যান*, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬১।
১৫. কমিশনের সদস্যরা ছিলেন এসআর দাস, সিপি রামস্বামী আইয়ার, এমসি চাগলা, (আমেরিকায় ভারতীয় দূত, লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনার এবং পরে শিক্ষামন্ত্রী)।
১৬. সরকারের পক্ষে পাঁচজন লোক প্রমাণ দেয়। রাজিন্দার সিং ভাটিয়া কণ্ঠী একতার সম্পাদক এবং ড. গোপাল সিং জারদি ফিন লিবারেটর-এর সম্পাদক দাস কমিশনের পূর্বে শিখরা কী কী

১৯৬২ সালের নির্বাচন পরিস্থিতির কোনো উন্নতি করে না।^{১৭} অধিকাংশ জায়গাতেই কংগ্রেস জয়লাভ করে। আকালিরা শিখ ভোটারদের সমর্থন পায়। আকালিরা সুবার জন্য অন্য কোনো আন্দোলনে নামার আগেই চাইনিজরা আক্রমণ করে।^{১৮} শিখরা সকল কিছু ভুলে দেশ রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৬৪-এর ২৭ মে মৃত্যুর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু শিখদের প্রতি আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। পাঞ্জাবিকে পাঞ্জাবের একমাত্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা দেয়ার জন্য প্রতাপ সিং কায়রনকে নির্দেশ দিলেন।^{১৯} কায়রন সেইসময় খুবই খারাপ অবস্থানে ছিলেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়। তার মনে হয় আকালিদের প্রতি কোনো বক্তব্য তাকে দুর্বলতর করবে। কায়রন নেহরুকে জানান সুবা গঠনে শিখ নয় বরং আকালি সমর্থনই প্রধান।

লান বাহাদুর শাস্ত্রী এবং তার স্বরাস্ট্রমন্ত্রী গুলজারি লান নদী না বলা কথা চালিয়ে যান। প্রতাপ সিং-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণিত হলে অবস্থার পরিবর্তন হয়ে। স্মরণ সিং-এর পরামর্শে পররাস্ট্রমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী রামকিষণকে^{২০} মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন।

সন্ত ফতেহ সিং সুবা আন্দোলনে নতুন উদ্যম খুঁজে পায়। পাকিস্তানী শিখদের নিজের মাতৃভূমির পক্ষে সমর্থন জানিয়ে রেডিও পাকিস্তানে নিয়মিত প্রচারণা চালানো হয়। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার অস্থিরতা বাড়তে থাকে, যুদ্ধ শুরু হয়। ১ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সালে জম্মু-কাশ্মীরে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে। পঁচদিন পরে ভারতীয় আর্মি লাহোরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

আকালি পরিস্থিতি খারাপ না করে সরকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে। আবারও শিখ কৃষকেরা তরবারি হাতে, খাদ্য বহন করে, যুদ্ধে সাহায্য করে। অনেক অফিসারের মধ্যে এই ২২ দিনের যুদ্ধে সবচেয়ে অসাধারণ ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাক্বাক্স সিং। ভারতের সকল অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ ছিল পাঞ্জাবি সৈন্যদের। তাদের মধ্যে রাজস্থানের গঙ্গানগরে শিখ অধ্যুষিত কৃষকদের অবদান সবচেয়ে বেশি। এভাবে শিখবিরোধী কথা বন্ধ হয়ে যায়।

অধিকার ভোগ করছে তা তালিকাভুক্ত করা হয়। রাজ্য সভার জন্য দারদি তালিকাভুক্ত হয়। বুলগেরিয়া ও ক্যাটরবিয়ানে তারা দূত পাঠায়। স্বর্ণমন্দিরে আর্মির কাজের একমাত্র শিখ সমর্থক তিনি। গোয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর হিসেবেও নিয়োগ পান। শিখ কতগুলো বইয়ের লেখকও তিনি। গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করেন।

১৭. পাঞ্জাবে আকালিরা ১৯টি আসন দখল করে, লোকসভার ৩টি। মুখ্যমন্ত্রী কায়রন মাত্র ৩৪টি আসনের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

১৮. পাঞ্জাবিদের কৃতকার্য সমস্ত ভারতের অবদানের থেকে বেশি। রাজস্থানের গঙ্গানগরে শিখ শরণার্থীরা অবস্থান নেয়।

১৯. পিসি জোসি, পাঞ্জাবি সুবা-এসিমপোজিয়াম, পৃ-৬৯।

২০. রামকিষণ জাং থেকে আসে। ১৯৫২ সালে পাঞ্জাব আইন পরিষদে তিনি নির্বাচিত হন এবং ১৯৬২ সালে মন্ত্রী হন। ১৯৬৪-এর জুলাই থেকে ১৯৬৫-এর জুলাই পর্যন্ত পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হন।

শত্রুতা বন্ধ হলে পাঞ্জাব সুবা গঠনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়।^{২১} ভাষার উপর ভিত্তি করে পুনরায় সীমানা নির্ধারণের পক্ষে একটি রিপোর্ট করে। ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬-এ লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর হঠাৎ মৃত্যু কেন্দ্রীয় সরকারের পাঞ্জাবি সুবার প্রতি শত্রুতা বন্ধ করে দেয়। ইন্দিরা গান্ধী, শাস্ত্রীর সফল প্রধানমন্ত্রী আবিষ্কার করেন তার দল এই সংক্রান্ত আলোচনা বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে। ১০ মার্চ ১৯৬৬ সালে কংগ্রেস-এর কার্যকরী কমিটি ঘোষণা করে। পাঞ্জাবের বর্তমান পরিস্থিতিতে পাঞ্জাবি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনই ঠিক হবে। সরকারকে এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করা হয়।

এই বিলের বিপক্ষে শক্তিশালী বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু কামরজ কংগ্রেসের সভাপতি মিসেস গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করার পর তার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা চলে আসে।^{২২} অন্যান্য রাজ্যে ভোগকৃত সুবিধাগুলো পাঞ্জাবিরা কেন ভোগ করবে না? প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই বি চ্যাভান শিখদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শত্রুতাকে সমর্থন করে। তিনি বলেন, ‘ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য পাঞ্জাবের পৃথক রাজ্য গঠনে দেরি হবে।’^{২৩} প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ‘কার্যকরী কমিটি প্রস্তাবটি পাস করেছে এবং এখন আমাদের কাজ করতে হবে।’^{২৪}

সকল রাজনৈতিক দলের ভারত জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থনই ভারতীয় জন সংঘ কে বাঁচিয়ে দেয়।^{২৫} জ্ঞান সংঘ সেই সময় পাঞ্জাবি হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রেসিডেন্ট প্রার্থী অধ্যাপক বলরাজ মাধোক এবং পাঞ্জাব প্রদেশের সভাপতি ড. বলদেব সিং সুবার বিরোধিতা করেন। দল বিভিন্ন বক্তৃতায় আয়োজন করে। বিভিন্ন জায়গা বিশেষ করে পানিপটে লুটতরাজ ও হত্যা হুঁচিল। তারপরও সুবাবিরোধী আন্দোলন স্থগিত ছিল কারণ শুধু শিখ নয়, হিন্দিভাষী জনগণও একে সমর্থন করে। শুধু পাঞ্জাবি হিন্দুরাই এসকল কিছু থেকে দূরে ছিল। হঠাৎ করে তারা আবিষ্কার করে নিজেদের মাতৃভাষাকে অবমাননা করে তারা নিজেদের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। হিন্দিভাষী এলাকায় তারা আজব হিসেবে গণ্য হবে।

সকল কিছু আবার পর্যালোচনার জন্য বিচারপতি জে.সি. শাহ, এস. দত্ত এবং এমএস ফিলিপকে ২৩ এপ্রিল ১৯৬৬ সালে নিয়োগ দেয়া হয়। পাঞ্জাবি সুবাকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার শর্ত দেয়া হয়। নিজেদের মাতৃভাষা সম্পর্কে

২১. পাঞ্জাবি এবং শিখদের সাথে আলোচনায় মিসেস গান্ধী রাষ্ট্র প্রধান-এর চেয়ে রাজনীতিবিদদের মতো বেশি ব্যবহার করেন। প্রথমেই তিনি চণ্ডিগড় থেকে রাজধানী সরিয়ে নেন। ১১ এপ্রিল ১৯৮৩-তে প্রকাশিত দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এ হকুম সিং মৃত্যুর পূর্বে এ সকল কথা লিখেন।

২২. পূর্ব উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজি এই দাবিকে সাম্প্রদায়িক বলে দাবি করেন। উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পাটনায়ক এবং ড. রাম সুবহাস সিং তাকে সমর্থন জানান। পি.সি. জোশী, পাঞ্জাবি সুবা, এ-সিম্পোজিয়াম, পৃ-৮২।

২৩. দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, নয়াদিল্লি, ১০ মার্চ ১৯৫৬।

২৪. পূর্ববর্তী।

২৫. পি.সি. জোশী, পাঞ্জাবি সুবা-এ সিম্পোজিয়াম, পৃ-৮৬।

সিদ্ধান্ত নিতে পাঞ্জাবি হিন্দুদের উপর পুনরায় পরিসংখ্যান নেবার নির্দেশ দেয়া হয়।^{২৬} অন্যক্ষেত্রে গ্রামগুলো আগের মতোই একটি একক হিসেবে বিবেচিত হবে। খারারে অবস্থিত চণ্ডিগড় ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যা। এস দত্ত ঘোষণা করেন পাঞ্জাবের সাথে শহরগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই বিচারপতি জে.সি. শাহ এবং ফিলিপ চণ্ডিগড় এবং হরিয়ানা সম্পর্কে কিছু বলেননি। শহরকে উভয় রাজ্যের অংশ বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে। পাঞ্জাবি সুবায় কোনো রাজধানী ছিল না। জালান্দার, হুশিয়ারপুর, লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, অমৃতসর, পটিয়ালা, ভাটিনদা, কাপুরথাল্লা এবং গুরুদাসপুর, আম্বালা, সাংরুর এর কিছু অংশ নিয়ে পাঞ্জাব সুবা গঠিত হয়।

হরিয়ানায় ১৬,৮৩৫ বর্গমাইলের এলাকায় ৭৫.২৭ লাখ লোক বাস করে। তাদের মধ্যে ৫ শতাংশ শিখ। হিমাচল-এ ১০,২১৫ বর্গমাইলে ১১.৯৬ লাখ লোক বাস করে যাদের মাঝে ২ ভাগ শিখ।

ভাষাভিত্তিক আন্দোলন সফল না হলেও পাঞ্জাবি সুবায় প্রায় ৮০ ভাগ শিখ বাস করে। এছাড়া দিল্লিতে ৭ ভাগ জনগণ এবং ৩ লাখের উপর লোক শিখ।

সুবার আবারও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয় ছিল। হিন্দু এবং শিখদের মাঝে ঝগড়া না বেড়ে বরং সাম্প্রদায়িকতা কমে আসে। দুই দলেই নিজেকে পৃথক দেখতে পায়। স্বাধীন শিখ রাজ্যের আর কোনো নিশানা ছিল না। ‘পাঞ্জাবি সুবা আমাদের শেষ ইচ্ছা’ সন্ত ফতেহ সিং বলেন। তিনি বলেন, ‘মাস্টার তারা সিং এবং আকালিদের চাওয়া স্বাধীন রাষ্ট্র একটি ব্যবহারহীন ইচ্ছা ছিল।’^{২৭} একই সময় সুবাবিরোধী, শিখবিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতীয় জান সিং এর জনপ্রিয়তা হ হ করে নামতে থাকে। সুবাকে দ্বিভাষী রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দেয়ায় বাবা-মারা তাদের ইচ্ছামতো ভাষার স্কুলে বাচ্চাদের পাঠাতে পারে।

আবারও সীমানা নির্ধারণ করে রাষ্ট্রপতির শাসন নিশ্চিত করা হয়। গুরুমুখ সিং মুসাফির^{২৮} পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী রামকিষণ এর বদলে ভাগওয়াত দয়াল শর্মা এবং ড. পরমার হরিয়ানা ও হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রী হন। পাঞ্জাবকে ভাষার ভিত্তিতে ভাগ করা হলে অন্য রাজ্যগুলো কৃষি, শিল্পক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। পাঞ্জাবি সুবা আধুনিক কৃষি পদ্ধতির প্রচালন করে। তারা ফল এবং আলু অন্যপ্রদেশগুলোতে সরবরাহ করে।^{২৯}

২৬. ১৯৫৫ সালের প্রথমে স্টেট রাষ্ট্র পুনর্গঠন কমিটি বলে অনেক হিন্দুর মাতৃভাষা পাঞ্জাবি। বিগত পরিসংখ্যান নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৫১ সালের আদম শুমারির রিপোর্ট বিশেষ করে পাঞ্জাবের জন্য ভুল ছিল। ১৯৬১ সালে আদম শুমারিতে ভাষার দাবি আরও শক্তিশালী ছিল।

২৭. পিসি জোশী-পাঞ্জাবি সুবা-এ সিম্পোজিয়াম, পৃ-১২০।

২৮. গুরুমুখ সিং মুসাফির ক্যাম্পবেলপোর এর আধওয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ‘মুসাফির’ নামটি কবিতার ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৯৩০ সালে জাখের আকাল তাক্ত এবং ১৯৩১-এ এস.জি.পি.সি-এর সম্পাদক ছিলেন। ‘ভারত ছাড়’ (১৯৪২-৫) আন্দোলনের সময় তিনি কারাবন্দি হন। তিনি পাঞ্জাব আইন পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫২ সাল থেকে পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস-এর সভাপতি। ১৯৫৭ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হন এবং পরে রাজ্যসভায়।

২৯. ১৯৭১-২ সালে পাঞ্জাবিদের আয় ছিল প্রায় ৯৯৫ টাকা (ভারতের গড় আয় থেকে প্রায় ৬৪৫ টাকা) এরপর হরিয়ান ৮২৯ টাকা। সবচেয়ে দরিদ্র হিমাচল ৫৬৩ টাকা মাথাপিছু।

১৯৬৭ সালে সাধারণ নির্বাচন হয়। ১০৪টি আসনের মধ্যে আকালি, জন সংঘ এবং কমিউনিস্টদের দিয়ে গঠিত ইউনাইটেড ফ্রন্ট ৫৩টি আসন পায়। কংগ্রেস পায় ৪৩টি আসন। মুখ্যমন্ত্রী মুসাফির একজন নতুন কমিউনিস্ট সত্যপাল দং-এর কাছে পরাজিত হন।^{৩০}

যুক্তফ্রন্ট গুরনাম^{৩১} সিংকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে। তার সহকর্মীরা ছিলেন জন সংঘের ড. বলদেব প্রকাশ, লছমন সিং গিল এবং সত্যপাল দং।

এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্য হাসিলের পর কি করবে তা আকালিরা জানত না। ভাষাভিত্তিক সীমানা নির্ধারণ এবং চণ্ডিগড়কে পাঞ্জাবে ফিরিয়ে আনার প্রশ্নে বিভেদ দেখা যায়। এটা আর গোপন ছিল না যে মাস্টার তারা সিং ভাষাকে শুধুমাত্র শিখদের পৃথক রাজ্য পেতে ব্যবহার করেন। সবকিছু খুলে বলতেও তিনি দ্বিধা করেননি। খুবই ছোট্ট একটি দল হলেও স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র স্থাপনে আগ্রহী ছিল।^{৩২}

পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদদের কাছে অন্য যেকোনো বিষয়ের থেকে ব্যক্তিগত বিষয়ই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ধোঁকা ও সুবিধাবাদীতার আরেকটা প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায় পার্টিবাজি। প্রথমে কংগ্রেস নেতা জ্ঞান সিং লছমন সিংকে হারিয়ে সুরনাম সিং-এর মন্ত্রণালয় দখল করে নিজে কার্যালয় বানান। প্রথমে তিনি এজিপিএসি এর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি সন্ত দলকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং ফতেহ সিং-এর ডান হাত চামান সিংকে গ্রেপ্তার করেন। একই সময় প্রশাসনিক ভাষা আইন পাস হয়। এর ফলে পাঞ্জাবি একমাত্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পাঞ্জাবের মহারাজা রনজিত সিং যা করতে পারেনি গিল তা করেছেন বলে অহংকারে ফুলে ওঠেন।

গিল-এর এই অফিস দখল নিয়ে পাঞ্জাবের সংসদে ভীষণ সমালোচনা হয়। তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। পাঞ্জাব রাষ্ট্র প্রধানের নেতৃত্বের অধীনে আসে।

পরবর্তী সাড়ে পাঁচ মাস ধরে গভর্নর ডিসি পাভেট দুইজন উপদেষ্টার সহযোগিতায় রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ধীরে ধীরে পাঞ্জাবি দলগুলোর মধ্যে ফাটল চোখে পড়ে। রারওয়ালাকে প্রদেশের সভাপতি জ্ঞানী জেইল সিং চ্যালেঞ্জ করেন। রারওয়ালার কংগ্রেস ত্যাগ করে আকালিতে যোগ দেন। ১৯৬৯-এর নির্বাচনে সন্ত আকালি একমাত্র দল হিসেবে আইন পরিষদে আসে।^{৩৩} ১০৪ আসনের মধ্যে

৩০. সত্যপাল দং লায়ালপুরের গোজরা গ্রামে ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। গুরনাম সিং-এর মন্ত্রণালয়ে খাদ্যবিভাগে পদপ্রাপ্ত হন।

৩১. গুরনাম সিং লুধিয়ানার নারায়ণওয়াল-এ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে পাঞ্জাব হাইকোর্ট থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৩২. পরবর্তীতে ড. জগজিৎ সিং চৌহানের নেতৃত্বে একটি দল গড়ে ওঠে। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে তিনি জ্ঞানী কর্তার সিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করেন। আকালি পার্টিতে যোগদান করেন। সন্ত আকালি দাল-এর সম্পাদক হন।

৩৩. কয়েকদিন পর গুরনাম সিং কংগ্রেস এবং এমএলএ হয়ে জয়লাভ করেন।

আকালিরা ৪৩, কংগ্রেস ৩৮, জন সংঘ ৮টি আসন পায়। বাকিগুলো কমিউনিস্ট, সমাজবাদী এবং স্বতন্ত্র দলগুলোতে চলে যায়। সুরনাম সিং আবার আকালিদের নেতা হয়ে সরকার গঠন করে।

গুরুনাম সিং ১০ পয়েন্টের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এতে ছিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, চণ্ডিগড় রক্ষা, নিচুবর্ণের অধিকার সংরক্ষণ এবং আরও অনেক। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল তাই ৪৭টি এলাকাতে নির্ধারিত নির্বাচন তিনি পিছিয়ে দেন। জালান্দারে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল বলে তিনি এটির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেন। দুর্নীতির অভিযোগে লক্ষণ সিং গিলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জনগণের মনে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তুলে তিনি কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের দুটি দলের মধ্যে বিরোধিতা দেখা দেয়। মিসেস গান্ধীকে সমর্থনের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। ভি.ভি. গিরি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

সন্ত ফতেহ সিং এবং মাস্টার তারা সিং-এর অনুসারীরা হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়। তারা সিং-এর অনুসারীরা দুর্নীতি ও ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ তোলে। সন্ত ফতেহ সিং-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। যখন এই আক্রমণ ও পালটা আক্রমণ চলছিল তখন কারাবন্দি স্বতন্ত্র পার্টির দর্শন সিং আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন এবং ২৭ অক্টোবর ১৯৬৯ সালে ২৭ অক্টোবরে ৭৪ দিনের অভুক্তির পর মারা যান। তার শেষকৃত্যনাষ্ঠানে বিশাল জনসংখ্যা গুরুনাম সিং এবং সন্ত ফতেহ সিং-এর বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়।

কয়েকদিনের জন্য গুরুনাম সিং সন্ত ফতেহ সিংকে সমর্থন করেন। হরিয়ানায় হিন্দু-শিখ অস্থিরতা বাড়ে। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা শিখদের বিরুদ্ধে রেগে ওঠে। গুরুনাম সিং এবং সকল আকালি সদস্যের পদত্যাগ দাবি করেন। গুরুনাম সিং দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানান, সন্ত ফতেহ সিং শিখ জনতাকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০-এ তিনি অনশন শুরু করেন। চণ্ডিগড় ফিরিয়ে দেয়া না হলে তিনি নিজের জীবন দেবেন।

মিসেস গান্ধী সামনে এগিয়ে আসেন। পাঞ্জাবের সাথে কি অবিচার করা হয়েছে তা জানতে চান। তিনি চণ্ডিগড় পাঞ্জাবকে ফিরিয়ে দেন।

১১৫ গ্রামের মধ্যে ৬০টি গ্রাম পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলত। কিন্তু তা হরিয়ানার মতো ছিল না। সমস্যা সমাধানে তিনি খান্দুখেরা গ্রামে পাঞ্জাব ও রাজ্যস্থানের মাঝ দিয়ে এক ফার্লং দৈর্ঘ্যের সীমারেখা টানেন। এভাবে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজনীতিতে তিনি ভিনদেশি জিনিস ঢোকান। শুধুমাত্র পাঞ্জাবে রাজধানী ছিল এবং তাদের করিডোর ভাগ করে নিতে হয়।

গুরমান সিং এবং ফতেহ সিং উভয়েই চণ্ডিগড়ের বিজয় দাবি করেন। তাদের সম্পর্ক ভাঙার উপক্রম হয়। ফতেহ সিং-এর অনুসারীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়ায় গুরমান সিং কংগ্রেস-এর কাছে সাহায্য চান। গুরমান সিং ২৫ মার্চ ১৯৭০-এ পদত্যাগ

করেন কারণ কংগ্রেস তাকে জামিন দিতে অস্বীকার করেন। দল থেকে বহিষ্কার করে আকালিরা তাকে আরও অপমান করে।

কংগ্রেসের প্রশাসনিক দায়িত্ব নেয়া আকালিদের হতাশ করে। প্রকাশ সিং বাদল ৫৪ জন আইনজ্ঞকে সংগ্রহ করে গভর্নর হাউসের সামনে রেখে প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দাবি জানায়।^{৩৪} ২৭ মার্চ ১৯৭০ অন্যান্য আকালি নেতাদের সাথে তিনি অফিসে শপথ গ্রহণ করেন।^{৩৫}

নতুন মুখ্যমন্ত্রী তার সমর্থক এবং অন্য সবাইকে খুশি রাখার প্রাণপণ চেষ্টা চালায় যখন তিনি ব্যর্থ হন তখন আইনের বদলে অর্ডিন্যান্স জারি করেন। গভর্নর পালন করতে অস্বীকৃতি জানায়।

১৯৭১ সালের মার্চে সংসদীয় নির্বাচন হয়। পাঞ্জাবের ১৩টি আসনের মধ্যে ১০টি কংগ্রেস পায়, কমিউনিস্ট ১টি এবং আকালিরা ১টি।

আবারও পাঞ্জাব রাষ্ট্রপ্রধানের শাসনাধীনে আসে। গভর্নর এবং তার উপদেষ্টারা রাষ্ট্রের আইন পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেয়। সমর্থন পেতে তারা জমিকর মওকুফ করে দেয়। এর ফলে প্রতি বছর ৩.৫ কোটি ক্ষতি হয়। সরকার ৫ একরের ক্ষম জমি অধিকারীদের সুবিধা দেয়। ছাত্রদের দ্বারা এবং কমিউনিস্ট দ্বারা ক্ষত কার্যাবলি নিষিদ্ধ করা হয়। হাশিস, আফিম, তরল এবং সোনা পরীক্ষা করা হয়।

অপরদিকে বাদল এবং তার আকালি সহকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। প্রধান বিচারপতি দুর্গা শংকর দেব নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সুরনাম সিং-এর বিরুদ্ধে তদন্ত করার দাবীও তোলা হয়।

এই সকল কিছু মध्ये ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার অস্থিরতা যুদ্ধে রূপ নেয়। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলার মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। পাকিস্তানীদের করা অপমান পাঞ্জাব মনে রেখেছিল। ফাজিলকা হুসাইনওয়ালা, দেরাবাবা নানক ও সাকারগড়-এ রক্তপাতসহ যুদ্ধ হয়। পাকিস্তানি ট্যাংক যাতে আসতে না পারে এজন্য লোহার ব্রিজ উড়িয়ে দেয়া হয়।

১৪ দিনের যুদ্ধ ভারতীয় জয়ে শেষ হয়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এর জন্য অভিনন্দন পান। তাকে ভারতরত্ন উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তার জনপ্রিয়তা চূড়ান্তে উঠে। দেশের অন্যান্য অংশ থেকে যুদ্ধ পরবর্তী পাঞ্জাব পৃথক ছিল না।

৩৪. প্রকাশ সিং বাদল ফিরোজপুরের আবুলখুরানা গ্রামের একজন ধনী জমিদার ছিলেন। তিনি আকালি দল-এর সদস্য ছিলেন এবং বহু বছর এসজিপিএস-এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৭ ও ১৯৬৯ সালে তিনি পাঞ্জাব সংসদের সদস্য ও মন্ত্রী হয়। তিনি তিনবার পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এবং লোকসভার সদস্য হন। আকালি বিদ্রোহের সময় কারাগারে বন্দি হন। কংগ্রেস সদস্য হিসেবে ১৯৫৭ সালে নির্বাচিত হন। সুবা বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য খেপ্তার হন।

৩৫. মাই ডেইজ এ্যাক্স গভর্নর বাই ডিসি প্যাভেট, পৃ-১৩৯।

শুধুমাত্র আকালি দল বিরোধী দল হিসেবে ভিন্ন ছিল। মাস্টার তারা সিং মৃত, সন্ত ফতেহ সিং ক্ষমতাচ্যুত। সরকারের বিরুদ্ধে শিখ উত্তেজনা কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১৫ আগস্ট ১৯৭২-এ তার সাথে আরও ৯০০০ আকালি কারাবন্দি হয়।

১৯৭২ সালের মার্চে সাধারণ নির্বাচন আকালিদের রাজনৈতিক অবস্থা পুরো শেষ করে দেয়। কংগ্রেস ৬৬টি, কমিউনিস্ট ১০, মার্কসিস্ট ১টি, স্বাধীন ৩টি আসন পায়। ১০৪টি আসনের মধ্যে আকালিরা ২৪টি আসন পায়। ১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ জ্ঞানী জেইল সিং মুখ্যমন্ত্রী হন^{৩৬}। জ্ঞানী জেইল সিং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ৫ বছর ছিলেন। তার উপর ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বাস ছিল এবং তিনি রাজ্য নিপুণভাবে পরিচালনা করতেন। শিখ রাজনীতিতে আকালি দলের আধিপত্য ভেঙে দেয়াই তার উদ্দেশ্য। তিনি বুঝতে পারেন যতদিন আকালিরা সেজিপিএস নিয়ন্ত্রণ করবে, চাঁদা তুলবে এবং গ্রন্থিদের নিয়োগ দেবে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল চালাবে ততদিন তাদের আধিপত্য থাকবে। এসজিপিএস থেকে আকালি আধিপত্য সরানোই তার উদ্দেশ্য। তিনি জনগণের কাছে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন একজন আকালি নেতা থেকে শিখধর্ম সম্পর্কে তিনি অনেক বেশি জানেন। অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি ভাবেন অপরিমেয় উন্নতির সাথে তারা শিখ ধর্মীয়বাদ শিখবে। এটা শিখ এবং অন্যান্য ধর্মের মধ্যের দূরত্ব দূর করবে। এভাবে পাঞ্জাব আরও উন্নতি থেকে রক্ষা পাবে।

৩৬. জ্ঞানী জেইল সিং ১৯১৬ সালে আন্ধ্রপ্রদেশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ফরিসকোটে প্রজামণ্ডল স্থাপন করেন। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য কারাবন্দি হন। তিনি পিইপিএসইউ সরকারের মন্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ও প্রধান ছিল। ১৯৫৬-৬২ সাল পর্যন্ত রাজ্য সভার সদস্য হন। ১৯৭০ সালে পাঞ্জাব সংসদে নির্বাচিত হন। ১৯৭২-৭ সালে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮০-২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রী এবং ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৯. সমৃদ্ধি ও ধর্মীয় মৌলবাদ

নীতির চাইতে আচারশাস্ত্রকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে ঐতিহ্যবাহী ধর্মে প্রত্যাবর্তন একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা, যা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার প্রভাবশালী বিষয়ের প্রকাশের উপর ভিন্ন হয়ে থাকে। খ্রিস্টধর্মের পুনর্জন্মলাভকারী খ্রিস্টানরা খ্রিস্টের উপদেশগুলোকে সৃষ্টিকর্তার বাণী হিসেবে বিশ্বাস করে। ইসলামের ওয়াহাববাদ এবং খোমেনবাদ কোরআন এবং হাদীসের আত্মিকভাবে চাইতে আক্ষরিক ভাবেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ভারতও ধর্মীয় মৌলবাদের পুনরুত্থান থেকে মুক্ত হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ (৮৫ শতাংশ) যারা এক বা অন্যান্য হিন্দুবাদে বিশ্বাসী তারা মনে করে যে, সময়ের স্রোতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতা পুনঃপ্রমাণিত হয়েছে। ভারতের নব শাসকেরা একে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্র (যা ভারতীয় পরিভাষায় বিধর্মিতা নয় বরং প্রত্যেক ধর্মকেই সমান সম্মান দান করা) হিসেবে তৈরি করতে চাইছেন যদিও তারা হিন্দুদের পুনঃজন্মে পুরোপুরি সমর্থন করেন। এ যেন অনেকটা বহু অস্ত্রধারী দুর্গার পাথুরে প্রতিমূর্তির প্রতিটি হাত প্রাণচঞ্চল ও পরিচালিত করার মতন। সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং প্রাচীন পুস্তকের গবেষণা হয়; প্রাচীরিণী সভা (নীতিপ্রচার সংস্থা)-র মাধ্যমে বেদের দর্শনকে উচ্চ প্রশংসা করে শহর ও নগরে পুনঃজাগরিত হয়; স্বামী, সন্ত, অবতার ও অন্যান্য ধর্মপ্রচারকদের তাদের আশ্রম থেকে হিন্দুবাদের আত্মিক বাণী জড়বাদী পশ্চিমাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। যোগব্যায়ামকে শুধু সর্বোত্তম শারীরিক পরিশ্রম নয় বরং সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পুনঃআবিষ্কার করা হয়। দেশীয় ঔষধ, আয়ুর্বেদ, এর পুনরুদ্ধার হয়; পুরাতন ধ্বংস-পড়া মন্দিরগুলো পুনঃনির্মাণ করা হয় এবং নতুন ভাষা তৈরি করা হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যম, সকল ভারতীয় রেডিও ও দূরদর্শন ভজন ও ধর্মীয় আলোচনা এবং হিন্দু পুরাণের কাহিনী নাটক হিসেবে প্রচারের জন্য একটি মূল্যবান সময় উৎসর্গ করে। যার নব উদ্যম বিভিন্ন আধা-সামরিক সংস্থা যেমন আরএসএস এবং শিবসেনার উৎপত্তি ঘটায়।

এই উন্নতি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম, খ্রিস্টান এবং শিখ সম্প্রদায়কে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কায় ফেলে। ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্ম যাদেরকে অভ্যন্তরীণ ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, বিদেশী স্বধর্মীদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অবস্থানে অদম্য থাকে। শিখরা একটি অসন্তোষজনক অবস্থায় পড়ে যায়। তারা মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশেরও

নিচে অত্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠতা লাভ করে। অধিকাংশ হিন্দু তাদেরকে হিন্দুবাদের একটি সংগ্রামশীল অংশ হিসেবে মনে করে যাদের শুধুমাত্র বাহ্যিকভাবে খালসার প্রতীক, পুরুষদের চুল ও দাড়ি না কামানো, দেখে পার্থক্য করা যায়। হিন্দুবাদ শিখবাদকে বা তাদের খালসার প্রকাশকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মনে করে করেনি। সমাজে ঘটে যাওয়া সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে যে আধুনিকায়ন ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়, তা থেকেই শিখদের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবির্ভাব হয়। তরুণ শিখদের একটি ক্রমবর্ধমান অংশ তাদের মনে বড় চুল-দাড়ির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন আনে এবং নিজেদের অতীতের পুরানিদর্শন ভেবে ঘৃণিত করে। অধিক শিক্ষিত ও স্বচ্ছলদের মাঝে এই স্বধর্মত্যাগী মনোভাব বিপদাশংকাপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত হয়। অনেকের কাছে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এটি হিন্দু গোষ্ঠীতে পুনঃশোষিত হবে এবং জৈন বা বৌদ্ধদের মতো হয়ে যাবে, যারা হিন্দুদের একটি অংশ যারা শিখবাদে বিশ্বাসী। এই উন্নতি গোঁড়া খালসাদের হৃদয়ে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে; এটি সেসব রাজনীতিবিদদের কাছেও মানানসই হয় না যাদের কাছে শিখবিচ্ছিন্নতা রাজনৈতিক অস্তিত্ব নিশ্চিত করে।

পাঞ্জাব বিভাগের পর এবং এর উপর একটি উপরাপর দৃষ্টিপাত করলে, এবং অর্ধেকেরও বেশি সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর জন্মস্থান থেকে প্রস্থানের পর শিখদের বিন্যাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কীভাবে বিচ্ছিন্নতার বীজ বপন এবং গোড়ামির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছে স্থানটি।

দেশভিত্তিক শিখ, যাদের মধ্যে অধিকাংশই জাট জোরিগর এবং নিম্নবর্ণের দিনমজুর, তাদের অভিবাসন পূর্ব পাঞ্জাবের সীমানা পর্যন্তই সীমিত ছিল, এই বাড়তি জনসংখ্যার স্থান হয়েছিল পার্শ্ববর্তী রাজস্থানের গঙ্গাধার জেলা এবং উত্তর প্রদেশের তেরাই অঞ্চলে। ব্যবসায়ী শিখ সম্প্রদায় তাদের হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বিদের মতোই শহর ও নগরে থেকে যায় তাদের ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য।

এই বিভক্তির জন্য দেশভিত্তিক সম্প্রদায়গুলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় একত্রিত হয় যদিও ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন এলাকায় ভাগ হয়ে যায় এবং ছড়িয়ে পড়ে। জাট শিখ, যারা অকৃষক সম্প্রদায়ে কখনোই সম্মানিত হয়নি, তারা নিজেদের অবহেলিত দ্বিতীয় শ্রেণীর শিখ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। প্রতাপ সিং কাইরন তাদেরকে প্রকাশ্যে 'ভাপা' (ভাই) বলে অভিহিত করে। এটি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও অরোরা বংশীয়দের জন্য একটি নিন্দাসূচক শব্দ। যদিও শিখদের দশ গুরু ছিলেন ক্ষত্রিয় যেমন বন্দ সিং বৈরাগী। পাঞ্জাবি শিখ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব চলে যায় দেশভিত্তিক ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর হাতে যারা বিভিন্ন জেলা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল তাদের চাইতে যারা আগে থেকেই সেখানে বসবাস করত তাদের হাতে। এর ফলে মাজা এবং দোবাদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে এবং লুধিয়ানা, পাতিয়ালা, ফরিদকোট এবং ফিরোজপুরে মওলা শিখদের উন্নতি ঘটেতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী শিখ নেতারা ছিলেন মওলা জাট-এর। আকালি দল এবং এসজিপিসি রাও তাদের অধীনে ছিল। শহুরে শিখ সম্প্রদায়রা ছিল সীমাবদ্ধ। তাদের সমন্বিত কার্যাবলী দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়।

সবুজ বিপ্লব

এই রাজনৈতিক কলহ-বিবাদে অলক্ষ্যে একটি বিপ্লব ঘটে যায়। এর উপকেন্দ্র ছিল লুধিয়ানার পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (পি.এ.ইউ) যা ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয়। এখানে নরওয়েয়ান এবং আমেরিকান কৃষি বিজ্ঞানী, নরম্যান বোরলগ^১ তার ভারতীয় বিজ্ঞানীদলকে নিয়ে উদ্ভাবন করেন মেক্সিকান গমের একটি ছোট প্রজাতি এবং একে কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দেন। এই নতুন বীজের সাথেই আধুনিক কৃষিকাজের সূচনা হয় এবং ট্রাক্টর, মাড়াই যন্ত্র, ফসল কাটার যন্ত্র, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার হতে শুরু করে। পাঞ্জাবে আগে থেকেই খাল খনন করে সেচ কাজ হতো। সেখানে আরও ব্যাপক হারে টিউবওয়েল খনন হয় এবং এগুলো চালিত হতো ডিজেল অথবা ডাক্রা নাল্লার জলচালিত টার্বাইনের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুতের মাধ্যমে। পাঞ্জাবের এই কৃষি অগ্রগতি ১৯৬০ সালের মাঝামাঝিতে উৎকর্ষ সাধন করে। প্রতি একরে দ্বিগুণ এবং পরবর্তীতে তিনগুণ ফল লাভ হতে থাকে। গমের বাম্পার ফলনের পর তাইওয়ান থেকে আসা উন্নত ধানের বীজে ধানেরও বাম্পার ফলন হয়। একইভাবে আখ এবং তুলার উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। একে সবুজ বিপ্লব হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়। এতে মূলত শিখ কৃষকেরাই বেশি লাভবান হয়। কেননা, পাঞ্জাবের ৯০ শতাংশের বেশি জমি ছিল কৃষি জমি।

লুধিয়ানাকেই এই বিপ্লবের সূচনাক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এটি ছিল ইন্দো-গঙ্গা অঞ্চলের সবচাইতে উর্বর অঞ্চল। কেননা এখানে ছিল ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন এবং পুনরায় ভরাট করার সুবিধা। এই বিশাল কেন্দ্রীভূত অধিকার প্রতিষ্ঠা ১৯৬১ সালে সম্পন্ন হয়। যদিও এই ঘনবসতিপূর্ণ (৭৭৩ জন/বর্গমাইল) জনগোষ্ঠীর ৬৫ শতাংশেরও বেশি অংশ কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ছিল। শহরে হোসিয়ারী, সাইকেল, মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশ, কারখানার যন্ত্রাংশ ইত্যাদি উৎপাদন করে, যা ভারতীয় ক্ষুদ্র শিল্পের রাজধানী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। গ্রামাঞ্চলে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে শহরের শিল্পোন্নত এলাকা থেকে সুবিধা পেয়ে থাকে। জনসংখ্যার চাপ ছিল অপেক্ষাকৃত কম। কেননা কৃষকদের অর্ধেকেরও বেশি পরিমাণ ছিল কৃষি জমি এবং তাদের প্রত্যেকেরই ২০ একর জমি ছিল। আরও ৪৩ শতাংশের ছিল ১০-২০ একর জমি। শুধুমাত্র ২০ শতাংশের ছিল ১০ একরের চেয়ে কম বর্গাজমি। পাঞ্জাবের যেকোনো জেলার চাইতে লুধিয়ানায় শিক্ষার হার ছিল সবচেয়ে বেশি (৪২ শতাংশ) সবচেয়ে বড় কথা এই কৃষিগোষ্ঠী ছিল প্রায় পুরোপুরি শিখ এবং অগ্রসরগামী।

১. নরম্যান আর্নেস্ট বোরলগ (১৯১৪), ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটার মাইক্রো বায়োলজিস্ট, ১৪ বৎসর মেক্সিকোর ভূট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন এবং পরে লুধিয়ানায় আসেন। তিনি ১৯৭০ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।

১৯৬৫ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় লুথিয়ানাকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচি (আই.এ.এ.পি)'র জন্য নির্বাচিত করে। ফোর্ড ফাউন্ডেশন পূর্বেই সম্পূর্ণ অনুশীলনগুচ্ছ তৈরি করেছিল— যার অন্তর্ভুক্ত ছিল সহজ ঋণ সুবিধা, রাসায়নিক সারের ব্যবহার, নতুন প্রজাতির বীজ, কীটনাশক, মূল্য উদ্দীপক এবং বিপণন সুবিধা। এ সবকিছুই আই.এ.এ.পি. লুথিয়ানায় চালু করে। এর ফল হলো উদারহস্ত যা কৃষি ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক গ্রাস থেকে মুক্ত করেছিল। বড় বড় জমিদাররা ছিল নলকূপ খনন, ট্রাক্টর কেনা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারত বেশি এবং তারা বেশি লাভবানও হতো। মধ্যম জমিদাররা খুব কমই লাভবান হতো। যাদের জমি ১০ একরের চেয়ে কম ছিল তাদের জন্য কৃষিকাজ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। সবুজ বিপ্লবের প্রথমদিকে মজুররা জমিদারদের কাছ থেকে বেশি মজুরি আদায় করত। দুই শতকের অধিক সময় ধরে বিদ্যমান ঐতিহ্য ছিল কৃষকেরা উৎপাদিত ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত বিশ ভাগের একভাগ) পাবে, যা দরকষাকষি এবং নগদ টাকা হিসেবে শোধ করা হতো। যেহেতু কৃষিতে যান্ত্রিকতার সূচনা হয়, জমিদারগণ কৃষক বদল করতে শুরু করে। যুগ যুগ ধরে চলে আসা খরিদার-মক্কেল সমন্বয় ব্যাহত হয়। ধনী জমিদাররা আরও ধনী এবং প্রান্তিক চাষিরা আরও গরিব হতে শুরু করে। জমিহীনরা অসহায় হয়ে পড়ে। ধারণা করা হয় যেহেতু শ্রম যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় তাই ভূমিহীনরা ট্রাক্টর চালক এবং শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ পেতে শুরু করে। যদিও অধিকাংশ কৃষক নিজেরাই ট্রাক্টর চালানো এবং দেখাশোনা করত। ভূমিহীন বেকারদের সংখ্যা তাই বাড়তেই থাকে। এমনকি প্রাচীন লাভজনক কাজ যেমন গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন ধনীদের হাতে চলে যায়। তাই সমৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রেণীবৈষম্যের বীজও বপন করা হয়।

১৯৬৯ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে, 'সাম্প্রতিক কৃষিবৈষম্যের কারণ ও প্রকৃতি'; বলা হয় ৮০ শতাংশ বিক্ষোভের সূচনা হয়েছিল ভূমি মালিকদের বিরুদ্ধে ভূমিহীনদের। সবুজ বিপ্লব নিয়ে গবেষণায় ফ্রাংকেল প্রমাণ করেন যে, অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে সাথে বাড়তে থাকা সামাজিক বিভেদ রাজনৈতিক সহিংসতায় রূপান্তরিত হতে থাকে। বিভিন্ন মৌলিক দল দেশে একটি শ্রেণীআন্দোলন ঘটানোর সূচনা করে।^২ লুথিয়ানাকে নির্দিষ্ট করে তিনি বলেন, 'যেখানে অধিকাংশ কৃষকের সামর্থ্য আছে ১৫-২০ একর বা তার বেশি জমির এবং তারা সঞ্চয় বা ঋণের মাধ্যমে মূলধন অতি অল্পই সেচ, খনন ও উন্নত যন্ত্রপাতিক্রমে ব্যয় করেছিল, তবুও প্রযুক্তির এই উপকারিতা অসমভাবে বণ্টিত হয়েছিল। ২০ শতাংশেরও কম সংখ্যক কৃষক, যাদের জমি ছিল ১০ একরেরও নিচে, তাদের চরম অর্থনৈতিক অবনতি ঘটেছিল। কারণ তারা যথেষ্ট পরিমাণ লগ্নি করতে পারেনি (বিশেষ করে ক্ষুদ্র সেচ শ্রমিকেরা) যা নতুন প্রযুক্তির লাভজনক ফল পাওয়ার জন্য দরকার ছিল।'^৩

২. ফ্রান্সিন আর. ফ্রাঙ্কেল- ভারতের সবুজ বিপ্লব : অর্থনৈতিক প্রাপ্তি এবং রাজনৈতিক ব্যয় প্রিন্সেটন এন.জি : প্রিন্সেটন ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৭১ পৃ-১০।

৩. ইবিদ, পৃ-১৯১-২।

সবুজ বিপ্লবের সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্য এবং পশ্চিমা দেশগুলোতে অভিবাসনের হার বাড়তে থাকে। সেই শতকে ক্ষুদ্র শিখ গোষ্ঠীগুলো কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকাতে চলে যায়। কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে সুবিধা পাওয়ায় হাজার হাজার শিখ ইংল্যান্ড, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায় এবং জাতীয়তা লাভ করে। বাকিরা যায় যুক্তরাষ্ট্রে। অধিকাংশ আরব দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যে কাজের সন্ধান পায়। তারা তাদের পরিবারে টাকা পাঠাত ঋণ পরিশোধের জন্য এবং তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাগ্যহীন প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জমি কিনে নতুন ঘরবাড়ি বানানোর জন্য। তারা তাদের সন্তানদের স্কুল-কলেজে পাঠাত। তাদের রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন এবং দর্শন ও শ্রবণযন্ত্র, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনারও ছিল। তাদের ছেলেরা মোটরসাইকেল চালাতে শিখেছিল। এই স্বচ্ছল কৃষকেরা ১৯৬০ এবং ১৯৭০ সালেও এমন ছিল না। উন্নত জীবনযাত্রার মানের সাথে সাথে তাদের ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষাও বাড়তে থাকে। এক কথায় বলা যায়, সবুজ বিপ্লব তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তোলে।

সবুজ বিপ্লবের আরেকটি দিক লক্ষ্যণীয়। জমির উৎপাদন ক্ষমতার চাইতেও এর দাম বেড়ে যায়। কৃষি সম্প্রদায়ের জমির মালিকানাই সামাজিক মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়। বৈদেশিক অর্থপ্রাপ্তি বা তাদের ঋণজুরি থেকে সঞ্চয় বা ট্যাক্সি ও ট্রাক চালিয়ে তা যা পেত, তার চেয়ে তারা অধিকার দিত অধিক জমি ক্রয়ের প্রতি। যেখানে প্রতি একর জমির দান এক লাখ রুপিও উপরে চলে যায়, সেখানে ব্যাংক বা ব্যবসায়িক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ছিল আরও অনেক বেশি। যে ক্ষুদ্রাংশ অবশিষ্ট ছিল তা প্রতিবেশী দেশের ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যয় হয়ে যেত। এভাবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি একটি ক্ষুদ্র পরিসরেই চাপা পড়ে যায়।

এর পাশাপাশি, কৃষকদের শিক্ষিত সন্তানেরা জমিতে কাজ করার চাইতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সহজ কাজ করাকেই বেশি গুরুত্ব দিতে থাকে। তারা সদ্য প্রাপ্ত সম্পদেই অটল থাকে। অধিক পরিশ্রমের জন্য স্বচ্ছল শিখদের কাছে হাজারে হাজারে উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে ফসল তোলার মৌসুমে পাঞ্জাবে আসতে থাকে। শিক্ষিত শিখদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। যেখানে স্বাধীনতার সময় মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ ছিল যা পরবর্তীতে পাঞ্জাবি সুবায় পরিণত হয়, ১৯৭০ সালে সেখানে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৫০টি কলেজ স্থাপিত হয়। প্রতিবছর প্রায় শত শত স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে।

উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির সাথে সাথে সমৃদ্ধির নানা মন্দ দিকের জন্ম হয়। মদ্য সেবন এবং মাদকদ্রব্য যেমন— আফিম, হাসিস এবং হেরোইন সেবন বৃদ্ধি পায়। তরুণ শিখরা নিজেদের দাড়ি কেটে আধুনিক হয়ে উঠে। ধর্মীয় নিষেধ সত্ত্বেও ধূমপান শুরু করে। বিদেশ ফেরত শিখদের মাধ্যমে আসা পর্নোগ্রাফিক ছবি ও বই ধর্মীয় শিক্ষার

বই-পুস্তকের স্থান দখল করে। গ্রাম্য গুরুদুয়ারা বা সমাবেশের চাইতে ভিডিও ক্যাসেট এবং সিনেমার দর্শক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সবুজ বিপ্লব এবং বিদেশী অর্থ প্রাপ্তির এই সুখময় দিন বেশি স্থায়ী হলো না। সমৃদ্ধির হেঁচকি এরপর এল অতিআতিশয্যের প্রবাহ। জমি থেকে আসা শস্য সর্বোচ্চ স্থিতি অবস্থায় চলে আসে। নতুন বীজ, উন্নত সার এবং ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহার করেও এর চাইতে বেশি শস্য উৎপাদন সম্ভব হয় না। প্রতি প্রজন্মে জমি পুত্র-কন্যাদের ভেতর বারবার ভাগ হতে থাকায় তারা অনর্থনৈতিক হতে থাকে এবং তাদের জমি ধনী চাষীদের কাছে বিক্রি করে দিতে হয়। অন্যান্য দেশে ভিসা এবং চাকরির অনুমতি সীমাবদ্ধ হওয়ায় বিদেশ থেকে আসা অর্থ কমতে শুরু করে। তরুণ শিখ, যারা স্কুল-কলেজ থেকে পাস করে বের হয় তাদের জন্য দেশে কর্মসংস্থান হয় না। তারা বিদেশেও যেতে পারে না এবং পাঞ্জাবে এমন শিল্প প্রতিষ্ঠান কমই ছিল যারা তাদের চাকরি দিতে পারে। ভূমিহীনদের সংখ্যা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।^৪ তারা একদিকে মার্কসবাদী অন্যদিকে ধর্মযাজকদের কথা শোনে। প্রথমদিকে মার্কসবাদের চাইতে ধর্মই ছিল উপরে কারণ তা নৈতিক ও আইনসম্মত হিসেবে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা ভিন্ন হয়ে যায়।

শিখ ধর্মীয় পুনরুত্থান ছিল সবুজ বিপ্লবের সমকালীন। যিসি এর পেছনে ছিলেন তিনি হলেন জ্ঞানী জাইল সিং। তার উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক এস.জি.পি.সি থেকে আকালি দলকে উচ্ছেদ করা এবং রাজনীতিতে এর গুরুত্ব কমিয়ে দেয়া। আকালিদের কাছে শিখবাদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ পুঞ্জীভূত ছিল। জাইল সিং, প্রধানমন্ত্রী (১৯৭২-৭) প্রমাণ করেন যে, যদিও তিনি কংগ্রেস পার্টির সদস্য ছিলেন যাদের মূলনীতি ছিল রাষ্ট্রনীতি থেকে মুক্ত থাকা তিনিও আকালির চাইতে শিখ হিসেবেই বেশি নিবেদিত ছিলেন। শিখদের অভিনুতা প্রমাণের জন্য ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে আন্দোলন শুরু হয় যখন গুরু গোবিন্দ সিং এবং গুরু নানকে তৃতীয়

৪ পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লুধিয়ানা থেকে ১৯৪৭ সালে একটি তথ্য প্রকাশ করে যার বিষয় ছিল ১৯৮৪-৫ সালে পাঞ্জাবের গ্রামীণ কর্মসংস্থান। এতে বলা হয় (১) ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালে শিক্ষিতদের ০৫.৫৫ শতাংশই ছিল বেকার। (২) চাকরি প্রত্যাশীদের ১৬.৭৪ শতাংশ শিক্ষিত লোক ৪ বৎসর এবং ৪০.৫০ শতাংশ লোক ২ বৎসর কর্মসংস্থানের জন্য ব্যয় করে। (৩) পাঞ্জাবি শ্রমিকরা গড়ে প্রতি বছর ৩২৩ দিন চাকরিরত ছিল। (৪) ঐচ্ছিক কাজ বছরে ৯৩ দিন সহজলভ্য ছিল। (৫) ৩৮ শতাংশ লোক প্রতিমাসে ২০০ ঘণ্টার কম সময় কাজ করত অর্থাৎ দিনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টার মতো।

এতে সিদ্ধান্তে আসা হয় যে, বেকারত্বের এই ভয়াবহ সমস্যা ১৫-৩০ বৎসরের বয়সীদের মধ্যে বেশি ছিল। শিক্ষিতের মধ্যেই সর্বোচ্চ নিম্নকর্মসংস্থান দেখা যায়। প্রায় ৫০ শতাংশ শিক্ষিত লোক প্রতিমাসে ২০০ ঘণ্টারও কম কাজ করত। ৮.৪৮ শতাংশ প্রায় বেকার ছিল কারণ সত্যিকার অর্থে তাদের চাকরি ছিল প্রতিদিন প্রায় ২ ঘণ্টা।

এবং চতুর্থ শতবার্ষিকী জাতীয় পর্যায়ে উদযাপিত হয়েছিল। জ্ঞানী এই আন্দোলনকে আরও উস্কে দেন। তিনি ১৯৭৩ সালে সিং সভা প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৯৭৫ সালে গুরু তেগ বাহাদুরের ৩০০তম শহীদ দিবস পালন করেন। এরপর মহারাজ রনজিত সিং-এর ২০০তম জন্মশতবার্ষিকী পালনের প্রস্তুতি চলে। জ্ঞানী জাইল সিং অমৃতসরে গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। গুরুদের নামে দেশে অনেক হাসপাতালও নামকরণ করা হয়। তিনি সারাদেশে কীর্তন দুর্বার আয়োজন করেন। সামাজিক অনুষ্ঠান গুরু হতো আরদাস দিয়ে (প্রার্থনা)। আনন্দপুর থেকে পাতিয়ালা সংযোগকারী ৪০০ কি.মি. রাস্তায় বহু ঐতিহাসিক গুরুদুয়ারার নামকরণ করা হয় গুরু গোবিন্দ সিং মর্গের নামে। ধারণা করা হয় গুরুর প্রজননক্ষম ঘোড়ার বংশধরদের রাস্তায় রাখা হয়। গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধাভরে ঘরে ফেরার সময় মিষ্টি নিয়ে যেতেন। গুরুর শহীদ পুত্রের নামে একটি নতুন শহরের নাম রাখা হয়, যার নাম শহীদ বাবা অজিত সিং নগর। আকালিরা যখন জ্ঞানী জাইল সিং-এর কাছ থেকে পরিশ্রম করে ক্ষমতা নিয়ে নেয় এবং জনতা পার্টির সাথে একযোগে সরকার গঠন করে তখনও তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি পবিত্র শিখ মানুষদের শ্রদ্ধা করতে গুরু করেন এবং তাদের প্রতি অত্যাচার অনুধাবন করেন।

জারনাইল সিং ভিন্দারওয়াল

সন্ত (সাধু)দের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক বিস্তৃত। মানুষ তাদের দেরা (ধর্মশালায়) আসত শুধু বৈষয়িক বিষয়ে শাস্ত্রনা ও উপদেশের জন্যই নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিষয়েও। অনেক সন্ত তাদের ধর্মভক্তির জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন। তাদের দেরা ভক্তদের মাধ্যমে ফুলেফেঁপে উঠেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে যে ব্যাপারটি পুনরায় মহত্ব লাভ করে তা হলো দামদামি টাকশাল। ১৯০৬ সালে টাকশালকে ভিন্দার গ্রামে (মোগা তেহসিলে) সরিয়ে নেওয়া হয় এবং যাজক ব্যক্তির ভিন্দারওয়াল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।^৫

সন্ত গুরুবচন সিংয়ের সময় ভিন্দার-এর টাকশাল সুখ্যাতি অর্জন করে। গুরুবচন সিং মারা যাবার পর তার দুই অনুসারী মোহন সিং এবং কর্তার সিংয়ের

৫. পাতিয়ালায় তালওয়াগি সাবোতে অবস্থিত দামদামা সাহিব হলো সেই স্থান যেখানে সর্বশেষ শিখ গুরু গোবিন্দ সিং কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিলেন (দম মানে বিশ্রাম, দ্বিতীয় শ্বাস গ্রহণ) এবং পবিত্র গ্রন্থের চূড়ান্ত সংশোধন সম্পন্ন করেছিলেন। এর প্রথম প্রধান ছিলেন বাবা দ্বীপ সিং যিনি হরিমন্দিরের একজন অপবিত্রকারীকে হত্যার দায়ে খুন হয়েছিলেন। তার দেহাবশেষ দক্ষিণাঞ্চলের স্বর্ণমূর্তি 'পরিকর্মে' সংরক্ষিত আছে।

সাফল্য লাভ করেন। মোহন সিং একজন আকালি মন্ত্রীর সমর্থন লাভ করেছিলেন এবং ভিন্দার টাকশালের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কর্তার সিং অমৃতসর সংলগ্ন চওক মেহতায় নিজস্ব টাকশাল স্থাপন করেন। ১৯৭১ সালে কর্তার সিং সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর উপাসকমণ্ডলীর সম্মতিতে জার্নাইল সিং নির্বাচিত হন, তিনি কর্তার সিংয়ের প্রিয়পাত্র ছিলেন। কর্তার সিংয়ের পুত্র অমুক সিংয়ের চাইতেও তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। মতপার্থক্য থাকলেও অমুক সিং জার্নাইল সিংয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহযোগী ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে সর্বভারতীয় শিখ ছাত্র ফেডারেশনের (এ.আই.এস.এস.এফ) প্রধান নির্বাচিত হন।

জার্নাইল সিং ভিন্দারওয়াল ১৯৪৭ সালে ফরিদকোট জেলার রোদে গ্রামে জনগ্রহণ করেন। তিনি তার পরিবারের আট সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তার বাবা জগীন্দর সিং একজন দরিদ্র ব্রারজাট কৃষক ছিলেন। শুধু দরিদ্র নয় ধর্মীয় ভক্তির কারণে সাত বছর বয়সী জার্নাইল সিংকে তার বাবা জগীন্দর সিং চওক মেহতার দামদামি টাকশালে প্রেরণ করেন। জার্নাইল সিং গ্রন্থ পাঠ করে খুব সামান্যই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং শিখ পুরাণ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এতে করে তিনি অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শিখ কৃষকদের বিভিন্ন ব্যাপার বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার বক্তব্যের সূচনা ছিল সরল এবং তিনি গুরু গোবিন্দ সিং প্রচলিত খালসা পথের ইতিহাস এবং আধুনিকায়নের খামুপি দিকগুলো আলোচনা করেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সবাইকে মদ্যপান ও মাদক নেওয়া, ধূমপান বন্ধ করতে বলেন এবং বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে বলেন (দাড়ি ও চুল না কেটে)। যারা তার কথায় সম্মত হয়েছিল তারা উপাসকমণ্ডলীর সাম্মান্য ধর্মীয়দীক্ষায় অভিসিদ্ধিত হয়েছিল (পুনঃঅভিসিদ্ধিত)। তিনি সেই সময় নারী ও শিশুদের শক্তিশালী সমর্থন লাভ করেছিলেন যারা ছিল তাদের মদ্যপ বা মাদকাসক্ত পিতা, স্বামী বা ভাইদের দ্বারা নির্যাতিত। ভিন্দারওয়ালের ‘অমৃত প্রচার’ (ধর্মদীক্ষার সুধা অর্জনের পরিকল্পনা) ছিল একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাফল্য। হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্ককে জনসম্মুখে পানীয়, তামাক ও মাদকদ্রব্য ত্যাগের জন্য শপথ করানো হয় এবং ধর্মদীক্ষা দেয়া হয়। নীলছবি প্রদর্শনাকারী ভিডিও ক্যাসেট এবং সিনেমা হলো গুরুদুয়ার কাছে হারিয়ে যায়। পূর্বে নিজেদের গাফিলতির কারণে যে অপব্যয় করেছিল তা তারা আবার সংগ্ৰহ করে। জমিতে দীর্ঘ সময় কাজ করে এবং অত্যধিক ফসল ফলাতে সক্ষম হয়। তারা জার্নাইল সিং-এর কাছে ছিল অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং তাদের কাছে তিনি পরিচিত হন বাবা সাধু জার্নাইল সিং খালসা ভিন্দারওয়াল হিসেবে।

শুধু একজন ধর্মোপদেষ্টা হিসেবেই নয় ভিন্দারওয়াল তার ব্যক্তি প্রকাশ করেন একজন সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবেও। যেসব কৃষকরা একদিন মামলা-মোকদ্দমা ও আইনজীবীদের পেছনে অর্থব্যয় করেছিল, তারাও তার কাছে সাহায্যের জন্য আসতে শুরু করে। কন্যার পিতা-মাতারা যারা যৌতুকের জন্য নিষ্পেষিত হচ্ছিল

তাদের প্রতিও তিনি দৃষ্টি দেন। তার অস্ত্রধারী অনুসারীদল তার আজ্ঞা পালিত হচ্ছিল কিনা তা পর্যবেক্ষণ করত। তাকে সবচেয়ে বেশি সাফল্য এনে দিয়েছিল যে ব্যাপারটি তা হলো অন্য ধর্মযাজক যেখানে শুধুমাত্র বর্ণহীন লোকদেরও দীক্ষা দিত তিনি সেখানে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের জন্য কাজ করেছেন এবং নিম্নবর্ণের শিখদের প্রতিও সমধর্মিতা প্রকাশ করেছেন।

ভিন্দারওয়ালের সুখ্যাতি বাড়তেই থাকে। তিনি ছিলেন লম্বা, সুঠামদেহী, দীর্ঘ নাক বিশিষ্ট এবং তার চোখ ছিল গভীর, সন্দেহপ্রবণ। তাঁর দাড়ি ছিল নাভি পর্যন্ত এবং তিনি বুকের চারপাশে বুলেট ভরা চামড়ার থলে (ব্যান্ডওলিওর) পরতেন এবং নিতম্বের পিস্তল রাখার খাপে পিস্তল রাখতেন। হাতে রূপালী দয়ার তীর বহন করতেন যা বহন করতেন গুরু গোবিন্দ সিং এবং মহারাজা রনজিৎ সিং। তিনি শিখদের অস্ত্রধারী হওয়ার পরামর্শ দেন যাতে সনাতন কিরপানের পাশাপাশি আধুনিক অস্ত্র যেমন পিস্তল, রিভলবার এবং রাইফেল ইত্যাদি স্থান পায় এবং পূর্বসূরীদের মতো ঘোড়ায় চড়ার পরিবর্তে মোটরসাইকেলে চড়ার পরামর্শ দেন।

তিনি মহান বক্তা ছিলেন না বটে, কিন্তু তার শুষ্ক ও রুক্ষ বক্তব্যগুলো পরিপূর্ণ ছিল হিন্দুদের প্রতি অসম্মানসূচক যেখানে তিনি তাদেরকে ধুতিওয়ালে (ধুতি পরিহিত), টুপিওয়ালে (টুপি পরিহিত) অভিহিত করেন। তিনি মিসেস গান্ধীকে ব্রাহ্মণী (ব্রাহ্মণ মহিলা) এবং পণ্ডিতা দি ধী (পণ্ডিতদের কন্যা) বলেন এবং শ্রোতাদের সম্মতি লাভ করেন। তিনি সাংবাদিকদের সমৃদ্ধ বক্তব্য দান করেন। তিনি তিক্তভাষী সাধু সৈনিকের কারিশমা অর্জন করেন।

শিখ মৌলবাদ, যার আলোকদিশারী ছিলেন ভিন্দারওয়ালে, এর সাথে অন্যান্য ধর্মীয় আন্দোলনের অনেক মিল ছিল। ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালের পাঞ্জাবের মতো যখন গ্রাম্য মূলহীন শিখ সম্প্রদায় তাদের অনাগত ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত ছিল তখন ভিন্দারওয়ালে ঘূর্ণি কবলিত সমুদ্রে বাতিঘরের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। বিশ্বাসের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকায় আলোর শক্তিশালী দ্যুতি ছড়িয়ে দেন। তিনি ঈশ্বরতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেননি। তিনি পরিষ্কার ভাষায় দৃঢ়ভাবে কর্তব্য এবং বর্জনীয় বিষয়গুলো নির্ধারণ করেন। তিনি পবিত্র গ্রন্থ থেকে সেসব বিষয়গুলো বেছে নেন যা তার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত এবং অন্যান্য বিষয়গুলো বর্জন করেন যা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ভালোভাবে বুঝেছিলেন ভালোবাসার চাইতে ঘৃণার আবেগপ্রবণতা বেশি। তাই তিনি ঘৃণিত বিষয়গুলোকে অধিকতর পরিষ্কার ও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন। ঘৃণিতদের তালিকায় সবচেয়ে উপরে ছিল স্বধর্মত্যাগীরা (পাটিত) যারা তাদের দাড়ি ও লম্বা চুল কেটে খালসা প্রথার প্রতি অসম্মান করেছিল, ধূমপান, মাদকদ্রব্য বা মদ্যপান করেছিল। অবশ্য এসব ধর্মত্যাগীরা ধর্মদীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের পাপমোচন করার সুযোগ পেয়েছিল। ঘৃণিতদের তালিকায় এর পরেই ছিল সন্ত নিরানকারিরা যারা শিখদের মধ্য থেকে

একটি বড় আকারের অনুসারী তৈরি করেছিল। তারা জীবিত মানুষকে গুরু হিসেবে বিশ্বাস করে গর্হিত পাপ করেছিল। শিখরা পবিত্র গ্রন্থ ‘গ্রন্থ সাহিব’কে দশ গুরুর জীবিত প্রতিমূর্তি হিসেবে বিশ্বাস করত। সন্ত নিরানকারীরা তাদের নিজেদের রচিত গ্রন্থ ‘যোগ পুরুষ’ এবং ‘অবতার বাণী’কে অতিরঞ্জিত করে তোলে। এজন্য তারা ছিল ক্ষমা বা পাপমোচনের অযোগ্য এবং দমনযোগ্য।

সবশেষে ছিল হিন্দুরা যারা শিখদের কাছাকাছি ছিল এবং তাদের অবদমিত করাও কঠিন ছিল। তাদের প্রতি আচরণ ছিল তাদেরকে মেয়েলি, বেসামরিক জাতি এবং আইনবিরোধী নিচু জাতের জনগ্রহণকারী হিসেবে গণ্য করা। দশম গুরু গোবিন্দ সিং বলেছিলেন। একজন শিখ সোয়া লাখ (১½ মিলিয়ন) এবং ফৌজ (একক সৈনিক)-এর সমান। তেমনি ভিন্দারওয়ালও বলেন, একজন শিখকে সহজেই পঁয়ত্রিশ জন হিন্দুর সমকক্ষ হিসেবে ধরা যায়।^৬

ভিন্দারওয়ালের কাছে আধুনিকতা ছিল পাপ। শিখদের অবশ্যই তাদের সৈনিক পূর্বপুরুষদের দেখানো সরলপথ অনুসরণ করা উচিত। তাদের খোলা দাড়ি, যা পেচিয়ে চিবুকের কাছে বাঁধা থাকবে এবং লম্বা শার্ট, যা হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে থাকে (কুচ্চা) পরা উচিত। এতে তাদেরকে পূর্বপুরুষদের মতো দেখাবে। তেমনি শিখ মহিলাদেরও হিন্দুদের মতো শাড়ি না পরে সালোয়ার কামিজ (টোলা পাজামা ও ছোট কুর্তা) পরা উচিত। এটি পাঞ্জাবি পোশাক শিখ মহিলাদের টিপ (কপালে ফোঁটা) দেয়া উচিত নয়। তার নতুন খালসা ছিল ঈশ্বরের ছায়ায় থাকা (সাবাত সুরাত গুর শিখ) এবং পৃথিবীর সব অনৈশ্বরিক বিষয়ে তার ছিল অভিশাপ। তার নতুন খালসা ছিল গুরুর শিষ্যদের মাধ্যমে তাদের অপমান করা। ঠিক যেমন পায়ের নিচে কীটপতঙ্গ পিষে মারার মতো। ভিন্দারওয়াল সরল মনের কৃষকদের জাগিয়ে তোলেন। রাজনীতিবিদদের পরেই ছিল ভিন্দারওয়ালের আকাশ ছোঁয়া জনপ্রিয়তা। তার ভেতর ঔদ্ধত্যের বীজ বপন শুরু হয় এবং তিনি তাঁর ঔদ্ধত্যের ও অবদমিত চরিত্রের মাধ্যমে আরও অজেয় হয়ে ওঠেন।

ভিন্দারওয়ালকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নগণ্য বলে বিচার করতেন জ্ঞানী জেইল সিং। তার দৃঢ় প্রতিদ্বন্দ্বী দরবারা সিং এবং তাদের পথ অনুসরণ করে মিসেস গান্ধীর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুত্র সখওয় গান্ধী। প্রকাশ সিং বাদল যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তাঁর আকালি জনতা সরকার জেইল সিং-এর উপর ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্ত করেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসেবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বিরুদ্ধে আনা বক্তব্যকে অবজ্ঞা করা, আকালি সরকারকে ক্ষমতা থেকে বহিষ্কার করা এবং এস.জি.পি.সি-এর বিরুদ্ধে আকালি দলের ক্ষোভ দূরীভূত করা। জেইল সিং

৬. ‘এ সমকক্ষতা ৩৫-এ উল্লিখিত হয়েছিল। কিন্তু ১০০-তে নয়। ৬৬ কোটি জনতাকে ভাগ করে প্রতি শিখ-এর জন্য ৩৫ জন হিন্দু ধরা হয়। তুমি দুর্বল এটা কীভাবে বল?’ লেখক কর্তৃক ধারণকৃত বক্তব্য যা দ্য হোয়াইট পেপার অন পাঞ্জাব এজিটেশন এ-ও প্রকাশিত হয়েছিল। পৃ-১৬৩।

এবং দরবারা সিং দুইজনই ভিন্দারওয়ালকে আমন্ত্রণ জানান এবং অমৃক সিংসহ তার সকল পদপ্রার্থীকে আকালিদের বিরুদ্ধে ১৯৭৯-এর নির্বাচনে পদপ্রার্থীতা বাতিল করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। চল্লিশ জন প্রার্থীর মধ্যে যাদের ভিন্দারওয়াল সরিয়ে নিয়েছিলেন তার মাত্র ৪ জন পরাজিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মযাজক হিসেবে ভিন্দারওয়ালের জনপ্রিয়তা শ্লাকলেও শিখ রাজনীতিতে তার প্রভাব খুব বেশি ছিল না। তিনি তাঁর রাজনৈতিক দক্ষতা কংগ্রেস এবং আকালি উভয় দলের মাধ্যমে ব্যাহত হয়েছিল। শক্তিশালী ক্ষমতা ব্যবহার করে উভয়ই ভিন্দারওয়ালকে তাদের দলে নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভিন্দারওয়াল তাদের কাছে পরাজিত হননি।^৭

১৩ এপ্রিল ১৯৭৪ পর্যন্ত পাঞ্জাবের বাইরে ভিন্দারওয়ালের নাম খুব কম মানুষই শুনেছিল। সেইদিন থেকে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (তিনি ছয় বছর পর ১৯৮৪ সালের জুনে মৃত্যুবরণ করেন) এমন দিন খুবই কম ছিল যেদিন তাঁর নাম জাতীয় পত্রিকার প্রথম পাতায় আসেনি। দলত্যাগী সন্ত নিরানকারীদের প্রতি তাঁর ছিল চরম অসন্তোষ^৮ এবং এরপর গুরু গোবিন্দের দীক্ষার প্রতি। তিনি সরকারের কাছে ‘যোগ পুনিস’ ও ‘অবতার বাণী’ ধর্মগ্রন্থ দুটি বাতিল করার জন্য মামলা করেন। কিন্তু জা কোনো কাজে আসেনি। ভিন্দারওয়াল নিজেই এসব গ্রন্থ বাতিলের দায়িত্ব নেই। তারা যখন ঘোষণা দেয় যে, পাঞ্জাবের নববর্ষ ১ বৈশাখে (১৩ এপ্রিল) অমৃতসরে তাদের বার্ষিক সম্মেলন করবে তখন ভিন্দারওয়াল তাতে বাঁধা দেন। বাদলের নেতৃত্বাধীন আকালি জনতা সরকার সন্ত নিরানকারী সমাবেশ বাতিলও করেনি। আবার ভিন্দারওয়ালের সমাবেশ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনো পূর্ব প্রস্তুতিও নেয়নি। আখন্দ কীর্তনী জ্যাঠা ও ভিন্দারওয়ালের অনুসারীদেরকে স্বর্ণমন্দির থেকে শহরের প্রধান বাজার হয়ে সন্ত নিরানকারী সমাবেশের দিকে একটি শোভাযাত্রা করার অনুমতি দেওয়া হয়। সন্ত নিরানকারীরা গোলযোগ সৃষ্টির জন্য প্রস্তুত ছিল। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে সতেরো জন নিহত হন। এর মধ্যে একজন ফৌজা সিংসহ আখন্দ কীর্তনীর বেশিরভাগ লোক ছিল। এসময় ভিন্দারওয়ালে স্বর্ণমন্দিরের পেছনে অবস্থান করছিলেন। ফৌজা সিং-

৭. কুলদ্বীপ নায়ারের মতে, মিসেস গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয় গান্ধী সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি জেইল সিংকে পরামর্শ দেন আকালি দমনের জন্য যে দু’জন সাধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তাদের মধ্যে একজন হল ভিন্দারওয়াল। অপরজন তেমন সক্রিয় নন। সঞ্জয় গান্ধীর বন্ধু কামাল মাখ, এম.পি. নায়ারকে বলেন, ‘আমরা তাকে (ভিন্দারওয়াল) অনেক টাকা দেব’ (ট্রোজেডি অফ পাঞ্জাব, পৃ-৩১)। ভিন্দারওয়ালও কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করতেন, যেমন গুরুদয়াল সিং ধিলন, আর.আই. ভাটিয়া এবং পাঞ্জাব পুলিশ কমিশনার-এর স্ত্রী মিসেস ভিন্দারকে তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় সমর্থন প্রদান করেন।

৮. এই বিভক্তি এসেছিল বুটা সিং-এর মাধ্যমে যিনি তার পূর্বসূরী থেকে আলাদা হয়ে নতুন দল গঠন করেন সন্ত নিরানকারী নামে। তিনি অনেকের সমর্থনও লাভ করেন। বুটা সিং অবতার সিংয়ের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেন। ১৯৬৩ সালে অবতার সিংয়ের মৃত্যুর পর তার পুত্র গুরুবচন সিং গুরু পদবি লাভ করেন। তাঁর হত্যার পর ১৯৮০ সালে তার পুত্র হরদেব সিং দল প্রধান হন। ১৯৭৮ সালের ১০ জুন আকাল তাক্ত থেকে সন্ত নিরানকারীদের বহিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এর বিধবা স্ত্রী অমরজিৎ কৌর ভিন্দারওয়ালকে কাপুরুষ হিসেবে দায়ী করেন। যাই হোক, তাঁর নাম পুলিশের কাছে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের তালিকায় ছিল। বিচারে বাবা গুরুবচন সিংসহ সকল সন্ত নিরানকারীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়, কেননা তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য কাজ করেছিল।

ভিন্দারওয়াল এই নৃশংসতার জন্য প্রকাশ্যে স্বেচ্ছায় দায় গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সালের ২৪ এপ্রিল বাবা গুরুবচন সিং এবং তাঁর দেহরক্ষীকে তাদের প্রধান কার্যালয়ে দিল্লিতে হত্যা করা হয়। হত্যাকারীরা পালিয়ে যায়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দপ্তর প্রথমে যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে বিশ জনের নাম ঘোষণা করা হয়। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভিন্দারওয়ালের অনুসারী। ভিন্দারওয়ালের হত্যার চক্রান্তকারী হিসেবে দায়ী করা হয়। জ্ঞানী জাইল সিং, তদানিন্তন সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভিন্দারওয়ালের সংযুক্ততা সূচক পুলিশী বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী দরবারা সিং ও ভিন্দারওয়ালকে এ ব্যাপারে দায়ী করার পক্ষপাতী ছিলেন না।^৯

এর এক বছর পর (৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮১) লাল জগত নারায়ণকেও গ্যাং ট্রাংক রোডে হত্যা করা হয়। তিনি ছিলেন হিন্দু সমাচার পত্রিকা এবং ভিন্দার থেকে প্রকাশিত 'নিউ যুগবাণী ইন গুরুমুখী'র মালিক। পাঞ্জাবের কংগ্রেস পার্টির সভাপতি হিসেবে তিনি পাঞ্জাবি হিন্দুদের মাতৃভাষা হিসেবে হিন্দীকে বেছে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সন্ত নিরানকারীদের সমর্থন করে লেখেন এবং ভিন্দারওয়ালকে সমর্থন করার জন্য আকালি এবং কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করেন। সন্দেহভাজনদের মধ্যে ভিন্দারওয়ালের নাম প্রথমে ঘোষণা করা হয়। তাঁকে গ্রেফতারের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী দরবারা সিং অল ইন্ডিয়া রেডিওতে তাঁর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার ঘোষণা দেন। সে সময় ভিন্দারওয়াল হরিয়ানার চাঁন কালান গ্রামে অবস্থান করছিলেন। হরিয়ানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করাকে তাদের দায়িত্ব মনে করেনি।

-
৯. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের স্বনামধন্য সাংবাদিক ও প্রধান সম্পাদক অরুণ সুরি ১৯৮১ সালের ১০ জুলাই ঘটনার ব্যাপারে বলেন, গতবছর নিরানকারী গুরু, বাবা গুরুবচন সিং এবং তার প্রধান সহকারীর হত্যা মামলার কোনো সমাধান হবে না। হত্যাকারীরা জার্নাইল সিং ভিন্দারওয়ালের ছত্রছায়ায় থাকায় তাদের কখনোই গ্রেফতার করা হবে না। তারা পাঞ্জাবের অমৃতসরে অবস্থান করছিল। পাশাপাশি প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনীও হত্যাকারীদের গ্রেফতার করতে নিজেদের সম্পৃক্ত করেনি। 'দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী দরবারা সিংয়ের কাছে বারবার সুপারিশ করেন। সি.বি.আই.-এর পরিচালক পাঞ্জাব সরকারের কাছে চিঠি পাঠান। কিন্তু তাদের কোনো সাহায্য পাওয়া যায়নি। দিল্লির বর্তমান লেফ. গভর্নর মি. এস.এল. খুরানা পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান সন্দেহভাজন খুনীদের গ্রেফতার করার জন্য। সি.বি.আই.-এর পরিচালক প্রাদেশিক সরকারকে প্রায় ১০ দিন আগে চিঠি পাঠান খুনীদের গ্রেফতার করতে সি.বি.আইকে সাহায্য করার জন্য এবং তাদের অস্ত্র উদ্ধারের জন্য। কিন্তু প্রাদেশিক সরকার এই নির্দেশের কোনো তোয়াফাই করেনি। সি.বি.আই. তাদের তদন্ত সম্পন্ন করে এবং ১১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে যারা ছিল ঘোষিত অপরাধী।...' 'ইল্যাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া থেকে গৃহীত, ১৭-২৩ জুন ১৯৮৪, পৃ-১১।

তাঁর অনুসারীরা একটি পুলিশের গাড়িতে চড়ে হরিয়ানা থেকে পাঞ্জাব তাদের প্রধান কার্যালয় (চন্ডক মেহতা) পর্যন্ত ৩০০ কি.মি. এলাকা ঘেরাও করতে ৭ দিন সময় নেয়। ভিন্দারওয়াল পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের দিন, সময় ও স্থান ঘোষণা করেন। ১৯৮১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তিনি সন্ত লাংওয়াল, তোহরা এবং দিল্লির জাটদার সান্তোখ সিং-এর সামনে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর সমর্থনকারীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সতেরোজন নিহত হয়। তাঁকে পুলিশ কয়েদের পরিবর্তে প্রাদেশিক সরকারের সার্কিট হাউজে বন্দি রাখা হয় যেখানে মন্ত্রী ও উর্ধ্বতন দাপ্তরিকরা থাকতেন। আকালি নেতাদের সুপারিশে ১৫ অক্টোবর তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাইল সিং-এর সমর্থন ছাড়া তাঁর মুক্তি সম্ভব ছিল না। তিনি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে মুক্তির আদেশ জারি করিয়ে নেন।

ভিন্দারওয়ালের নাম কিংবদন্তীতে পরিণত হয়। তিনি গুরুবচন সিং এবং লালা জগত নারায়ণের হত্যার জটিলতায় গুরুত্ব না দিয়ে তাদের কর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তিনি জনসম্মুখে বলেন, ‘যারা এমন বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন তাদেরকে আকাল তাক্ত-এর সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।’ তিনি ঘোষণা দেন, ‘যদি হত্যাকারীরা আমার সামনে আসে আমি তাদের সোনা দিয়ে বরণ করব।’ ১৯৮১ সালের ৯ নভেম্বর চন্ডক মেহতার গুরুদুয়ারায় একটি বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় যাতে তার তিনজন সহযোগী মারা যায়। ভিন্দারওয়াল তিন ঘন্টা পুলিশকে ঘটনাস্থলে ঢুকতে দেননি এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র তার অনুমতিপ্রাপ্ত অফিসাররাই ঘটনাস্থলে ঢুকতে পেরেছিল।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাইল সিং প্রধানমন্ত্রী দরবার সিংকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে দায়ী করেন। ১৯৮১ সালের ২২ ডিসেম্বর দিল্লির জাটদার সান্তোখ সিং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে খুন হন। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ভিন্দারওয়াল উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন জ্ঞানী জাইল সিং, মন্ত্রী বুতা সিং এবং রাজিব গান্ধী। এর কয়েক মাস পর (১৯৮২ সালের মার্চ) ভিন্দারওয়াল ট্রাকভর্তি সশস্ত্র অনুসারীদের নিয়ে নয়াদিল্লিসহ ভারতের বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করেন। এবার দরবার সিং জাইল সিংকে দোষারোপ করেন কেননা তিনি ভিন্দারওয়ালকে গ্রেফতার করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং তার অনুসারীদের নিরস্ত্র করতে পারেননি, যাদের ‘অধিকাংশের কাছেই ছিল লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র।

পরবর্তী বছরের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও কেন্দ্রীয় সরকার বুঝতে পারেনি যে ভিন্দারওয়ালকে বশে আনা যাবে না এবং প্রধানমন্ত্রী দরবার সিংকেও তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ানো যাবে না। ততদিনে ভিন্দারওয়াল তার কর্মসূচিতে হিন্দু-নির্যাতন যোগ করেন। গরুর মাথা হিন্দুদের মন্দিরে ছুঁড়ে ফেলা হয় এবং তাদের প্রতিমা ধ্বংস করা হয়। এর উত্তরে হিন্দুরাও গুরুদুয়ারার সমাবেশ এলাকায় সিগারেট ছোঁড়ে, তাদের ‘গ্রন্থ’ পুড়িয়ে দেয় এবং গুরু রাম দাস-এর প্রতিকৃতি ধ্বংস করে। এবং

অমৃতসরে রেলওয়ে স্টেশনে রাখা স্বর্ণমন্দিরের প্রতিরূপ ধ্বংস করে দেয়। অমৃতসরে তামাক বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য ভিন্দারওয়ালে একটি নির্দেশনা জারি করেন। স্থানীয় হিন্দুরা বিদ্রোহস্বরূপ শ্লোগানে বলে ‘সিগারেট, বিড়ি পিয়েংগে, হাম সান সে জিয়েংগে’ আমরা সিগারেট ও বিড়ি খাব, মর্যাদার সাথে বাঁচব। ভিন্দারওয়াল বুঝতে পারেন যে, হিন্দুদের থেকে শিখদের নিজস্ব পরিচয় বাঁচিয়ে রাখার জন্য ‘অমৃত প্রচার’-এর চাইতে দুই কমিটির ভেতর ঘৃণা জাগানো বেশি কার্যকর হবে। তিনি হিন্দুদের উপর আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে, জাইল সিং এবং দরবার সিং দু’জনই তাকে আর সমর্থন দেবে না এবং তার প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে। তিনি তাদেরকে ‘ইন্দিরা’র চামচা হিসেবে অভিহিত করেন— তিনি বলেন, এই শিখরা ইন্দিরার ‘চপ্পল’ চেটে নিজেদের উদরপূর্তি করে।^{১০}

১৯৮২ সালের ১৯ জুলাই ভিন্দারওয়ালের প্রধান দুই সহকারী অমৃক সিং এবং থারা সিংকে হত্যার জন্য গ্রেফতার করা হয়। এতে ভিন্দারওয়ালের মনে সন্দেহ থাকে না যে পুলিশ খুব শীঘ্রই তাকেও গ্রেফতার করবে।^{১১} তিনি চওকি মেহতা থেকে স্বর্ণমন্দিরে সরে যান। আকালিয়া এসময় ‘নহর রোকো’ (খাল বাঁচাও) কর্মসূচি পরিচালনা করছিল যা খুব শক্তিশালী ছিল না। তারা ভিন্দারওয়ালেকে স্বাগত জানায় এবং স্বর্ণমন্দিরের এস.জি.পি.সি.-এর অফিসের কাছে গুরু নানক নিবাসে স্থান দেয়। তারা তাদের দাবিতে অমৃক সিং এবং থারা সিংয়ের মুক্তিও অন্তর্ভুক্ত করে। ভিন্দারওয়াল সন্ত লাংওয়ালকে ‘ধারাম যুদ্ধ’ (সত্যের জন্য যুদ্ধ)-এর পরিচালক নিযুক্ত করেন। এটি ১৯৮২ সালের আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্ণমন্দিরে ভিন্দারওয়ালের আগমন আকালিদের ‘মরচা’কে আরও উদ্দীপিত করে (পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)। তিনি গান্ধীর প্রতিবাদের পক্ষপাতী ছিলেন না কিন্তু অহিংস মনোভাব নিয়ে তাদের দলে যোগ দেন। অপরপক্ষে আকালিরা উভয় ধরনের মনোভাব পোষণ করত। তাদের অনুসারীরা পরোক্ষ প্রতিবাদের মাধ্যমে গুরুদুয়ারার মালিকানা লাভ করার কৃতিত্ব অর্জন করে। ‘ধরম যুদ্ধ’-এর নেতারা খুব কমই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তারা কেবল কয়েকদিন বা মাসের জন্য জেলে ছিলেন। (কখনও কয়েক ঘণ্টা), তাদের নেতারা ভিন্দারওয়ালের অনুসারীদের রাহাজানিমূলক কর্মকাণ্ডে চুপ ছিল। ‘সে সরকারকে পরাস্ত করার জন্য আমাদের ধাক্কা (উপায়)’^{১২} বলেন সন্ত লাংওয়াল।

এই ধাক্কা ভিন্দারওয়ালের অসমর্থকদের তেমন প্রভাবিত করেনি। তিনি মন্দিরে আশ্রয় নেয়ার কিছুদিন পর প্রধানমন্ত্রী দরবারা সিংয়ের জীবনের উপর ঝুঁকি আসে

১০. ৩০ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ-২১।

১১. অমৃক সিং এবং থারা সিংকে প্রায় একই সময় গ্রেফতার করা হয়।

১২. লেখকের সাক্ষাৎকার, ৪ আগস্ট ১৯৮২।

(২২-৩ জুলাই, ১৯৮২), ৪ আগস্ট ১৯৮২ সালে ১২৬ জন বিদেশি যাত্রীবাহী বিমান পাকিস্তানে হাইজ্যাক করা হয়। তাদের বিমানকে অবতরণ করতে দেওয়া হয়নি এবং অমৃতসরে ফিরিয়ে আনা হয়। সেখানে হাইজ্যাকাররা তাদের ছেড়ে দেয়। এর প্রায় ২ সপ্তাহ পর (২০ আগস্ট) আরেকটি বিমান হাইজ্যাক হয়। একে লাহোরে অবতরণ করতে দেওয়া হয়নি এবং যখন এটি অবতরণ করে তখন হাইজ্যাকারকে মেরে ফেলা হয়। একই দিন প্রধানমন্ত্রীর উপর আবার হামলা করা হয়। তিনি অক্ষত অবস্থায় বেঁচে যান। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীসহ প্রায় আঠারো জন গুরুতর আহত হন।

১৯৮২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যখন আকালি নেতাদের একটি বাসে করে কারাগারে নেওয়া হচ্ছিল তখন একটি লোকহীন রেলক্রসিং-এ একটি ট্রেন বাসটিকে আঘাত করে। এতে ৩৪ জনের মৃত্যু হয় এবং ২১ জন আহত হয়। আকালি নেতারা সরকারের কাছে এই সুচিন্তিত হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে। একমাস পর একটি শোভাযাত্রা মৃত নেতাদের জন্য নিয়ে দিল্লির সংসদে যায় এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। এমন দিন খুবই কম ছিল যেদিন খুন, ব্যাংক ডাকাতি, অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুট হয়নি। এইসব অপরাধের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটে ১৯৮৩ সালের ২৫ এপ্রিল সকালে। সেদিন পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল এ.এস. আটওয়াল মন্দিরে প্রার্থনা করে বের হবার সময় গুলিতে নিহত হন। দায়িত্বরত সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর এবং প্রায় শত শত উপস্থিতদের সামনে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। আক্রমণকারী কারো তোয়াক্কা না করে মন্দিরে ফেরত না গিয়ে বাজারের দিকে চলে যায়। এই নৃশংসতা বাড়তে থাকলেও আকালি নেতারা তাদের আন্দোলন থামিয়ে রাখেনি। তারা নতুন ফ্রন্ট তৈরি করেন। 'নহর রোকো (খাল থামাও)। এর পর ১৯৮৩ সালের ৪ এপ্রিল 'রাস্তা রোকো' (সড়ক বন্ধ)—'সব , 'রেল রোকো' (১৭ জুন); কাম রোকো (কাজ বন্ধ করো) ২৯ আগস্ট ইত্যাদির সূচনা করে। এ সময় চিহ্নিত লোকদের 'হিট লিস্ট' ঘোষণা করা হয়।^{১৩}

এর মধ্যে ছিল জুলুন্দারের 'দৈনিক প্রতাব'-এর এডিটর বীরেন্দ্র। তাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া একটি পার্সেল বোমার আঘাতে তার দুই কর্মচারী নিহত হয়। এ অসমাপ্ত বিধ্বংসী অপরাধকাণ্ডের আরও সাফল্য অর্জিত হয় ৫ অক্টোবর ১৯৮৩ সালের এক রাতে। এদিক অমৃতসর থেকে দিল্লিগামী একটি বাস হাইজ্যাক করা হয় দিলওয়ান নামক গ্রামের কাছাকাছি এলাকায়। ৬ জন হিন্দু যাত্রীকে বাস থেকে নামিয়ে গুলি করা হয়।^{১৪} এ থেকে প্রমাণিত হয় দরবারা সিং উত্তরোত্তর বাড়তে

১৩. ভিন্দারওয়ালে এবং বাক্সর খালসা সমর্থকদের বাইরেও এসময় অনেক সন্ত্রাসীর আবির্ভাব ঘটে।

১৪. সন্ত লাংওয়াল এবং কয়েকজন আকালি নেতা এই বিশৃঙ্খলার দুঃখ প্রকাশ করেন।

লাংওয়ালের কাছে আবেদন জানানো হয় যাতে তিনি আরও উচ্চপদস্থ পুরোহিতদের কাছে খুনিদের নাম ঘোষণার সুপারিশ করেন যারা নিরীহ লোক হত্যা করেছিল রানক্ষিয়া (ধর্মবাহিনীতদেরকে জি.এস. তোরা আশ্রয় দান করেন। একে সমাজের শাস্তিস্বরূপ মনে করা হয়। কিন্তু লাংওয়াল শুধুমাত্র এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন।

থাকা সহিংসতা দমনে ব্যর্থ। এর পরদিন (১৯৮৩-৬ অক্টোবর তার সরকারেরবিনাশ যাই এবং প্রেসিডেন্ট প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

দরবারা সিং-এর এই অবনতিকে ভিন্দারওয়াল কাঙ্ক্ষিত বিজয় হিসেবে মনে করেন এবং তার কর্মসূচির প্রতি আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। মন্দির ভবনে বিভিন্ন দলের ভেতর দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। এদিকে সন্তা লাংওয়াল যে সহিংস সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব করেন এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল পি.এস. বাদলের সমর্থকরা। তারা সহিংসতার বিপক্ষে ছিলেন এবং সরকারের সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হতে চেয়েছিলেন। অপরদিকে ছিলেন ভিন্দারওয়াল সমসহিংস বাক্বর খালসা এবং আখন্দ কীর্তনী জ্যাঠা যারা নিজেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন কিন্তু আলাদা শিখ প্রদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছিলেন। তাদের লক্ষ্যের প্রতি শিখদের মনোনিবেশ করাতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কিন্তু হিন্দুদের পাঞ্জাব ত্যাগে বাধ্য করিয়ে তারা তাদের উদ্দেশ্যপূরণ করেছিল। এর মাধ্যমে অন্যান্য হিন্দু এলাকায় বসবাসকারী শিখদের যাতে হিন্দুরা পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেয় সেজন্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এতে তারা যদি প্রদেশে জনগোষ্ঠীর অনুপাত ৬০ শতাংশ শিখ এবং ৪০ শতাংশ হিন্দু থেকে ৮০ শতাংশ শিখ-এ উন্নীত করতে পারে তাহলেই তাদের ডি ফ্যাক্টো খালিস্তান অর্জনে সাফল্য অর্জিত হবে।

যদিও লাংওয়াল আকালিদের প্রতি ভিন্দারওয়ালের অবজ্ঞা এবং বাদলের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, তবুও তিনি বাক্বর খালসা এবং আখন্দ কীর্তনী জ্যাঠার প্রতি মহাভীত ছিলেন। কয়েক মাসের জন্য এই তিন অংশ মন্দির ভবনের পূর্বদিকে এস.জি.পি.সি অফিসের কাছাকাছি 'সেরাইস'এ একান্তভাবে অবস্থান করেন। এদের মধ্যে প্রায়ই গালাগালি এবং ঘুমাঘুষি চলত। ভিন্দারওয়ালকে মন্দির থেকে অপসারণ করা না হলে সন্তা লাংওয়াল মন্দির ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেন। ভিন্দারওয়াল এই প্রস্তাবে রাজি হননি। কারণ তিনি জানতেন আশ্রয়স্থান ত্যাগ করলে তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করবে। এস.জি.পি.সি-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে তোহরা মন্দিরের শান্তিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একজন জ্ঞানী কিরপাল সিংকে বাধ্য করেন ভিন্দারওয়াল এবং তার সমর্থকদের আকাল তাখতের উঁচু স্থান দেবার জন্য। তখন আকাল তাখতের প্রধান পুরোহিত ছিলেন জ্ঞানী। ভিন্দারওয়াল তার বন্ধুকধারী অনুসারীদের নিয়ে আকাল তাখতে সরে যান। তার অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শাহবেগ সিং। তিনি ভিন্দারওয়ালের লোকদের আধুনিক অস্ত্র শিক্ষা দিতে রাজি হয়েছিলেন।^{১৫} আরেকজন ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জাসওয়ানত সিং বুল্লার।

১৫. শাহবেগ সিং একজন জাট শিখ। ১৯৭১ সালে ইন্দো-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশে কর্মরত অবস্থায় তার বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল জারি করা হয়। দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় এবং তাকে তার পদ থেকে

ভিন্দারওয়াল অস্ত্র জোগাড় করতে থাকে আর আকাল তাখ্তকে একটি দুর্গরূপে গড়ে তুলতে থাকেন। তাকে শুধু ভারতীয় বাহিনীর সাথেই লড়াই করতে হবে না, বাক্সর খালসা এবং অস্ত্রধারী আকালিদের বিরুদ্ধেও লড়াইতে হবে। সন্ত লাংওয়ালের প্রতি তার বিক্ষোভ তিনি গোপন করেননি। তিনি তাকে আরেকজন গান্ধী হিসেবে ঘোষণা করেন এবং তার বাসভবনকে গান্ধী নিবাস হিসেবে এবং পরে নাম ছিল শক্তি নিবাস (শক্তির আঁধার)।

ভিন্দারওয়াল এবং লাংওয়াল তাদের নিজ নিজ পথে অটল থাকেন। ১৯৮৪ সালের ১২ এপ্রিল (এক্স—এম.এল.এ.) এবং জেলা জনতা পার্টির প্রেসিডেন্ট হারবান লাল খান্নাকে অমৃতসরে খুন করা হয়। এর পরদিন তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হিন্দু-শিখ সংঘর্ষ হয় এবং আটজন লোক প্রাণ হারায়। একইদিন পাঞ্জাব সাহিত্যের এম.পি. এবং অধ্যাপক বিশ্বনাথ তিওয়ারিকেও তার চণ্ডিগড়ের বাসভবনে খুন করা হয়।^{১৬} ১৪ এপ্রিল সুরিন্দার সিং (সাদীকে মন্দিরের বাইরে) একটি চা স্টলে একজন মহিলা সহকারী গুলি করেন। সাদীকে ভিন্দারওয়াল তার ভাই হিসেবে পরিচয় দিতেন। পরদিন ঐ মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ একটি নর্দমায় ফেলে দেওয়া যায়। ভিন্দারওয়ালা সর্গর্বে বলেছিলেন, সাদীর হত্যাকারীকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ১২ মে ১৯৮৪ সালে রমেশচন্দ্র, যিনি তার বাবা জগৎ নারায়ণের পর হিন্দু সমাচার গ্রুপের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন, কে. জুলুন্দারে তার অফিসে খুন করা হয়।^{১৭} অভিযানের ব্যতিক্রম না করে সন্ত লাংওয়াল ঘোষণা করেন যে, ৩ জুন ১৯৮৩ (গুরু অর্জুনের শহীদ দিবস) থেকে শিখরা সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন করবে। তারা ভূমি কর, পানি ও বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করবে না এবং পাঞ্জাবে ফলিত ফসলাদি পাঞ্জাব থেকে বাইরে যেতে দেবে না। নব নিযুক্ত তরুণ উপদেষ্টাদের পরামর্শে মিসেস গান্ধী সিদ্ধান্তে আসেন যে, আকালি এবং ভিন্দারওয়ালের সাথে বোঝাপড়ার সময় এসেছে।

সরিয়ে দেয়া হয়। ভিন্দারওয়ালের প্রধান মিলিটারি উপদেষ্টা হবার আগে তিনি আকালিদের 'ধরম সুদ'-এ যোগ দেন। তিনি অপারেশন ব্লু স্টার-এ নিহত হন।

১৬. ড. তিওয়ারি ছিলেন চণ্ডিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি সাহিত্যের ভাই বীর সিং পদের অধিকারী। তিনি মিসেস গান্ধীর শাসনতন্ত্রের প্রশংসা করে একটি বই লেখেন এবং রাজ্য সভায় নির্বাচিত হন। তার স্টেনোগ্রাফার মনমোহন সিং ১৯৭৮ সালের ৩ আগস্ট প্রতিষ্ঠিত খালসার প্রধান কার্যসম্পাদক হন। তিনি জিয়ানি জাইল সিংয়ের মাধ্যমে এই পদ লাভ করেন। এটি পরে চরমপন্থীদের সাথে যুক্ত হয়।

১৭. এই সময় সংঘটিত অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ছিল স্কোয়াড্রন লিডার পরমজিৎ সিং এবং শ্রীত লারির সম্পাদক সুমিত সিং-এর হত্যাকাণ্ড (১৯৮৪-এর ২২ ফেব্রুয়ারি) এবং ১৯৮৪ সালের ২১ মে একটি বাসে ৪ জন হিন্দু যাত্রীকে হত্যা।

২০. আনন্দপুর সাহেব সংকল্প এবং অন্যান্য আকালি দাবিসমূহ

আকালি এবং সরকারের সংঘর্ষের কারণ জানতে হলে আমাদের আরও কয়েক বছর আগে ফিরে যেতে হবে এবং বিভিন্ন সময় আকালিদের দাবি এবং তাদের প্রতি সরকারের প্রতিক্রিয়ার দিকে নজর দিতে হবে। পাঞ্জাবি সুবাকে ১৯৬৬ সালেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু চণ্ডিগড় একটি ইউনিয়ন হিসেবেই থেকে গিয়েছিল। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা উভয়ই চণ্ডিগড়কে রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করত। পাঞ্জাবিভাষী পাঞ্জাব সংলগ্ন গ্রামগুলো পার্শ্ববর্তী প্রদেশের সাথেই থেকে যায়। কেন্দ্রীয় সরকার খাল সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিজেরাই দেখত। ইন্দো ওয়াটার ট্রিয়ারি ১৯৬০ অনুসারে সুতলেজ, রবি ও বীজ-এর জমিতে পানি সরবরাহ করা হয়। এতে ভারতেরও অংশ ছিল। আকালি বিভিন্ন দাবির প্রতি সরকারের এই ধীর প্রতিক্রিয়া আকালি এলাকাকে শিখ-বিরোধী এলাকায় পরিণত করে। তারা বিদ্রোহের বীজ বুনতে থাকে এবং দিন দিন তাদের দাবি বাড়তেই থাকে। এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকার বৈধ চাওয়াগুলো পূরণ না করে আরও বিলম্ব করতে থাকে। এভাবে আকালিদের একটি পরোক্ষ আন্দোলনের জন্য বাধ্য করা হয় যা কখনো কখনো সহিংসতায় পরিণত হতো। পাশাপাশি শান্তিপূর্ণ মোরচাও সন্ত্রাসে রূপ নেয় যা পুলিশ, পাশবিকভাবে দমন করত। তারা নিরীহ মানুষকে হত্যা করত এবং তাদের উপর অত্যাচার করত। পুলিশের এই নীতিতে হিতে বিপরীত হয় এবং আরও সন্ত্রাসীদের জন্ম দেয়।

সবচেয়ে ব্যাপক দাবির মধ্যে ছিল ১৯৭০ সালের আনন্দপুর সাহেব সংকল্প। এটি শিখদের পক্ষ থেকে আকালিরা দাবি করেছিল। এই দাবির কমপক্ষে তিনটি রূপ ছিল, যাতে আকালি নেতারা নিজ নিজ মতামত দিয়েছিলেন। কেউ কেউ যেমন সন্ত ফতেহ সিং মনে করতেন পাঞ্জাবি সুবাহ-ই তাদের একমাত্র চাওয়া যা ১৯৬৬ সালে বাস্তবিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। চণ্ডিগড় এবং পার্শ্ববর্তী পাঞ্জাবি ভাষী এলাকাতে এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। অপর দল মনে করেন এই দাবি ভারতীয় ইউনিয়নে শিখদের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গঠনের দাবি। এছাড়া অন্যরা মনে করতেন এটি একটি স্বাধীন-সার্বভৌম শিখ রাষ্ট্র গঠনের দাবি, যার নাম খালিস্তান।

শিখদের দাবিগুলোকে একটি সুসজ্জিত আকার দেওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন কাপুর সিং। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করেন এবং কয়েক বছর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস-এর সদস্য ছিলেন, দুর্নীতির দায়ে তাকে বরখাস্ত করা হলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং আকালিদের দলে একমাত্র বুদ্ধিদাতা হিসেবে যোগদান করেন এবং সংসদে যাবার জন্য নির্বাচিত হন। তিনি নিজের দুর্দশাকে সমাজের দুর্দশা হিসেবে গড়ে তোলেন এবং কখনোই সরকারকে শিখদের প্রতি বৈষম্য আচরণ করার দোষারোপ করা থেকে বিরত ছিলেন না। তিনিই শিখদের ‘সুই জেনেরিস’ একটি মুক্ত এবং সার্বভৌম জাতি হিসেবে ঘোষণা করার কথা বলেন। তার দলকে শিখদের জন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত রাজনৈতিক অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করার দাবি উত্থাপন করতে বলেন। তিনি ইংরেজিতে খসড়া তৈরি করেন। তিনি এই দাবির উদ্দেশ্য এবং অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সন্ত ফতেহ সিং এবং আকালির দলের প্রধান-এর কাছে বুঝিয়ে বলেন। ফতেহ সিং পাঞ্জাবি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানতেন না। তিনি তার দাবিতে সমর্থন দান করেন। কাপুর সিং-এর খসড়ায় শিখদেরকে ‘রাজ জাতি’ হিসেবে ক্ষমতা প্রদানের জন্য নিয়োজিত বলে ধরে নেওয়া হয়। মাস্টার তারা সিংও একই ধারণা পোষণ করতেন যে, শিখরা হয় শাসক বা বিদ্রোহী।

১৯৭৩ সালে আনন্দপুরে যখন এই দাবি উত্থাপন করা হয় তখন তা খুব বেশি নজর কাড়েনি। কাপুর সিংকে একজন ত্যক্ত বিকেন্দ্রিক সংগ্রাম ভাবাপন্ন লোক হিসেবে ধারণা করা হয় অনেকটা ভবঘুরে রাজনীতিবিদ-এর মতো। ১৯৭৭ পর্যন্ত প্রায় তিন বছর এই আন্দোলন সম্পর্কে তেমন আলোচনাই হয়নি। তখন আকালি দলের সভাপতি জ্ঞানী আজমীর সিং অমৃতসরের আরেক দফা ‘নতুন পলিসি প্রোগ্রামের খসড়া’ প্রকাশ করেন। এই নতুন নীতি কাপুর সিং-এর আসল খসড়াকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয় এবং অন্যান্যদের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়। এই কমিটিতে ছিল প্রকাশ সিং বাদল (পাঞ্জাবের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী), গুরুচরণ সিং তোহরা^১ এস.জি.পি.সি-এর সভাপতি, সুরজিত সিং বর্ণালা^২, বলবন্ত সিং^৩। জগদেব

১. জসওয়ান্ত সিং মান, *সাম ডকুমেন্টস অন দি ডিমাণ্ড ফর দি শিখ হোমল্যান্ড*, চণ্ডিগড়, ১৯৬৯, পৃ-৩৫।
২. ১৯১৯ সালে তোহরা গ্রামে জিল জাট গুরুচরণ সিং জনগ্রহণ করেন। তিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেননি। আকালি দলে যোগ দেয়ার আগে তিনি কমিউনিস্ট হিসেবে রাজনৈতিক জীবনযাত্রা শুরু করেন। তিনি ১৯৬৭-৭২ পর্যন্ত সংসদ সদস্য ছিলেন এবং ১৯৭৭ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন। তিনি তিনবার রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন এবং এস.জি.পি.সি-এর সভাপতি হিসেবে বিশ্ববহুর কৃতিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বহুবার জেলে যান।
৩. সুরজিত সিং ছিলেন খালিওয়াল জট এবং তিনি ১৯২৫ সালে আটালি গ্রামে (গুরুগাঁও জেলায়) জনগ্রহণ করেন। তিনি রাজনীতিতে আসার আগে কয়েক বছর আইন চর্চা করেন। তিনি আকালি দলের হয়ে পাঞ্জাব অ্যাসেমবলিতে নির্বাচিত হন এবং গুরুনাম সিং-এর মন্ত্রীসভায় শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জরুরি অবস্থায় তিনি আট মাস কারাগার যাপন করেন। ১৯৭৭ সালে তিনি সাক্ষর থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন এবং জনতা সরকারের কৃষিমন্ত্রী হন। আইন ভঙ্গ করার

সিং তালবন্দি^৮-এর সভাপতিত্বে ১৯৭৮ সালের ২৮-২৯ অক্টোবর লুধিয়ানায় সর্বভারত আকালি সম্মেলনের ১৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নতুন দাবিটি উপস্থাপন করা হয়। তোহরা এই দাবি প্রস্তাব করেন, এরপর বাদল এবং এটি কোনো দ্বিমত ছাড়াই উত্থাপিত হয়। জনতা পার্টির সভাপতি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। চন্দ্রশেখর এ ব্যাপারে কোনো কথাই বলেননি। কংগ্রেসের নেতারাও কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) এসময় পশ্চিম বাংলা শাসন করত এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছিল। তারাও একই দাবি আদায়ে একটি নতুন পাঞ্জাবের জন্য আকালিদের দাবিকে সমর্থন করেন। বি.জে.পি. ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (সি.পি.আই) এতে অমত পোষণ করেন। কেননা তারা মনে করেন আকালিদের এই দাবি পূরণ হলে দেশের একাত্বতা ক্ষুণ্ণ হবে।

এই দাবির বিরুদ্ধে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে এবং আকালিরা তাদের দাবির পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি অব্যাহত রাখে।^৯ আকালি দলের সভাপতি সন্ত হরচাঁদ সিং লাংওয়াল এই সংকল্পের একটি ‘গুপ্ত সংস্করণ’ ভারতীয় সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যের কাছে প্রেরণ করেন।^১ ছোট্ট ভূমিকা টেনে তিনি দাবি করেন যে, এই সংকল্প ‘অবৈধ দখলের বিপদ থেকে মুক্ত হবার জন্য একটি হাতিয়ার’ ছাড়া আর

জন্য তিনি এন.এ.এস.এ-এর অধীনে নয় মাস কারাগারে বন্দি ছিলেন। সন্ত লাংওয়ালের গুপ্ত হত্যার পর তিনি আকালি দলের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন গুণী প্রাকৃতিক চিত্রশিল্পী ছিলেন।

৪. বলবন্ত সিং ১৯২৯ সালে সাইদপুর (কাপুরতলা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন কামভোজ। তিনি অর্থনীতিতে এম.এ. ডিগ্রী এবং এল.এল.বি ডিগ্রী লাভ করেন। কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে তিন রাজনীতির সূচনা করেন। তিনি প্রথম নির্বাচনে পরাজিত হবার পর ১৯৬২ সালের নির্বাচনে জয়ী হন। তিনি পরবর্তীতে আকালি দলে যোগ দেন। তিনি পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু অবিশ্বাসী রাজনীতিক ছিলেন কেননা তিনি অর্থ অর্জনেই বেশি সচেষ্ট ছিলেন।
৫. জগদেব সিং ১৯২৭ সালে তালওয়ান্ডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (লুধিয়ানা জেলা)। তিনি ছিলেন জিল জাট। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৯৭০ সালে তিনি গুরুনাম এবং পরবর্তীতে বাদল মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৭৬ সালে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। তিনি খালিস্তানের দাবিকে সমর্থন করতেন।
৬. দিয়া জাট হরচাঁদ সিং (১৯৩৪-৮৫) গিদারয়ানী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (সাসরুর জেলা)। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল খুবই অল্প। তিনি গ্রাম্য গ্রন্থী ছিলেন এবং আকালি সদস্য হিসেবে কাজ করেন। মাস্টার তারা সিং তাকে ১৯৬০ সালে রাজনীতিতে আনেন। তিনি ১৯৬৭ সালে পাঞ্জাব অ্যাসেমবলিতে নির্বাচিত হন। তিনি মোরচার ‘ডিকটেক্টর’ হিসেবে জরুরি অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং পরবর্তীতে ‘ধারাম যুদ্ধ’-এ।
৭. সংকল্প অনুসারে যদি পাঞ্জাবের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হত তা হলে শিখদের সংখ্যা ৬০ শতাংশ থেকে কমে ৫০ শতাংশে পরিণত হত যা অধিকাংশরা দাবি করছিল। যদিও শিখভাষীদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। যখন আকালি নেতারা তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী চরণ সিংকে অনুরোধ করেন মুসলিম এবং খ্রিস্টানদের মতো শিখদেরকেও একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করতে তখন তারা উভয়ই এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন তারা শিখদেরকে হিন্দু গোষ্ঠীর সর্বস্ব মনে করেন। সূচী দেখুন।

কিছুই নয়।' এবং এটি হতে পারে বারবার এবং দুর্বল কল্পনাপ্রসূত প্রথার দ্বারা প্রাদেশিক ক্ষমতা বিভক্তিকরণের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে প্রাদেশিক ক্ষমতা অর্জন করে একটি সত্যিকার মৈত্রী চুক্তি করা। তিনি এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা এই চুক্তি একটি স্বতন্ত্র এমনকি স্বায়ত্তশাসিত শিখ প্রদেশ গঠনের জন্য এবং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটি সুসম্পর্ক রক্ষা করার জন্যই।

আনন্দপুর সাহেব সংকল্প ম্যাগনাকার্টার মর্যাদা লাভ করেন এবং শিখরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ধারণা করে নেয়া হয় 'শিরোমণি আকালি দল শিখপন্থার সর্বোচ্চ দিশারী এবং তাদেরকে প্রকাশ করার জন্য এবং নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পুরোপুরি সুগঠিত।' এর ধর্মীয় লক্ষ্যের পরিবর্তে মিথ্যা ধর্মীয় অর্থ দাঁড়ায় 'ধর্ম বিস্তারণ এবং শিখ মতবাদ প্রতিষ্ঠা এবং অ্যাথিজম বন্ধ করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, নিরক্ষরতা এবং বর্ণবাদ দূরীকরণ যা শিখদের ধর্মশাস্ত্রে স্থান দখল করে নিয়েছিল।' এসব লক্ষ্যের মাধ্যমে 'শিখদেরকে স্বনির্ভর জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য অনুপ্রাণিত করা এবং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে শিখদের অনুভূতির সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটতে পারে।' এর পাশাপাশি আরও ধর্মীয় লক্ষ্য যেমন— 'শিখদের মাঝে ঐশ্বরিক ভাবাপন্ন মনোভাব তৈরি করাকে মূল কাজ হিসেবে গণ্য করা।' এটি অর্জন করার জন্য পুরাণিক, ধর্মীয় বাণী-গায়কদের প্রশিক্ষণ দেয়া, ধর্মীয় সাহিত্য প্রকাশ করা এবং অমৃত প্রচার-এর প্রসার ঘটানো।

এই ধর্মীয় লক্ষ্যসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র বিতর্কিত বিষয়টি ছিল সর্বভারতীয় গুরুদুয়ারা আইন যার মাধ্যমে ভারতীয় সকল ঐতিহাসিক গুরুদুয়ারাগুলোকে এস.জি.পি.সি.-এর নিয়ন্ত্রণে আনা এবং বিশ্বজুড়ে গুরুদুয়ার সকল কথা বলা।' একটি শিকলে বন্ধনের মাধ্যমে আরও ফলপ্রসূতাবে সাধারণ ধর্মীয় ও দাবিগুলো আদায় করা। এখানে আরও বলা হয় গুরু নানকের জন্মস্থান (পাকিস্তানে) এবং অন্যান্য গুরুদুয়ায় সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা যেগুলো "পাঁছ" থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল (কাপুর সিং নানকানা সাহেবের জন্য 'ভাটিকান স্ট্যাটাস দাবি করেন')।

ধর্ম-নির্ভর প্রবাদগুলোর যথার্থতা ধর্ম-নির্ভর দলগুলোর মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে একে গ্রহণ করার পেছনে খুব কম যুক্তিই ছিল। সবচেয়ে বিতর্কিত উপ-ঘোষণা ছিল 'পন্থিক লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে দশ গুরুর নির্দেশিত পথকে ভিত্তি করে হবে। যা শিখ ইতিহাস এবং খালসা পথের মনে গেঁথে আছে। এর লক্ষ্য 'খালসাজি কা বোল বোলা'—“যেখানে খালসা শিখদের বক্তব্যই হবে পূর্বনির্ধারিত।” যদিও একে পাণ্ড-এর স্বাধীন ভিত্তির জন্য উপলব্ধি আনয়নের ধারাবাহিকতা ধরা হতো।' যা পূর্বেও সংকল্পে উল্লেখ করা হয়েছে, অধিকাংশ আকালিরাই এতে রাজি হননি। তাদের মতে এটি ছিল বহুযুগীয় পুরাতন ভারতে একটি দিব্যশাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

এই সংকল্পের রাজনৈতিক দাবি একটি নতুন একাত্ম পাঞ্জাব ভাষাভাষী এলাকার সীমানা নির্ধারণে সংকুচিত হয়ে পড়ে। পাঞ্জাবের বাইরে বসবাসকারী শিখ

সংখ্যালঘুদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা, বৈদেশিক নীতি, ডাক এবং টেলিগ্রাফ, মুদ্রা এবং রেলওয়ে এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা সীমিত হয়ে পড়ে।

এই সংকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতিকে ‘অকেজ এবং বিপদজ্জনক’ বলা হয় এবং সরকারকে ‘পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে বাধ্য করা হয়। বিশেষ করে যেসব দেশে শিখরা বসবাস করত এবং তাদের ধর্মীয় উপাসনালয় ছিল (পাকিস্তানকে প্রধানতম উদ্দেশ্য করা হয়)। এতে এও দাবি করা হয় যে, প্রতিরক্ষা বাহিনীতে শিখদের একটি নির্দিষ্ট অংশকে স্থান দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে লাইসেন্স ছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র বহন করার অনুমতি দিতে হবে।

আকালি দলের আগ্রহ দেখা যায় অর্থনৈতিক বিষয়ের সংকল্পের মধ্যে। তারা প্রত্যেক পরিবারের জন্য সর্বোচ্চ সতেরো থেকে ত্রিশ একর জমি দখলের দাবি করে। মধ্যবর্তীদের উপর থেকে কৃতদাস প্রথা উৎখাত করা এবং গড় চাষিদের উৎপাদন ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে কৃষি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করার দাবি করে। এই মূল্য প্রথমে প্রদেশে নির্ধারিত হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে নয়। প্রদেশের হাতে পাইকারী ব্যবসার ভার নিযুক্ত থাকবে এবং কৃষিপণ্যের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করতে হবে যাতে পুরো রাষ্ট্রকে একই খাদ্য এলাকা হিসেবে ধরে নেয়া যায়।

যখন কৃষকদের জন্য অধিক জমি এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য সাধারণ বাজারে পাওয়ার অধিকার আদায়ের দাবি চলছিল তখন সংকল্পে দাবি করা হয় যেন ‘সকল মূল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জনগণের আওতাধীন আনতে হবে’ এবং ‘সকল ভোক্তা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয়ভাবে সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে।’ শিল্প শ্রমিকদের জন্য এটি ছিল ‘প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি’ আদায় কিন্তু কৃষি শ্রমিকদের জন্য ‘ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং তা প্রয়োজন হলে বাড়ানো। এটা স্পষ্ট যে যখন সংকল্পে ‘খিন দাম’ অর্জন নিশ্চিত করার জন্য দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং পরমাণু শক্তিকে ভিত্তি করে শক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিল যখন নদীর পানি ভাগ করার ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। এটি পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছে আকালিদের প্রধান দাবি হয়ে উঠেছিল।

যদিও অধিকাংশ আকালিরা আনন্দপুর সাহেব দাবিকে আলাদা হবার বীজ হিসেবে তীব্রভাবে অবহেলা করত, কিন্তু ছোট ছোট অনেক দল একই সাথে একে গুরুত্ব দেন। তারা মনে করেন শিখদের এখানে একটি ‘কোয়াম’ ধরে তাদের নিজস্ব প্রদেশে নিজস্ব সরকার গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। এই বিভেদকারীরা অপ্রত্যাশিতভাবে এক-চুতর্থাংশের সমর্থন লাভ করেন। ১৯৮১ সালের মার্চে প্রধান খালসা দেওয়ান শিখ শিক্ষা সম্মেলনে বক্তব্য রাখার জন্য গঙ্গা সিং ধীলনকে আমন্ত্রণ জানান। এই বক্তৃতায় তিনি শিখদেরকে অন্যান্য ভারতীয়দের চেয়ে আলাদা জাতি হিসেবে বর্ণনা করেন এবং ইউনাইটেড ন্যাশনস-এর কাছে সেইরকম মর্যাদা দাবি করার জন্য সম্মেলনকে একটি দাবি পেশ করতে বলেন।

আরেকটি সংকল্প তৈরি করতে প্রধান খালসা দেওয়ানের প্রায় একমাস (১৬ এপ্রিল ১৯৮১) সময় লাগে কারণ এর আগের সংকল্পটি ছিল তার লক্ষ্যের বিরোধী। কিন্তু এর প্রতি অবিচার করা হয় কেননা ধারণা করা হয় যে, পুরনো এবং শ্রদ্ধেয় শিখ রাজনীতিকরা এই সম্মেলনকে দেশবিভাগের ধারণা সম্প্রসারণ করার একটি ফোরাম হিসেবে ব্যবহার করবে।^৮

যখন আকালিরা ক্ষমতায় ছিল, যখন আনন্দপুর রেজুলেশান পাশ করা হয় এবং জনতা রেজাইমের সময়, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এটিকে মেনে নেওয়ার দাবি জানায়নি। তারা একে তাদের দাবি আদায়ের একটি প্রকাশিত অস্ত্র হিসেবে ধরে রেখেছিল যাতে ক্ষমতা চলে যাবার পর এই সংকল্প মেনে না নেওয়ায় তারা আন্দোলন-এর পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দাঁড় করাতে পারে। এমনকি তারা একে স্বনির্ভরতা অর্জনের একটি দাবি হিসেবে ধরে নিয়েছিল মাত্র। যেমনটি দাবি করেছিল অন্যান্য কমিউনিস্ট দলগুলো। যেমন—ডি.এম.কে, এ.আই.ডি.এম.কে এবং তেলেগু দেশাম। তাদের যুক্তিতে একটি বাধা ছিল। তা হলো সম্পূর্ণ শিখ দল হয়েও তারা পাঞ্জাবি হিন্দুদের সমর্থন লাভ করতে পারেনি এবং একে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক আকার দিয়েছিল। আলাদা কোরাম হওয়াও ছিল শিখদের জন্য বিপত্তিজনক। কিছু আকালি নেতা কোরামকে এভাবে বর্ণনা করেন যে, এটি একটি আলাদা ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক দল কিন্তু আলাদা কোনো জাতি নয়। কিন্তু তাদের দলেরই অনেকে এটি গোপন রাখতে পারেননি। তারা আনন্দপুর সংকল্পকে তাদের আলাদা জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার একটি প্রকাশ হিসেবে বর্ণনা করে।

মিসেস গান্ধীর জ্ঞাত থাকার কথা যে, ক্ষমতাহীন আকালিরা ক্ষমতাহীন আকালিদের চাইতে পুরোপুরি আলাদা। তাদেরকে যদি পাঞ্জাব শাসন বা এতে সাহায্য করার সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সহযোগিতা করতেই বেশি ইচ্ছুক হবে। কিন্তু তাদেরকে যদি শাসন ভাগ করার সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে তারা আন্দোলন করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী এবং শাসনব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। ১৯৮০ সালে মিসেস গান্ধী যখন সংসদের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তখন বাদল তাকে জানিয়ে দেন যে, পাঞ্জাবে যদি তাকে স্থলাভিষিক্ত রাখা হয় তাহলে তিনি গান্ধীর সরকারকে সহযোগিতা করবেন। মিসেস গান্ধী তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তার সরকার ভেঙে দেন। তিনি আকালিদের মন জয় করতে সমর্থ হন কেননা তারা জয়প্রকাশ নারায়ণকে ইন্ধন জুগিয়েছিল এবং

৮. ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের একজন সদস্য গুরুতেজ সিং ব্রার জনসম্মুখে তার বক্তব্যে বলেন : শিখ জাতীয় থিওরি গুরু নানক-এর আমল থেকেই শিখদের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি আরও বলেন 'সন্ত জারনাইল সিং ভিন্দারওয়ালের মতো আরও অনেককে সত্য এবং ন্যায়ের জন্য শিখদের এগিয়ে নিতে পদক্ষেপ রাখতে হবে।' (ইন্ডিয়া টুডে ৩০ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ-২০) ব্রার'কে আগস্ট ১৯৮২ সালে বরখাস্ত করা হয় এবং তিনি ভিন্দারওয়ালের ক্যাম্পে যোগদান করেন।

পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। মিসেস গান্ধী ২৬ জুন ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন এবং তা আঠারো মাস স্থায়ী হয়েছিল। তিনি খ্যাতির চূড়ায় অবস্থান লাভ করেন এবং পাঞ্জাব আইন প্রণয়ন সম্মেলনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সমর্থন সহজেই লাভ করেন। তিনি দরবারা সিংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।^৯ আকালিরা জানত যে একটি ব্যাপক অংশ তাদের বিরুদ্ধে এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্বাচিত করবে না এবং প্রশাসনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে রাজি হবে না। আগস্ট ১৯৮০ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ পর্যন্ত তারা সাতটি আন্দোলনের সফলতা সম্মেলন আয়োজন করে এবং প্রায় ২৫,০০০ প্রতিনিধিকে আদালত আটক করতে পাঠায়। যখন কেন্দ্রীয় সরকার তাদেরকে তাদের দাবি উত্থাপন করতে বলে তখন তারা পঁয়তাল্লিশটি নালিশের তালিকা পাঠায়।^{১০} এর কিছু ছিল প্রকৃত বাস্তব : চণ্ডিগড়কে পাঞ্জাবে স্থানান্তর করা হয়নি (কিন্তু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বাদল তা পেশ করেননি), পাঞ্জাবের সীমানা পুনরায় সমন্বয় করা হয়নি এবং পাঞ্জাবিভাষী গ্রামগুলো প্রতিবেশী প্রদেশের আওতাধীন রয়ে গেছে। নদীর পানির সুষম বণ্টনের জন্য পাঞ্জাবের দাবি মেনে নেয়া হয়নি। পাঞ্জাবে কোনো ভারি শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই এবং কেন্দ্রীয় সাহায্য নেই।

সেনাবাহিনীতে শিখদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে পাঞ্জাবি কৃষকদের উত্তর প্রদেশ থেকে বিচ্ছেদ করা হয়েছিল, সমগ্র ভারত গুরুদুয়ারা আইন পাস করা হচ্ছিল না, শিখ ধর্মীয় আচার প্রথায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ এবং গুরুদুয়ারার পরিচালনায় তাদের বাধা প্রদান। প্রথমবারের জন্য শিখ নিজস্ব আইন-এর পরিচয়হীনতা'কে অভিযোগ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই তালিকায় অনেক মামুলি ধর্মীয় ব্যাপারও আনা হয়। অমৃতসরকে 'পবিত্র নগরী' ঘোষণা করতে হবে যেমন কুরুক্ষেত্র, হরদুয়ার এবং বানারস যেখানে তামাক এবং পানীয় বিক্রি নিষিদ্ধ। স্বর্ণমন্দিরের নিজস্ব প্রচার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাতে ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং ফ্লাইং মেইল নামক ট্রেনটিকে হরিমন্দির এক্সপ্রেস নামকরণ করা।^{১১} যখন তাদের দাবির প্রতি কোনো দৃষ্টিই দেয়া হচ্ছিল না তখন আকালিরা 'ধারম যুদ্ধ' মোরচা পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয় (সত্যের জন্য যুদ্ধ) এবং সন্ত হরচাঁদ সিং লাংওয়ালকে এটি পরিচালনায় নিযুক্ত করে। তিনি 'কেন এই পবিত্র যুদ্ধ' নামক

৯. জোহাল জাতীয় দরবারা সিং ১৯১৬ সালে জান্দিয়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (জুলুন্দুর জেলা)। তিনি ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগ দেন এবং তিন বছর কারাবরণ করেন। তিনি কংগ্রেসের মাধ্যমে পাঞ্জাবের আইন প্রণেতা নির্বাচিত হন এবং পরবর্তী বছরে নির্বাচনে আসন লাভ করেন। তিনি ১৯৮০-৬, অক্টোবর ১৯৮৩ পর্যন্ত পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন।

১০. সূচী দেখুন।

১১. এই দাবির ন্যায্যতা সম্পর্কে বলা হয় যে, হিন্দু তীর্থস্থানের নামে প্রায় ১৫টি ট্রেন আছে যদিও শিখ তীর্থস্থানের নামে একটিও নেই।

একটি পুস্তিকায় এর উদ্দেশ্য তুলে ধরেন এভাবে শিখদেরকে এই পবিত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে এই কারণে যে, ভারত শুধুমাত্র তাদের প্রতিজ্ঞা পূরণেই অসম্মতি জানায়নি, তারা তাদের স্বাধীনতা দানের নাম করে ক্রমান্বয়ে এবং অবাধে তাদেরকে দমিত করার চেষ্টা করছে এবং তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের অবস্থানে এনে রেখেছে।^{১২}

মিসেস গান্ধী 'ধারাম যুদ্ধ' মোরচাকে বেশি গুরুত্ব দেননি। তিনি প্রধানমন্ত্রী দরবারা সিং-এর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছিলেন যে, তিনি এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। তাদের কেউই বুঝতে পারেননি যে, আকালিদের দাবির প্রতি যত টিলেঢালা ভাব দেখানো হবে বিভিন্ন স্থানে মধ্যপন্থীদের চাইতে চরমপন্থী এবং খালিস্তানিদের সংখ্যাও তত বাড়বে।

১৯৮১ সালের অক্টোবরে সরকারের কাছে ১৫টি দাবির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পেশ করা হয়।^{১৩} এতে তারা আবারও বলে আনন্দপুর সাহেব সংকল্প বিভেদ সৃষ্টিকারী নয় বরং এজন্য প্রকাশ করা হয় যাতে প্রদেশের উন্নতিতে কেন্দ্রের অধিকার থাকে।^{১৪} এই তালিকায় আরও অন্তর্ভুক্ত করা হয় ভিন্দারওয়ালের মুক্তি (তখন তিনি জেলে ছিলেন)। পাঞ্জাবে একটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান এবং 'সিঙ্গ' ব্যাংক'কে জাতীয়করণ করা এবং প্রতিবেশি হিমাচল, হরিয়ানা, রাজস্থান, দিল্লি ইত্যাদি জায়গায় পাঞ্জাবিকে দ্বিতীয় ভাষা ঘোষণা করা যেখানে পাঞ্জাবি ছিল দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কথ্য ভাষা।^{১৫} পঁয়তাল্লিশ বা পনেরো দাবীর মধ্যে এমন কোনো বিষয় ছিল না যাকে পৃথককারী বা অসাংবিধানিক বলা যায়। এমনকি এখানে আনন্দপুর সাহেব সংকল্পের কথাগুলোও বেশি আনা হয়নি, আলাদা পরিচয় এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা দেয়ার দাবি। এতে যা চাওয়া হয়েছিল তা হলো আকালি প্রদেশ পরিচালক এবং কেন্দ্রের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট লেনদেন যাতে একটি স্থিতি অবস্থায় আসা যায়। কিন্তু এর কোনো কিছুতেই মিসেস গান্ধী সমঝোতায় আসেননি। কেননা এতে হিন্দুদের নামে শিখদের প্রতি সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। তিনি শুধু প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে নির্বাচনী নীতিমালার উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখেন। সেই সময় হরিয়ানায় নির্বাচনের সময় এসে যায়।

১২. সতীন্দর সিং, খালিস্তান, পৃ-৫৪।

১৩. সূচি দেখুন।

১৪. সূচী দেখুন।

১৫. ১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতেই কেবল আকালিদল তাদের দাবি লিখিত আকারে প্রকাশ করে যাতে ধারার ২৫নং আর্টিক্যাল মতে শিখ পারসোনাল ল' চাওয়া হয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু বিবাহ আইন এবং উত্তরাধিকার আইন প্রয়োগ যাতে শিখদের উপর থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়। শিখদের নিজস্ব বিবাহ আইন ছিল। আকালি নেতারা এই মত পোষণ করেন যে, ভাইয়ের মতো পিতার সম্পত্তিতে সমঅধিকার না নিয়ে যখন তারা বিবাহ করবে তখন স্বত্ত্বের সম্পত্তিতে সমঅধিকার পাবে। তারা ২৫নং ধারার ২নং উপ-বক্তব্যের বর্ণনারও বিরোধিতা করেন। যদিও বর্ণনামূলক ছিল কিন্তু এতে পরিষ্কারভাবে বলা হয় কিরপান আয় এবং ধারণ করা শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং হিন্দুদের রীতিও তাদের মতো পালিত হবে।

‘হোয়াইট পেপার অব দি পাঞ্জাব এজিটেশন’-এ সরকারকে অনেক প্রচেষ্টা করে প্রতিষ্ঠা করতে হয় যে তারা আকালিদের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন কিন্তু আকালিদের স্থান থেকে বিচ্যুত করতে প্রতি পদক্ষেপেই তারা ব্যর্থ হয়েছেন এবং তারা নতুন নতুন দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে। আকালি নেতা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ছাব্বিশটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ নভেম্বর ১৯৮১ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ পর্যন্ত। এর মধ্যে তিনটি ছিল প্রধানমন্ত্রীর সাথে, ৪টি ইউনিয়ন কেবিনেটের সদস্যদের সাথে, ৯টি গোপন এবং দশটি বিরোধী দলীয় নেতাদের উপস্থিতিতে। আকালিদের প্রতিনিধিরা ছিলেন একই। যেমন—লাংওয়াল, তোহরা, বাদল, কার্নাল, বলবন্ত সিং এবং সেসময়ের কাওমি একতার’ এডিটর আর.এস. ভাটিয়া এবং রবী ইন্দর সিং। সরকার কেবিনেট মন্ত্রী এবং সিনিয়র ব্যুরোকর্তাদের সাথে আলোচনায় বসেন। বিরোধীদলীয় কয়েকজন নেতা যেমন ফারুক আবদুল্লাহ (কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী), এল.কে. আদভানি, মধু দাদা ভাটে এমনকি পুরনো নেতা যেমন স্মরণ সিং এবং নতুন নেতা যেমন পাতিয়ালা অমরিন্দর সিংকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। দুই দলকে রাজি করানোর চেষ্টায় যিনি সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন তিনি হলেন হরকিষণ সিং সুরজিৎ। তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট এম.পি. এবং দলের পলিটব্যুরোর সদস্য। বেসরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণে পাঁচটি সম্মেলনের পর সমঝোতার কথা মোটামুটি পাকা হয় এবং বলা হয় আকালিরা নয় বরং মিসেস গান্ধীই তার প্রতিজ্ঞা থেকে সরে এসেছিলেন। এদের একটি পরিচালনা করেছিলেন হরকিষণ সিং সুরজিৎ এবং স্মরণ সিং। তারা মিসেস গান্ধীর পক্ষে ১৯৮২ সালের ২ নভেম্বর এই কাজটি করেন। পরদিন যখন ঘোষণা দেয়া হয় তখন দেখা গেল আকালিরা যে শর্তে রাজি হয়েছিল তা তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তারা জোরগলায় একে বিশ্বাঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে। স্মরণ সিং বলেন, ‘এটি বক্তব্য বা নীতির কোনো কথাই না।’^{১৬} এর দুই সপ্তাহ পর (১৮ নভেম্বর) প্রধানমন্ত্রীর প্রধান ব্যক্তিগত সচিব পি.সি. আলেকজান্ডার-এর বাসভবনে আরেকটি সমঝোতা হয়। শেষ মুহূর্তে মিসেস গান্ধী আরেকবার মত পরিবর্তন করেন।^{১৭}

১৬. দি পাঞ্জাব, ক্রাইসিস এন্ড রেসপন্স, পৃ-২৩৭।

১৭. সিদ্ধান্ত নেয়া হবে যে, আকালি নেতারা, অমরিন্দর সিং, কংগ্রেস এম.পি. ইউনিয়ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টি.এম. চাটুভেদী অমৃতসরের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ প্লেনের মাধ্যমে ৮.৩০ মি.-এ রওনা হবেন এবং অমৃতসরে আকালি দলের সভাপতির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করবেন এবং মধ্যরাতের মধ্যেই তা প্রকাশ হবে। কাপুরতলা হাটস থেকে বলবন্ত সিং সন্ত লাংওয়ালের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন (নয়াদিল্লির সরকারের অতিথিভবন থেকে) এবং তার সম্মতি লাভ করেন। আকালিদলের নেতারা সব কক্ষ দখল করেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কেননা তার সবাইকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার কথা ছিল। ৯টা পর্যন্তও যখন কোনো তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল না তখন অমরিন্দর সিং প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে যোগাযোগ করেন সেখানে ক্যাবিনেটের রাজনীতি কার্যসভা মিলিত হয়েছিল এবং তাকে বলা হয়েছিল যে, কোনো গণগোল আছে’। দি পাঞ্জাব, ক্রাইসিস এন্ড রেসপন্স, পৃ-২৩৭।

বিরোধীদের নেতাদের প্ররোচনায় ১৯৮৩ সালে আবার আলোচনা শুরু হয়। মন্ত্রীসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে এই ত্রিমুখী সম্মেলনে আকালিরা সতেরোটি হিন্দিভাষী গ্রামকে হরিয়ানায় স্থানান্তর করতে রাজি হয়। এই আলোচনা ভেঙে যায় কেননা সরকারি প্রতিনিধিরা বলেন, মিসেস-গান্ধী'স অ্যাওয়ার্ড ১৯৭০ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হবে। তার মানে চণ্ডিগড় পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হবে যদি আকালিরা ফজিলকা এবং আবোহরকে হরিয়ানার অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৮৩ সালের ২০ এপ্রিল আলোচনায় একই বক্তব্য উত্থাপন করা হয়। চণ্ডিগড় সংলগ্ন হিন্দুভাষী এলাকাগুলোকে ভাগ করতে আকালিরা সম্মত হয় কিন্তু ফজিলকা এবং আবোহরকে নয়। কারণ এটি হিন্দিভাষী বা সংলগ্ন গ্রাম ছিল না। ১৯৮৩ সালের ৩০ জুন সরকারি কোনো প্রতিনিধি ছাড়াই আকালি এবং বিরোধীদল একটি আলোচনা সভা করেন যা মিসেস গান্ধীর বিরক্তির কারণ হয়। তিনি এই ঐক্য বাতিল ঘোষণা করেন।

তিনি ১৯৮৩ সালের ২১ জুলাই বলেন, 'আমি কি হরিয়ানার জমি পাঞ্জাবে দিতে পারি? এটা কি আমার এলাকা?'^{১৮} অত্যন্ত বিরক্তির সাথে আকালিরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরবে। পরবর্তী মাসে অনুষ্ঠিতব্য এশিয়ান গেমসে সরকারবিরোধী শ্লোগান দেবার জন্য তারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে। খেলা চলাকালীন সময় বিবাদ প্রতিরোধের ব্যৱস্থা নেওয়ায় এবং মিসেস গান্ধীর এই ভূমকিতে সাড়া দেওয়ায় শিখদের মনে দৃষ্ট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। হরিয়ানার প্রধানমন্ত্রী ভজনলাভ পুলিশকে আজ্ঞা দেন যাতে দিল্লিগামী রেল বা সড়ক পথে সকল শিখকে বাধা দেওয়া, পরীক্ষা এবং প্রশ্ন করা হয়। যাদেরকে অপমান করা হয় তাদের মধ্যে ছিল পোশাকধারী আর্মি অফিসার^{১৯} এবং কংগ্রেসের সংসদীয় সদস্যরা। প্রথমবারের মতো একটি সম্প্রদায় হিসেবে শিখরা ধর্মীয় বিভেদের মুখোমুখি হয় এবং আকালি বা খালিস্তানিরা নয় বরং সরকারের গোলামরা তাদেরকে অন্যান্য ভারতীয়দের চাইতে আলাদাভাবে হিসেব করে।

মিসেস গান্ধী আকালিদের সাথে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। ১৯৮৪ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। নিউ দিল্লিতে গুরুদুয়ারা বাংলা সাহেবের সকল সমর্থকদের একত্রিত করেন এবং বলেন যে, আকালিদের ৩টি ধর্মীয় দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। যদিও তিনি আকালিদের সাথে মধ্যস্থতা করেন তবুও তিনি কংগ্রেস আকালিদেরই কৃতিত্বের দাবিদার মনে

১৮. ইবিদ, পৃ-২৩৮।

১৯. এর মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জসওয়ান্ট সিং বুলার এবং নারির সিং, যারা দুজনেই পরবর্তীতে ভিন্দারওয়ালের দলে যোগ দেন। বাধাপ্রাপ্ত এবং প্রশ্নজর্জরিতদের মধ্যে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার চিফ মার্শাল অর্জুন সিং এবং অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যিনি পরবর্তীতে আকালিদলে যোগ দেন এবং রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। এর মধ্যে আরও ছিলেন রাজ্যসভার কংগ্রেস সদস্য অমরজিৎ কর এবং তাঁর স্বামী।

করেন।^{২০} ১৯৮৪ সালে ত্রিদলীয় সম্মেলনে (সরকার, আকালি এবং বিরোধী দলীয় নেতাদের অংশগ্রহণে) যখন সবাই একটি মধ্যস্থতাকারী স্মারকে স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত হন তখন শিখবিরোধীরা হরিয়ানায় একত্রিত হয় এবং আকালিদের মধ্যস্থতা করতে বাধা দেয়।^{২১} সন্ত লাংওয়ালের নজরে অমৃতসর, চণ্ডিগড় এবং দিল্লির আকালি নেতাদের অকার্যকর পদক্ষেপ বিবেচিত হয়। একদিকে ছিলেন ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের, হিসেবী এবং বিচক্ষণ মিসেস গান্ধী অপরদিকে ছিলেন ভিন্দারওয়াল যিনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং গুলি বহন করতেন। তিনি একটি বক্তব্য প্রদান করেন, ‘আমি মিসেস গান্ধীকে বলতে চাই, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। তাকে আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ করতে হবে।’^{২২} একইসাথে তিনি একটি ১,০০,০০০ সৈন্যবিশিষ্ট সারজিয়ারী (জীবনুত) গঠনের ঘোষণা দেন যারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে আকালিরা তাদের ফিরে আসার বিপক্ষে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে থাকে।^{২৩}

BanglaBook.org

২০. তখন গুরুদুয়ারা দিল্লি কমিটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন এইচ.এস. মানচন্দ্র। ১৯৮৪ সালের ২৮ মার্চ তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

২১. ১৯৮৪ সালের ৩১ জুলাই ‘ইন্ডিয়া টুডে’র মতে, ১৯৮৪ সালের ২৫ মে যখন আকালি নেতা এবং সরকারি সদস্যদের মধ্যে গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় (পাঞ্জাবে সেনাবাহিনী প্রেরণের এক সপ্তাহ আগে) এবং সমঝোতা অর্জনে ব্যর্থ হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তিনজন মন্ত্রী পি.ভি. নরসিং রায়। প্রণব মুখার্জী এবং শিব শংকর দেশের সবচেয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করেন {দি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইজিং উইং (RAW)} এবং প্রধামন্ত্রীকে এগিয়ে যাবার এবং পাঞ্জাবে সেনাবাহিনী প্রেরণের পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বরাষ্ট্রসচিব পি.সি. আলেকজান্ডারের বাসভবনে অবস্থানকারী আকালি বা আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের কাউকেই এ ব্যাপারে জানতে দেওয়া হয়নি।

২২. ইন্ডিয়া টুডে, ৩০ এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ-১৬।

২৩. হরকিষণ রায় সরকারের একমুখীতার জন্য দোষারোপ করে বলেন ‘মিসেস গান্ধী ভিন্দারওয়াল তৈরি করেছেন। তিনি তাকে আকালিদের বিরোধী নেতৃত্বে উপনীত হবার জন্য তৈরি করেছেন যাতে তিনি তাঁকে ব্যবহার করতে পারেন। এখানে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। নিযুক্ত হবার ৩ দিনের মাথায় পি.এস. ভিন্দার (পুলিশ কমিশনার) একটি বিবৃতিতে বলেন, মন্দিরে কোনো সন্ত্রাসী নেই এমনকি লুকানো অস্ত্রও নেই। ১৯৮৪ সালের মার্চে রাজিব গান্ধী চণ্ডিগড় যান এবং ভিন্দারওয়ালর প্রশংসা করেন। দি পাঞ্জাব ট্রাইবুনস চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড রেসপন্স-এ প্রকাশিত নিখিল লক্ষণ-এর সাক্ষাৎকার থেকে গৃহীত, পৃ-৩৩৮-৯।

২১. সর্বনাশা ভুল

১৯৮৪ সালের ২ জুন সন্ধ্যায় টেলিভিশন সম্প্রচারের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আকালি এবং ভিন্দারওয়ালের বিরুদ্ধে গৃহীত কার্যসমূহের জন্য জাতিকে প্রস্তুত থাকতে বলেন। নতুন নতুন দাবি উত্থাপনের দায়ে এবং একের পর এক আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য তিনি আকালিদের দায়ী করেন। তিনি তাদেরকে দোষী হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব একটি গৌড়া এবং সন্ত্রাসী দলের হাতে জিম্মি যাদের লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার খুন, অগ্নিসংযোগ এবং লুট... তীর্থস্থানগুলোকে অপরাধী এবং খুনীদের আখড়া বানিয়ে রাখা হয়েছে। উপাসনালয়ে-এ ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করা হচ্ছে।'^২ তিনি তার বক্তব্যে ১৯৮১ পর্যন্ত মধ্যস্ততার চেষ্টাকে বর্ণনা করে বলেন, আমাদের (সরকারের) উদ্দেশ্য ছিল সকল সম্ভাব্য দাবি মেনে নেয়া।^৩ তিনি আকালিদের প্রতি তাদের সরকারের আচরণ বিশ্লেষণ করেন, স্বাধীনতার নামে আকালিরা দাবি করেছিল। তারা মধ্যস্থতা না করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং নদীর পানি ভাগ করার জন্য দায়ী করেন। তিনি একথা উল্লেখ করেননি যে তারা একটি মতৈক্যে পৌঁছেছিলেন এবং আকালিরা নন বরং তিনিই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। তিনি এমন পরিস্থিতি দাঁড় করান যে, সরকারকে বাধ্য হতে এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন করেন, 'আমরা এই নতুন পরিস্থিতিতে কী করতে পারি?' কয়েকমাস ধরে কোনো নির্দিষ্ট কাহিনীই ঘটেনি। যেমন নৃশংসতা ঘটেছিল ভিন্দারওয়ালের সময়। ভিন্দারওয়াল 'হিন্দু সরকার' এবং 'দিল্লি দরবার'-এর বিরুদ্ধে আকালি তাখত থেকে ঘৃণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।^৪ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা গুরু

১. পাঞ্জাব চরম ভুল বোঝাবুঝি, পাতওয়ান্ত সিং এবং হারজি মালিক কর্তৃক রচিত আর্টিকেল-এর শিরোনাম। (১৯৮৫)
২. দ্য হোয়াইট পেপার অন দি পাঞ্জাব এজিটেশন। ভারত সরকার ১৯৮৪, পৃ-১০৫-১০৭।
৩. ইবিদ, পৃ-১০৫।
৪. কৃষকদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন 'দি ভারত কিশাণ ইউনিয়ন (BKU) জল এবং বিদ্যুৎ বিল কমানোর এবং কীটনাশকের দাম কমানোর জন্য দুই বছর ধরে আন্দোলন করে আসছিল। ১৯৮৪ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে গম বাজার (মাণ্ডি) বয়কট করে এবং বাজারে কোনো গম পৌঁছাতে দেয়নি। দি হোয়াইট পেপার-বি.কে.ইউ.-এর আন্দোলনের ব্যাপারে কোনো কথাই বলেনি এবং আকালিদের উপরই পুরোপুরি দোষ চাপায়।

অর্জুনের শহীদ দিবস ৩ জুনকে তারাই নতুন আন্দোলনের জন্য বেছে নেয়। আকালি প্রতিনিধিদের খাদ্যশস্য আটক করতে বাধা দিয়ে পুলিশকে নির্দেশ না দিয়ে তিনি তীর্থস্থানে তাদের অনুশাসনের প্রতি অবিচার করেন এবং এতে সরকার বাধ্য হয়েছে বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ‘শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আকালিদের এই হুমকির আন্দোলন বন্ধ করতে অনুরোধ করেছি। আমরা যে সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েছি তা মেনে নিতে আহ্বান জানিয়েছি।’ তিনি সবশেষে বলেন, ‘আর রক্ত নয় বরং ঘৃণা বিসর্জন দিন।’^৫ একই সময় তিনি পূর্বে বর্ণিত কথার বিপরীত ঘটাতে পুলিশকে নির্দেশ দেন রক্ত ঝরাতে। তিনি এও জানতেন এতে স্বাধীনতা না আসা পর্যন্ত দেশে একটি ঘৃণা তৈরি হবে যা আগে হয়নি।

কয়েকমাস আগেই সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই স্বর্ণমন্দির আক্রমণে প্রস্তুত থাকতে পারে। মন্দির ভবনের একটি অংশে চক্রতা (মুসুরীর কাছে) তৈরি করে রাখা হয়েছিল যাতে ঘেরাও করা যায় এবং অস্ত্রধারীরা প্রবেশ এবং অবস্থান নিতে পারে। ভিন্দারওয়ালের যোদ্ধাদের শক্তি, অবস্থান, তাদের অস্ত্র সম্পর্কে পুলিশের তদন্ত সংস্থা এবং সেনাবাহিনী তথ্য সংগ্রহ করেছিল। এটা খুব একটা দুঃসহ কাজ ছিল না কেননা, হাজার হাজার লোক দিনরাত মন্দিরে আসতেন। এমনকি ভিন্দারওয়াল, তার সহকারী অমৃতসিং, তার ৩০০-৪০০ সৈন্যের কমান্ডার জেনারেল শাহবেগ সিং এবং জসওয়ান্ত সিং সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা মন্দিরের চারপাশে প্রতিরোধবাহিনীর দুর্গ পরিদর্শন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল কে.এস. সার। যিনি ছিলেন দাড়ি কামানো শিখ এবং অপারেশনের দলনেতা।

মিসেস গান্ধীর সাথে যারা আকালিদের সাথে সমঝোতার ব্যাপারে আলোচনা করেছিল তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং ভিন্দারওয়াল হাতেনাতে ধরার জন্য সেনা বাহিনীকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তা পালন করতে হয়। কিন্তু বিশ্বাস করার কারণ ছিল কেননা তার পরিচিত অরুণ নেহেরু, অরুণ সিং, দাড়ি কামানো শিখ যিনি নিজেকে পাঞ্জাবে পারদর্শী মনে করতেন, প্রতিরক্ষা বাহিনীর ডেপুটি মিনিস্টার কে.পি. সিং ডিও, তাঁর ছেলে রাজিব গান্ধী, কংগ্রেস দলের জেনারেল সেক্রেটারিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।^৬ সেনাবাহিনী টিলেঢালাভাবেই তাদের কাজ করছিল। দেশের সীমান্তবাসীদের প্রতিরক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়। নিজেদের লোকদের সাথে

৫. ইবিড, পৃ-১০৯।

৬. ১৯৮৪ সালের ২৩ মার্চ রাজিব গান্ধী অবশেষে বলেন, ‘আমার ধারণা আমাদের স্বর্ণমন্দিরে যাওয়া উচিত নয়। পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু ভালো সমতা বজায় রাখার প্রশ্ন উঠতে পারে। আজ আমরা যেভাবে শিখদের দেখছি আসলে তারা হিন্দুদের প্রতি তেমন নয়। তাদেরকে আলাদা করে এমন কিছুই আমাদের করা উচিত নয়।’ (দি পাঞ্জাব ক্রাইসিস, পৃ-২২৭)

যুদ্ধ করার জন্য নয়, পাঞ্জাবকে মিলিটারি শাসনের অধীনে এসে এই অলসভাব দূর করা হয়, ‘দি হোয়াইট পেপার অনুসারে’। ‘দেশকে আয়ত্তে রাখার জন্য সরকার দেশের নিরাপত্তা, একাত্মতা এবং সমগ্রতা বজায় রাখতে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিল যা সাধারণ আইনের মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছিল না।’^৭

পাঞ্জাবকে মিলিটারি শাসনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য মিসেস গান্ধী প্রেসিডেন্ট ও সুপ্রিম কমান্ডার জেনারেল জাইল সিংকে অনুরোধ করেন। যখন সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণে এসে গেল তখন সাধারণ কর্তৃপক্ষের এই নির্দেশ জারি করার প্রয়োজনীয়তা কমে গেল। মন্দিরের নির্মাণশৈলী সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট জাইল সিং কিছুই জানতেন না। ৩০ মে মিসেস গান্ধী তার সাথে একঘণ্টা আলোচনা করেন। এখানে তিনি আকালিদের সাথে নতুন সমঝোতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন। মিসেস গান্ধীর কল্পনার একটু আভাসও যদি তিনি আগে পেতেন তাহলে তিনি তাঁকে সতর্ক করে দিতে পারতেন। মিলিটারি শাসন জারি করলে অসংখ্য তীর্থযাত্রী তাদের শহীদ গুরুর স্মৃতি রক্ষার জন্য তৈরি হয়ে যাবে।^৮

এ থেকে বোঝা যায় মিসেস গান্ধী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সামরিক মনোভাব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। একটি আইনবহির্ভূত রিপোর্টে বলা হয়^৯ তিনি ব্যক্তিগতভাবে ভিন্দারওয়ালকে চিঠি লেখেন এবং রাজিব গান্ধীর বক্তব্যের সাথে একমত হয়ে বলেন, ভিন্দারওয়াল একজন নীতিবান কিন্তু রাজনৈতিক নেতা নন।^{১০} তিনি ভিন্দারওয়ালের শক্তি ও চাতুরি সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন স্বর্ণমন্দিরকে সম্ভ্রাসীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য অধিকাংশ শিখ সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাবে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, ব্রহ্মসম্মানে বাড়াতে থাকা উপাসকদের অনেকেই আকালি দল বা তাদের আন্দোলন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। এস.জি.পি.সি ভিন্দারওয়াল মন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গ গঠন করতে সাহায্য করুক তাও তারা চাইত না। তারা এর কোনোটির সম্মুখীন হয়নি। শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার-ব্যবহার পালনেই তারা ব্যস্ত থাকত। ভিন্দারওয়ালের কার্যকলাপের কোনো আভাসও তারা পেত না। শিখ জনতার কাছে মিসেস গান্ধী বা ভিন্দারওয়াল, আকালি দল বা কংগ্রেস পার্টি অথবা অন্য কোনো একক রাজনীতিক তেমন গুরুত্বই বহন করত না। তাদের কাছে স্বর্ণমন্দির এবং আকালি তাখ্তের পবিত্রতাই ছিল মুখ্য।

মন্দিরে সেনাবাহিনী প্রেরণের ফলাফল সম্পর্কে শুধু মিসেস গান্ধী বা তাঁর উপদেষ্টারাই যে বেহিসাবী ছিলেন তা নয়। বরং ভিন্দারওয়াল লোকদের তৈরি

৭. দি হোয়াইট পেপার অন দি পাঞ্জাব এজিটেশন, পৃ-০৩।

৮. সরকারের ‘দি হোয়াইট পেপার’ শহীদ দিবস বা মন্দিরে তীর্থযাত্রীদের অবস্থান সম্পর্কে কোনো তথ্যই দেয়নি।

৯. স্বর্ণমন্দির সংগ্রহশালার লাইব্রেরিয়ান দেবেন্দ্র সিং, ডুগ্গাল ১৯৮৪ সালের ৩ জুন ভিন্দারওয়ালে সম্পর্কে অবহিত হন এবং অপারেশন ব্লু স্টারের সময় তথ্যাদি আশুনে পুড়িয়ে ফেলেন।

১০. ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬ মে ১৯৮৪।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আর্মি কমান্ডারের ধারণাও ভুল প্রমাণিত হয় এবং আকাজক্ষার সমাপ্তি ঘটে^{১১}। তারা ধারণা করে একটি শক্তিম্যান ও পরবর্তী দৃঢ় সম্মুখ আঘাত তাদেরকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে।^{১২}

মিসেস গান্ধী সেনাবাহিনীকে সংকেত দিয়েছিলেন। কিন্তু তার তরুণ উপদেষ্টাদল এই অপারেশনকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে এটি নিকট সংঘর্ষে রূপান্তরিত করে। প্রধান সেনাকর্মকর্তা জেনারেল এ.এস. বিদ্যা, ডেপুটি লে. জেনারেল সুন্দরজী, জি.ও.সি ওয়েস্টার্ন কমান্ড-এর সাথে দুই শিখ জেনারেলের মুখোমুখি হয়। এদের মধ্যে ছিলেন চিফ অফ স্টাফ রনজিৎ সিং দয়াল, ওয়েস্টার্ন কমান্ড। তিনি পাঞ্জাব সরকারের প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা ছিলেন, তাকে সাহায্য করেছিলেন মেজর জেনারেল কে. এস. সার।

মিসেস গান্ধীর প্রচারণার কিছুদিন আগে থেকেই সেনাবাহিনী পাঞ্জাবে অবস্থান নিতে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সড়ক, রেল এবং আকাশ পথে বিপুল সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে ছিল ট্যাংক, মাউন্টেন গান, ডুবুরী এমনকি পুলিশের কুকুর। বিভিন্ন সেনাকৌশলী এলাকায় সত্তর হাজার পোশাকধারী মানুষ নিয়োগ করা হয়। এর অধিকাংশই ছিল অমৃতসরে এবং এর আশেপাশে। পাকিস্তান সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়।

২ জুন সেনাবাহিনীকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা হলো— পাঞ্জাব প্রদেশ ও চন্ডিগড় ইউনিয়ন এলাকায় চরমপন্থী ও কমিউনাল নৃশংসতা পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করা, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা...’। আর্মি কমান্ডাররা ভেবেছিলেন পতাকা মিছিল এবং কার্ফু জারি কড়াকড়িভাবে আরোপ করা হলে এবং পরবর্তীতে স্বর্ণমন্দির ও সন্দেহভাজন আরও চল্লিশটি মন্দির, যেখানে চরমপন্থীরা লুকিয়ে থাকতে পারে, যেখান থেকে বারবার ঘোষণা দিয়ে মানুষকে বেরিয়ে আসতে বলাই যথেষ্ট হবে।

আকালি দলনেতারা যেমন সন্ত লাংওয়াল, জি.এস. তোহরা, বি.এস. রামুওয়ালিয়া, বিধবা অমরজিৎ কর এবং আরও প্রায় ৩৫০ জন মন্দির পশ্চিম পাশে

১১. অপারেশনের পর একটি সাক্ষাৎকারে জেনারেল সুন্দরজী বলেন, তদন্তবাহিনী ছিল অপ্রতুল এবং বছরের সবচেয়ে কম সমন্বয় দল।’ এর আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। (চোপড়া, এগোনি অফ দি পাঞ্জাব, পৃ-২৭)। চারটি তদন্ত দল যারা তথ্য সংগ্রহ করেছিল তারা হল— সি.আই.ডি, আর.এ.ডব্লিউ, দি ইনটেলিজেন্স ব্যুরো এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। ১৯৮৪ সালের ১৩ জুন বিরোধী দলীয় নেতাদের কাছে বলা হয়, সরকারি তদন্তদল ব্যর্থ হয়েছে এবং মন্দিরে রক্ষিত অস্ত্রের পরিমাণ এবং ধারণা সম্পর্কে সেনাবাহিনী আশ্চর্য হয়েছে। (দি পাঞ্জাব ট্রাইবুনাল, পৃ-২৩০)।

১২. দি হোয়াইট পেপার পরিতাপের সাথে বলে যে, ‘সন্তাসীদের শক্তি এবং অবস্থান সম্পর্কে সরকারের তথ্যদাতারা যে তথ্য দিয়েছিল তা ছিল খুবই অপ্রতুল’। (পৃ-৪৪) ভিন্দারওয়ালের অনুসারী এবং অন্যান্যদল যেমন বাক্বর খালসা যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে অংশ নিয়েছিল তাদের সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা দেয়া হয়নি।

রান্নাঘর, সরাইখানা এবং আকালি দল ও এস.জি.পি.সি-এর কার্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা হয়ত সেনাবাহিনীর প্রস্তাব মেনে নিয়ে বেরিয়ে আসতেন কারণ তারা অহেতুক রক্তপাত এড়াতে চেয়েছিলেন— কিন্তু তারা ভিন্দারওয়ালের লোকদের ওপর কড়া নজর রাখছিলেন যারা মন্দিরের অপরপাশে এবং তিনটি টাওয়ারের নিচে অবস্থান করছিল। এর মধ্যে ছিল ২টি রামগরমা বাংকার এবং ওয়াটার টাওয়ার। এখানে বাব্বর খালসা তার গোপন আক্রমণকারী দল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।^{১৩} তারা এতটুকুই করতে পারতেন যে, ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করা যাতে তাড়াতাড়ি অপারেশন শেষ হয়ে যায়। ভিন্দারওয়াল তার ক্ষোভ এবং অবজ্ঞা উদগিরণ করতে থাকেন। এমনকি যখন পুরো মন্দির সেনাবাহিনী ঘিরে ফেলে তখন প্রেস কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞেস করেন লোকহীন এবং অস্ত্রহীন অবস্থায় তার পরিকল্পনা কী? সংখ্যা কোনো ব্যাপার নয়, সিং-এর চাইতে ভেড়া সবসময়ই বেশি থাকে... যখন বাঘ ঘুমিয়ে থাকে তখন পাখি কিচিরমিচির করে। কিন্তু বাঘ যখন জেগে ওঠে তখন পাখি উড়ে যায়।^{১৪} তিনি আরেকদল সাংবাদিককে বলেন, ‘যদি কর্তৃপক্ষ ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে ইন্দিরা পস্তাবেন। তাদেরকে আসতে দেন... আমরা তাদের কুচি কুচি করব।’^{১৫} এর আগে খালিস্তান স্বেচ্ছাসেবক তিনি যা বলেছিলেন তার চাইতেও বাড়িয়ে বলেন। আমি মোটেই এর প্রতিপক্ষ নই। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একে সমর্থন করি তাও বলতে পারি না। তার সহকারীদের সহায়তা তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেন, ‘সত্যি বলতে আমি মনে করি, শিখরা ভারতে বা ভারতের সাথে থাকতে পারবে না।’^{১৬}

১ জুনের মধ্যে সবাই চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সরকারের সংসদীয় বাহিনী, কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশবাহিনী (সি.আর.পি.এফ) এবং সীমান্ত প্রতিরক্ষাবাহিনী (বি.এস.এফ.) মন্দিরের ভিতরে অবস্থানরতদের প্রতি প্রকাশ্য গুলিবর্ষণ করে, এটা জানার জন্য যে কোথায় এবং কি ধরনের অস্ত্র তাদের কাছে আছে? আট ঘণ্টা অনুসন্ধান চালানোর পরও তাদেরকে প্রতিউত্তরে গোলাবর্ষণে বাধ্য করা সম্ভব হয়নি। মন্দিরের ভেতর অবস্থানরত এগারোজনের সকলে প্রাণ হারায় এবং ডজনখানেক লোক আহত হয়। রাত ৯টায় শহরে ৩৪ ধারা কার্ফু জারি করা হয়। সন্ত লাংওয়াল প্রেসিডেন্ট জাইল সিংকে টেলিফোনে পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সহকারী জানান, প্রেসিডেন্টকে পাওয়া যাবে না। লাংওয়াল জরুরিভিত্তিতে আকালি দলের হাইকমান্ড-এর মিটিং আহ্বান করেন। কিন্তু তোহরা ছাড়া আর কেউই উপস্থিত হননি। মিটিং ৪ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা

১৩. শেষ পর্যন্ত ৪ জুন যখন তোহরা ভিন্দারওয়ালের বিপরীতে অবস্থান নেন, তিনি কাপুরুষের মতো ফিরে আসেন।

১৪. দি সানডে অবজারভার, ১০ জুন ১৯৮২।

১৫. কুলদীপ নায়ার, ট্র্যাজেডি অফ পাঞ্জাব, পৃ-৯২।

১৬. ইবিদ।

হয়। লাংওয়াল মিসেস গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিতে তার সরকারকে দোষারোপ করে বলেন, ‘শিখদের উপর নতুন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।’ এবং তিনি তাঁকে সতর্ক করে বলেন, ‘পৃথিবীর যেখানেই শিখরা থাকুক-না কেন স্বর্ণমন্দিরের উপর বর্ষিত প্রতিটি বুলেট তাদের আঘাত করবে।’^{১৭} মন্দিরের প্রধান গ্রন্থী এবং উচ্চপদস্থ পুরোহিতরা শিখদেরকে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের ধ্বংস করতে আহ্বান জানান।^{১৮} প্রতিরক্ষার জন্য ডেকগুলোকে প্রস্তুত করা হয়। বিদেশীদের আগমনের উপর অনেক নির্দেশিকা জারি করা হয়, পাঞ্জাবি পত্রিকার উপর সেন্সরশীপ জারি করা হয়; সড়ক, রেল ও বিমান পথ বন্ধ করে দেয়া হয়। মন্দিরের বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়, ভবন অন্ধকার করে রাখা হয়, দুর্গের চারপাশে বেটনী দ্বারা আবদ্ধ করে রাখা হয়। ভিন্দারওয়ালের লোকেরা মশাল জ্বালিয়ে বিভিন্নস্থানে বাহিনীর অবস্থানের উপর নজর রাখে এবং তাদের অগ্রগতি প্রতিহত করে। প্রতিরক্ষাবাহিনীকে শক্তি প্রদর্শনে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩ জুন মন্দিরে দর্শনার্থীদের সংখ্যা (গুরু অর্জুনের শহীদ দিবস) সবসময়ের মতো ছিল না। কিন্তু যখন একঘণ্টার জন্য কার্ফু উঠিয়ে নেয়া হয় তখন এই দর্শনার্থীরা হাজারে হাজারে মন্দিরে আসতে থাকে। ২ জুন মিসেস গান্ধীর টেলিভিশন বক্তব্য দেয়া প্রস্তুত এবং প্রত্যাখ্যান করে সন্ত লাংওয়াল একটি বিবৃতি দেন। সেই সন্ধ্যায় (৩ জুন) মন্দিরের টেলিফোন সংযোগ এবং খাবার পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়। পরদিন সকালে (৪ জুন) পরিস্থিতি বদলে যায়। তিনটি টাওয়ারের চূড়া এবং উঁচু দালানে অবস্থান করে বাব্বর খালসার লোকেরা মন্দিরের উপর নজর রাখছিল। তাদের উপরই লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় তাদেরকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য। মাউন্টেইন গান দিয়ে তাদের ঘাটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

যদিও একই দলে ছিলেন বাব্বররা নিজেদের মতো কাজ করেন এবং কখনো কখনো জেনারেল শাহবেগ সিং-এর নির্দেশনাও মান্য করেননি। কিন্তু তাদের বিনাশ সেনাবাহিনীকে পূর্বদিক থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ সুগম করে দেয়। সেখানে রান্নাঘর, সরাইখানা এবং এস.জি.পি.সি.-এর কার্যালয়ের অবস্থান ছিল। প্রায় দুইশত এস.জি.পি.সি. এবং তাদের পরিবার বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর ভয়ে অন্যান্যরা যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায়। এরপর খবর আসতে থাকে যে, অমৃতসরের কৃষকশ্রেণী অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হতে থাকে তাদের গৌরো অস্ত্র নিয়েই।

তারা শহরে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেনাবাহিনীকে তাদের আক্রমণ বাড়াতে বাধ্য করে। হেলিকপ্টারের মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০-এর উপর বিশৃঙ্খলাকারীকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে ট্যাংক এবং অস্ত্র

১৭. এইচ.এস. বানওয়ার, ডেয়ারী ডে পান্না, পৃ-২১।

১৮. ইবিদ, পৃ.-২৪।

বোঝাই গাড়ি পাঠানো হয়। সেনাবাহিনীর কমান্ডাররা বুঝতে পারে সময় ফুরিয়ে আসছে। যদি তারা মন্দিরের প্রতিরোধবাহিনী সরিয়ে না নেয়, তাহলে শিখদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। তারা ৫-৬ জুন রাতের মধ্যেই কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এতে প্রাণ বা অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি যতই হোক-না কেন তা অবহেলা করে তারা। তাদের যা ছিল সব কিছুকে কাজে লাগায়। তাদের কমান্ডো, ডুবুরী, হেলিকপ্টার, গোলাভর্তি গাড়ি এবং ট্যাংক সব। তারা প্রথমে লঙ্গর (রান্নাঘর), সরাইখানা এবং এস.জি.পি.সি প্রাঙ্গণ ঘেরাও করে যেখানে আকালি নেতারা লুকিয়ে ছিল। একঘণ্টা পর মধ্যরাতে লাংওয়াল, তোহরা, রামু ওয়ালিয়া, অমরজিৎ কর এবং অন্যান্যরা সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।^{১৯} যখন এই ঘটনা ঘটছিল তখন বিশৃঙ্খলাকারীদের তুলে নেয়া হয় এবং ভিন্দারওয়ালের দুই শত্রুকে গুলি করা হয়। ভিড়ের মধ্যে একটি গ্রেনেড বিস্ফোরণ করা হয় (যদিও কেউ জানে না কাজটি কে করেছিল)। অনেককে হত্যা করা হয়। সেনাবাহিনী তিনদিক থেকে মন্দিরে প্রবেশ করে, যেখান থেকে তারা আকালি নেতাদের উদ্ধার করেছিল সেখান থেকেই প্রধান আক্রমণ শুরু করেছিল। অস্ত্র বোঝাই গাড়ি এবং ট্যাংক নিয়ে তারা মন্দির পরিক্রমায় প্রবেশ করেন। আকাল তাখ্ত এবং পাশের দালান থেকে অবিরত গোলাবর্ষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একটি গোলা বোঝাই গাড়ি রকেটের আক্রমণে স্থানচ্যুত হয়। ট্যাংক নিয়ে আসা হয়। এরমধ্যে একটি নিজের ভারেই ডুবে যায় এবং আটকে যায়। ট্যাংকের লাইট জ্বলে আকাল তাখ্তের উপর শেল ছোড়া হয়। একটি দর্শনী দিওধি হয়ে হরিমন্দিরের দিকে তৈরি রাস্তার দিকে যায়। আরেকটি আকাল তাখ্তকে আঘাত করে এবং অন্যান্য অট্টালিকা গুড়িয়ে দেয়।

এই যুদ্ধ পরিক্রমার প্রতিটি কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ভিন্দারওয়ালের লোকবাহিনী আর্মি জোয়ানদের আক্রমণের জন্য নিচ থেকে উঠে আসে। ৬ জুন সকাল নাগাদ সেনাবাহিনী মন্দিরের এবং এর চারপাশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে আনে। সকাল ৪.৩০ মি.-এর মধ্যে সেনাবাহিনী আকাল তাখ্ত নিয়ন্ত্রণে আনে। যুদ্ধ আরও দুইঘণ্টা চলে। জেনারেল সার বলেন, ‘চরমপন্থীরা শেষ পর্যন্ত লড়েছেন। ভূ-গর্ভে ভিন্দারওয়াল, অমুক সিং (যিনি কিছুদিন আগে বিয়ে করেছিলেন), ওয়াকিটকি হাতে শাহবেগ সিংয়ের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়।’^{২০}

১৯. যেভাবে আকালি নেতাদের ধরে নেয়া হল তা ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক। এ নিয়ে জেনারেল কে এস ব্রার-এর মত ছিল সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, (১৯৮৪, ১৬ জুন) ‘লাংওয়াল ও তোহরাকে যখন ঘেরাও করা হয়, তারা নিজেরাই আত্মসমর্পণ করে। তারা কোনো রেষারেষিতে যায়নি।’ চোপড়া, এ্যাগোনি অফ পাঞ্জাব, পৃ-৩১।

২০. জেনারেল জসওয়াল ভুলার বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষ থেকে দূরে ছিলেন। পরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন এবং খালিস্তানের বিস্তৃতি ঘটান।

আরও চল্লিশটি দুর্গম গুরুদুয়ায় সন্ত্রাসীরা অবস্থান করতে পারে বলে একই ধরনের যুদ্ধ পরিচালিত হয়। এরমধ্যে ছিল পাতিয়ালার দুখ নিবারণ এবং তরন তরন ও মোগার গুরুদুয়ারা।^{২১}

২১. সরকারের 'হোয়াইট পেপার'-এ ঘটনার যে বর্ণনা দেয়া হয়েছিল তা মন্দিরের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নয়, যারা অপারেশন ব্লু স্টারের সময় মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। মিসেস আমিয়া রাও-এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি গবেষণা দল তাদের সংস্করণ সংগ্রহ করে এবং ১৯৮৫-এর মে'তে পাঞ্জাবের সিটিজেন ফর ডেমোক্রেসিতে প্রেরণ করে। বিচারপতি ভি.এম. তারকুণ্ডের লেখা মুখবন্ধসহ তাদের প্রাপ্ত তথ্য কয়েকমাস পর প্রকাশিত হয়। 'রিপোর্ট টু দ্য নেশন : অপারেশন ইন পাঞ্জাব' নামক ঐ বইটি সরকার হরণ করে এবং নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৮৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পাঁচ গবেষকের সবাইকে গ্রেফতার করা হয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা আইনে সেনাবাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৮৩ এবং সন্ত্রাসী ও বিভেদ সৃষ্টিকারী আইন ১৯৮৫ অনুসারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। বইটি পুনরায় গোপনে ভারত এবং অন্যান্য দেশে ছাপা হয় এবং প্রকাশিত হয়। এই বইতে ১-৭ জুন ১৯৮৪ পর্যন্ত স্বর্ণমন্দিরে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা প্রকাশ করা হয়। দেবেঙ্গ সিং, দুগ্গাল শিখ রেফারেন্স লাইব্রেরীর পরিচালক যার বাসভবন ছিল লাইব্রেরীর পাশেই এবং সেখান থেকেই মন্দির প্রত্যক্ষ করেন, এস.জি.পি.সি.-এর সচিব বান সিং, মন্দিরের একজন পুরোহিত, জ্ঞানী পুরান সিং এবং অন্যান্য আরও অনেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবৃতি নিয়ে। নিরপেক্ষভাবে তারা বলেন, (ক) ১ জুন দুপুরের কিছুক্ষণ পর সি.আর.পি.এফ. গুলিবর্ষণ শুরু করে এবং সাত ঘণ্টা অব্যাহত রাখে। এমন কোনো সময় ছিল না যখন ভবন থেকে একটিও গুলি ছোঁড়া হয়নি। নিহত আটজনের মধ্যে ছিলেন একজন মহিলা ও একটি শিশু। (খ) ২ জুন ভেমন শোচনীয় কিছু ঘটেনি। কারফিউ তুলে নেয়া হয় এবং তীর্থযাত্রীদের শহীদ দিবসের আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। ২ জুন রাতে মন্দিরের বাইরে সি.আর.পি.এফ.-এর পরিবর্তে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। (গ) শহীদ দিবস উপলক্ষে মন্দিরে আগতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০,০০০ (৩ জুন)। এর মধ্যে ১৩০০ ছিল জাট যার ধারাম যুদ্ধ মোরচা'য় অংশগ্রহণ করতে আসেন (এর মধ্যে ২০০ জন মহিলা ও ১৮ জন শিশু ছিল)। তারা সকলেই মন্দির ভবনের গুরু রামদাস সরাইখানায় তেজা সিং সমুদ্রী হল অথবা পরিক্রমায় অবস্থান নেয়। (ঘ) সেনাবাহিনী কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই মন্দির ভবন আক্রমণ করে। ৪ জুন ভোর চারটার আগে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রথম গোলাটি আকাল তাখতের কাছাকাছি নিক্ষেপ করা হয়। সেনাবাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ করে। দুগ্গাল-এর মতে, 'একটি হেলিকপ্টার আকাশে ঘুরতে থাকে এবং উপর থেকে গুলিবর্ষণ করতে থাকে। কিছু হেলিকপ্টার আলো জ্বালিয়ে সেনাবাহিনীর গোলাবাহিনীকে উদ্দেশ্যের নির্দেশনা দিতে থাকে। গোলাকারে ঘোরার পর লক্ষ্যের দিকে ক্যাসন বল ছুঁড়তে থাকে যা সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। আমরা অনেক ছেলেকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখেছি। (ঙ) প্রধান উপাসনালয় হরিমন্দিরে প্রায় ৫০ জন পুরুষ ও মহিলা ছিল যাদের মধ্যে দুজন নিহত হয়, (চ) সেনাবাহিনী মন্দিরে প্রবেশের পর প্রকৃত প্রতিরোধ শুরু হয়। ভিন্দারওয়ালের মাত্র ১০০ জন লোক ছিল যুদ্ধ করার জন্য এবং ১০০ টিরও কম অস্ত্র ছিল যার মধ্যে বেশিরভাগই ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত ৩০৩ রাইফেল, ৩১৫ টি বন্দুক এবং কিছু স্টেনগান। সেনাবাহিনী যখন প্রবেশ করে তখন তাদের গোলা-বন্দুক ছিল প্রায় শেষের দিকে। মধ্যরাতের কিছু পর (৬ জুন সকালে) প্রায় ১টার দিকে একটি বন্দুকধারী গাড়ি এবং আটটি ট্যাংক ভবনের ভেতর প্রবেশ করে। (ছ) ৫ জুন সন্ধ্যায় দুগ্গাল রিসার্চ লাইব্রেরী ছাড়ার আগ পর্যন্ত সেখানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ১৪ জুন ফিরে এসে তিনি দেখেন সব ধ্বংস হয়ে গেছে। দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাকে একটি রশিদে স্বাক্ষর করতে বলা হয়। তিনি অসম্মত হলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। (রিপোর্ট টু দ্য নেশন : অপারেশন ইন পাঞ্জাব, ইউ.এস.এ.-এ প্রকাশিত পুনঃমুদ্রণ)।

দুইদিন পর (৮ জুন) প্রেসিডেন্ট জাইল সিং মন্দির পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী জাইল সিং-এর সাথে অর্জুন সিং এবং তার ব্যক্তিগত সচিব আর.কে. ধাওয়ানকে পাঠান যাতে তিনি এমন কিছু না বলেন যাতে সরকার বিব্রত হয়। জাইল সিং সবকিছু দেখে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হন। পবিত্র পুলে মহিলা ও শিশুদের লাশ তখনও ভাসছিল। যদি স্বজ্ঞের নিশানা মুছে দেয়ার জন্য হিংস্র উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তবুও মৃতদেহের দুর্গন্ধ এবং ধূমহীন বারুদের গন্ধে চারপাশ ছেয়ে গিয়েছিল। তিনি ভেঙে পড়েন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পাশের ভবনে লুকিয়ে থাকা একজন গুপ্তঘাতী তাকে হত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পেছনে থাকা দেহরক্ষী আহত হয়। মিসেস গান্ধীও কিছুদিন পর মন্দির পরিদর্শন করেন এবং ক্ষয়ক্ষতির বিস্তৃতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে যান। অপারেশন ব্লু স্টার-এ যে দুঃখজনক বিচারের ভুল এবং অপ্রত্যাশিত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা তিনি কাজক্ষিতভাবে বা রাষ্ট্র সাধারণভাবে সামনের দশকেও এর মূল্য দিতে পারবে না।

সরকারি মাধ্যম এবং সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হিন্দু প্রেসগুলো এই পদক্ষেপের ন্যায্যতা প্রকাশের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। পেশাদারী দক্ষতাসম্পন্ন প্রতিপক্ষের সাথে এমন একটি যুদ্ধে নৈপুণ্য প্রকাশের জন্য সেনাবাহিনীর বীরত্ব প্রকাশ করে এবং ইচ্ছেমতো ভাষায় ভিন্দারওয়ালকে গালমন্দ করে। এক্ষেত্রে বলা হয় যে, সেনাবাহিনীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে কেননা হরিমন্দিরের দিকে গুলিবর্ষণ থেকে তারা বিরত ছিল। এ কারণেই তা অক্ষত ছিল এবং ক্ষতের অবস্থানরত কেউ আহত হয়নি। উপস্থিত জনতা অবশ্য অন্য কথা বলে, তীর্থস্থানে অবিরত গুলির শব্দ হচ্ছিল এবং কমপক্ষে একতান ‘রাগী’ (গায়ক) নিহত হন।^{২২} কাহিনীতে বলা হয়, মন্দির প্রাঙ্গণে অসংখ্য মহিলা পাওয়া যায় যাদের মধ্যে পতিতা এবং বিদেশী হিপ্পিরাও ছিল। তাদের অনেকেই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। অন্যেরা গর্ভধারণ প্রতিরোধ করতে পেরেছিলেন। কেননা অনেক ব্যবহৃত কনডম ধ্বংসস্বূপে পাওয়া যায়। এছাড়া আফিম, হেরোইন ও হাসিসের স্তূপও পাওয়া যায়। অধিকাংশ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এসব কাহিনী ছাপা হতো। পরে সংশোধন করে লেখা হয় যে, মন্দির চত্বরে হিপ্পি এবং ঘুমের ওষুধ পাওয়া গেলেও বাইরে এর প্রচলন ছিল খুবই অল্প। ভিন্দারওয়ালের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার জন্য আরও কুৎসিত পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ নিয়ে আরও বলা হয়, তিনি তার লোকদের হাতেই নিহত হয়েছেন।^{২৩}

২২. এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর সাক্ষাৎকারে জেনারেল কে.এস. সার বলেন যে, সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে কারণ হরিমন্দির থেকে চরমপন্থীদের নিষ্ক্ষেপিত গুলির প্রত্যুত্তর দিতে তাদের বারণ করা হয়েছিল। হরিমন্দিরে এক হাজারেরও বেশি তাজা বুলেটের দাগ এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহের উদ্রেক করে হয় মন্দিরে কোনো চরমপন্থী ছিল না এবং ক্রসফায়ারের সময় ঐ দাগ হয়েছে, অথবা যদি তারা থেকেও থাকে তাহলে সেনাবাহিনী তাদের দিকে পাল্টা গুলি ছুঁড়েছে, চোপড়া দেখুন, এ্যাগোনি অফ পাঞ্জাব, পৃ-২৮-৩০।

২৩. ‘হিন্দুস্তান টাইমস’-এ (১৯৮৪, ৮ জুন)-র প্রথম পৃষ্ঠায় এম.কে. ধর-এর বক্তব্যকে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র ধরে বলা হয়, ভিন্দারওয়াল নিজেই নিজের জীবন নিয়েছেন।

আত্মসম্মানসম্পন্ন কোনো শিখ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কথা তোলেনি। ভীতসন্ত্রস্ত গেলো লোকেরা টিভি ক্যামেরার প্রতি বেশি আকর্ষিত ছিল এবং তাদের বানানো বক্তব্যই বারবার ক্যামেরার সামনে আওড়াতে থাকে। আকাল তাখ্তের প্রধান পুরোহিত জাঠাদার কিরপাল সিং তার হাতে বানিয়ে দেওয়া বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য হন এবং বলেন যে, ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে তা অত্যন্ত সামান্য।^{২৪}

এই ঘটনায় পুরো শিখ সম্প্রদায় অত্যাচারিত হয় এবং যেভাবে সম্ভব সেভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। ভারতের বিভিন্ন অংশে আটটি ক্যান্টনমেন্টে প্রায় ৪০০০ শিখ সেনা দল থেকে পালিয়ে যায়, অফিসারদের হত্যার চেষ্টা করে এবং অমৃতসর যাওয়ার চেষ্টা করে। তারা স্থানীয় পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। মুখোমুখি সংঘর্ষে উভয়দলের অসংখ্য লোক নিহত হয় এবং বাকি পলাতকরা গ্রেফতার হয়। লোকসভার দুজন সদস্য, একজন পাতিয়ালায় অমরিন্দর সিং, এবং মিসেস গান্ধীর দলের সদস্য ও কংগ্রেস পার্টি থেকে তাদের পদচ্যুতি দাখিল করেন। পাঞ্জাবের ব্যবস্থাপক সভার অনেক সদস্যও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। একজন শিখ কূটনীতিবিদ নরওয়েতে রাজনৈতিক আশ্রয় খোঁজেন। সিনিয়র পুলিশ অফিসার সিরধিং সিং মান মহারাষ্ট্রে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে ইস্তফাপত্র দাখিল করেন এবং অপ্রকাশ্যে চলে যান। পরবর্তীতে নেপালে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং শুনানির জন্য আটক রাখা হয়।^{২৫}

অনেক স্বনামধন্য শিক্ষিত ব্যক্তি যেমন ঐতিহাসিক গুপ্ত সিং, সাদু সিং হামদর্দ, অজিত-এর সম্পাদক ভগত পুরান সিং তাদের সরকার প্রদত্ত সম্মানসূচক ডিগ্রী ফিরিয়ে দেন। ভগত পুরান সিং আজীবন অজস্র ও কুষ্ঠরোগীদের জন্য কাজ করেছেন এবং পাঞ্জাবের দাড়িওয়ালা মাদার তেরেসা খেতাব পেয়েছিলেন। অপারেশন ব্লু স্টারের একমাস পর এবং অনেকবার স্থগিত থাকার পর ১০ জুলাই সরকার 'হোয়াইট পেপার অন দি পাঞ্জাব এজিটেশন'^{২৬} নামক গ্রন্থে সকল ঘটনা

২৪. গণমাধ্যমগুলো যে দুজন 'শুদ্ধ শিখ'-এর কাছ থেকে সেনাবাহিনীর পক্ষে সমর্থন লাভ করতে পারত তারা দুজনই ছিলেন সরকারি উচ্চপদপ্রার্থী। একজন ছিলেন চির-স্থলাভিষিক্ত ডাঃ গোপাল সিং দরদী এবং অপরজন প্রফেসর হারবান সিং। দরদী ছিলেন গোয়া, দমন এবং দিউ-এর লেফটেন্যান্ট গভর্নর। আকাল তাখ্তের নিয়মনীতি পুনঃনির্মাণের চুক্তিতে প্রফেসরের পরিবারকে খোরপোশ প্রদান করা হয়।

২৫. ভাগলপুর জেলখানায় থাকাকালীন মান আকালিদলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

২৬. ১৯৮৩ সালের ১৪ জুলাই সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটিতে এইচ.এস. সুরজিং এবং অন্যান্য বিরোধী দলীয় সাংসদরা সরকারকে একটি 'হোয়াইট পেপার' প্রকাশের দাবি জানায়। সরকার এ দাবি পূরণ করে। এর ক্রোড়পত্রে চীন নির্মিত এবং রাশিয়ান কাইয়াশনিকভ-এর ৫২টি রাইফেলের কথা উল্লেখ করা হয়নি। 'হোয়াইট পেপার'-এ নির্মাণকারী দেশগুলোর নাম পরিত্যাগ করা হয়। রাইফেল ও হালকা অস্ত্রগুলোকে অপারেশনের পর সরিয়ে নেয়া হয়। এটা এ কারণে যে, সেগুলো ছিল ভারতে নির্মিত। মধ্যম মানের মেশিনগান-এর কথা লুকিয়ে বলা হয় যে, সেগুলো আটক করা হয়েছে। এগুলোকে সেনাবাহিনীর মজুদ থেকে কয়েকমাস আগেই চুরি করা হয়েছিল। দেশে এবং মন্দিরে

প্রকাশ করে। একমুখী বক্তব্য ছাড়াও এতে অনেক অসংগতি ছিল। এর প্রধান বক্তব্য ছিল আকালি আন্দোলনের মাধ্যমে সৃষ্ট ভিন্দারওয়ালের সন্ত্রাসবাদ। যেহেতু আকালিরা তাকে দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিল তাই তাকে উৎখাত না করে সরকারের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু মূল বিষয় হলো ১৯৭৮ সালের ১৩ এপ্রিল থেকে নিরানকারীদের বিরুদ্ধে ভিন্দারওয়ালের সন্ত্রাসবাদ আগেই শুরু হয়েছিল। নিরানকারী গুরুবচন সিং এবং লালা জগৎ সিং-এর হত্যা, রেল রাস্তার ক্ষতিসাধন, দুটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই, প্রধানমন্ত্রী দরবারা সিং-এর প্রাণনাশের চেষ্টা এবং বহু সন্ত নিরাপকারীকে হত্যা করা এসব ঘটনাই ১৯৮২ সালের ৪ আগস্ট আকালিদের ধারাম যুদ্ধ মোরচা শুরু হবার আগেই ঘটেছিল।

‘দি হোয়াইট পেপার’-এ ভিন্দারওয়ালের সব অপকর্মের দায়ভার আকালিদের উপর চাপানো হয়। তাকে গড়ে উঠতে সরকারের ভূমিকা, খুনের দায়ে আটক করার পর তাকে মুক্তি দেয়া এবং বোম্বে ও দিল্লিতে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই সহকারীদের নিয়ে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া, রান্নার জন্য আনা মুদি সামগ্রীর সাথে অস্ত্র পাচার করা ইত্যাদির জন্য সরকারকে কোনোভাবে দায়ী করা হয়নি।^{২৭}

সরকারি বক্তারা কখনও কখনও সন্ত্রাসীদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ‘বিদেশী শক্তি’র (পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে পাকিস্তান বা যুক্তরাষ্ট্র অথবা উভয়ই) কথা উল্লেখ করেন। জম্মু ও কাশ্মীরে তাদের ক্যাম্পও স্থাপিত হয়েছিল। ‘দি হোয়াইট পেপার’-এ আরও বলা হয়, ‘বিদেশী উৎস থেকে সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন ধরনের সক্রিয় সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারটি বিশ্বাস করা যথেষ্ট যুক্তি সরকারের ছিল।’^{২৮} এখানে কানাডায় অবস্থিত একটি চরমপন্থী দলকে বোঝানো হয়েছে। তারা

পাচারকৃত অস্ত্র কীভাবে পৌছাত সে সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়া হয়নি। অথচ বিবৃতিতে বলা হয়, এগুলোকে ‘কার সেবা’ ট্রাকে করে আনা হয়েছিল। তাই বিএসএফ এবং সিআরপিএফ উভয়েরই মন্দির প্রাঙ্গণে কোনো কাজ ছিল না।

‘হোয়াইট পেপারের কাছে অসংখ্য গুলির ছিদ্র ইট গেঁথে বন্ধ করা হয়েছিল এমন দরজা ও জানালার ছবি ছিল। এর মধ্যে একটি ব্যক্তিগত বাড়ি ছিল যা মন্দিরের বাইরের দিকে অবস্থিত ছিল এবং এটি সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

২৭. পুলিশের আইজি পিএস ভিন্ডার স্বীকারোক্তি দেন যে, মন্দিরের রান্নাঘরের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহকারী ট্রাকগুলোতে তল্লাশি চালানো হয়নি, কেননা তিনি ‘দি টপ’-র পক্ষ থেকে মৌখিক নির্দেশনা পেয়েছিলেন। (উচ্চতর কর্তৃপক্ষের ভারতীয়করণ) *পাঞ্জাব, ক্রাইসিস*, পৃ-২৩০।

সরকারি মুখপাত্র প্রায়ই মন্তব্য করতেন যে, অস্ত্র এবং সন্ত্রাসীদের প্রশিক্ষণের উপকরণ যোগানে এবং ক্যাম্পও ‘বিদেশী হাত’ (পরিষ্কাররূপে বোঝালে পাকিস্তান বা যুক্তরাজ্য-অথবা উভয়ই) তারাই জম্মু এবং কাশ্মীর গঠন করেছিল। ‘হোয়াইট পেপারের মতেও’ সরকারের কাছে বিশ্বাসের কারণ ছিল যে সন্ত্রাসীরা বৈদেশিক উৎস থেকে নানারূপ সক্রিয় সমর্থন গ্রহণ করছে।’

২৮. মিসেস গান্ধী ১৯৭২ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবে বৈদেশিক হস্তক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন। দি হোয়াইট পেপারে একে বলা হয় ‘বৈদেশিক শক্তি’ এবং ‘বহিরাগত সমর্থন।’ একে দোষারোপ করে বলা হয়, সাধারণের জন্য বিস্তারিত যুক্তির কোনো দরকার নেই। গভর্নর বি.ডি. পান্ডে ১৯৮৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর বলেন পাঞ্জাব সংঘর্ষে বৈদেশিক কোনো শক্তির উপস্থিতি প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একজন জোহান ভান্ডারহস্টকে ভাড়া করেন। এজন্য যাবতীয় তথ্য ‘দি ভ্যানকুভার সান’-এর একটি রিপোর্ট থেকে নেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে স্পষ্ট অসামঞ্জস্য ছিল ‘দি হোয়াইট পেপার’-এ বর্ণিত মানুষের দুর্দশা ও পবিত্র সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বর্ণনায়। এতে বলা হয় ‘সাধারণ সন্ত্রাসী’দের ৫৫৪ জন নিহত ও ১২১ জন আহত হন। সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হিসেবে বলা হয় ৯২ জন নিহত (এর মধ্যে ৪ জন অফিসার ও ৪ জন জি.সি.ও. ছিলেন) এবং ২৮৭ জন আহত হন। এর কিছুদিন পর নাগপুরে বক্তব্য প্রদানের জন্য রাজিব গান্ধী বলেন সেনাবাহিনীর ৭০০ জনের অধিক মৃত্যুবরণ করেছে। (তিনি কিছুক্ষণ পরেই তার বক্তব্য ফিরিয়ে নেন)।

এই বক্তব্যে বোঝা যায় ‘সাধারণ সন্ত্রাসীদের’ নিহতদের সংখ্যা হয়ত বা ‘দি হোয়াইট পেপারে’ প্রকাশিত সংখ্যার সাতগুণ হতে পারে। অধিকাংশ প্রত্যক্ষদর্শী এই সংখ্যা ১৫০০ থেকে ৫০০০ বলে উল্লেখ করেন যাদের মধ্যে অধিকাংশই তীর্থযাত্রী, মহিলা ও শিশু।^{২৯} যারা মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদের নাম প্রকাশের জন্য সরকার কোনো আগ্রহই প্রকাশ করেনি। এমনকি গ্রেফতারের পর যাদেরকে নিভৃতে হত্যা করা হয়েছিল তাদের নামও নয়।^{৩০}

২৯. কুলদ্বীপ নায়ার বলেন, ‘প্রায় ১০০ অনুরক্ত ব্যক্তি, যার মধ্যে ৩৫ জন মহিলা ও ১০ জন শিশু তাদের প্রাণ হারায়’; ট্র্যাজেডি অফ পাঞ্জাব, পৃ-১০২। ‘দি নিউইয়র্ক টাইমসে’ নিহতদের সংখ্যা ১২০০ উল্লেখ করা হয় (১৯৮৪, ১৭ অক্টোবর) এবং শিকাগো ট্রাইবুনে বলা হয় ২০০০ (১২ জুন, ১৯৮৪)।

৩০. অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস-এর বক্স চেল্লানি, যিনি সেনাবাহিনী থেকে সুকৌশলে পালিয়ে এসেছিলেন এবং পুলিশের বেড়াডাল ছিন্ন করতে পেরেছিলেন, অনেক ময়নাতদন্ত করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল এমন লোক যাদের নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে গুলি করা হয়েছিল এবং সন্ত্রাসীরা প্রথমে তাদের হাত পিছনে বেঁধে নিয়েছিল। ১৯৮৪ সালের ১৪ জুন দি টাইমস অফ লন্ডনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। চেল্লানীকে গ্রেফতারের জন্য সমন জারি করা হয়।

সিভিল লিবার্টির পিস্তল কাউন্সিলেও ‘ব্ল্যাক ল’স (পৃ-৫৭) একই ধরনের ধ্বংসাত্মক বর্ণনা দেয়া হয়, ‘স্বর্ণমন্দিরে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম হওয়ার সময় সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে নাম না জানা অনেক মহিলা ও শিশুও ছিল। ময়নাতদন্তে বলা হয় নিহতদের অনেকের হাত পিছনে বাঁধা ছিল। নিহতদের মধ্যে ১৬ জন ছিল বাবা খড়ক সিংয়ের সেবাদার যারা বাবা শাম সিংয়ের গুরুদুয়ারার ডেরা থেকে এসেছিল। স্বর্ণমন্দির থেকে ৫০ গজ দূরে অবস্থিত বাবা খড়ক সিং ছিল শান্তি ও শান্তিকামীদের প্রতীক। ৭ জুন ৭০ বছর বয়স্ক জগীন্দর সিং এবং ১৮ বছর বয়সী হরদেব সিংসহ ১৬ জনকে ডেরা থেকে বের করে আনা হয়। হাত পেছনে বেঁধে তাদেরকে আত্মমন্দির বাজারের রাস্তায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং বি.এস.এফ-এর সদস্যরা ডি.সি.এম-এর দোকানের সামনে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। বিহার সেনাদল এবং বি.এস.এফ-এর সদস্যরা ডেরা থেকে বিভিন্ন জিনিস লুট করে এবং ৭০,০০০ টাকা মূল্যের প্রায় $\frac{2}{3}$ কেজি স্বর্ণ সরিয়ে ফেলে। গুরুদুয়ারার গ্রন্থির মাধ্যমে আমরা তা জানতে পারি। হত্যা এবং লুটতরাজ এই সংবাদ একজন প্রত্যক্ষদর্শী নিশ্চিত করেন।’

সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, হরিমন্দিরের কোনো ক্ষতিসাধন করা হয়নি। অপারেশন ব্লু স্টার সংঘটিত হবার কিছুদিন পর অনুমতিপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করেন এবং স্বর্ণ-পত্র ও মার্বেলে অসংখ্য তাজা বুলেটের চিহ্ন দেখতে পান।^{৩১}

সরকার আরও বিবৃত করে যে, মন্দিরের সংগ্রহশালায় হাজারখানেক দুর্লভ হাতে লেখা গ্রন্থের কপি এবং গুরুদের স্বাক্ষরযুক্ত হুকুমনামা ছিল যা যুদ্ধের সময় পুড়িয়ে ফেলা হয়। সংগ্রহশালার সংরক্ষক ডি.এস. দুগ্গাল নিশ্চিত ছিলেন যে, যুদ্ধের পর সন্তাসীরা সংগ্রহশালায় আগুন ধরিয়ে দেয় এবং মন্দিরের হিসাব সংক্রান্ত হাতে লেখা কাগজগুলো ধ্বংস করে। এই সময়ের মধ্যে তারা এস.জি.পি.সি, আকালি দল এবং ইন্ড্রি আকালিদের অফিসে ঢুকে পড়ে এবং মূল্যবান বস্তু খুঁজে বের করে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। ভবনে প্রায় ডজনখানেক উপাসনালয় ছিল যার প্রতিটিতে গোলক ছিল (কয়েন এবং টাকা জমা রাখার জন্য ধাতবপাত্র)। সেনাবাহিনীর অভিযানের পর এদের একটিও পাওয়া যায়নি। মন্দিরের রান্নাঘরে শত শত তীর্থযাত্রীদের জন্য খাবার রান্না করা হতো অথচ সব বাসনপত্র ডাকাতি হয়ে গিয়েছিল। অস্থানান্তরযোগ্য অমূল্য সম্পদের মধ্যে ছিল একটি রত্নখচিত শামিয়ানা। এটি হায়দারাবাদের নিজাম মহারাজা রনজিত সিংকে উপহার দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে মহারাজা স্বর্ণমন্দিরে দান করে দেন। বিরোধী দলীয়রা কঠোরভাবে ‘দি হোয়াইট পেপার’-এর সমালোচনা করে। বিজেপির প্রেসিডেন্ট অটল বিহারী বাজপেয়ী সেনাবাহিনীর অভিযানে প্রশংসা করেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, ‘এটি অনেক পরিস্থিতি সামলানোর চাইতে সুকৌশলে তা এড়িয়ে যায়।’ ইন্ডিয়া টুডেতে এই অভিযানকে ‘অপারেশন হোয়াইট ওয়াশ’ আখ্যা দেয়া হয়।^{৩২}

সেনাবাহিনীর এই আচরণ যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দুঃখ প্রকাশ করে। যখন তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রীর উপরে উঠে যায়, তখন কয়েদীরা (যাদের শত্রু বলে বিবেচনা করা হতো) পানি পান করতে অস্বীকার করে। অনেককে আলকাতরা মেশানো নুড়ির উপর পেট দিয়ে গড়িয়ে চলতে বাধ্য করা হয়, সৈন্যরা পবিত্রস্থানে জুতা পরে চলাচল করে এবং তাদেরকে উত্তেজিত করার জন্য রাম ও ধূমপান করানো হয়। এর একমাস পরও আকাল তাখতের ধ্বংসাবশেষের বাইরে সাইনবোর্ড ঝোলানো ছিল। এখানে সৈন্যদেরকে মন্দির প্রাঙ্গণে মদ্য ও ধূমপান থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করা হয়।

দি হোয়াইট পেপারে যে প্রশ্নটির উত্তর এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেটি হলো ভিন্দারওয়াল ও তাঁর লোকদের শায়েস্তা করার জন্য ট্যাংক ও আর্টিলারীর মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো ছাড়া অন্য কোনো পথ অবলম্বন করা যেত কিনা? মন্দিরের নকশা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বিকল্প অনেক পথ ছিল। মন্দিরের তিনটি প্রধান প্রবেশদ্বার ছিল। এর মধ্যে দুটি ছিল উত্তর পাশের, একটি ছিল ঘড়ি মিনারের দিকে মুখ করা

৩১. কুলদীপ নায়ার কমপক্ষে ৩০০ বুলেটের চিহ্ন শনাক্ত করেন। একজন বীর (গ্রন্থী) বুলেট দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন।

৩২. ইন্ডিয়া টুডে, ৩১ জুলাই ১৯৮৪।

এবং অপরটি ছিল রান্না ঘরের সেরাই এবং এস.জি.পি.সি-এর অফিসের দিকে ও তৃতীয় প্রবেশদ্বারটি ছিল উত্তরমুখী যা খুব কম ব্যবহৃত ছিল। এর পাশাপাশি অনেক সরু গলি ছিল যা প্রতিবেশী এলাকার বাসিন্দারা অনেক বেশি ব্যবহার করত। তাদের প্রত্যেককে পুলিশ ও প্যারামিলিটারি সদস্যরা সেনাবাহিনী অভিযানের আগে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেত। পূর্বদিকে অবস্থিত মন্দিরভবন থেকে আকাল তাখতের বেশ দূরত্ব ছিল। এবং অব্যবহৃত একটি রাস্তা বাজারের দিকে গিয়েছিল। সব মিলিয়ে বের হবার সময় ভিন্দারওয়ালর সাথে ৩০০-৪০০-এর বেশি লোক ছিল না। দর্শনার্থী ও সাংবাদিকদের সাথে মিলিত হবার সময় তার চাইতে ডজনেরও কম দেহরক্ষী থাকত। জীবন ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে আরও শক্তিশালী করার জন্য সাদা পোশাকের কম্যান্ডোরা ঘুরে বেড়াত। আকাল তাখতকে প্রাচীর দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়, খাবার পানি ও রেশম বন্ধ করা হয় এবং এর বাসিন্দাদের গ্যাসে পুড়িয়ে মারা হয়।^{৩৩} কিন্তু সরকার কি কারণে তা জানা যায়নি, প্রথমে শাসক দলের নেতাদের মাধ্যমে ভিন্দারওয়ালকে নেতা হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। পুলিশ ও প্যারামিলিটারি বাহিনী চোরাই পথে আসা অস্ত্র মন্দিরে নেয়ার পর দেখেও না-দেখার ভান করেছিল। আবার সরকারই ট্যাংক ও ভারী বন্দুক দিয়ে সেনাবাহিনীকে আদেশ দিয়েছিল স্বর্গমন্দির ধ্বংস করতে। মিসেস গান্ধী শিখদের নাকে ঘুষি দিয়ে রক্ত ঝরিয়েছিলেন।^{৩৪} শিখরা ক্ষমা করতে পারত। অপারেশন ব্লু স্টারে কিছু করার ছিল এমন কাউকে তারা ভুলে যেতে ক্ষমা করতে পারত না।

মন্দিরের ধ্বংসযজ্ঞ চালানোতে শিখরা বিশ্বব্যাপী তাদের গুরুদুয়ারাগুলোকে প্রার্থনার আয়োজন করেছিল। ভারতীয় দূতাবাস এবং বাণিজ্যদূত-এর বাসভবনের সামনে প্রচুর শিক্ষামূলক কাউন্সিলের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতের অনেক স্থানে বাঁধাদানকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং অনেকে প্রাণ হারায়।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাঞ্জাবের ক্ষতিপূরণের কথা চিন্তা করেন এবং শিখদেরকে সন্দেহভাজন না ভাবার জন্য লোকদের আহ্বান জানান। তিনি শিখদের এও প্রস্তাব দেন, ‘তারা যাতে বিভক্ত হবার কথা না তোলে।’^{৩৪}

কীভাবে ক্ষতিপূরণের ইংগিত দেয়া হয়েছিল তা আরেক কাহিনী শিখদের প্রতি এমন আচরণ করা হতো যেন তা সন্দেহভাজক, বিচলিত ও বিভেদের স্বীকার। সরকার এমন আইন পাস করলো যাতে পুলিশ এবং সাধারণ কর্মকর্তারা

৩৩. ভারতীয় সেনাবাহিনীরা ইসরাইল ও জার্মানির কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারত, তারা কীভাবে সন্ত্রাসী দলকে হাতে আনা যায়। কেননা তারা তাদের দেশের বহু মাইল দূরে অবস্থানকারী যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। ১৯৮৮ সালের মে মাসে যখন সন্ত্রাসীরা একইভাবে স্বর্গমন্দিরে অস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে তখন পুলিশের তীরন্দাজ বাহিনী তাদের ২০০ জনকে অস্ত্রসমর্পণ করতে বাধ্য করে এবং মন্দিরে ঢুকতে দেয়নি। এই অভিযান চলাকালে ২ জনকে হত্যা করা হয় এবং ব্ল্যাক থাভার নামের আরেকজন আত্মহত্যা করে।

৩৪. ১৯৮৪ সালের ২৫ জুন শ্রীনগরে (গারওয়াল) দেয়া বক্তৃতা থেকে যা ইউ.এন.আই. প্রকাশ করেছিল।

সমন ছাড়াই লোকদের গ্রেফতার করতে পারে এবং বিনাবিচারে তাদের আটক রাখতে পারে। যাদের আটক রাখা হতো তাদের পক্ষ নেওয়ার মতো কাউকে বেছে নেয়ার অধিকার ছিল না, বাদীকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত রেখে তাদের কারণ দর্শানোর সুযোগ ছিল না এবং তারা নিজেদের নিষ্পাপ প্রমাণ না করা পর্যন্ত তাদেরকে দায়ী ধরে নেয়া হতো। পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে বিশেষ আদালত স্থাপন করা হয়েছিল। এসব আদালতের ক্যামেরার মাধ্যমে শুনানির ক্ষমতা ছিল এবং কোনো আপিল ছাড়াই বিচার করার অধিকার ছিল।^{৩৫} যেহেতু সন্তাস নির্মূলের জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দেয়া হয়েছিল তারা উডরোজ নামক আরেকটি অভিযান চালায়। গ্রামের পর গ্রাম ঘিরে রাখা হয়। শিখদের ঘরবাড়িতে তাদের কাছ থেকে অস্ত্রের খোঁজ নেয়া হয় (হিন্দুরা কখনোই নয়)। শিখ তরুণদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রহার ও অত্যাচার করা হয়। সেনাবাহিনীর এই আচরণের সমালোচনা করা হয় গণবিদ্রোহের মাধ্যমে। যাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ, পলাতক ঘোষণা ও গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তারা।^{৩৬}

মানবাধিকার সংগঠন যেমন পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টির প্রধান বিচারক ভি.এম. তারকুন্ডে পাঞ্জাবে অধ্যাদেশ ও দমন আইন কীভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল তা নিয়ে গবেষণা করেন। আইনের ব্যর্থতার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রমাণ হয় অপারেশন ব্লুস্টারের সময় স্বর্ণমন্দিরে ৩৭৯ জন লোক নারী ও শিশু আটক করার ঘটনা থেকে।^{৩৭}

৩৫. বাস্তবে রূপান্তরিত নির্মম ও কঠোর আইনসমূহের তুলনায় ছিল আভ্যন্তরীণ গোপনীয়তা রক্ষা আইন (এম.আই.এস.এ), ১৯৭১ পাঞ্জাবের জন্য একটি বিশেষ আইন চালু করা হয় যার নাম ছিল টেরোরিস্ট এন্ড ডিসরাপটিভ অ্যাক্টিভিটিস (প্রিভেনশন) আইন, ১৯৮৫।

৩৬. এই পুস্তকের পৃ-৪৯, চণ্ডিগড় ইউনিয়ন এলাকায় মেজর জেনারেল ভিরেন্দর সিং, ব্রিগেডিয়ার জগীন্দর সিং ধীলন এবং নভোরঙ সিংকে গণবিদ্রোহের দায়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পি.এস. পূর্ব চণ্ডিগড়ে ১৯৮৪ সালের ১৫ জুলাই রেজিস্ট্রিকৃত এফ.আই.আর. নং-৪৬০/৮৪-এ বলা হয় দোষী ব্যক্তির উদ্দীপক বক্তৃতা প্রদান করেছেন। এফ.আই.আর.-এ বলা হয়, যখন আটককৃত ব্যক্তির সেনা অভিযানের সমালোচনা করেছেন এবং সেনাবাহিনী কীভাবে লোকদেরকে গ্রেফতার করেছে তখন তাদের মন্তব্যে কোনো উস্কানিমূলক কিছু ছিল না। তারপরও চণ্ডিগড়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ১৯৮৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর দোষারোপ করে বলেন, জগীন্দর সিং ধীলন পালিয়ে গিয়েছেন অথবা নিজেকে গোপন করার চেষ্টা করেছেন এবং ১৯৮৫ সালের ৩০ জানুয়ারি আদালতে তার উপস্থিতি দাবি করেন। অপর দুই দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ আনা হয়। এ সত্ত্বেও তিনজনই চণ্ডিগড়ে তাদের বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন।

৩৭. এদের মধ্যে ছিলেন ইন্ড্রজিৎ কর (৩৫) নামক একজন মহিলা। তিনি ৪ সন্তানের জননী ছিলেন এবং মন্দির সংলগ্ন বাজারে থাকতেন। অন্যান্য অনেকের মতো তিনিও মন্দিরে প্রার্থনার মাধ্যমে দিন শুরু করতেন। অন্য সবার মতো তাকেও মন্দির থেকে তুলে নেয়া হয়। ন্যাশনাল সিকিউরিটি আইনে তাকে বন্দি করে রাখা হয়। তাকে গ্রেফতারের কারণ একটি প্রতিলিপিতে লেখা হয় এবং অপরাধ স্বীকারনামা তৈরি করা হয়। সেখানে তাকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। স্বীকারনামায় বলা হয় আমি এই বক্তব্য দিচ্ছি যে, আমি অমৃতসরের আত্মমন্দিতে বসবাস করি এবং আমি সর্বভারতীয় শিখ ছাত্র সংসদ ও খালসা দলের একজন সদস্য। এই সংগঠনগুলোর প্রেসিডেন্ট ছিলেন ভাই অমৃক সিং।

সম্ভ্রাসবাদ উচ্ছেদ এবং বিভক্তিকরণের অনুভূতি থেকে দূরে সরে অপারেশন বুস্টার ও উডরোজ বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেয় এবং শত শত শিখ যুবক-যুবতীকে সম্ভ্রাসী করে তোলে। যারা সেনাবাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করতে পারে। তাদের অনেকেই সীমানা পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে যায় এবং একে তাদের অভিযানের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তোলে। ইংল্যান্ড, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমব্যর্থীদের দেয়া অর্থ দিয়ে তারা পাকিস্তান থেকে আরও উন্নত অস্ত্র সহজেই কিনে আনে। তারা সম্ভ্রাসী কর্মকাণ্ড সাধন করতে পারত কেননা সেনাবাহিনীর নৃশংসতার পর জনগণ তাদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছিল।

অপারেশন বু স্টারের পর শিখরা আজ্ঞাপালন করবে এবং সরকারের সাথে সমঝোতায় আসবে এমন ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়ে যায়। চাপা ক্ষোভ তাদের ভেতর একটি সাম্প্রদায়িক একতা সৃষ্টি করে। সন্ত লাংওয়াল এবং তোহরা এবং তার পর বাদল এবং বর্ণালাকে কারারুদ্ধ করে সরকার আকালিদের নেতৃত্বে একটি শূন্যস্থান তৈরি করে। তাদের স্থানে আরও উদ্দীপিত মানুষেরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তোলার জন্য এগিয়ে আসে। অভিযানের একমাস পর তারা শিখ জনতাকে একটি শহীদী জাট (শহীদ দল) সংগঠনের আহ্বান জানায়। তারা স্বর্ণমন্দিরকে সেনাবাহিনীর কজা থেকে রক্ষা করার জন্য অমৃতসরগামী একটি মিছিল আহ্বান করে। তারা আরও ঘোষণা দেয় যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী স্বর্ণমন্দিরে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তাকে স্মৃতি করে রাখার জন্য আকাল তাক্তকে সেই অবস্থানেই রাখা হবে।

এই সংগঠনগুলো সন্ত ভিন্দারওয়ালের সাথে সংযুক্ত ছিল এবং আমরা সন্ত জার্নাইল সিং-এর কথামতো কাজ করতাম। শিখদের একটি আত্মনির্ভরশীল সত্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমাদের লক্ষ্য ছিল একটি আলাদা প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত করা (খালিস্তান) যার একটি আলাদা সংবিধান থাকবে। এই অভিযান সম্পন্ন করার জন্য আমরা বিদেশ থেকে প্রচুর অস্ত্র, গোলাবারুদ, বোমা এবং বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলাম। যাতে খালিস্তান নামক শিখ প্রদেশ অর্জনের জন্য আমরা সরকারকে আঘাত করতে পারি। এই লক্ষ্যে ৬০০০ লোক একত্র করা হয় এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল শাহবেগ সিং তাদেরকে অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেন। তিনি দরবার সাহেব অমৃতসরের দর্শনার্থী ও সরকারের কাছে আমাদের উদ্দেশ্য গোপন রাখেন। ৫.৬.৮৪-এ দরবার সাহেব ঘিরে থাকা প্রতিরক্ষা বাহিনী আমাদেরকে দরবার সাহেব থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সতর্ক করে দেয়। তাদের সতর্কতা সংবাদে প্রায় ১২০ জন দরবার সাহেব থেকে বেরিয়ে আসে। আমরা দলবদ্ধ ছিলাম। গোলাগুলির জন্য ১০.৮.৮৪ পর্যন্ত প্রতিরক্ষাবাহিনী সাথে ছিল। অন্যরা ছিল আমাদের সংগঠনের সক্রিয় সদস্য।

আমি এবং অন্যান্যরা শক্তিশালীভাবে অংশগ্রহণ করি। দরবার সাহেবে প্রবেশ করার পর প্রতিরক্ষাবাহিনী আমাদের বাঁধা দেয়। সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষের সময় আমাদের অনেক কর্মী নিহত হয়। দরবার সাহেবের পাশ্বের্তী অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী অনেক অস্ত্র সরিয়ে নেয়। এর পাশাপাশি পাকিস্তানি সৈন্যরাও আমাদের সাথে হাত মেলায় এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সরকার সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় গুলি করে দরবার সাহেব ধ্বংস করে দেয় এবং শিখদের হত্যা করে। প্রতিটি নিহত শিখের বদলে আমরা চারজনকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেব। এমনকি ছাড়া পাবার পরও আমরা অস্ত্র ও সমর্থকদের একত্রিত করব এবং আলাদা প্রদেশ খালিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করব।' ব্ল্যাক লস ১৯৮৪-৮৫, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস, দিল্লি, পৃ-৬৫-৬।

যুদ্ধভাবাপন্ন এই মনোভাব আবার জাগ্রত হওয়ায় সরকার সতর্ক হয়ে যায়। মিসেস গান্ধী যত দ্রুত সম্ভব আকাল তাখত পুনর্নির্মাণের জন্য বুটা সিংকে নির্দেশ দেন। আকালি নেতাদের অনুপস্থিতিতে একমাত্র প্রধান পুরোহিতের সাথেই তিনি আলোচনা করতে পারতেন। এমনকি আকাল তাখতের জ্ঞানী কিরপাল সিং এবং হরিমন্দিরের সাহেব সিং আগেই সেনাবাহিনীকে খোলা চিঠি পাঠিয়েছিল। এতে লেখা ছিল—শিখ জাতির ক্ষুধ্রতা ও তাদের আদেশ পালনে অপারগতার কথা। বুটা সিং বাবা খড়ক সিংকে প্রস্তাব পাঠান। তিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় সন্ত যিনি সারাজীবন গুরুদুয়ারায় জনকল্যাণমূলক কাজে পার করেছেন। খড়ক সিং তীব্রভাবে বুটা সিংয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন, শুধুমাত্র প্রধান পুরোহিতের নির্দেশেই তিনি করসেবা করবেন। বুটা সিং শরবত খালসা আয়োজনের মাধ্যমে প্রধান পুরোহিতকে হাত করার চেষ্টা করেন এবং বুদ্ধ দলের প্রধান সন্ত সিং নিহাংকে নেতৃত্ব প্রদানে রাজি করেন।^{৭৮} সন্ত সিংকে প্রেসিডেন্ট করে ১৯৮৪ সালের ১১ আগস্ট সরকার আয়োজিত শরবত খালসা অনুষ্ঠিত হয়। দরবার সিংয়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস দলের শিখ সদস্যরা ছাড়াও সরকারের যাতায়াত খরচে আসা অনেক ধার্মিক ব্যক্তি অমৃতসরে আসেন। তিনি বলেন, ‘তারা সবসময় নিরীহ শিখদের লক্ষ্য করে তাদের সুবিধা ও সম্পদের অপব্যবহার করেছে।’^{৭৯} সন্ত সিং তোহরাকে মন্দির থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দেন।^{৮০} সরকার শিখ গুরুদুয়ারা আইনের ছলনায় এস.জি.পি.সি’কে ব্রিডা করে মন্দিরের কার্যসমূহ সামলানোর জন্য। অনেক পরিকল্পনা করা হয় এবং বুটা সিং ও দরবারা সিংকে আকাল তাখত নির্মাণে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমতা দেয়া হয়। সন্ত সিং নিহাং এবং ১৫০ জন অনুসারী ছাড়াও কিছু শিখ এতে সহায়কারীর ভূমিকা পালন করে। সি.পি.ডব্লিউ.ডি-এর তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ কাজের চুক্তি ঠিক করা হয়। গম্বুজের জন্য সরকার স্বর্ণ দান করে।^{৮১}

যখন নির্মাণ কাজ চলছিল তখন প্রধান পুরোহিতকে আবার শরবত খালসার সমন পাঠানো হয়। চলাচলে বাধা দেয়ার জন্য পাঞ্জাব সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। তারা অমৃতসর-এ যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয় এবং গ্রামের প্রধানদেরকে সতর্কতা জারি করে দেয়। সরকার আয়োজিত সভার চাইতে ১৯৮৪ সালের ১-২ সেপ্টেম্বর আয়োজিত শরবত খালসার দ্বিগুণেরও বেশি লোক সমাগম ঘটে। এই সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট জার্নাইল সিং, বুটা সিং ও সন্ত সিং নিহাংকে টাংখাজিয়া

৩৮. সন্ত সিং নিহাং ছিলেন একজন অস্বাভাবিক মানুষ যার বিরুদ্ধে ভাং (হাসিস)-এর আসক্তির অভিযোগ ছিল। তিনি নিজেকে সুলতান-উল-কওম-সম্প্রদায়ের শাসক মনে করে জীবনযাপন করতেন।

৩৯. ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ-৭০।

৪০. ইন্ডিয়া টুডে, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ-৩৮।

৪১. চুক্তিকারী প্রতিষ্ঠান ছিল মেসার্স ক্বিপার কনস্ট্রাকশন কোম্পানি এবং নয়াদিল্লির ভাই বীর সিং মদনের প্রফেসর হরবন সিং-এর পুত্র তেজওয়ান্ত সিং। প্রফেসর সিং সরকারকে অবিরত সমর্থন যুগিয়েছেন।

উপাধি দেয়া হয়। এতে আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সেনাবাহিনী যদি ১ অক্টোবরের মধ্যে মন্দির ভবন ত্যাগ না করে তাহলে তারা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মিসেস গান্ধী। ১৯৮৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি মন্দির থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। ‘এখন ক্ষতিপূরণ সম্পন্ন হয়েছে, স্বর্ণমন্দিরে বিন্দুমাত্র সেনাবাহিনীর উপস্থিতিও এখানে প্রত্যাহার করা হবে।’^{৪২} প্রেসিডেন্ট জাইল সিং ক্ষমতা হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সৃষ্টির অভিযোগও তুলে নেয়া হয়। তিনি প্রধান পুরোহিতের সমর্থন লাভ করতে সফল হন। অনুষ্ঠানে তার বক্তব্য ছিল ক্ষমা প্রার্থনাসূচক। তিনি বলেন, ‘এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আমি সকল গুরুর কাছে আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।’^{৪৩} আকাল তাক্তের জাঠাদার কিরপাল এই বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করেন, ‘যদি সরকার এভাবেই শিখ বিরোধী আচরণ অব্যাহত রাখে এবং আমাদের সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মতো আচরণ করে তাহলে শুধুমাত্র দেশের একতাই বিপদগ্রস্ত হবে না, সাম্প্রদায়িক অশান্তিরও সূচনা হবে।’

তারা এ.আই.এস.এস.-এর বাতিলের নীতিতে প্রত্যাহারের দাবি জানায়। তারা আরও দাবি জানায় আকালি নেতাদের মুক্তি, শিখ তরুণদের অবাধ প্রবেশের বন্ধ করা এবং সেনাবাহিনী অভিযানের শিকার হওয়া পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার।^{৪৪} প্রেসিডেন্ট জাইল সিংয়ের বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলার অভিযোগ তুলে নেয়া হয়। বুটা সিংয়ের ভাগ্য ততটা সুপ্রসন্ন ছিল না। তার অনেক দায়িত্ব ছিল কারণ তার অধিকাংশ ভোটদাতারা ছিল শিখ এবং কয়েকমাস পরও নির্বাচন হবার কথা ছিল। তিনি এস.জি.পি.সি. ভাবনার পুনর্নির্মাণের বিরুদ্ধে তর্ক অব্যাহত রাখেন এবং পাকিস্তানি মুদ্রার পুনর্ব্যবহারের বিরোধিতা করেন। কিন্তু প্রধান পুরোহিত তার কথায় একমত হননি।

১৯৮৪ সালের ১ অক্টোবর স্বর্ণমন্দির থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। এস.জি.পি.সি.’কে ক্ষমতা না দিয়ে প্রধান পুরোহিতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। সেনাবাহিনীর অভিযান হিন্দু ও শিখদের মধ্যে অনেক বিভেদ সৃষ্টি করে। হিন্দুরা একে স্বাগত জানায় কিন্তু শিখরা তা করেনি এবং খালিস্তান আন্দোলনে জার্নাইল সিং ভিন্দারওয়াল প্রথম শহীদ হন। এই বেহিসেবীর জন্য ভারতকে মূল্য দিতে হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নীরব ঘাতক হিসেবে সবচেয়ে বড় বেহিসাবী হিসেবে ভূষিত হন।

৪২. ইন্ডিয়া টুডে, ১৪ অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ-৫৫।

৪৩. এই পুস্তকের পৃ-৪৫।

৪৪. এই পুস্তকের পৃ-৩৫।

২২. বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক গোপন হত্যা এবং তারপর

শিখদের সম্পর্কে যারা জানত তারা এও জানত যে, শিখরা তাদের মন থেকে হরিমন্দির ও আকাল তাক্ত-এর পবিত্রতা কখনোই মুছে ফেলতে পারবে না। যারা এর প্রতি কোনোরকম অসদাচরণ করবে, ক্ষমা না চাওয়া পর্যন্ত তারা তাদের ক্ষমা করবে না। শিখদের মনে নৃশংসতা ও শহীদী উৎকর্ষ খুব ভালোভাবে গেঁথে যায়। ১৯৮৪ পর্যন্ত অনেক শিখ নিজেদের অপরিবর্তিত প্রমাণের জন্য প্রস্তুত ছিল। যখন সেনাবাহিনী স্বর্ণমন্দির ঘিরে রেখেছিল তখন ভিন্দারওয়ালের অনেক সমর্থক তা থেকে বের হয়ে আসার সাহস রাখত। তারা জানত, গ্রেফতার হলে তাদের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হবে না এবং তারা যদি আরও অপরাধ করে তাহলে তাদের গুলি করে বা ফাঁসিতে ঝোলানোর চাইতে খারাপ আর কিছু করা হবে না। এমন অনেকে ছিল যা স্বর্ণমন্দিরের ক্ষয়ক্ষতি দেখে পবিত্র গ্রন্থের নামে শপথ করেছিল যে, যারা এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তাদেরকে প্রয়োজনে হত্যা করবে, অথবা এই পথে মৃত্যুবরণ করতেও কুষ্ঠাবোধ করবে না।^১ তাদের তালিকাশীর্ষে ছিল প্রেসিডেন্ট জাইল সিং, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তাঁর পুত্র ও পরিবার, সেনাবাহিনী কর্মকর্তা প্রধান এ.এস. বিদ্যা^২, যেসব অফিসার মন্দিরে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোয় অংশগ্রহণ করেছিল এবং অন্যদের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল।

এটা ছিল একটি জানা বিষয়। সতর্কতামূলক প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও জোরদার হয়। যারা বিপদের আশংকায় ছিলেন তাদেরকে বুলেট প্রতিরোধ পোশাক এবং ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দেওয়া হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিখুঁত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা

১. ১৯৮৪ সালের জুলাইয়ে নিউইয়র্কে মিসেস গান্ধীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করার জন্য দিল্লি এয়ারপোর্টে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জর্জী সিংকে গ্রেফতার করা হয়। ১ আগস্ট আদালতে হাজির হবার পূর্বে ব্রিগেডিয়ার বলেন, 'আমি একটি মিথ্যা মামলায় ফেঁসে গেছি, তারা বলছে, আমি নাকি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করতে চাই।' (ইন্ডিয়া টুডে, ৩১ আগস্ট ১৯৮৪, পৃ-৫৫)। আসামীকে পরবর্তীতে মুক্ত করে দেয়া হয়।
২. ১৯৮৬ সালের ১০ আগস্ট পুনায় ৪ জন বন্দুকধারী গোপনে জেনারেল বিদ্যাকে হত্যা করে। খালসা কমান্ডো ফোর্স এই অপরাধের দায়িত্ব নেয়। জেনারেলকে তার জীবনের প্রতি হুমকি দেয়া হয়েছে বহুবার। তিনি বলেছেন বলে উল্লেখ আছে যে, 'যদি একটি গুলিও আমার দিকে ছোঁড়া হয়, তাহলে তা হবে আমার নামখচিত বুলেট।' (ইন্ডিয়া টুডে, ৩১ আগস্ট ১৯৮৬, পৃ-২৬)।

হয় মিসেস গান্ধীর জন্য। ১ সফদার জন রোডে অবস্থিত তার বাসভবন এবং পাশের ভবনে অবস্থিত সচিবগণের বাসভবনে সার্বক্ষণিক পাহারার ব্যবস্থা করা হয় এবং দর্শনার্থীদের ধাতব ডিটেক্টর ও বডি সার্চ করে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হতো। একটি অ্যাম্বুলেন্স ভর্তি প্রয়োজনীয় রক্তের বোতল ও একজন ডাক্তার সবসময় প্রস্তুত রাখা হতো। সিকিউরিটি অফিসাররা মিসেস গান্ধীকে তার বাসভবনে শিখ পাহারাদার না রাখার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য করেননি।^৭

১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর সকালে বাসার সকল কাজ শেষ করে তিনি তার অফিসের সামনের বাগান দিয়ে হেঁটে আসছিলেন বি.সি.সি.-এর দলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। যে বেষ্টনী দিয়ে বাগানটি দু'ভাগে বিভক্ত ছিল, সেটি অতিক্রম করার সময় তার দু'জন শিখ প্রতিরক্ষী তাঁকে প্রকাশ্যে গুলি করে এবং তার নিখর দেহে আঠারোটি গুলি গুঁথে দেয়। উপস্থিত অন্যান্য রক্ষীরা আক্রমণকারীদের দিকে গুলি ছোঁড়ে। দু'জনকেই জীবিত গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু তাদের একজন বেয়াস্ত সিং (৩৮)কে হাতাহাতি লড়াইয়ে হত্যা করা হয়। অপরজন সাতওয়ান্ত সিং (২১) গুরুতর আহত হন এবং তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। মিসেস গান্ধী প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা তার ইতালিয়ান পুত্রবধূ সোনিয়াকে চার কি.মি. দূরে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সাইন্সেস-এ (এ.আই.আই.এম.এস) নিয়ে যাওয়া হয়।

গোলাগুলির সময় প্রেসিডেন্ট জাইল সিং উত্তর ইয়েমেনে প্রাদেশিক সফরে ছিলেন। মিসেস গান্ধীর পুত্র রাজিব তখন কলকাতায় ছিলেন। বি.বি.সি সকাল ১০টায় (আই.এস.টি) এই হামলার কথা প্রচার করে। অল-ইন্ডিয়া রেডিও আরও একঘণ্টা পর এই সংবাদ প্রকাশ করে। মিসেস গান্ধী দুপুর ২টায় মৃত্যুবরণ করেন। খবরটি প্রধান প্রধান প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অল ইন্ডিয়া প্রচারিত ৬টার সংবাদে তাঁর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করা হয়। সকল জাতীয় পত্রিকায় বিশেষ সংবাদ প্রচার করা হয় যে, আক্রমণকারীরা ছিল 'দু'জন শিখ এবং একজন দাড়িহীন শিখ' যা প্রশাসনের নির্দেশ ছিল।^৮

৩. এটা ধারণা করা যায় যে, মিসেস গান্ধী তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বেই অবগত ছিলেন। এর আগেরদিন (৩১ অক্টোবর ১৯৮৪) তার দলের জন্য ভোট প্রার্থনার সময় উড়িষ্যায় তিনি এই সম্ভাবনার কথা বলেন, 'যদি আমি মারা যাই....'

৪. ভারতীয় প্রেসের জন্য এটি একটি শতসিদ্ধ ব্যাপার যে সাম্প্রদায়িক হত্যার জন্য ধর্মীয় সম্পর্ককে কখনো প্রচার করা হয় না। দু'জন শিখকে হাতেনাতে গ্রেফতার করার পর তৃতীয় একজন দাড়িবিহীন শিখ-এর উপস্থিতি ছিল রহস্যজনক। মিসেস গান্ধীর হত্যাকারী হিসেবে তিনজনকে দায়ী করা হয়। এদের মধ্যে ছিল সাতওয়ান্ত সিং, কেহর সিং এবং বলবীর সিং (এর সাথে মৃত বিয়াস্ত সিংও) দিল্লির অতিরিক্ত সেশন জজ মহেশ চন্দ্র তিনজনকেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। দিল্লি হাইকোর্টে বিচারপতি এস. রসোনাতান, বি.এন. কিরপল এবং এম.কে. চাওলা'র সম্মতিতে ১৯৮৬ সালের ৩ ডিসেম্বর এই রায় নিশ্চিত হয়। সাতওয়ান্ত সিং (পরবর্তীতে খারিজকৃত)-এর স্বীকারোক্তি, বলবীর সিং-এর দলিল প্রমাণ, বিয়াস্ত সিং-এর স্বীয় এই প্রমাণের প্রতি সমর্থন, বিমল

পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের তিন বছর পর মিসেস গান্ধীর হত্যাকাণ্ড ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার চেষ্টা করে। যদিও পাঞ্জাবে নিহতদের মধ্যে হিন্দুদের মতো শিখরাও ছিল হত্যাকারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল শিখ। তাই পুরো শিখ সমাজকেই দায়ী করা হয় এবং তাদের শাস্তি কামনা করা হয়। শিখ নেতারা ভিন্দারওয়াল বা নিম্পাপ হিন্দুদের সন্ত্রাসী দল কর্তৃক হত্যার বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলতে পারেননি। এতেই শিখ-বিরোধী অনুভূতিতে আরও আক্রোশ যুক্ত হয়।

৩১ অক্টোবর বিকেলে এ.আই.আই.এম.এস-এর চারপাশে ভিড় বাড়তে থাকে এবং নিম্নশ্রেণীর শিখ জনতা চারপাশে জড়ো হয়। দিল্লি আসার পথেই প্রেসিডেন্ট জাইল সিং মিসেস গান্ধীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি বিমানবন্দর থেকে সরাসরি এ.আই.আই.এম.এস. চত্বরে চলে আসেন। মিসেস গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর তিনি যখন রাষ্ট্রপতি ভবনের দিকে আসছিলেন তখন দাঙ্গা সৃষ্টিকারীরা তার গাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করে। কেন্দ্রীয় সভা, কংগ্রেস দলের সিনিয়র নেতা বা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীদের সাথে পরামর্শ না করেই প্রেসিডেন্ট জাইল সিং রাজিব গান্ধীকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

রাজিব গান্ধী তার মন্ত্রীসভা পুনরায় সাজান এবং প্রতিরক্ষা ও বিদেশিক দায়িত্ব নিজের অধিকারে রাখেন।

শিখ-বিরোধে আকস্মিক আক্রমণ পুলিশের সহজ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিহত করা কোনো ব্যাপারই ছিল না। মিসেস গান্ধীর গুণহত্যার পর একটি নির্মম কাহিনীর সূচনা হয় যাতে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা একটি বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হয় যা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর কখনো দেখা যায়নি।

এ.আই.আই.এম.এস. থেকে দাঙ্গাকারীরা চারপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং পুলিশ তাদের বাধা দেয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি। সূর্যাস্তের পর শিখ মালিকাবীন দিল্লির প্রধান শপিং সেন্টার, কনোট সার্কেলে লুটতরাজ চলে এবং অগ্নিসংযোগ করা

কর খালসা এবং একজন পুলিশের জবানবন্দির ভিত্তিতে এই রায় প্রদান করা হয়। (ইন্ডিয়া টুডে, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৬)।

৫. পরবর্তীতে বোম্বের ম্যাগাজিন 'অনলুকার'-এর সাথে সাক্ষাৎকারে জাইল সিং বলেন, 'তিনি যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার তিন সদস্য প্রণব মুখার্জী, পি.ডি. নরসিমা রাও অথবা পি.সি. শেঠীর সাথে পরামর্শ করতেন তাহলে কংগ্রেস পার্টি ভেঙে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এই মুহূর্তে সময়ে এই বিভক্তি দেশের জন্য কোনো মঙ্গল বয়ে আনত না। কেননা কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো যোগ্য দল ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'আমি আরও চেয়েছিলাম নেহেরু-গান্ধী রাজবংশের প্রতি আমার ঋণ কিছুটা হলেও পরিশোধ করতে। শত হলেও আমি পণ্ডিতজীর (নেহেরু)-এর প্রতীকী এবং মিসেস গান্ধী আমাকে প্রথম ইউনিয়ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেছেন এবং আমাকে দেশের সর্বোচ্চ অফিসে নির্বাচিত করেছেন। পরিশেষে আমার মতে রাজিব গান্ধী আধুনিক মানসিকতাসম্পন্ন, জনগণের প্রতিচ্ছবি, মনোহর ব্যক্তিত্ব এবং আরও অনেক গুণাবলীর অধিকারী। তিনি দেশে ও বিদেশে সমাদৃত। দেশের এই দুঃসময়ে তিনি জাতিকে সাড়া দিতে পারবেন। (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৮ ফেব্রুয়ারি)।

হয়। বিশাল জনতা এই দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। উপস্থিত বিশাল পুলিশ বাহিনী নিষ্কর্ম দর্শকের মতো এ দৃশ্য অবলোকন করে। শিখ চালিত ট্যাক্সি, ট্রাক, ত্রিচক্রযান ও স্কুটার চূর্ণ করা হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। বিভিন্ন স্থানে ধোঁয়ার মেঘ দেখা যায়। সন্ধ্যার আকাশ জ্বলন্ত অশ্বরের মতো হয়ে ওঠে। পুরো শহরে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে থাকে এবং পানি দেয়া না হলে এই আগুন পুরো শহরকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। যদিও কোনো শিখ নিহত হবার খবর পাওয়া যায়নি।

কেন্দ্রীয় সরকার বা দিল্লি প্রশাসন কেউই এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় পদক্ষেপ নেয়নি। পরবর্তীতে প্রকাশিত হয় যে, দিল্লি প্রশাসন স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশ পালন করেছিল এবং যেসব প্রদেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল সেসব প্রদেশে পুলিশকে ঘটনায় কোনো হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়। শিখদের এমন শিক্ষা দেয়া উচিত, যাতে তারা তা কখনও ভুলে না যায়। প্রাথমিক স্বতস্ফূর্ত শিখবিরোধী কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং উত্তর ভারতের অধিকাংশের মাঝে বিরাট বিস্ফোরক আকার ধারণ করে। তামিলনাড়ুতে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া কংগ্রেস শাসিত এ-ছাড়াও এ-ধরনের নৃশংসতা ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় নেতাদের মধ্যে সংসদ সদস্যও ছিলেন, এসব কর্মকাণ্ডের ইন্ধন যোগান।

অপারেশন ‘শিখদের শিক্ষা দাও’ ৩১ অক্টোবর রাতে একটি সতুন গতি পায়। গুজব রটানো হয় যে, শিখরা রাস্তায় ভাংরা নৈঁচে, গৃহে অলোকসজ্জা করে এবং মিষ্টি বিতরণ করে মিসেস গান্ধীর মৃত্যুর আনন্দ উদ্‌যাপন করছে।^৬ এরপর গল্প ছড়ানো হয় যে, পাঞ্জাব থেকে দিল্লিগামী ট্রেনে শিখরা হিন্দুযাত্রীদের হত্যা করেছে। মধ্যরাতের দিকে আরও গুজব রটে যে, শিখরা দিল্লির খাবার পানিতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে।^৭ এরই মধ্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত টি.ভি. (দূরদর্শন) অবিরত প্রচার, মিসেস গান্ধীর মৃতদেহের ছবি এবং দুঃখজর্জরিত রাজিব গান্ধীকে দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাতের ছবি প্রচার করতে থাকে এবং এর ফাঁকে ফাঁকে জনগণকে শ্লোগানরত অবস্থায় দেখানো হয়, ‘খুনকে বাদলা খুনসে লেগে’— আমরা রক্তের প্রতিশোধ রক্তেই নেব, ‘ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ’— ইন্দিরা গান্ধী চিরজীবী হোক। ক্ষেত্র প্রস্তুতের পর পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে গ্রামবাসীকে সেনাবাহিনী কমিশনের ট্রাক দিয়ে নিয়ে আসা হয়। তাদের হাতে লোহার রড ও গ্যাসোলিনের কৌটা ধরিয়ে দেয়া হয়। পুলিশ তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না বলে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়।

৬. স্বাধীন সংগঠন কর্তৃক তদন্তে জানা যায় যে, ভারতের কোনোস্থানেই এ ধরনের উৎসব উদ্‌যাপনের একটিও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইংল্যান্ড, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের কিছু ক্ষুদ্র দল এ ধরনের আনন্দ উদ্‌যাপন করেছিল।

৭. পিপলস ইউনিয়ন অফ ডেমোক্রাটিক রাইটস এবং পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস-এর রিপোর্ট অনুসারে, উভয় গুজব ছড়িয়ে পড়ায় প্রমাণিত হয় যে, ‘পুলিশরা ভ্যানে চড়ে কিছু এলাকায় লাউড স্পীকার দিয়ে ট্রেন আসা ও পানিতে বিষ মেশানোর খবর ছড়ায়।’ হ আর দি গিল্টি? পৃ-২।

তরুণ জাট, গুজ্জার এবং নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের তাদের আত্মরক্ষার জন্য জড়ো করা খুব বেশি কঠিন ছিল না এবং তাদের যা আছে তা নিয়েই তারা সমৃদ্ধ শিখদের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত ছিল। এই নিখর লোকদের যে বিষয়টি উদ্বেগ করেছিল তা হলো লুটতরাজের শপথ, হত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং ধর্ষণ। তারা যা করেছে তার প্রতি আরও যুক্তি যোগ করার জন্য এইসবের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার জন্য তাদের মধ্যে ক্ষোভ বা দুঃখ কোনো কিছুই ছিল না।

শিখদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। তারা দিল্লির মোট জনসংখ্যার ৭.৫ শতাংশ ছিল এবং বাকি ৮৩ শতাংশই ছিল হিন্দু। মুসলিমরা একটি নির্দিষ্ট মহল্লায় (এলাকায়) থাকত এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার অভিজ্ঞতা তাদের ছিল। কিন্তু শিখরা তাদের মতো ছিল না। তারা হিন্দুদের সাথেই বসবাস করত এবং তাদের কাছ থেকে কোনো নৃশংসতায় ভয় পেত না। শিখরা মুসলিমদের মতো না হওয়ায় তাদের দূর থেকে সহজেই আক্রমণকারীরা চিনতে পারত। ভোটের লিস্ট থেকে শুরু করে সরাসরি দাঙ্গাকারীদের হাতে রাখা কংগ্রেস দলের কর্মীদের সাথে শিখদের ঘরবাড়ি, দোকান ও অন্যান্য সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল। তাই ১ নভেম্বর থেকে শিখ হত্যার কার্যকলাপ পুরোদমে শুরু হয় এবং ৩ নভেম্বর মিসেস গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্যন্ত অবিরাম চলতে থাকে। দিল্লিতে প্রায় শ'খানেক গুরুদুয়ারায় অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং শিখদের ঘরবাড়ি, দোকানপাট এবং কারখানায় হামলা করে এবং লুট করে নিয়ে যায়। শিখ যুবতীদের গণধর্ষণ করা হয় এবং যেসব শিখদের বয়স ১৫ থেকে ৫০ বৎসরের মধ্যে ছিল তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ট্রেন এবং বাস থামিয়ে শিখ যাত্রীদের নামিয়ে হত্যা করা হয়। ট্রেন দুর্ঘটনার শিকার অনেকেই ছিলেন পোশাকধারী সেনা অফিসার। একটি বিশেষ পন্থায় তাদের হত্যা করা হয়। নির্যাতিতদের প্রথমে লোহার শিখ দিয়ে পেটানো হতো, তারপর তাদের উপর পেট্রোল ঢালা হতো এবং জীবিত দাহ করা হতো। এই অগ্নিকাণ্ডের শেষ পর্যায়ে হত্যাকাণ্ডে আরও নিপুণতা যোগ করা হয়। প্রথমে নির্যাতিতের হাত পিছমোড়া করে বাধা হয়, তারপর জ্বলন্ত গাড়ির টায়ার তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, অনেকটা জ্বলন্ত পুস্পমাল্যের মতো।^৮

ঐ চারদিনে কত শিখ নিহত হয়েছিল তার সংখ্যা নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব। সরকার নিয়ন্ত্রিত মাধ্যম এবং অফিসিয়াল এজেন্সীর ইস্যুকৃত পত্রিকায় এই সংখ্যা ৪০০-এর কম প্রকাশ করা হয়। এটা ধারণা করা হয় যে, প্রথম দুই দিনে নিহত শিখদের স্ত্রী এবং যারা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল এমন লোকের সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। দিল্লির পাশাপাশি হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, রাজস্থান,

৪. শিখদের রক্ষা করার জন্য পাঞ্জাবি হিন্দুদের এগিয়ে আসার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। হিন্দু সংগঠন যেমন বি.জে.পি. এবং আর.এম.এস.ও একই পদক্ষেপ নেয়।

মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশেও শিখ হত্যা ছড়িয়ে পড়ে। ভয়াবহ হামলার শিকার হয় কানপুর, লক্ষৌ, রাঁচি, উত্তর প্রদেশের রাওরকেলা এবং বিহারের শহরগুলো। নিহত শিখ-এর সংখ্যা ১০,০০০ হলেও অতিরিক্ত বলা হবে না (রাজধানীতে বসবাসকারী জনতার অর্ধেক)^৯।

শিখদের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয় করা দুরূহ ছিল, কেননা এর মধ্যে ছিল বিশাল প্রতিষ্ঠান যেমন তিনটি বোতল নির্মাণকারী সংস্থা। এর মালিক ছিল মেসার্স পিওর ড্রিংকস। যার মূল্য কম করে হলেও কয়েক কোটি রুপি। এছাড়াও কয়েক হাজার ছোট দোকান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা হয়। দিল্লির আশ্রয়কেন্দ্রে ৫০,০০০-এর উপর শরণার্থী আশ্রয় নেয়। ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ শিখ পরিবার ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পাঞ্জাবে আশ্রয় নেয়।

শিখদের বিরুদ্ধে এই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ কি প্রতিহত করা যেত? এক্ষেত্রে কিছু সন্দেহ থেকে যায়। কেননা কেন্দ্রীয় সরকার যদি তা চাইত তাহলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো যেত। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর দায়িত্বে ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু তিনিও ঘটে যাওয়া নৃশংসতার ব্যাপকতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যায় তিনি একটি সভা আহ্বান করেন। এতে দিল্লির লেফ. গভর্নর, পুলিশ কমিশনার এবং এম.এল. কোটেদার (গান্ধীর পরিবারের একান্ত কাছের মানুষ এবং পরবর্তীতে রাজিব গান্ধীর মন্ত্রীসভার সদস্য) উপস্থিত ছিলেন। এতে সিনিয়র পুলিশ অফিসার মত প্রকাশ করেন যে, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা উচিত, তা নাহলে আরও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আশংকা রয়েছে। তিনি তাঁর এই মতামতের কোনো গুরুত্বই দেয়া হয়নি।

একই সন্ধ্যায় নবনিযুক্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি.ভি. নরসীমা রাও বি.জে.পি. নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আশ্বস্ত করেন যে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।^{১০} অল-ইন্ডিয়া রেডিওতে প্রধানমন্ত্রী শান্তি কামনা করে ভাষণ দেন। কিন্তু যা শোনা গিয়েছিল তার বাস্তব রূপ দেখা যায়নি। প্রথম রাতে অবরোধ জারি করা হয়নি। যেসব লোকজন পরেরদিন সকালে (১ নভেম্বর) প্রেসিডেন্ট এবং মন্ত্রীদের বাসভবনের দিকে যাত্রা করার সাহস করেছিল, তাদের বলা হয় যে, সেনাবাহিনীকে আবার নিয়োগ করা হবে এবং পুনরায় অবরোধ জারি করা হবে।^{১২}

৯. 'সেমিনার' সম্পাদক রমেশ থাপার দিল্লিতে শিখদের মৃত্যুর সংখ্যা ৬০০০-৮০০০ ধারণা করেন, যার মধ্যে ৩০ জন পোশাকধারী অফিসার ছিলেন। ২,০০০ ট্রাক ও ট্যাক্সি ধ্বংস করা হয় এবং প্রায় ৩০০ কোটি মূল্যমানের সম্পত্তি লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ইলান্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া, ২৩-৯ ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃ-১২।

১০. হ আর দি গিল্টি? পৃ-৬।

১১. দি স্টেটসম্যান, ১০ নভেম্বর ১৯৮৮।

১২. হ আর দি গিল্টি? পৃ-৬।

আই.পি.সি.-এর ১৪৪ ধারা অনুসারে চার অথবা ততোধিক লোকের সংঘবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ। ১ নভেম্বর বিকেলে এই ধারা এবং অবরোধ জারি করা হয়। উত্তেজিত জনতা উভয় আদেশ অমান্য করে এবং সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। পুলিশ অলসভাবে দৃশ্য অবলোকন করে এবং উত্তেজিত জনতাকে উৎসাহ দেয় এবং তাদের লুটতরাজে অংশগ্রহণ করে। ২ নভেম্বর সংবাদপত্রে দৃঢ়ভাবে বলা হয় একটি অনির্দিষ্ট অবরোধ জারি করা হয়েছে এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে একটি লোক দেখানো আদেশ দেয়া হয়েছে। কোনোটিই দৃষ্টিগোচর ছিল না। এমনকি সেনাবাহিনীকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়নি। মিসেস গান্ধীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা অতিথিবৃন্দের নিরাপত্তার জন্যই প্রধানত এটি করা হয়েছিল। এর মধ্যে দিল্লির শিখ রক্ততৃষ্ণার উপশম হয়েছিল।

এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার পর সরকারের ব্যবহারে খুব কমই বাহবা পেয়েছিল। ১৯ নভেম্বর মিসেস গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজিব গান্ধীর প্রথম জনসভায় তিনি পুরো নাশকতাকে একবাক্যে বলেন, ‘যখন একটি বিশাল বটগাছ ঊষ্মাড়ে পড়ে তখন এর নিচের মাটিতেও কাঁপুনি লাগে।’^{১৩} তিনি বিশৃঙ্খলার শিকার লোকেদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি কোনো সহমর্মিতা প্রকাশ করেননি। শুধু একজনকেই শাস্তি দেয়া হয়। লেফটেন্যান্ট পি.জি. গাভাইকে বরখাস্ত করা হয় এবং পুলিশ কমিশনারকে পদচ্যুত করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিব-এর দায়িত্ব ছিল দেশে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা। তাদের ভূমিকা প্রশংসিত হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও মন্ত্রীসভার বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য নির্বাচিত হন। স্বরাষ্ট্র সচিব এম.এম.কে ওয়াল দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর নির্বাচিত হন।

এই অপরাধের জন্য ত্রেফতারকৃত ১৮০৯ জনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। অথবা কংগ্রেস দলের নেতাদের সুপারিশে মুক্তি দেওয়া হয়। সরকার এ ব্যাপারে তদন্ত কর্মসূচিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে, কেননা এতে করে হিতে বিপরীত হতে পারে।^{১৪} কিন্তু অনেকে মনে করতেন অপরাধ যদি এভাবে নির্বিঘ্নে সংঘটিত হতে থাকে তাহলে তা আরও বাড়বে এবং নির্যাতিতদের আইন নিজের হাতে তুলে নিতে

১৩. দি হিন্দুস্তান টাইমস, ২০ নভেম্বর ১৯৮৪।

১৪. সংসদ সদস্য কে.পি. উল্লুকশনান বলেন, কংগ্রেসকর্মীরা হত্যার সাথে জড়িত ছিল। এই বক্তব্যের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আপনি এই মিথ্যা গুজব রটিয়ে আরও দূরবর্তী উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করছেন।’ (ইন্ডিয়া টুডে ১৯৮৪, ১৫ ডিসেম্বর, পৃ-৩২) এ ব্যাপারে ইন্ডিয়া টুডে-এর কর্মীর প্রশ্নে তিনি জবাব দেন, ‘আমরা পুলিশ কমিশনারকে আহ্বান জানিয়েছি ব্যাপারটি দেখার জন্য এবং পুরো পুলিশবাহিনী তাদের কর্তব্য পালন করবে এমনটি আশা করা হয়েছিল।’ সাংবাদিকটি তার বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি এবং লিখেছিলেন ‘এটি ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক বাধ্যতার বাইরে। তাই তিনি দিল্লিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার একটি আইনানুগ তদন্ত কার্যক্রমের বিরোধিতা করেছিলেন কেননা এতে তার দলের সদস্যদের অভিযুক্ত করা হবে।’

বাধ্য করবে। এ ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তারা হলো পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইট এবং পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস, মৃতলোকদের আত্মীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে নাগরিক একতামঞ্চের সেচ্ছাসেবী সদস্যরা তথ্য সংগ্রহ করে। এই প্রতিষ্ঠানের কোনো সদস্যই শিখ ছিল না। ১৯৮৪-এর নভেম্বরে 'হু আর দি গিল্টি' শীর্ষক গ্রন্থে তাদের প্রাপ্ত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হয়।

কাহিনীর ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়ে তারা দৃঢ়তার সাথে সকল রাজনীতিবিদ, পুলিশ এবং অন্যান্যদের নাম প্রকাশ করে যাদেরকে অত্যাচারিত এবং প্রত্যক্ষদর্শীরা শনাক্ত করেছিল এবং এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মনে করেছিল। এদের মধ্যে ছিল রাজিব গান্ধীর মন্ত্রীসভার একজন সদস্য এইচ.কে.এল ভগত এবং তিনজন সংসদ সদস্য জগদীশ টাইটলার (কিছুদিন পরেই মন্ত্রীসভায় উন্নীত হন), সঞ্জীব কুমার এবং ধরম কুমার শাস্ত্রী। অন্যান্য রাজনীতিবিদরা ছিলেন দিল্লি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন^{১৫}, মেট্রোপলিটান কাউন্সিল^{১৬} এর সদস্য এবং অন্যান্যরা। হামলাকারীদের উত্তেজিত করা এবং লুটতরাজে অংশ নেয়ার অপরাধে ১৩ জন পুলিশের নাম ঘোষণা করা হয়। এছাড়া অন্যান্য অপরাধে আরও ১৯৮ জনের নাম প্রকাশ করা হয়। মানহানিকর লেখার জন্য প্রতিষ্ঠানের আদালতে জাহির করা ছিল নাম প্রকাশিতদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তাদের কেউই এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। এতে সরকারের উপরও তেমন প্রভাব পড়েনি।

হু আর দি গিল্টি? এর পর একটি ক্ষমতাস্বার্থক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আরেকটি তদন্ত প্রকাশ করে।^{১৭} এর প্রধান ছিলেন অমরপ্রাপ্ত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এস.এম. সিক্রি। এর অন্য সদস্যরা ছিলেন বদরুদ্দীন ত্যাবাজি (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত, কমনওয়েলথ সচিব এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর), রাজেশ্বর দয়াল (প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব, রাষ্ট্রদূত, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং সদস্য), গোবিন্দ নারায়ন (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সচিব এবং গভর্নর) এবং টি.সি. এ. শ্রীনিবাস বর্ধন (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব)। এই কমিশন নির্যাতিতদের প্রত্যক্ষদর্শন করে, ক্ষতিগ্রস্তদের পরীক্ষা করে এবং এফিডেবিট সমর্পণ করে। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরসীমা রাও কমিশন মেনে নিতে অসম্মতি জানান।

১৫. বাবু রাম শশী, মঙ্গত রাম সিঙ্গাল, ডঃ অশোক কুমার, জগদীশ চন্দ্র, ঈশ্বর সিং।

১৬. ললিত মাখন, মহীন্দ্র এবং সোহান লাল সুদ।

১৭. এটি ছিল অবসরপ্রাপ্ত এয়ার চিফ মার্শাল অর্জুন সিং, মিসেস তারা আলী বেগ, ধর্মবীর (পণ্ডিত নেহেরুর প্রথম প্রধান ব্যক্তিগত সচিব, মন্ত্রীসভার সচিব ও গভর্নর), মিস.সি.বি. মুখারন্না (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত), ভগবান সাহা (প্রাক্তন গভর্নর), এইচ.ডি.সুরি (কমন কজের ডিরেক্টর), এল.পি. সিং (প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব ও গভর্নর), সোলি সোরাবজী (প্রাক্তন সলিসিটর জেনারেল), কপূরতলার সুখজিৎ সিং এবং টি. স্বামীনাথন (প্রাক্তন মন্ত্রীসভার সচিব ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার) এর অনুরোধ।

১৯৮৫ সালের ১৮ জানুয়ারি কমিশন এর প্রাপ্ত তথ্য প্রকাশ করে। এতে ইতি টেনে বলা হয় যে, 'শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নির্মম মৃত্যু এ ধরনের বর্বর নৃশংসতার জন্য ইন্ধন জুগিয়েছে। অপরাধ সংঘটনের একটি স্মরণীয় উপায় এবং কোথাও কোথাও স্থানীয় ভিন্নতা এ কথাই প্রমাণ করে যে, কিছু ক্ষেত্রে এই ঘটনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'শিখদের উচিত শিক্ষা দেয়া', প্রশাসন ও পুলিশবাহিনীর পরিত্যাগযোগ্য এবং অবিরাম ব্যর্থতা, সন্দেহজনক রাজনৈতিক প্ররোচনা, তথ্য মাধ্যমগুলোর দ্ব্যর্থ ভূমিকা এবং অফিসিয়াল ব্যক্তিদের জড়তা, নিক্রিয়তা ও অসাড় মনোভাব সব মিলিয়ে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই অস্থিতিশীল ও সন্ত্রাসী পরিবেশের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, পাঞ্জাব ও দিল্লি প্রশাসন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর প্রতি হামলা ও তাকে হত্যার প্রাতিষ্ঠানিক ঘোষণা এর মধ্যবর্তী সময়ে কিছু সুযোগ দেয়া উচিত ছিল যাতে জনবিশৃংখলা ও অস্থিতিশীল পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন যথেষ্ট সময় পায়। অর্থাৎ আমাদের কাছে নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৩১ অক্টোবর রাতে বা পরদিন সকালে কোনো ধরনের আদেশ পাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।^{১৮} এবং আরও অনেক কিছু।

সরকার কমিশন কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি কোনো মনোযোগ নিবেশ করেনি এবং সংসদে বজায় রাখে যে যদি দিল্লি দুর্ঘটনার একটি আইনানুগ তদন্ত পরিচালনা করা হয় তাহলে শিখ সমস্যার আরও অবনতি হবে। এবং যদি এ ধরনের কোনো তদন্তের প্রয়োজন হয় তবে তা হবে আকালি নেতাদের সাথে সমঝোতার একটি অংশবিশেষ— জাতীয় নৈতিকতা থেকে নয়। অথচ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি আদান-প্রদানের মাধ্যমে। পরিশেষে সমঝোতার মাধ্যমে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয় (পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। যেভাবে হাঙ্গামায় জড়িতদের শনাক্তকরণ করা হয়েছিল তাতে তাদের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করা হয়েছিল মাত্র। সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি রঙ্গনাথ মিশরাকে ব্যাপারটি খতিয়ে দেখার জন্য একব্যক্তি কমিশনার নির্বাচিত করা হয়। তিনি ভালোভাবেই জানতেন ক্ষমতাস্বার্থ দলের অনেক সদস্য এমনকি মন্ত্রীত্বপ্রাপ্ত অনেকের নামই তদন্তে বেরিয়ে আসবে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে তাদেরকে তদন্তের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করেছিলেন।

সুপ্রীমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এম.এম. সিক্রির নেতৃত্বে সিটিজেন জাস্টিস কমিটি (সি.জে.সি.) নির্যাতিতদের মামলা উপস্থান করেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি.এম. তারকুন্দের নেতৃত্বাধীন দল সারাংশ জ্ঞাপন করে। এবং কমিশনের সামনে এটি উপস্থাপন করেন ভারতের অগ্রগামী আইনজীবী সোলি সোরাবজী। শিখ বিরোধী দুর্ঘটনায় মদদ দেওয়ার রাজনীতিবিদ ও পুলিশের বিপক্ষে সি.জে.সি. ৬০,০০০-এরও বেশি প্রমাণপত্র ও একশোরও বেশি প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য তুলে ধরে। একটি স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থাকে সাহায্যকারী হিসেবে পাশে

১৮. মিসরা কমিশন।

রাখার ক্ষমতা কমিশনের ছিল। পুলিশের একজন জুনিয়ার সুপারিনটেনডেন্টকে এই সংস্থার প্রধান নিযুক্ত করার মতামতও এতে ছিল। অন্যদিকে সি.জে.সি.-এর প্রমাণপত্র ও সাক্ষ্যপ্রমাণের উদ্দেশ্য ছিল জেরা করা। যাদের মাধ্যমে প্রমাণ-এর কপি জারি করা হয়েছিল তাদের নাম গোপন করা হয়েছিল, এমনকি যারা প্রতিজ্ঞা করেছিল তাদের নামও প্রকাশ করা হয়নি। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দিল্লির প্রশাসনের একজনকেও দাঁড় করানো হয়নি। প্রধান পুলিশ রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য সি.জে.সি. শমন জারি করলেও তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। সেই সময় আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত নয়জন সিনিয়র অফিসারের বিরুদ্ধে জারিকৃত শমনও অপ্রকাশিত থেকে যায়। একইভাবে যেসব পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শীরা ভীতি প্রদর্শন বা হাঙ্গামার অভিযোগ এনেছিল তাদের অভিযোগের তদন্তও হয়েছিল। অবশেষে, সি.জে.সি. কমিশন জাঠার ঘোষণা দেয়। একজন এটি বিস্তারিত কারণ দর্শায়। বিচারপতি তারকুণ্ডে বলেন, ‘আমাদের অংশগ্রহণের কোনো যুক্তিই আমরা অনুভব করি না। এটি ছিল একটি এক পার্শ্বিক তদন্ত। আমরা যেভাবে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেভাবে এতে অংশগ্রহণ করার কোনো সুযোগ আমাদের কখনোই দেওয়া হয়নি।’^৯

মিসরা কমিশন রিপোর্টের পুরোটা জনগণের কাছে প্রকাশ করা হয়নি। শুধুমাত্র নিহতদের সংখ্যা নিরূপণ ও পুলিশের বিরুদ্ধে আটোভাব প্রকাশ হয়েছিল। একটি শাসক কংগ্রেস দল ও রাজনীতিবিদদের ‘কে দায়ী?’ এই শীর্ষে প্রকাশ করে। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের শনাক্ত করে এবং আটকের জন্য এটি আরও সংস্থার নিয়োগ অনুমোদন করে। হাজার হাজার শিখ হত্যার চার বছর পরও একজনকে শাস্তি প্রদান করা হয়নি।

২৩. নির্বাচন এবং সেই অনুসারে

দেশের একাত্মতা নিশ্চিত করতে ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোটদেয়দের প্রভাবিত করে একটি নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয় যাতে বলা হয় যে, যারা মিসেস গান্ধীকে হত্যা করেছে তারা ভারতের ঐক্য নষ্ট করতে চায় এবং মিসেস গান্ধী তা রক্ষা করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শবযানে জাফরান কাপড়ে মোড়ানো মৃতদেহ সম্বলিত অনেক পোস্টার সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর কোনোটিতে আবার পোশাকধারী শিখ তাকে গুলি করেছে এমন ছবিও ছাপা হয়। অন্যান্য পোস্টারে দেখানো হয় কাঁটাওয়ালা তার ঘেরা একটি শ্লোগান ‘দেশের সীমানা কি শেষ পর্যন্ত আপনার বাড়ির দরজায় এসে ঠেকবে?’ এবং এর নিচে আরেকটি শ্লোগান ‘ভারতে ঐক্য থাকবে নাকি বিভক্ত হয়ে যাবে সেটি আপনার ভোটের উপর নির্ভরশীল।’ আরেকটিতে দেখানো হয় একজনকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, অন্য একটি প্রদেশের ট্যাক্সি ড্রাইভার চালিত ট্যাক্সিতে চড়তে আপনি কীভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?’^২ যদি এই শ্লোগানগুলো বার্তা না পৌঁছায় যা রাজিব গান্ধীর সমর্থকরা চিৎকার করে তার শিখ ভাবী মেনেকার বিরুদ্ধে বলেছিল, তা ছিল যথেষ্ট স্পষ্টবাদী এবং নির্দিষ্ট ‘কেটি হ্যায় সারদার কি, কওম হ্যায় গান্ধার কি’ (তিনি একটি শিখ কন্যা, তিনি বিদেশঘাতক জাতির একজন)।

কংগ্রেসের পক্ষে প্রধান ভোটজয়ী ছিলেন শহীদ আম্মা-মাতা অনেক টিপে সজ্জিত ইন্দিরা গান্ধী তার পুত্রকে আশীর্বাদ করছেন এমন ছবি ছড়িয়ে পড়ে (হিন্দু মহিলাদের কপালে সজ্জিত ফোঁটা)। তাঁর বক্তব্য সম্বলিত ক্যাসেট, সেখানে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি যদি মারা যাই, আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু জাতিকে আরও তেজদীপ্ত করবে।’ এটি সকল নির্বাচনী সম্মেলনে বাজানো হয়।^৩ এর পর রাজিব

১. অনেক পরিদর্শকের মতে নির্বাচনী প্রচারণায় কংগ্রেস দল ৩০০ কোটিরও বেশি অর্থ ব্যয় করে। শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনেই ১৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। রিডিফিউশান সম্যক একটি মুম্বাই এজেন্সির মাধ্যমে নয়টি ভাষায় বিজ্ঞাপন তৈরি করা হয়। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়া, ১৩ জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ-২২।
২. এই পুস্তকে।
৩. মৃত্যুর আগেরদিন অপরাধ স্বীকার করে মিসেস গান্ধী একটি লেখনীতে বলেন, ‘আমার যদি একটি নৃশংস মৃত্যু হয়, যার ভয় আমি করছি এবং কেউ পরিকল্পনা করছে। আমি জানি হত্যাকারীর চিন্তা

গান্ধীর তরুণ, সুদর্শন, দুর্নীতিহীন ও এগিয়ে যাওয়ার প্রতিচ্ছবি অংকন করা হয় একজন রাজপুত্র হিসেবে, যে কী না রাজনীতির সব জঞ্জাল মুছে ফেলবে। তিনি তারুণ্যদীপ্ত, নিবেদিত প্রাণের প্রতীক ‘মি. ক্লীন’ হিসেবে আবির্ভূত হন। যিনি কম্পিউটার অধ্যায়ে উন্নতি ঘটাবেন এবং ভারতকে এর বিভীষিকাময় অতীত থেকে একুশ শতকের কাছে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এর আগে কোনো সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দল এত পেশাগত দক্ষতার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। তারা আধুনিকভাবে প্রচারণা চালায়নি। অথবা সাধারণ নির্বাচনে এত অর্থও ব্যয় করেনি। তারা উত্তর ভারতকে সংযুক্ত করে একটি লভ্যাংশের সেতুবন্ধন তৈরি করেছিল। রাজিব গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল ভোটারদের অর্ধেক ভোট পায় এবং লোকসভার আশি শতাংশ পদ জয় করে। ৫৪০টির মধ্যে ৪১০টি। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু অথবা ইন্দিরা গান্ধীর সময়ও তারা এত বিপুলভাবে জয়ী হয়নি। রাজিব গান্ধী আসলে সকলের প্রত্যাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যেসব প্রদেশে শিখবিরোধী অনভূতি জাগ্রত ছিল সেখানে কংগ্রেস অবিস্মরণীয় জয়লাভ করে। অন্যান্য প্রদেশ যেমন পশ্চিমবাংলা, আসাম এবং উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক এসব এলাকায় ভোটাররা শিখদের এই অপরাধ কর্ম-সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল সেসব এলাকায় বিরোধী দলগুলোর তাদের নিজ নিজ স্থান ধরে রাখতে সমর্থ হয়।

নির্বাচনে জয়লাভের পর ১৯৮৫ সালের ৫ জানুয়ারি দেশব্যাপী সম্প্রচারে রাজিব গান্ধী বলেন যে, তিনি পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানকে সুদীর্ঘ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর একদিন আগে তিনি মন্ত্রীসভার একটি উপকমিটি স্থাপন করেন যাতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এস.বি. চাবন, পি.ভি. নরসীমা রাও এবং কে.সি. পাণ্ড। তাদেরকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পরামর্শ প্রদানের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু দশটি প্রদেশে মার্চের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবার কথা ছিল, এগুলো শেষ হবার আগে উপ-কমিটি পাঞ্জাবের দিকে মনোযোগী হতে পারছিল না। অধিকাংশ প্রদেশে বংগ্রেসের অবিরত বিজয়ের সাথে আকালিদের অসন্তোষও যুক্ত হতে থাকে। কেননা তারা মনে করে যে, শিখদের প্রতি সরকার তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। ১৯৮৫ সালের ৭ মার্চ আকালি দল এবং এস.জি.পি.সি. সরকারকে ঘোষণা দেয় যে, ১৯৮৪-এর নভেম্বরে সংঘটিত শিখ হত্যার বিষয়ে যদি আইনানুগ কোনো তদন্ত করা না হয় এবং পহেলা বৈশাখ (১৩ এপ্রিল)-এর মধ্যে যদি তাদের নেতাদের মুক্তি না দেয়া হয়, তাহলে তারা ‘জেনোসাইড উইক’ শীর্ষক আরেকটি আন্দোলনের সূচনা করবে।^৪

ও কাজে নৃশংসতা প্রকাশ পাবে। আমার মৃত্যুতে কোনো ঘৃণা দেশের প্রতি আমার ভালোবাসাকে ঢেকে রাখতে পারবে না। কোনো বল এত শক্তিশালী নয় যে, আমাকে আমার উদ্দেশ্য থেকে এবং দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থেকে আমাকে বিচ্যুত করবে। *আন হোলি টেরর*, পৃ-১।

৪. আকালি দলের কনভেনর সূরজন সিং টেকেদার, এস.জি.পি.সি.-এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান, প্রেম সিং লালপুরা, প্রধান পাঁচডান পুরোহিত এবং প্রাক্তন আইনমন্ত্রী বলবীর সিং কারাগারে আটক আকালি

রাজিব গান্ধী আর একবারও আকালিদের সম্মুখীন হতে চাইছিলেন না। পরপর দুটি স্মরণীয় বিজয় নাগালে আসার পর এবং তার দৃষ্টিতে কোনো রাজনৈতিক ঝুলন্ত অবস্থা না থাকায় তিনি পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শুরু করেন। তার মায়ের পছন্দ থেকে তার পছন্দ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি সবসময় দলের নির্বাচনী বিষয়টি সর্বাপেক্ষা উপরে রাখতেন। কোনো সমস্যা সমাধানে কখনও তাড়াহুড়া করতেন না এবং সাধারণত কোনো বিষয়ে সমাধানের ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না যেগুলো তাকে জনগণের সামনে রাজনৈতিক অসুবিধার সম্মুখীন করে। তার প্রিয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী সঞ্জয় গান্ধী ১৯৮০ সালের ২৩ জুন বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হবার পর তিনি দমে যান এবং সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকেন। তিনি এই কারণ বা অন্যান্য কারণ খুঁজে আকালিদের সাথে সমঝোতা বাতিল করে দেন। এর ফলে সরকারের সাথে সমঝকারীরা ভিন্দারওয়ালের চরমপন্থীদের কাছে দ্রুত হেরে যেতে থাকেন। রাজিব গান্ধী এই পন্থার পরিবর্তন করেন এবং একটি মধ্যপন্থী আকালি নেতৃত্বের কথা চিন্তা করেন যাতে তারা চরমপন্থীদের সাথে টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

আকালিদের প্রতি ভালো থাকার পন্থা গ্রহণ করা হয়। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জনগোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি রাখা হয় যাতে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। ১৯৮৫ সালের ১২ মার্চ শীর্ষ আটজন আকালি নেতা, সন্ত লাংওয়াল এবং বর্ণালা (উভয় সমঝকারী) ও তালবন্দি (চরমপন্থী)কে মুক্তি দেয়া হয়। তোহরা এবং বাদল কারাগারে থেকে যান। দুদিন পর অর্জুন সিং যিনি মাত্র একদিন আগে মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে ভূষিত হয়েছিলেন, তাকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এরপর অন্য সবার চাইতে অর্জুন সিং সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই সময়ে মন্ত্রীসভার উপ-কমিটি প্রদেশ পরিদর্শন করে এবং জনগণের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করে। প্রথমত, পাঞ্জাব প্রেসের উপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়, এরপর যেসব জেলায় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল, সেসব এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১১ এপ্রিল সরকার ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের একটি আইনানুগ তদন্তের কথা ঘোষণা করে, এ.আই.এস.এস.এফ-এর বাতিল প্রত্যাহার করে এবং বিনা বিচারে আটকদের মামলা পুনরায় শুরু করা হয়। পহেলা বৈশাখে ৫৩ জনকে প্রথমে মুক্তি দেওয়া হয় এবং রাজিব গান্ধী পুনরায় পাঞ্জাব সমস্যা সমাধানের কথা বলেন। ১৯৮৫ সালের ২৩ মার্চ হুসাইনিওয়ালায় প্রথম পাঞ্জাব পরিদর্শনে তিনি কাপুরতালয় রেল কোচ ফ্যাক্টরী স্থাপনের ঘোষণা দেন যাতে ২০,০০০ দক্ষ শ্রমিক কাজ করতে পারবে।

নেতাদের স্থান পূরণ করেন। এস.জি.পি.সি.-এর সিনিয়র ভাইস-চ্যান্সেলর (তালবন্দি বিরোধী) বলেন, 'একটি সর্বোপরি সমঝোতা স্থাপিত হতে যত বিলম্ব হবে ততই সমাজতান্ত্রিকদের ভয়াবহতা আরও বাড়তে থাকবে।' ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫।

সরকার কিছুদিনের জন্য আকালি নেতাদের প্রতি শিখ জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে। সকলের সাধারণ অনুভূতি ছিল যে, সেনাবাহিনীর কাছে নতিস্বীকার করে শিখ ঐতিহ্যকে অবমাননা করা হয়েছে। সন্ত লাংওয়াল যতদিন আকালিদের প্রধান ও ধারাম যুদ্ধ মোরচার একনায়ক ছিলেন ততদিন তার দায়িত্ব ছিল যা ঘটছে তার দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার। তিনি সারা প্রদেশে এমনকি দিল্লিতেও সভা আহ্বান করেন। তিনি তার বক্তব্যকে ঘুরিয়ে বলেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেছেন এমনকি মিসেস গান্ধীর ঘাতকদের প্রশংসা করেছেন।^৫ একই সাথে তিনি সম্মতবাদকে দণ্ডিত করেছেন, দল থেকে অপসৃতদের সর্বসম্মুখে অভিযুক্ত করেছেন এবং শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে সৌহার্দ্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। পাঞ্জাবিরা যারা এই চার বছর ভয়ে এবং অস্থিতিশীল অবস্থায় সময় অতিবাহিত করেছে, তারা তাঁর ডাকে প্রবলভাবে সাড়া দেয়। চরমপন্থীরা মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে করে। ১৯৮৫ সালের ২৫ মার্চ তালবন্দির অর্ধেক সমর্থক তার দল ত্যাগ করে এবং লাংওয়ালের দলে যোগদান করে। তালবন্দির খ্যাতিহ্রাসের পর সরকার ১৯ এপ্রিল তোহরাকে মুক্তি দেয় এবং এর কিছুদিন পর বাদলকেও^৬ তিনজনের মধ্যে কার সাথে সমঝোতা হবে তা দেখা যাক।

তোহরা ১৩ বছর এস.জি.পি.সি.-এর সভাপতি ছিলেন। তিনি খালিস্তান সহানুভূতি জাগরণে পূর্বসূরী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। আকালি তাখ্তে উপনীত হবার পর তিনি নির্মম পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সর্বনিম্ন ও সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালানোর জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন ‘অধ্যায়িকদের হাতে ক্ষমতা থাকতে পারে না। বাবা সন্ত সিং সিংহান এবং বুটা সিং দু’জনকেই টাংখাইয়া ঘোষণা করা হয়। সি.পি.ডব্লিউ.ডি.-এর সহায়তায় খাঁটি কর সেবা-সেচ্ছাসেবা পুনর্নির্মাণ করা হবে। তিনি আশা করেছিলেন এতে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। তখন তার মতামতের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এর ছয়মাস পর এ.আই.এস.এস.এফ.-এর চরমপন্থীরা তার হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে নেয় এবং পরিবর্তন ও পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে। তোহরা কিছুদিন পর সন্ত লাংওয়ালের ধারার অনুসারী হন। বাদল তখনও একই পথ অনুসরণ করে লাংওয়ালকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেননি।

তালবন্দি বাবা জগীন্দর সিংকে ধরে আকালি দল আয়ত্ত্ব করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। তিনি ছিলেন ভিন্দারওয়ালের অশীতিবৎসর বয়স্ক পিতা যিনি দলের দায়িত্বে ছিলেন। তার সাথে ছিলেন মিসেস গান্ধীর ঘাতক বিয়াস্ত সিংয়ের বিধবা স্ত্রী বিমল কর খালসা। প্যাঙ্কিক একতার নামে বাবা আকালি দলের অফিস কর্মচারীর বরখাস্ত দাখিল করতে বলেন এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসন পুনর্নির্মাণ শুরু করে। এতে

তিনি মধ্যপন্থীদের চাইতে চরমপন্থীদের বেশি প্রাধান্য দেন। সন্ত লাংওয়াল দৃঢ়ভাবে তার ইস্তফাপত্র প্রদান করেন এবং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং তার গ্রামে ফিরে যান। জুয়াখেলার আবসান ঘটে। দলের সিনিয়র নেতারা যেমন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনজুরা তার গ্রামে হাজির হন এবং তাকে তার কার্যক্রমে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেন। তালবন্দি এবং তার নগণ্য বৃদ্ধ সহকারীকে ফলপ্রসূভাবে পরাস্ত করা হয়। ১৯৮৫ সালের ১৪ মে তারা প্রতিদ্বন্দ্বী সংযুক্ত আকালি দল (ইউ.এ.ডি.) যা চরমপন্থীদের ছায়াদানকারী সংস্থায় পরিণত হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত ছিল খালিস্তানিরা, এ.আই.এস.এস.এফ এবং সানড্রাই সন্তাসী দল।^৬ এই দ্বন্দ্ব এটিই প্রমাণ করে যে, শিখ সম্প্রদায় চরমপন্থীদের চাইতে সন্ত লাংওয়ালের নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থীদের প্রতি বেশি আস্থাবান ছিল।

গভর্নর অর্জুন সিং লাংওয়াল, তোহরা এবং বাদলকে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি সঠিকভাবে অনুবধান করেন যে, তিনি যার সাথে কথা বলবেন তিনি লাংওয়াল।^৭ তার উপদেশ (গভর্নরের) অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার লাংওয়াল-এর লোকদের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে শুরু করে। ২৭ জুন সরকার ঘোষণা করে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি আর.এন. মিসরা ১৯৮৪ সালের নভেম্বরে ঘটে যাওয়া শিখ বিরোধী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করবেন। গভর্নর অর্জুন সিং আটক শিখদের মুক্তি দেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি ১৭০০-এরও বেশি বন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়।

আকালিদের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ছিল একটি চতুরতা। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারাই সরকারের সাথে আলোচনা করতে গেছে তারাই এজেন্ট হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছে। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৫ সালের ২ জুলাই রাজিব গান্ধী একটি গোপন ও লুকায়িত চিঠি দেন লাংওয়ালকে। এতে তিনি পুনরায় মধ্যস্থতা স্থাপনের উপযুক্ততা জানতে চান। কিছু লোক একান্তভাবে এ পদক্ষেপে সাড়া দেয়। অন্যদিকে সন্ত লাংওয়াল আকালি নেতাদের পর্যবেক্ষণ করেন। তোহরা এবং বাদল তাকে সাবধান থাকার পরামর্শ দেন। বর্ণালা এবং বলবন্ত সিং তাকে এগিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। দ্বিমুখী পরামর্শের সম্মুখীন হয়ে

৬. তোহরা তার প্রতিকূলতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'যখন পাঞ্জাবি তরুণদের আমরা কিছুই দিতে পারিনি, তখন কীভাবে আমরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করব? সরকার আনন্দপুর সাহেব দাবি মেনে নিয়ে বিশেষ আদালত বাতিল করে এবং আলোচনার মাধ্যমে ডিস্টার্বড এরিয়াস অ্যাবট তুলে নিয়ে আমাদের হাতকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।' *ইন্ডিয়া টুডে'র সৌজন্যে, ১৫ মে ১৯৮৫, পৃ-২০।*

৭. উদয়পুরের অতিথি ভবনে অবস্থানকারী সন্ত লাংওয়ালের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি বুটা সিংয়ের সাথে সাক্ষাৎ বাতিল করেন কেননা তাকে তাংখাইয়া হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু পাঞ্জাব সংসদের প্রাক্তন স্পিকার রবী ইন্দ্র সিং এবং নভো-এর নরেন্দ্র সিংকে গ্রহণ করেন। তিনি আরও সাক্ষাৎ করেন পাঞ্জাব গভর্নরের সিনিয়র উপদেষ্টা আর.ভি. গুজামানিয়াম। তার গ্রহণতার পর এটিই ছিল প্রথম দাপ্তরিক সাক্ষাৎ। তিনজনই একমত পোষণ করেন যে, সরকারের সাথে পুনরালোচনার বিরুদ্ধে সন্ত ছিলেন না।

উদ্বিগ্ন সন্ত পবিত্র গ্রন্থে পদ অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রার্থনার পর তিনি ‘ভাক’^৮ গ্রহণ করেন। গুরু অর্জুনের দীক্ষা ছিল এই যে, কোনো শিখ ব্যক্তি যদি গুরুকে পদপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নেয় তবে সে কখনোই দ্বিধায় পড়বে না। ১৯৮৫ সালের ২৩ জুলাই সন্ত প্রধানমন্ত্রীর সাথে দিল্লিতে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হন।

উভয় দলই অনুভব করে যে, সার্থক হবার জন্য কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে এবং যেসব রাজনৈতিক নেতাদের বিঘ্ন সৃষ্টি করার আভাস রয়েছে তাদের দূরে রাখতে হবে এবং পূর্বে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুসারে উপস্থাপন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী তার পক্ষে গভর্নর অর্জুন সিংকে একমাত্র সহকারী মনোনীত করেন। প্রেসিডেন্ট জাইল সিং যখন দিল্লিতে থাকবেন না তখন সাক্ষাৎ-এর দিন নির্ধারণ করা হয়। মন্ত্রী বুটা সিং এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দরবারা সিংকে কিছুই জানানো হয়নি। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভজন লালকে সবসময় হাজির থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। তার উপর দুর্নীতির বিরাট তালিকা আরোপ করে অন্যায়ের প্রবণতা দমন করা হয়। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করা হয়নি। সন্ত তোহরা এবং বাদলকে পাত্তা না দিয়ে বর্নালা এবং বলবন্ত সিংয়ের পরামর্শ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

লাংওয়ালের দুই উপদেষ্টা রাতের ফ্লাইটে দিল্লিতে যাত্রা করেন এবং সূর্যাস্তের আগেই চণ্ডিগড়ে ফিরে আসেন। ১৯৮৫ সালের ২৩ জুলাই সন্ত প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ের মধ্যে সকল আলোচনা সমাধা করা হয়। পরদিন সকালে ১৯৮৫-এর ২৪ জুলাই একটি এগারো দফা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।^৯ এতে সব প্রধান দাবিগুলোকে একত্র করা হয়েছিল। যা আঞ্চলিকরা প্রথম তাদের দাবিতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। দুই পক্ষেই স্থানসংকুলানের উদ্দেশ্য ছিল লক্ষ্যণীয়। এগারোটির মধ্যে পাঁচটিই ছিল আকালিদের একান্ত দাবি। তিনটি ছিল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও ভাষা সংক্রান্ত বিষয়। যার অধিকাংশ ইতোপূর্বেই মিসেস গান্ধীর সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। বাকি তিনটি ছিল সত্যিকারের চুক্তি যেমন—অঞ্চলভিত্তিক, মানিয়ে চলা এবং নদীর পানি বন্টনের বিষয়। এটি লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, মিসেস গান্ধী যদি শেষ মুহূর্তে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করতেন তাহলে এই চুক্তি দুই বৎসর আগেই স্বাক্ষরিত হতো। সন্ত এবং রাজিব গান্ধীর এই একাত্মতা স্বাক্ষরিত হবার পর এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যখন মধ্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের কথা চিন্তা করা হয়েছে তারা আনন্দপুর সাহেব দাবি কখনোই হ্রাস করা বা বিভক্ত হবার জন্য উত্থাপন করেনি। বরং পাঞ্জাবে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তুলেছিল। তারা অনতিবিলম্বে সরকারি কমিশনে তাদের দাবিসমূহ তুলে ধরে।

৮. ভাক (শব্দ) : অনেক সম্প্রদায়ে প্রচলিত একটি পরিচিত প্রথা। এতে একটি পবিত্র গ্রন্থ খোলা হয় (মুসলিমদের ক্ষেত্রে হাফিজের কাজ) এবং বামদিকের পৃষ্ঠা থেকে প্রথম লাইন পাঠ করা হয়। এক্ষেত্রে ভাকটি ছিল ‘দুবিধা চাও গুরু তেরে আঙ আঙ’, মন থেকে দ্বিধা দূর করে দাও, গুরু তোমার সাথে। (দি ট্রাইবুন, ২৬ জুলাই ১৯৮৩)।

৯. সূচী দেখুন।

অবশ্যাস্তাবীরূপে যেসব নেতাকে এই সম্মতি চুক্তি থেকে দূরে রাখা হয়েছিল তারা নিজের দূরবর্তী ও বঞ্চিত মনে করে। আকালিদের পক্ষে এদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তোহরা এবং বাদল এবং সরকারের পক্ষে বুটা সিং ও দরবারা সিং। সন্ত লাংওয়াল বিষয়টি শিখ জনতার কাছে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৮৫ সালের ২৬ জুলাই আনন্দপুরে অনুষ্ঠিতব্য সমাবেশের আগে জেলা দলীয় নেতাদের কাছে সম্মতিপত্র উপস্থাপন করেন গ্রহণ বা বর্জনের জন্য। এটি প্রশংসার সাথে গৃহীত হয়।^{১০} কিন্তু তোহরা এবং বাদল পুনরায় মিত্রতা স্থাপনে অসম্মতি জানায় এবং একে বিশ্বাঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে। বুটা সিং এবং দরবারা সিং পরিকল্পনা বানচালের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন।

রাজিব গান্ধী আরেকটি দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। তিনি ঘোষণা করেন, সন্ত্রাস না চালিয়ে পাঞ্জাবের সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ভোটে অংশগ্রহণ করা হয়। ইউ.এ.ডি.'র নেতৃত্বে চরমপন্থীরা নির্বাচন বাতিল করার আহ্বান জানায়। তার আহ্বানে তেমন কেউই সাড়া দেয়নি। তারা মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় তারা সেসব ব্যক্তিকে সরিয়ে দেবে যারা তাদের বিশ্বাস নষ্ট করেছে। ১৯৮৫ সালের ১১ আগস্ট গ্রাম্য গুরুদুয়ারায় গ্রন্থের সামনে বসে থাকা অবস্থায় একটি সন্ত্রাসী দল সন্ত হরচাঁদ সিং লাংওয়ালকে গুলি করে এবং তিনি মারা যান।

১৯৮৫-এর নির্বাচন

১৯৮৫-এর সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাব নির্বাচনে ১৩টি সংসদীয় ও ১১৭টি পরিষদীয় আসনের জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন ছিল। কেননা এটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাইতে সম্মতি চুক্তির জন্য গণজোট ছিল। সবচেয়ে মজার বিষয় হলো প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস ও আকালি দল উভয়ই সম্মতির পক্ষে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরোধী ছিল। আকালিরা তাদের শহীদ সন্ত লাংওয়ালকে তুলে ধরেছিল। কিন্তু কংগ্রেস মিসেস গান্ধীর শহীদ হওয়াকে তুলনায় আনেনি। তাদের নীতিমালার অধিকাংশই উৎসর্গীত ছিল অর্থনৈতিক পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনায়। তাদের নীতি একই ধারায় ছিল যদিও রাজনৈতিক ভিন্নতা ছিল তাদের মধ্যে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো যদিও প্রাদেশিক পরিষদে আকালিরা প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পেয়েছিল, নির্বাচনী অপ্রাসঙ্গিকতার জন্য আকালি দল, কংগ্রেস বা দুটি কমিউনিস্ট দলের মধ্যে ক্ষমতার হাতবদল প্রয়োজন ছিল। এই পক্ষের ডান

১০. শান্তিচুক্তির পক্ষে পাঞ্জাবি জনগণের জনমত জানতে কাজ করে টাইমস অফ ইন্ডিয়া। তারা বলেন, যাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তাদের শতকরা ৮১ জন এতে সম্মতি দান করে, ১১ শতাংশ অসম্মতি জানায় এবং ১১ শতাংশের কোনো মন্তব্য ছিল না।

হাত হিন্দু দল জনসংঘ যা ভারতীয় জনতা পার্টি নামে পরিচিতি লাভ করে পরে তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

আকালি দলের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম এটি ধর্মীয় দলের চাইতে আঞ্চলিক দল হিসেবেই বেশি প্রকাশ পায়। প্রার্থীদের মধ্যে ছয়জন হিন্দু, একজন মুসলিম এবং একজন খ্রিস্টান। ইউ.এ.ডি.-এর প্রত্যাহার আহ্বান প্রত্যাখ্যাত হয়, এমনকি এর সমর্থকদের কাছেও, যারা এই হাঙ্গামায় যোগ দিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিলেন বিমল কর খালসা, যিনি তার প্রার্থী আবেদন দুটি নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থাপন করেছিলেন। প্রতিটি পদের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা ছিল প্রচুর, এমনকি আগের চেয়েও বেশি। মোট ৮৩২ জন, যার মধ্যে ৩০ জন মহিলা। ১৩ পদবিশিষ্ট লোকসভার জন্য ৭৪ জন প্রার্থী আবেদন করে যার মধ্যে ৬ জন ছিল মহিলা। নির্বাচনে ভোটারদের সংখ্যাও ছিল পূর্বের চাইতে অনেক বেশি (প্রায় ৬৭ শতাংশ)।

গত চার বছরে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা, যার সূচনা হয়েছিল ভিন্দারওয়ালের হিন্দু এবং কেন্দ্রীয় হিন্দু সরকারের বিরুদ্ধে ভয়াবহতা দিয়ে, এরপর অপারেশন ব্লু স্টার এবং তার পরবর্তীতে অপারেশন উডরোজ, মিসেস গান্ধীর গুপ্তহত্যা এবং সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া শিখ বিরোধী নির্মমতা নিঃসন্দেহে দুই গোষ্ঠীর ভেতর দূরত্ব বাড়াতে থাকে এবং ধরে নেয়া হয় যে, অধিকাংশ শিখ এদের মধ্যে শহুরে এবং নির্ধারিত গোত্রের লোকেরা আকালি দলকে ভোট দিবে এবং অধিকাংশ হিন্দু কংগ্রেস অথবা বি.জে.পি.কে ভোট দেবে। এটি কিভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তার উপর নির্ভর করবে না। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিখ কংগ্রেসকে ভোট দেয় এবং বিশাল সংখ্যক হিন্দু যারা সংসদের জন্য কংগ্রেসকে নির্বাচিত করেছিল তারা প্রাদেশিক পরিষদের জন্য আকালি দলকে ভোট দেয়।

ফলাফল আকালিদের আত্মতৃপ্তি দেয় তাদের প্রাপ্ত শতকরা ভোটের চাইতে। ১৩ লোকসভার জন্য তারা ১১ জন প্রার্থী নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং এদের মধ্যে ৭ জন কৃতকার্য হয়। কংগ্রেস ১৩টি পদের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কিন্তু বাকি ৬টি ভোট পায় মাত্র। কিন্তু আকালিরা ৭টি পদ পেয়েও মাত্র ৩৭.১৮ শতাংশ ভোট পায়। অন্যদিকে কংগ্রেস ৬টি ভোট পেয়েও ৪১.৫৩ শতাংশ ভোট পায়। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ছিল সমান আশ্চর্যের। মোট ১১৫টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় (দুটি প্রার্থীর মৃত্যুর জন্য পদ বাতিল করা হয়)। এর মধ্যে আকালিরা ১০০টির জন্য লড়াই করে এবং ৭৩টি জয়লাভ করে যা মোট ভোটের ৩৮.৫৫ শতাংশ। অন্যদিকে কংগ্রেস সবগুলো আসনের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অনেক কম শতাংশ (৩৭.৮৬) লাভ করে এবং ৩২টি আসন পায়। এটি নিশ্চিত ছিল যে, কংগ্রেস থেকে আকালিদের হাতে রাজনৈতিক দায়িত্ব গেলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হবে না। যদি সামান্য এক শতাংশ ভোটও আকালিদের বদলে কংগ্রেস পেত তা হলে এর ফলাফল পুরোপুরি ভিন্ন হতে পারত। যে পরিবর্তনটি

লক্ষ্য করা যায় তা হলো আকালিরা শিখদেরসহ শহুরে এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সকল ভোট জয় করেছিল যা পূর্বে কংগ্রেস লাভ করত। কংগ্রেস সব হিন্দু ভোট যা বি.জে.পি. দলের ভোটসমূহ লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

পুরাতন দলসমূহ যেমন সি.পি.আই এবং সি.পি.এমও ভাগ্যহীন হয়েছিল কংগ্রেসের কারণে। তারা স্বাভাবিকভাবে ৬ শতাংশ ভোট পেতে পারত। কিন্তু প্রাদেশিক পরিষদে মাত্র একজন প্রার্থী যেতে পেরেছিল। এই নির্বাচনের সময় আরেকটি ঘটনার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার নাম কহজন সেবক সমাজ।^{১১} নির্দিষ্ট গোত্র এবং নিম্নবর্ণীয় গোত্রের একটি সংস্থা যা পাঞ্জাবের মোট জনগোষ্ঠীর ২৬.৮৭ শতাংশ। তার ধর্মীয় পরিচয় একটি অনিশ্চয়তার মুখে ছিল। কেননা বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে তারা নিজেদের শিখ অথবা হিন্দু হিসেবে পরিচয় দিত। যখন তারা যেভাবে সুবিধা করতে পারে। সমাজ ৫০ জন প্রার্থীকে প্রাদেশিক পরিষদের জন্য মনোনয়ন দেয়। যদিও তাদের কেউই জয়লাভ করেনি। তারা দোয়াবা অঞ্চলের নির্বাচনে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট আশা করেছিল এবং অন্যান্য দলের প্রার্থীদের ভাগ্যকে প্রভাবিত করেছিল।

‘নদীর পানি’

যে বিষয়টি পাঞ্জাব এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্পর্ক কলুষিত করেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আকালিদের ক্ষোভের তালিকায় শীর্ষস্থানে ছিল, তা হলো নদীর পানি বন্টন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির সময় ভারত ও পাকিস্তান সরকার বিশ্বব্যাংককে অনুরোধ জানায় যাতে ইন্দুবেসিনের পানি ব্যবহারের জন্য তারা তাদেরকে পরামর্শ দেয় ও সাহায্য করে। ১৯৫৫ সালের ২৯ জানুয়ারি ভারত সরকার বিভক্তির রেখা সংলগ্ন তিনটি প্রদেশের প্রয়োজনের কথা উপস্থাপন করে। এগুলো হলো— পাঞ্জাব (যার ভেতর হরিয়ানা এবং হিমাচল অন্তর্ভুক্ত ছিল), রাজস্থান, জম্মু এবং কাশ্মীর। ১৯৬০ সালে পাকিস্তান ও ভারত সরকার ‘ইন্দুস ওয়াটার ট্রিটি’ স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে তিনটি পশ্চিমা নদী— ইন্দুস, বোলুম ও চেন্নাব পাকিস্তানের ভাগে চলে যায়। তিনটি পূর্ব দিকে নদী সুতলেজ, বিয়াস এবং রবী ভারতকে দেয়া হয়। এজন্য ভারত পাকিস্তানকে ১১০ কোটি টাকা প্রদান করে। প্রদেশের সাথে যখন ভারতের অংশ বিনিময়ের প্রশ্ন আসে, পাঞ্জাব সরকার বলে যে, বিশ্ব ব্যাংকের কাছে যে তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা অত্যন্ত

১১. দলিত শোষিত সমাজ সমিতির একটি অংগ প্রতিষ্ঠান ছিল সমাজ। ১৯৮৪ সালের ৬ ডিসেম্বর শিব কানসিনাথ এটি প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবে হরিয়ানা, হিমাচল, রাজস্থান এবং পশ্চিম-উত্তর প্রদেশের নিম্নবর্ণীয়দের মাঝে এটি অনেক সমর্থক তৈরি করে।

দ্রুততার সাথে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে না। একটি দক্ষ কমিটি নতুন নকশা প্রকাশ করে (১৯৬৬ ফেব্রুয়ারি) কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য প্রাতিষ্ঠানিকই রয়ে যায়। কেননা পরের বছর হিমাচল ও হরিয়ানা আলাদা প্রদেশে বিভক্ত হয়ে যায়। নীতি গ্রহণ করা হয় যে, সংযুক্ত পাঞ্জাবের সম্পদের ৬০ শতাংশ পাঞ্জাব এবং ৪০ শতাংশ হরিয়ানার কাছে ভাগ করে দেয়া হবে। পানি বন্টনের এই নীতি হরিয়ানার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। অপরদিকে পাঞ্জাব দোষারূপ করে যে, ব্যাংকের অনুমতি প্রাপ্ত দেশ হিসেবে যেটুকু দরকার তার সবটুকুই পাঞ্জাবের প্রাপ্য। বাকি যে অংশ অতিরিক্ত তা অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারে। এটি ছিল অনৈতিক, কেননা ইন্দুস ওয়াটার ট্রিয়ারি অনুসারে পাঞ্জাব নয় বরং ভারতই ছিল তিনটি নদীর পানির অনুমোদন প্রাপ্ত দেশ। রাজস্থান এই চুক্তি হবার অনেক আগে থেকেই যেকোনো উপায়ে সুতলেজ-এর পানি ব্যবহার করত। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত পাঞ্জাব ও হরিয়ানাকে কতগুলো রীতি মেনে নেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়। তাদের ব্যর্থতার পর কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৬ সালের ২৪ মার্চ ঘোষণা করে যে, সহজলভ্য নদীর পানি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে। এর কিছু অংশ দিল্লির খাদ্য পানীয়ের জন্য ব্যবহার করা হবে। কোনো প্রদেশই এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট ছিল না।

এর ফলে মিসেস গান্ধী তার ঘোষিত জরুরি অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন। সরকারের এক বছর আগে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে কমবেশি সুবিধা লাভ করেন। তিনি পাঞ্জাব রিঅর্গানাইজেশন আইন ১৯৬৬ অনুসারে এই সুবিধা লাভের অধিকার আদায় করেন। কেননা এতে বলা হয়, কোনো প্রদেশ যদি সম্মতিতে পৌছাতে না পারে তবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী জাইল সিং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাকে দৃঢ়ভাবে এই পুরস্কার গ্রহণ বা বরখাস্ত নিতে বলা হয়, তিনি থেকে যান।

এই পুরস্কারে ২১৪ কি.মি. দীর্ঘ সুতলেজ-যমুনা সংযোগ (এ.ওয়াই.এল) খাল স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। যার মধ্যে ১২২ কি.মি. পাঞ্জাব ও ৯২ কি.মি. হরিয়ানায় খনন করা হবে।

১৯৭৭-এর নির্বাচনে মিসেস গান্ধী ও তার দলের কাছ থেকে ক্ষমতা চলে যাবার পর এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। পাঞ্জাব ও হরিয়ানা উভয়স্থানেও জনতা পার্টি সরকার গঠন করে এবং তাদের মুখ্যমন্ত্রীরা ১৯৭৬ পুরস্কার গ্রহণ করে। বাদল এবং দেবী লাল উভয়ের দ্বারাই খাল খনন সূচনা হবার কথা ছিল। প্রাথমিকভাবে বাদল হরিয়ানার কাছ থেকে পাঞ্জাবের জন্য এক কোটি রূপি গ্রহণ করেন। এরপর উভয় মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে দ্বিতীয়বার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ পেশ করে।

১৯৮০ সালে মিসেস গান্ধী আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি পাঞ্জাব ও হরিয়ানার নতুন মুখ্যমন্ত্রীদ্বয় (দরবারা সিং ও ভজনলাল) কে সুপ্রীমকোর্ট থেকে

অভিযোগ তুলে নেয়ার পরামর্শ দেন এবং ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর মোট ১৭.৭ এম.এ.এফ.কে এভাবে বিভক্ত করেন ৪.২২ পাঞ্জাবকে, ৩.৫ এম.এ.এফ হরিয়ানাতে, ৮.৬ এম.এ.এফ. দিল্লিকে। এরপর তিনি এস.ওয়াই.এল. সংযোগ খাল কাপুরিতে খনন করার অনুমতি দেন (পাতিয়ালা জেলা)।

আকালিয়া ‘নাহার রোকো’ (খাল বন্ধ কর) আন্দোলনের মাধ্যমে এর প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু এটি কার্যকর হয়নি। আকালি জনতা মুখ্যমন্ত্রী যে সমঝোতা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে শুধু আকালিরাই মুখ খোলেনি। এই বিষয় আবার স্থগিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আকালি দলের প্রেসিডেন্ট সন্ত লাংওয়াল (যিনি দৃঢ়ভাবে মোরচার একানয়কত্ব করেছিলেন, যার মধ্যে নাহার রোকোও অন্তর্ভুক্ত ছিল) এবং প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর মধ্যে ১৯৮৫ সালের ২৪ জুলাই স্বাক্ষরিত সম্মতিপত্রে স্থান পেয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে পাঞ্জাবের হরিয়ানা, রাজস্থানে কৃষকেরা সেই হারে পানি পাবে যা তারা ১৯৮৫ সালের ১ জুলাই থেকে রবী-বীজ সিস্টেমের মাধ্যমে পেয়ে আসছিল। বাকি পানির বন্টন নিয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার মধ্যে যে বিবাদ ছিল না সুপ্রীমকোর্টের বিচারকের বিশেষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে মীমাংসিত হবে। এই ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত ছয় মাসের মধ্যে কার্যকর করা হবে এবং উভয় দলের উপরই আবশ্যিকভাবে আরোপিত হবে।^{১২}

নদীর পানি বন্টন নিয়ে প্রদেশগুলোর মধ্যে বিবাদ থেকেই যায়। পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় উৎপাদিত বহুবিধ ফসলের জন্য যতটুকু পানি দরকার ছিল তার প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হতো না। জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারের কারণে ধান, আখ ও আলু ক্ষেতে প্রচুর পানি প্রয়োজন ছিল। এজন্য উভয় প্রদেশের কৃষকেরা গভীর নলকূপ খনন করে তাদের প্রয়োজন মেটাতে। কিন্তু নলকূপ বা ভূগর্ভস্থ পানির চাইতে খালের পানি সস্তা ছিল। এজন্য উভয় প্রদেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছিল এবং কৃষকের ব্যয় বেড়েই যাচ্ছিল।

সম্মতিচুক্তির অকার্যকারতা

১৯৮৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের অবশিষ্ট শান্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বর্নালাকে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। তার আকালি মন্ত্রণালয় ছিল প্রথম যা অন্যান্যদলের মতো ছিল না। তার বিচারে তিনি একে পন্থিক সরকার হিসেবে বর্ণনা

১২. সূচী দেখুন ‘সন্ত লাংওয়াল-রাজিব গান্ধীর সন্ধি’। ১৯৮৭ সালের আগস্টে হরিয়ানা নির্বাচনে যাওয়ার কিছু আগে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক ইরাদী সরকারের কাছে তার রিপোর্ট জমা দেন। এটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আন্তরিকতার সাথে গৃহীত হয়। তেমনি পাঞ্জাব ও হরিয়ানা একে একইভাবে পরিত্যাগ করে। তার প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে এই বিজ্ঞ বিচারক আবিষ্কার করেন যে, পানির আরেকটি উৎস রয়েছে যা এর আগে কেউই খেয়াল করেনি।

করেন। বিদ্রোহাত্মকভাবে পন্থের জন্য আশাজনক ছিল যে এটিই ষড়যন্ত্র করে তাকে নিচে নামায়। এতে তাকে হঠাৎ নবাব হিসেবে পরিচিত করে। বাদল এবং তোহরা তাকে নিচু দৃষ্টিতে দেখে, তাদের সৃষ্টি হিসেবে এবং তাদের চাইতে উন্নতি করাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ডেপুটি চিফ মিনিস্টার পদ ছাড়া বাদল মন্ত্রীসভায় যোগদান করতে নারাজ ছিলেন। বর্নালা এতে তেমন গুরুত্ব দেননি, কারণ তিনি ভালো করেই জানতেন যে, বাদলের বিশাল আকালি এম.এল.এ. সমর্থক রয়েছে। তিনি অনেক সম্মানী ব্যক্তি এবং মুখ্যমন্ত্রীর পদ পেতে তার বেশিদিন লাগবে না। কারণ এ পদে তিনি ইতোপূর্বেই দুবার আসীন হয়েছিলেন। বর্নালা দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে বলবন্ত সিংকে নিরাপদ ভেবেছিলেন। বলবন্ত ‘জাট’ ছিলেন না। তিনি একজন ‘সাধু মানুষ’ ছিলেন যিনি নিপীড়ন বা ঘুষ প্রদান করে আকালি নেতাদের পরিচালনা করতেন এবং তার স্বার্থ উদ্ধারেই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। এরপর ছিলেন তোহরা। যিনি ছিলেন এস.জি.পি.সি.-এর নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হবার জন্য দৃঢ় আশাবাদী। এখানে আরেকজন প্রার্থী ছিলেন যার নাম অমরিন্দর সিং। তিনি কংগ্রেস থেকে আকালিতে যোগদান করেছিলেন এবং পাতিয়ালা পরিবারের তরুণ বংশধর। আকালি দলের ঐক্যে শীঘ্রই ফাটল ধরে যখন আকালি দল অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

লাংওয়াল-গান্ধী সম্মতির ভিত্তি ছিল যে এতে ধরে নেয়া হয় উভয় দলই এর নীতিসমূহ মেনে চলবে, সৎ পরামর্শ দেবে এবং যারা একে বাতিল করার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। যখন চুক্তি হয়ে যায় তখন কোনো দলই এই চুক্তির কোনো অংশ বাস্তবায়ন করতে উৎসাহ দেখায়নি এবং সম্মতি ভাঙনের দিকে চলে যায়। প্রথম আঘাতটি আসে প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর উপর। তাকে বুঝ দেয়া হয় যে, ১৯৮৬ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে চণ্ডিগড়কে পাঞ্জাবের কাছে হস্তান্তর করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। অফিস যুক্তি দেখায় যে, ম্যাথুও কমিশন, দুটি ভোগদখলের প্রসারণ থাকা সত্ত্বেও সেসব গ্রাম শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয় যেগুলো চণ্ডিগড় থেকে হরিয়ানায় স্থানান্তর করা হবে। এর প্রধান কারণ ছিল রাজিব গান্ধী হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভজন লালের কথায় কান দিয়েছিলেন এবং তিনি জানতে পেরেছিলেন যদি তিনি চণ্ডিগড়কে পাঞ্জাবের অধীনে দিয়ে দেন তাহলে তিনি পরবর্তী বছর অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে চণ্ডিগড়ের হিন্দু ভোট হারাবেন। বর্নালা, যিনি বিশ্বাস ভঙ্গের বিষয় উত্থাপন করেন এবং ইস্তফা পত্র জমা দেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর কারণ মেনে নেন এবং তার মুখ্যমন্ত্রীত্ব লাভের আশায় থাকেন। এর পাশাপাশি তার সরকার এম.ওয়াই.এল. খাল খননের জন্য গভীর করার কাজে হাত দেয় যাকে প্রকৃতপক্ষে বিগত মাসগুলোতে কাজ হচ্ছিল না। বর্নালা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতের পুতুল হিসেবে নিজের সমালোচনা প্রকাশ করেন।

যখন মধ্যমপন্থীরা নিজের মধ্যে কলহ শুরু করে। তখন চরমপন্থীরা সমাজের উপর নতুন ক্ষোভে তাদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে। যেদিন চণ্ডিগড়কে পাঞ্জাবের অধীন করার কথা ছিল কিন্তু দেয়া হয়নি সেদিন তারা এস.জি.পি.সি.-কে স্বর্ণমন্দিরের সমন্বয় রক্ষার দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে, খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে এবং পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পন্থিক কমিটির মাধ্যমে আকাল তাক্ত ভেঙে দেয়। এভাবে তারা তোহরাকে পরাভূত করে যিনি তার ছলনা দিয়ে জনগণের কাছে পুনর্বাসিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি চরমপন্থীদের সাথে যুক্ত হয়ে করসেবা করতে রাজি হন। যদিও তিনি এস.জি.পি.সি.-এর বর্তমান প্রেসিডেন্ট ছিলেন তবুও তিনি শিখদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ উপাসনালয়ের নিয়ন্ত্রণ হারান। কেন্দ্রীয় সরকার সতর্ক হয়ে যায় এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৮৬ সালের ১ এপ্রিল সিদ্ধার্থ শংকর রায়কে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চরমপন্থীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল তার। এটা পরিষ্কার ছিল যে, বর্নালা তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তার উপর আস্থা হারায়।

চরমপন্থীরা তাদের জয়ে সংবাদ সম্মেলন করে। ১৯৮৬ সালের ২৯ এপ্রিল তারা একটি আনুষ্ঠানিক সংকল্প প্রকাশ করে খালিস্তানবাদকে দাবি করে এবং পুনরায় স্বর্ণমন্দিরে খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিতে গভর্নর রায় এবং পুলিশ প্রধান জুলিও রবারিও বর্নালাকে চাপ প্রয়োগ করে এই বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। পরদিন সকালে (১৯৮৬-এর ৩০ এপ্রিল) বর্নালা পুলিশকে স্বর্ণমন্দিরে প্রবেশ করে উত্তরাধিকারীদের ত্রৈফতারের নির্দেশ দেয়। এতে বাদল, তোহরা ও অমরিন্দর সিং তাদের প্রতীক্ষিত সুযোগের সন্ধান পেয়ে যায়। তারা পুলিশ প্রবেশকে দ্বিতীয় অপারেশন ব্লু স্টার হিসেবে আখ্যা দেয় এবং সমর্থকদের আইনানুগ সমাবেশ করে বর্নালা মন্ত্রণালয়ের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে ভোট দাবি করে। একটি সংখ্যালঘু সংখ্যক মন্ত্রী ও এম.এল.এ.গণ বর্নালাকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু বর্নালার সহকারী বলবন্ত সিং সবচেয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তিনি বাকিদের একত্র করে হিমাচলের অতিথি ভবনে নিয়ে যান যেখানে ভিন্নমত পোষণকারী নেতারা তাদের কাছে পৌছাতে পারবে না। তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় সংসদে ফিরিয়ে আনা হয় যাতে সরকারের পক্ষে তারা ভোট দিতে পারে। যারা নীতিবান ছিলেন তাদের প্রত্যেককে মন্ত্রীসভায় পদ বা জনস্বার্থে চেয়ারম্যান পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। ১৯৮৬ সালের ৬ মে নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এবার বর্নালা কেন্দ্রীয় সরকারের পুতুল হিসেবে তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করেননি এবং

১৩. ওয়াশিংটন ডি.সি'তে অবস্থিত শিখ সংস্থা এই ঘোষণা দেয়া হয়েছিল বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায়। এর জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন জেনারেল বাসওয়াস্ত সিং বুলার। অপারেশন ব্লু স্টারের সময় স্বর্ণমন্দিরের সেনাবাহিনী প্রবেশের ঠিক আগে সময়মতো তিনি পালিয়ে যান।

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কংগ্রেস এম.এল.এ.-এর সমর্থন নিয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এস.জি.পি.সি.-এর নির্বাচনে তিনি আরেক দফা ভোগান্তির শিকার হন। তার মনোনীত প্রার্থী কাবুল সিং তোহরার কাছে হেরে যান। তিনি ১৬তম বারের মতো পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পরদিন তোহরা এবং বাদল গ্রেফতার হন।

স্বর্ণমন্দিরে অবস্থানকারী চরমপন্থীরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তথাকথিত মধ্যমপন্থীদের নিঃশেষ করার সময় এসে গেছে। ১৯৮৭-এর ফেব্রুয়ারিতে একজন বিখ্যাত ধর্মীয় সংগীত শিল্পী দর্শন সিং রাগীকে আকাল তাখতের প্রধান পুরোহিত মনোনীত করে এবং তাদের মনোনীত পুরোহিতদের পাঞ্জাবের তাখতে বসায়। পন্থিক ঐক্যতার নামে কর্মরত উচ্চপদস্থ পুরোহিত তাদের পৃথক করার জন্য আরেকটি আকালি দল আহ্বান করে। বর্নালা তার লাংওয়াল আকালি দল থেকে পৃথক করার বিরোধিতা করে এবং তানখাইয়া হিসেবে ঘোষিত হয়। তিনি সর্বস্ব হারান। তার সহকর্মীরা তাকে ছেড়ে যায়, পাণ্ডু তার হাতছাড়া হয়ে যায় এবং প্রধানমন্ত্রী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

রাজিব গান্ধীর অংশটি সম্পন্ন করতে না পারায় সন্ধি চুক্তি অসম্ভব হয়ে যায়, এ ব্যাপারটিতে কিছুটা সন্দেহ ছিল। তার উপর যে চাপ পড়েছিল তা তিনি প্রতিরোধ করতে পারেননি। ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথমে বুটা সিং অপমানিত হন এবং তানখাইয়া ঘোষিত হন এবং ১৯৮৫-এর এপ্রিলে পদত্যাগ করেন। ১৯৮৬ সালের মে মাসে রাজিব গান্ধী তাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। আকালি ও উচ্চপদস্থ পুরোহিতদের সাথে বুটা সিংয়ের ভালো সম্পর্ক ছিল। এরপর ছিলেন দরবারা সিং। প্রোভিসিয়াল কংগ্রেস কমিটিতে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তার মনোনীত প্রার্থী সন্তোষ সিং রানধাওয়াকে দোষারোপ করা হয় যে, সন্তোষীদের সাথে তার যোগাযোগ ছিল এবং ১৯৮৫ সালের জুনে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। তার স্থানে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণ অপরিচিত মেজর জেনারেল রাজেন্দ্র সিংস্প্যারো, এম.পি.'কে নিযুক্ত করেন। পাঞ্জাব কংগ্রেস দলের প্রভাব কমে যায় এবং দরবারা সিং দায়িত্ব গ্রহণের ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়েন। পরিশেষে হরিয়ানার ভজন লাল সিং ক্রমাগত প্রধানমন্ত্রীর কানে মন্ত্র দিতে থাকেন যে, শিখ বা পাঞ্জাবকে যদি ছাড় দেয়া হয় তাহলে তিনি হরিয়ানার হিন্দু ভোট হারাবেন। রাজিব গান্ধী তার কথায় কান দেন এবং ১৯৮৭ সালের ১১ মে বর্নালায় আকালি সরকারকে বাজেয়াপ্ত করেন। এর কয়েক মাস পর তার দল হরিয়ানায় সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে চলে যায়। তিনি পাঞ্জাব ও হরিয়ানাকে হারান সেই সাথে তার নিরপেক্ষ রাজনীতিবিদের পরিচয়ও হারাতে হয়।

২৪. বৈদেশিক যোগাযোগ ও খালিস্তান

সরকারি মুখপাত্র ও ভারতীয় গণমাধ্যম ভারতকে অস্থিতিশীল করার জন্য শিখ সন্ত্রাসীদের অর্থ, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি ও আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করার জন্য বৈদেশিক সংস্থাসমূহকে দোষারোপ করে। দুটি অতি উচ্চারিত নামের মধ্যে ছিল আমেরিকার সি.আই.এ. (যারা কখনও পশ্চিম জার্মান সংস্থার মাধ্যমে কাজ করত বলে অভিযোগ করা হয়) এবং পাকিস্তান। যদিও বৈদেশিক কোনো শক্তির অস্তিত্ব নিশ্চিত প্রমাণের মাধ্যমে পাওয়া যায়নি তবুও ভারত সরকার আটককৃত শিখ সন্ত্রাসীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে পাকিস্তান সরকারকে দোষারোপ করে। এছাড়াও কিছু পাকিস্তানি সংস্থার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় যারা আশ্রয়স্থল, দীক্ষা দিয়ে নতুনদের এনে, অস্ত্র আমদানিতে সাহায্য করে এবং ভারতে চোরাইপথে এনে তাদের সাহায্য করেছিল। পাকিস্তান বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করে। সন্ত্রাসবাদ ও খালিস্তান দাবি ছড়িয়ে পড়ায় বৈদেশিক সাহায্যের একমাত্র বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় ইংল্যান্ড, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রে স্বতন্ত্র শিখ বা শিখ সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে।

এটি নির্ণয় করা হয় যে, প্রায় ১৮ মিলিয়নের মধ্যে ৫ মিলিয়ন শিখ ভারতের বাইরে বসবাস করে। ৩০০০ গুরুদুয়ারার ভেতর ৫৫০টি ভারতের বাইরে অবস্থিত। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ ছিল না যেখানে উপাসনার স্থান ও নিজস্ব সামাজিক সংঘবদ্ধতা নিয়ে শিখরা বসবাস না করত। এর মধ্যে অধিক সংখ্যক ছিল ব্রিটেনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যুক্তরাজ্যে শিখদের সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার। লন্ডনের শেফার্ড ব্রুয়ের কাছে তাদের প্রধান গুরুদুয়ারা এবং ছোটগুলো ম্যানচেস্টার ও বার্মিনহাম শহরে অবস্থিত ছিল। এই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল ছাত্র, পেশাজীবী এবং ভাত্রা ফেরিওয়ালারা। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও পাঞ্জাব বিভক্তির পর পাকিস্তান থেকে ইংল্যান্ডে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীর আগমন ঘটে। ইংরেজ মালিকানাধীন কারখানায় তারা সহজে চাকরি লাভ করে এবং দুর্দশাপূর্ণ আধা-দক্ষ হাতে কাজ শুরু করে। তাদের অনুসরণ করে কেনিয়া, উগান্ডা এবং অন্যান্য পূর্ব

১. এন.এস. মারজিল, ইন্টারন্যাশনাল ডিরেক্টরি অফ গুরুদুয়ারা এন্ড শিখ অর্গানাইজেশন, সাউথ টল, ইউ.কে. (এল. ভেন্দী ব্রাদার্স, ১৯৮৫)।

আফ্রিকার শিখরা যাদের একসময় ইংল্যান্ড শাসন করত। তারা ছিল সুশিক্ষিত পেশাজীবী, ব্যবসায়ী অথবা দক্ষ শিল্পী। শেষ শিখ অভিযাসীরা আসে অপারেশন ব্লু স্টার এবং ১৯৮৪ সালে মিসেস গান্ধীর গুপ্ত হত্যার পর শিখ বিরোধী নৃশংসতার পর। যদিও সংখ্যায় কম ছিল, তবুও শেষ দলটি ছিল ধর্মীয় মৌলবাদে বিশ্বাসী—যারা ছিল ভারতীয় সরকারের চরম বিরোধী। ইংল্যান্ডে অবস্থানকারী শিখ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩০০০০ এবং ১৪৫টি গুরুদুয়ারার নিয়ন্ত্রণ চরমপন্থীদের হাতে।

পূর্বে বর্ণিত অধ্যায়ে আমরা কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকারী শিখদের সম্পর্কে জানতে পেরেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত দেশ দুটিতে ১০,০০০-এর বেশি শিখ ছিল না। ১৯৮৫ সালে নির্ণয় করা হয় যে, কানাডাতে এই সংখ্যা ১২০,০০০ থেকে ২০০,০০০-এর মধ্যে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১২৫,০০০-এরও বেশি। কানাডাকে ১২৫টি গুরুদুয়ারা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯০০টি গুরুদুয়ারা অবস্থিত। ইংল্যান্ডের মতো এই দুটি দেশেও সেগুলোর অধিকাংশই ছিল চরমপন্থীদের দখলে।

১৯৮৪ সাল পর্যন্ত বিদেশী শিখ সম্প্রদায়ের কার্যক্রম (তাদের দেশে কানাডীয় ও আমেরিকান প্রভাব ছাড়া) তাদের অঞ্চলের গুরুদুয়ারাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা স্বর্ণমন্দিরে প্রলয় ঘটে যাওয়ার পর তাদের আচারের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ধর্মীয় গোঁড়ামী ও রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিতরা গোঁড়াহীন ও অশুশ্র শিখদের কাছ থেকে গুরুদুয়ারার নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেয় এবং তাদেরকে ভারতীয় সরকার বিরোধী মতবাদে আনার চেষ্টা করে। বিপুল সংখ্যক সংস্থা খালিস্তানকে ছড়িয়ে দিতে এবং ভারতে সন্ত্রাসীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ঘাঁটি গড়ে সেখানে প্রশিক্ষক ভাড়া করে আনা হয় তাদেরকে গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। পাঞ্জাবে অবস্থিত প্রতিটি সংস্থার অপর একটি অংশ ছিল ইংল্যান্ডে, কানাডায় এবং যুক্তরাষ্ট্রে। তাদের ছিল বাক্সার খালসা, আকন্দ কীর্তনী জ্যাঠা, খালসা কমান্ডো ফোর্স, খালসা লিবারেশন ফোর্স এবং ভিন্দারওয়াল টাইগার ফোর্স, দশমেষ রেজিমেন্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশন। গুরুদুয়ারায় নিয়মিত সংগ্রহ বজায় রাখা হতো যাতে ভারতে তাদের মূল ঘাঁটিতে সরবরাহ করা যায়। তিনটি দেশেই কয়েকটি নৃশংসতার ঘটনা ঘটে।^২

২. ভারতীয় মিশনের বাইরে প্রতিরক্ষা সমাবেশ আয়োজনের পাশাপাশি ভারতীয় দূতাবাস ও দূতদের সাথে কঠোরতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কানাডীয় শিখ সন্ত্রাসীরা এয়ার ইন্ডিয়ার কনিষ্কয় একটি টাইম বোমা স্থাপনে সফল হয়। এটি ১৯৮৫ সালের ২৩ জুলাই ৩২৯ জন যাত্রী কর্মচারীসহ আইরিশ কোস্টের সমুদ্রে বিধ্বস্ত হয়। আরেকটি এয়ারক্রাফটে একই সময়ে আরেকটি বোমা স্থাপন করা হয় যা টোকিওর নারিতা বিমানবন্দরে দু'জন অফ-লোডারকে নিহত করে। এর এক বছর পর ১৯৮৬ সালের ৩১ মে নিউইয়র্কে আরেকটি ভারতীয় এয়ারক্রাফট বিমান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করা হয়। এটি মন্ট্রিলে ধ্বংস হয় এবং বাক্সার খালসার দুই সদস্যকে অভিযুক্ত করে তাদের আজীবন কারাদণ্ড

অপারেশন বু স্টার এবং ১৯৮৪ সালের শিখ হত্যার রেশ কিছুটা প্রশমিত হবার পর এসকল সংস্থাগুলো বিভিন্নভাবে ভাগ হয়ে যায়। পুলিশ এবং তদন্ত সংস্থা তাদেরকে দমন করতে এবং তাদের কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটাতে সফল হয়।

অধিকাংশ বৈদেশিক শিখ সংস্থার অস্তিত্ব এখন শুধুমাত্র কাগজে কলমে। তাদের সদস্য সংখ্যাও কম এবং এগুলো তাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির বাসভবনে অবস্থিত। এ ধরনের সংস্থা হলো গঙ্গা সিং ধীলনস নানা কানা সাহেব ফাউন্ডেশন এবং শিখ কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশন, দি শিখ কাউন্সিল অফ নর্থ আমেরিকা, দি শিখ ফাউন্ডেশন অফ ইউ.এস.এ. এবং দি ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশন। এর একটি ফল হলো দি ওয়ার্ল্ড শিখ অর্গানাইজেশন যা ১৯৮৪ সালের ২৭ জুলাই নিউইয়র্কে স্থাপিত হয়। একসময় কানাডায় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫,০০০, যুক্তরাজ্যে ১,০০০ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১০০০। এগুলো চলত বিভিন্ন সাহায্যের মাধ্যমে যা ধনী শিখ যেমন যোবা সিটির দিদার সিং বাইন প্রমুখেরা দিতেন। একসময় মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) জসওয়ান্ত সিং বুলার ছিলেন এটির সেক্রেটারি জেনারেল। তার পদত্যাগের পর এর কার্যক্রম হ্রাস পায়। খালিস্তানি সংস্থার যেটুকু বাকি ছিল তা হলো— উত্তর আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল শিখ অর্গানাইজেশন যার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫০০-এরও নিচে। প্রখ্যাত পরমাণু জীববিজ্ঞানী গুরমিত সিং আওলাখ-এর এবং কাউন্সিল অব খালিস্তানের সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি সিনেটর এবং কংগ্রেস ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারতেন এবং ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নীতি নিয়ে ইস্যু সৃষ্টি করতে পারতেন।

খালিস্তান আন্দোলন অচল রয়ে যায়। ড. জগজিৎ সিং চৌহান ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডনে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এর সূচনা করেন। এক মাস পর ১৯৭১ সালের ১৩ অক্টোবর নিউইয়র্ক টাইম-এর একটি বিজ্ঞাপনে খালিস্তান প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়।

নয় বছর পর (১২ এপ্রিল ১৯৮০) ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ খালিস্তানে চৌহান সভাপতি ও বলবীর সিং সাধুকে সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত করে নির্বাচনে অংশ নেন। তিনি তার মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের নাম ঘোষণা করেন এবং বিদেশি দেশগুলোতে রপ্তাদূত নিয়োগ করেন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তার অনুরোধে দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি দেয় একটি মাত্র দেশ, ইকুয়েডর। এতে কানাডায় তার সমর্থকের সংখ্যা

দেয়া হয়। ১৯৮৬ সালের ২৫ মে পাঞ্জাবের পরিকল্পনামন্ত্রী মালকীত সিং সিধুকে ভ্যানকুভার গুলি করে নির্মমভাবে আহত করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশনের চার সদস্যকে অভিযুক্ত করে তাদেরকে বিশ বৎসর শাস্তি দেয়া হয়। ১৯৮৬ সালের ১৪ জুন বাব্বার খালসার সাতজন সদস্য ভারতের সংসদ গুঁড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র করলে তাদেরকে পথে লন্ডনে আটক করা হয়। তাদের কানাডায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ষড়যন্ত্রের প্রসার ঘটে। এর মধ্যে ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার পরিকল্পনা।

নির্দেশ করা যায় না যারা খালিস্তানি পাসপোর্ট, মুদ্রা ও পোস্টাল স্ট্যাম্প ইস্যু করে, যা ছিল কালেক্টরের কাজ।

খালিস্তান আন্দোলন ভারতের শিখদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেতে ব্যর্থ হয়। এ.এই.এস.এস.এফ.-এর কুখ্যাত দল এবং দমদমি টাকশালের কেরানীরা যারা মাঝে মাঝে স্বর্ণমন্দিরে খালিস্তানি পতাকা উত্তোলন করত এবং শ্লোগান দিত, তারা ছাড়া এর তেমন পৃষ্ঠপোষক ছিল না। এমনকি বিদেশি শিখদের মধ্যেও খালিস্তানের দাবি স্তিমিত হয়ে যায়। গুটিকতক লোক পূর্ব-খালিস্তানি বক্তব্য দিত। কিন্তু অধিকাংশই নিজেদেরকে তাদের হাত থেকে দূরে রাখত এবং গুরুদুয়ার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ করে। প্রখ্যাত শিখ সাংবাদিক যতীন্দ্র সিং ১৯৮০-এর শেষের দিকে বিদেশী শিখ জাতিকে নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি এই বক্তব্যে পৌঁছেন যে, ইংল্যান্ড, কানাডা ও যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী শিখরা এখন তার রবিবারের সমাবেশে ভারতীয় সরকারের বিরুদ্ধে ধোঁয়া তোলে না এবং তারা এখন আর সপ্তাহান্তের খালিস্তানি^৩ নয়। পাঞ্জাবের সন্তাসীদের সাহায্য আসা কমে যায়।

BanglaBook.org

সারকথা

শিখদের পাঁচ শতাব্দীর ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়; প্রথম তিনশো বছরকে একশো বছর হারে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। দ্বিতীয় ভাগকে পঞ্চাশ বছর করে চারভাগে ভাগ করা যায়। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে গুরু নানক তার অভিযান শুরু করেছিলেন। প্রায় একশো বছর পর গুরু অর্জুন (১৬০৪ সালে) এই পবিত্র রীতির পূর্ণতা সাধন করেন। যা আদি গ্রন্থ নামে পরিচিত এবং শিখদের জন্য একটি পবিত্র নগরী উপহার দেন যার নাম অমৃতসর। এই শতকে শিখ ধর্মীয় দর্শনের সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এর পরবর্তী শতকে শিখরা ক্রমান্বয়ে নানকপন্থীর নির্ভেজাল অনুসারী থেকে (যারা নানকের পথ অনুসরণ করত) শক্তির ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে যায়। শেষ দিকের শিখ গুরু ১৬৯৯ সালে মিলিটারি বাহিনী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়। পরবর্তী শতাব্দীতে শিখদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বান্দা বৈরাগী পাঞ্জাবে মুঘল শাসনের উপর একটি মারাত্মক আঘাত করেন। এরপর দল খালসার বিস্তৃতি ঘটে এবং আটক থেকে গ্যাঙের কাছে অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রসার আরও দৃঢ় হয় রনজিৎ সিং-এর মাধ্যমে। যখন তিনি ১৭৯৯ সালে লাহোরে ধরা পড়েন এবং নিজেকে পাঞ্জাবের মহারাজা দাবি করেন।

মহারাজা রনজিৎ সিংয়ের চল্লিশ বৎসর (১৭৯৯-১৮৩৯) ছিল শিখ রাজনৈতিক অর্জনের স্বর্ণযুগ। তার মৃত্যুর পর শিখদের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিভক্তি ঘটে। শিখ সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে দুটি অ্যাংলো-শিখ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮৪৯ সালে তাদের রাজ্য নতুন ভূ-খণ্ডে পরিণত হয়। পূর্বেই লক্ষণীয় হলেও এই সময় তাদের সামাজিক অবনতি ঘটে। কেশধারী খালসাদের হুমকি দিয়ে দমিয়ে রাখা হয় যেহেতু প্রচুর সংখ্যক লোক তাদের বাহ্যিক ভূষার বাড়তি অংশ ছেড়ে ফেলে (চুল, দাড়ি না কাটা) এবং সহজধারী শিখে রূপান্তরিত হয়। খালসা ঐতিহ্য কৃত্রিমভাবে জীবিত রাখা হয় ব্রিটিশ কেশধারী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রিভিলেজের মাধ্যমে। যেমন সেনাবাহিনী ও জনসেবায় তাদের প্রবেশের সুবিধা, এবং পরবর্তীতে আলাদা নির্বাচনক্ষেত্র এবং আইন সংস্থায় তাদের আলাদা আসন বরাদ্দ করা ইত্যাদি। এর ফলে কেশধারী খালসারা সহজধারীদের এমনকি হিন্দুদের মধ্যে যা শিখবাদে বিশ্বাস করত তাদের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। শিখ

রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর মান, নেতৃত্ব ও প্রভাব পাশাপাশি স্তিমিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রধান খালসা দিওয়ানরা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যেমন স্যার সুন্দর সিং মজিথিয়া, আটারির হারবান সিং এবং সীমান্তের দিকে রাজা স্যার দলজিৎ সিং এবং স্যার যগীন্দ্র সিং প্রমুখ তারা প্রত্যেকে ছিলেন সুশিক্ষিত, ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসভাজন এবং উপস্থাপনা ও সনাতন মতবাদের বিশ্বাসী। যুদ্ধের পর প্রধান খালসা দিওয়ান পদটি পেছনে চলে যায় এবং আকালি দলের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়। আকালিদল আবিষ্কার করে যে, অহিংসা ও অসহযোগিতার মাধ্যমে প্রশাসনের বিরোধিতা করা শাসকদের কাছে দাবি তোলা বা আইনের পরিবর্তন সাধনের চাইতে অনেক বেশি ফলপ্রসূ। গ্রাম্য জাটদের সমন্বয় বিপুল সংখ্যক নতুন নেতারা প্রকাশ্যে আসে। যাই হোক, আন্দোলনের পূর্ববর্তী সময়ে তারা তাদের নেতাদের সুশিক্ষিত ও তাদের প্রতি উৎসর্গীত হবে এমন ব্যক্তিদের আশা করত। এমনই লোক ছিলেন বাবা খরক সিং, মেহতাব সিং ও মাস্টার তারা সিং। তারা রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক দায়িত্ব জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর আরোপ করেছিলেন যেমন উজ্জ্বল সিং, বুটা সিং এবং সম্পুরান সিং যারা গোলটেবিল আলোচনায় তাদের গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করত। ক্ষমতা হস্তান্তরের কাছাকাছি সময়ে শিখদের পক্ষ থেকে দক্ষ রাজনীতিবিদ জ্ঞানী কর্তার সিং দাবি তোলেন। সেই সাথে তারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের কাছ থেকে আশাভীত নেতৃত্ব প্রাপ্ত হয়ে লাভবান হয়। এতে অনভিজ্ঞ সাধারণ লোকদের অবস্থা পূরণ হয়ে যায় যেমন বলদেব সিং, যিনি পণ্ডিত নেহেরুকে নিজের পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছিলেন।

পাঞ্জাবের স্বাধীনতা ও বিভক্তির পর শিখ নেতৃত্ব অমার্জিত রূপ ধারণ করে এবং দ্রুত নিচের দিকে চলে যায়। স্মরণ সিং, প্রতাপ সিং কাইরন, জাইল সিংয়ের মতো যোগ্য লোকেরা চলে যায় এবং কংগ্রেস দলে যোগ দেয়। নতুন আকালি নেতৃত্ব শিক্ষা ও নীতিগত যোগ্যতা তাদের পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক নিচে নেমে যায়। দলাদলি, মন্ত্রীত্ব বা লাভজনক পদ লাভের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো প্রদেশ নিয়ন্ত্রিত দলে স্থানান্তর মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। গুরুদুয়ারাতে দুর্নীতি একটি সর্বজনস্বীকৃত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। রাজনৈতিক বিষয়ে গুরুদুয়ারার অর্থ ব্যয় এবং এম.জি.পি.সি.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রধান পুরোহিত গ্রন্থি, রাগি, সেবাদার, হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, হাসপাতাল, এতিমখানায় লোক নিয়োগ হতো এবং রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো হতো। এস.জি.পি.সি.-এর নেতৃত্বের মান নিচে নেমে যাওয়ার একটি উদাহরণ গুরুচরণ সিং তোহরা। তিনি ছিলেন একজন বামপন্থী, তার শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল খুব কম। তিনি পর পর ষোলবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই সাথে সংসদের দ্বিতীয় দফার সদস্য, যা তিনি খুব কমই সময় দিতেন। সনাতনী রাজনীতিতে জরুরি নেতা যেমন বাদল, বলবন্ত সিং এবং অমরিন্দর সিংয়ের আবির্ভাব

ঘটে। যাদের প্রাথমিক জবাবদিহিতো ছিল তাদের নিজেদের কাছে। ভদ্র রাজনীতিবিদ যেমন তোহরাও পাশাপাশি ছিলেন। এভাবে যাজক শ্রেণী, যাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান পুরোহিত, রাগি এবং গ্রন্থি, মনে করেন যে, তাদেরকে অন্ধকার শীতলতায় রাখা হয়েছে এবং তারা গুরুদুয়ারা অর্থভাণ্ডারের দায়িত্ব নিতে যায় এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আওয়াজ তোলে। তাই এস.জি.পি.সি.-এর ক্ষমতা বলে প্রধান পুরোহিত তারাই মনোনীত করতেন। ধর্মীয় সংগীত শিল্পী দর্শন সিং রাগী^৪ এভাবেই আকাল তাক্তের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পন্থের গন্তব্যের দিশা দেন। পরবর্তীতে এ.আই.এস.এফ.-এর নেতাদের মাধ্যমে ধর্মীয় যাজকদের কাছ থেকে ক্ষমতা চলে যায় এবং ভিন্দারওয়ালের সন্ত্রাসী শিক্ষালয়ে দমদমি টাকশালের মনোনীতরা স্থান পায়। তারাই প্রথম একের চেয়ে বেশি বার ক্ষমতায় আসতে শুরু করে।

শিখদের আত্মমূর্তি বাস্তবের সাথে খুব কমই খাপ খায়। তাদের উপরে ওঠার অনাকাঙ্ক্ষা যা তাদের ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত করেছিল তা শূন্য অসারতায় পরিণত হয়। ধর্মীয় ব্যাপারের চাইতে ধর্ম দেখিয়ে কাজ করাই তাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মীয় জীবন শুধুমাত্র অন্ধকার আচার-অনুষ্ঠানে এবং ভাড়া করা গ্রন্থিদের আখন্দ পান্থ-এ সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। গ্রন্থির ধার্মিকতা যা একসময় ছিল আদর্শ তা ধর্মীয় দর্শনে রূপান্তরিত হয় এবং রাগীরা কীর্তন শোনানোর জন্য মোটা অংকের টাকা দাবি করত যা কিনা সিনেমায় প্লেব্যাক সংগীতশিল্পীদের মতোই। রাগী এবং গ্রন্থিরা এধরনের আচার অনুষ্ঠানে বেশি আগ্রহ প্রকাশ করে। বর্ণভেদ দূর হবার ঘোষণা দেয়া হলেও নিম্নবর্ণীয় শিখদের প্রতি বৈষম্য ছিল হিন্দু ছায়ার একটি অংশ। সমগ্র মানবজাতির প্রতি সুচরিত্রের দীক্ষা যা গ্রন্থি বর্ণনা করা হয়েছিল তা শুধুমাত্র গান ও আচার-অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের প্রেরণা সর্বভাবে খারাপ মত থেকে ন্যায়ের পথে সকলকে আহ্বান জানায় যা পর্যবেক্ষণের চাইতে কার্যক্ষেত্রে বেশি প্রয়োজন। কিছু লোক দুর্বৃত্তদের বাধা দিতে অসমর্থ হয় যারা বাস থেকে নিরীহ, নিরস্ত্র লোকদের ধরে ধরে হত্যা করে, জনবহুল দোকানপাটে এবং সিনেমা হলে গ্রেনেড স্থাপন করে। অসাড় শিখ সমাজে হিন্দুধর্মসী ভিন্দারওয়াল শহীদ নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন। সময়ের সাথে সাথে এটি প্রতীয়মান হয় যে, খালসা তাদের জন্য অনুমোদিত ইতিহাসের পথ নির্দেশ করে এবং তাদের জ্ঞানী গুরুরা তাদেরকে এমন নেতা উপহার দেয় যা তাদের মৃত্যু কামনাকে বাস্তব করে।

৪. সুরানওয়াল গ্রামের (বর্তমান পাকিস্তানের সাহিওয়াল জেলা) দর্শন সিং (জন্ম ১৯৩৬) ছিলেন একজন অরোরা শিখ। তিনি সংগীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে দামি রাগী এবং ধর্মোপদেষ্টা। অপারেশন ব্লু স্টারের পর তিনি রাজনীতিতে আসেন এবং সরকারকে দোষারোপ করে দেয়া অগ্নিময় ধর্মোপদেশের জন্য দু'বার কারাবরণ করেন। সুরকারের রচনা বিষয় ব্যাখ্যা (২)।

উপসংহার

১৯৮৪ সালের জুনে স্বর্ণমন্দিরে ঘটে যাওয়া প্রলয় এবং ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর শিখ দেহরক্ষীর হাতে মিসেস গান্ধীর গুলিহত্যার পর ৫০০০-এরও বেশি নিরীহ শিখ হত্যারস্মৃতি—উত্তর ভারতের অধিবাসীর মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। শিখ ও পাঞ্জাবি হিন্দুরা ব্যাপারটি কীভাবে গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে বিরাট তারতম্য দেখা যায়। যারা মন্দির থেকে ভিন্দারওয়ালের হিন্দু বিরোধী ঘৃণাত্মক বক্তৃতার ভিত্তিতে ঘটনাগুলো বিচার করেছিল, পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় তার সন্ত্রাসের আধিপত্য কমে গিয়েছিল। একটি স্বাধীন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা ও আকাল তাখ্তে খালিস্তানে পতাকা উত্তোলন করেছিল যারা তাদের পবিত্র উপাসনালয়ে ধ্বংসযজ্ঞ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতির দোষারোপ করেছিল, কুকর্মের শাস্তি দেওয়ার জন্য হোয়াইট পেপার আরোপ করেছিল এবং শিখ বিরোধী অবাদ হত্যার পর একের পর এক তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু কেউই তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়নি। এর ফলে অপরাধের মাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ভিন্দারওয়ালের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উন্নয়নের সময় এর মাত্রা ছিল সবচাইতে বেশি। মাস্টার তারা সিংয়ের কন্যা রাজেন্দ্র কনকে পাঞ্জাবের একটি গ্রামে হত্যা করা হয় এবং দিল্লিতে দিল্লি গুরুদুয়ারা কমিটির এইচ.এস. মানচন্দ্রকে গুলি করা হয়। এমনকি যখন সন্ত লাংওয়াল রাজিব গান্ধীর সাথে শান্তিচুক্তি করেছিলেন (১৯৮৫ সালের ২৪ জুলাই-এ স্বাক্ষরিত) তখন একটি এয়ার ইন্ডিয়া বিমান, কানিঙ্ক যা কানাডার ভ্যানকুভার থেকে লন্ডনে যাচ্ছিল, ১৯৮৫ সালের ২০ জুন আইরিশ উপকোর্থে ধ্বংস করে দেয়া হয়। এতে ৩২৯ জন যাত্রী ও কর্মী নিহত হয়। ভারতে যাওয়ার জন্য মালামাল পরীক্ষা করার সময় নারিতা এয়ারপোর্ট, টোকিওতে দু'জন মালামালধারী লোককে খুন করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই অপরাধ সংঘটনে জড়িতরা শিখ, কানাডা প্রবাসী শিখরা। এর পরের মাসে সংসদ সদস্য এবং প্রেসিডেন্ট শংকর দয়াল শর্মার জামাতা ললিত মাখনকে দিল্লিতে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যা করা হয়। সংপুর জেলার শেরপুর গ্রামে গুরুদুয়ারায় উপাসনার সময় ১৯৮৫ সালের ২০ আগস্ট সন্ত লাংওয়ালকে হত্যা করা হয়। পাঞ্জাবে প্রতিটি প্রদেশের প্রতিটি জেলায় নৃশংসতা ছড়িয়ে পড়ে এবং আকাল তাখ্ত সন্ত্রাসীদের

হাতে চলে যায়। রাজিব-লাংওয়াল সম্মতির পর এস.এস. বর্নালা প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তিনি প্রশাসনের লাগাম ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। ১৯৮৬ সালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ব্যাপকভাবে প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ে। অল ইন্ডিয়া শিখ স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন (এ.আই.এস.এস.এফ.) চন্ডিগড়কে পাঞ্জাবে স্থানান্তর করার জন্য আন্দোলনকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। আকালিদের দলাদলি রাস্তায় উঠে আসে 'রাস্তা রোকো' (সড়ক বন্ধ কর)। হরিয়ানাতেও প্রাদেশিক সরকারের বদান্যতায় বিরোধী দল একই ধরনের রাস্তা রোকো আন্দোলন করে। কেন্দ্রীয় সরকার সবচেয়ে ভালো যা করতে পারত তা হলো চন্ডিগড়ের পরিবর্তে হরিয়ানাকে পাঞ্জাবের হাতে তুলে দেয়ার জন্য হিন্দীভাষী গ্রাম্য শনাক্ত করার জন্য একটি এক ব্যক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা করা। দুটি যুক্তিসংগত গ্রাম ফজিলকা ও আবহার ছিল প্রধানত হিন্দীভাষী কিন্তু হরিয়ানার পার্শ্ববর্তী নয়। মধ্যবর্তী অবস্থানে অবস্থানরত কাভুখেরা গ্রাম ছিল পাঞ্জাবি ভাষী এবং নির্বাচনী এলাকা। কিন্তু একে পাঞ্জাবে রাখার বিরোধিতা করা হয়। একইভাবে ফজিলকা এবং আবহার-এর ভাগ্য নির্ধারিত হয়।

একই সময়ে সন্তসীরা তাদের কার্যক্রম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮৬ সালের ২ অক্টোবর দিল্লির রাজঘাটে প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। এর পরদিন ডিজি পুলিশ জুলিও রিবেরো এবং তার স্ত্রীকে জার্মানিদারে গুলি করা হয় এবং তারা আহত হন। (১৯৯১ সালের ২০ আগস্ট রোমানিয়ায় দূত নিযুক্ত হবার পর ২য় বারের মতো রিবেরোকে হত্যার চেষ্টা চালানো হয় এবং তিনি গুরুতর আহত হন। রিবেরো ঘটকদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য দিল্লিতে অবস্থিত রোমানিয় দাপ্তরিককে অপহরণ করা হয় এবং ২৩ দিন পর মুক্তি দেয়া হয়।) গুপ্ত ঘটকদের বুলেটের শিকার হয়েছিলেন আকালি নেতা জিওয়ান সিং উমরানাঙ্গাল এবং দু'জন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তার পুত্র পি.এস. কাহলন ও ডি.এস. মাখাত। পাতিয়ালায় ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ও স্পোর্টস (এন.আই.এস.)-এ যোগ করার সময় আরো দু'জন পুলিশ অফিসার অরবিন্দর সিং ব্রার ও কে.আর.এস. গিলকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯৮৬ সালের আগস্টে পুনাতে দুইজন শিখ গুপ্তঘাতী জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এ.এস. বিদ্যাকে হত্যা করে। তিনি অপারেশন ব্লু স্টার চালাকালীন সময়ে আর্মি স্টাফদের প্রধান ছিলেন।

এই ছাপিয়ে যাওয়া ঘটনার সমালোচনা না করে ক্ষমতাস্বার্থ আকালি দলের রাজনৈতিক নেতারা পুলিশকে দোষারোপ করতে থাকে বিপুল সংখ্যক তরুণ শিখকে সরিয়ে দেয়া বা ক্ষুদ্র সন্দেহে বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য। পাঞ্জাব এবং বৈদেশিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই অভিযোগকে বাস্তবতা সম্পন্ন মনে করেনি। বর্নালা সরকার এই অভিযোগ বা পাল্টা অভিযোগ নিয়ে জ্রফ্ফেপ করেনি।

বর্নালা সরকার সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন আকালি দলের তার বিরোধী নেতারা। যেমন পরশ সিং বাদল, জি.এস. তোহরা এবং পাতিয়ালায় অমরিন্দর

সিং। তারা চাইতেন নিজেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন করতে। এমনকি তার সমর্থকদের মধ্যে যারা মন্ত্রীত্ব পায়নি তারাও অসন্তুষ্ট হয়।

১৯৮৭ সালের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জাইল সিং এবং প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীর মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। আকাল তাখ্তের ভারপ্রাপ্ত জ্যাটাদার হিসেবে বর্নালা আরও একঘরে হয়ে যান। দর্শন সিং রাগী তাকে স্বর্ণমন্দিরে পুলিশ পাঠানোর জন্য তানখাইয়া ঘোষণা করেন।^১ হরিয়ানাতে নির্বাচন স্থগিত থেকে যায়। মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল সিং প্রধানমন্ত্রীকে কানপড়া দেন যে, পাঞ্জাবকে যদি আরও সুযোগ দেয়া হয় তাহলে হরিয়ানার নির্বাচনে কংগ্রেস হিন্দু ভোট হারাবে। রাজিব গান্ধী তার কথা শোনে এবং বর্নালা সরকার ভেঙে দেন। পাঞ্জাব সংসদকে ‘স্থগিত চিত্র’ হিসেবে রেখে দেন এবং ১৯৮৭ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্টস আইন জারি করেন। কিন্তু হরিয়ানার নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায়!

১৯৮৮ সালের প্রথম মাসটি পাঞ্জাবের ইতিহাসে কালো জানুয়ারি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এটি দুইজন সিনিয়র অফিসারের মৃত্যু দিয়ে শুরু হয়। পাতিয়ালায় শিখ সন্ত্রাসীরা তাদের হত্যা করে। হিন্দু ও শিখ হত্যা উভয়ের মধ্যেই ব্যবধান তৈরি হয়। অবস্থার অবনিত ঘটার কারণ হলো কেন্দ্রীয় সরকার বা আকালি নেতারা কেউই জানতেন না, কীভাবে প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাশক্তিতে সিমরানজিৎ সিং মানকে ত্রাণকর্তা মনে হয়। অনিশ্চিত রিপোর্টের মতো তাকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদ প্রস্তাব করা হয়েছিল যদি তিনি প্রদেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেন। মান অসৌজন্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু বিপুল সংখ্যক আকালিকে তার পক্ষে আনতে সমর্থ হন।

এ সময়ে স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে ও বাইরে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। মন্দিরের ভিতর আশ্রয় নেয়া সন্ত্রাসীরা সীমান্তবর্তী এলাকার পুলিশ স্টেশনের দিকে গুলি ছোঁড়ে। ডি.আই.জি. পুলিশ এস.এস. ভারক মন্দিরের বাইরে গুলিবিদ্ধ হন এবং গুরুতর আহত হন। রাজিব গান্ধী ও তার উপদেষ্টাগণের উচিত ছিল এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া। সৌভাগ্যক্রমে তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য তারা দু’জন পুলিশ অফিসারকে খুঁজে পান। এরা হলেন কে.পি. এস. গিল, ডি.জি. পুলিশ ও শবরজিৎ সিং। অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার গভর্নর এম.এম. রায়, পি. পিদামবরম ও রিবেরো’র মাধ্যমে পরিকল্পনা করা হয় মন্দিরকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলতে হবে, সুবিধামতো স্থানে লোক বসাতে হবে এবং খাদ্য পানীয়ের কাছে যাতে মানুষ যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮০ সালের ১৩-১৮ মে

অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডার নামে পরিচিত অভিযান চালানো হয়। আকাল তাখ্তের ভেতর লুকিয়ে থাকা নর-নারীদের বাইরে আসতে বাধ্য করা হয়। দু'জন পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে তাদের গুলি করা হয়। একজন সায়ানাইড ক্যাপসুল খেয়ে আত্মহত্যা করে, বাকিরা মাথা উঁচু করে আত্মসমর্পণ করে। একটি অভিযান হিসেবে অপারেশন ব্লু থান্ডার বৈদ্যুতিক সাফল্য লাভ করে।

মন্দিরে অবস্থানকারী আর্মি সদস্যদের পুনরায় দল গঠনের সমস্যা সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একবার, এরপর সকলের জন্য 'করিডোর প্রজেক্ট' (গালিয়ারা নামে সুপরিচিত) চালু করে। এর ফলে ৩০-৬০ মিটার দীর্ঘ নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হয়। স্বর্ণমন্দিরের চারপাশে এবং হাজারো ব্যক্তিগত মালিকানার উপর কত্থু বা ধ্বংস করে ফেলার জন্য আবশ্যিক আইন জারি করা হয়। ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় এবং পুনর্বাসন ও পুনর্নির্মান প্রোগ্রাম চালু করা হয়। কিন্তু কিছু কিছু পুরাতন শহরের চিহ্ন মুছে যায়। যেমন মাইবাজার চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। এই প্রজেক্টের কাজ পরে অনির্ধারিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রজেক্টের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী অমৃতসরে তার কার্যালয়ে নিহত হন।

যেভাবে অপারেশন ব্লু থান্ডার সন্ত্রাসীদের নির্মূল করেছিল তা ছিল অপরিণত। যারা পুলিশের হাতে মারা যায় তাদেরকে শহীদ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। তাদের হত্যাস্থানে ছোট ছোট উপাসনালয় গড়ে তোলা হয়। 'অজিত' পত্রিকা যা মৃত্যুর জন্য কর আদায় করত এবং যারা চলে গেছেন তাদের স্মৃতিতে আখান বিজ্ঞপ্তি দিত তাদের উপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। উপাসনা তখন সন্ত্রাসীদের অধীনেই এবং তারা 'বয়স' বা খাড়াকু (সফল মার্কু) হিসেবে পরিচিত হয়। তাদের সাথে যোগ দেয়ার জন্য তাদের খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রাম থেকে হিন্দুরা শহর এবং নগরে চলে যেতে শুরু করে, যা ছিল তাদের জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

১৯৮৯ সালের ৬ জানুয়ারি শীতের প্রথম দিকে একটি মেঘাচ্ছন্ন সকালে দিল্লির তিহার কারাগারে সাতওয়াস্ত সিং ও কেহার সিংকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। তাদেরকে প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর হত্যার জন্য পাঁচ বছর আগেই অভিযুক্ত করা হয়। যদিও বিজ্ঞ জুরী এবং সুপ্রীমকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণ কেহার সিং-এর মুক্তির জন্য সুপারিশ করেছিলেন তবুও তা কার্যকর হয়নি। তিনি হত্যার ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যখন মিসেস গান্ধীর মৃত্যুর ঘটনাটি পাঁচ বছর যাবৎ চাপা পড়ে যায়। তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অনেক মানুষ সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং হাজার হাজার নিরীহ শিখকে হত্যা করে তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। তারা অবাধে ঘুরে বেড়ায়।

(এর মানে অনেকেই ২০০৪ সালে এই উপসংহার লেখা পর্যন্ত কোনো শাস্তি ভোগ করেনি)। যেমনটি আশা করা হয়েছিল, পাঞ্জাবের একটি নৃশংস ঘটনায় উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে দশ জন নিরীহ হিন্দু ক্ষুরের আঘাতে মৃত্যুবরণ করে। একটি রেলওয়ে স্টেশনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। শিখরা শত শত হাজারে হাজারে সাতওয়ান্ত সিং ও কেহার সিংয়ের জন্য গুরুদুয়ারাতে প্রার্থনা করতে যায়। তাদেরকে শহীদ ঘোষণা করা হয়েছিল।

সম্ভ্রাসীরা তাদের বিধবংসী কর্মকাণ্ড সাধনের জন্য আরেকটি অজুহাত পায়। তারা এমন একটি স্থান পছন্দ করে যেখান থেকে তারা অভিযান চালাতে পারে এবং পুলিশকে ধুলো দিতে পারে। সুতলেজ ও বিয়াস নদীর তীরবর্তী প্রায় ৬০০ বর্গমাইল এলাকা যার মধ্যে ফিরোজপুর, অমৃতসর, কাপুরতলা এবং জালান্দর জেলাসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আরেকটি স্থান যা পাকিস্তান সীমানার ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি মান্দ নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল বন্য, জঙ্গলপূর্ণ এলাকা যেখানে পেঁপে, বেগুন গাছ ও কাটাময় গুল্ম প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো। যখন নদীর পানি শুকিয়ে গেল তখন বিশাল অংশ বন্যায় ডুবে যায় এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি করে যেখানে চ্যাপ্টাতলার নৌকা দিয়ে যাওয়া যেত। বন্য পাখির জন্য এটি ছিল একটি অভয়ারণ্য। যেখান থেকে হিমাচল ও হিন্দুকুশের বরফশৃঙ্গ হতে ভারতে বংশবৃদ্ধি করতে আসা পাখিরা স্থান করে নেয়। এটি দুটি ভয়ঙ্কর গ্যাং স্টার দল দি খালিস্তান কমান্ডো ফোর্স এবং বাব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনালের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়। এখানে তারা কৃষিকাজ করে জীবনযাপন করত, তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে এবং তাদের নারীদের উপর অধিকার লাভ করে। দিনের বেলায় তারা বন-জঙ্গল, আখ এবং মসুর ক্ষেতের ভিতর লুকিয়ে থাকত এবং রাতে যখন পুলিশরা পুলিশ স্টেশনে থাকত তখন অবাধ ঘোরাফেরা করত। এদের দু'দলের মধ্যে গ্যাংস্টারের পাশাপাশি কৃষকে রূপান্তরিত হওয়া লোকেরা নিরাপত্তার জন্য পুরস্কার দাবি করে (দশওয়ান্ত বা এক দশমাংশ)। পুলিশ কয়েকবার তাদের খোঁজ করে কিন্তু নিরাপত্তা দেয়ার সামর্থ্য এদের ছিল না। এই চরম অবস্থায় পাঞ্জাব পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড থেকে গোয়েন্দাদের আমন্ত্রণ জানায় পরামর্শের জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের চরম পর্যায় উন্নীত হয় এবং পরিষ্কার পাঞ্জাব পলিসি তৈরিতে তারা ব্যর্থ হয়। এটি একটি বিশেষ মন্ত্রিসভার উপকমিটি প্রতিষ্ঠা করে যার মধ্যে ছিলেন নরসীমা রাও (পররাষ্ট্রমন্ত্রী), এস.বি. চৌহান (অর্থমন্ত্রী) এবং পি. চিদাম্বরন (প্রাদেশিকমন্ত্রী)। তাদেরকে পাঞ্জাব দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য চণ্ডিগড় পাঠানো হয়। আকালি দলের তিনটি দল এবং জনতা দল তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বি.জে.পি. তাদেরকে সরাসরি একটি স্মারক প্রেরণ করে, এস.এস. বার্নালা একে চোখে ধূলি দেয়া হিসেবে বর্ণনা করে। এই সমাবেশে বুটা সিংয়ের একটি নেতৃত্বমূলক আচরণ আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা পূরণ করতে পারেননি। কেননা তার ও তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি দুর্নীতির অভিযোগ তোলা

হয়েছিল।^২ তাদের এই বিশাল আলোচনার পর তারা যে কাজটি করতে পারত তা হলো ভবিষ্যৎ সমঝোতার জন্য রাজিব-লাংওয়াল সম্মতি চুক্তি পুনরায় কার্যকর করার পরামর্শ দেওয়া। এই সময় যখন রাজিব গান্ধী সন্ত লাংওয়ালের সাথে সমঝোতা করেন, তিনিই আনন্দপুর সাহেব দাবিকে স্বায়ত্তশাসনের একটি দাবি ছাড়া আর কিছুই নয় বলে অভিহিত করেন। পিমলাতে বক্তব্যকালে তিনি একে ‘বিভক্তি ও ভারতের একাত্মতার হুমকি’ হিসেবে ঘোষণা করেন।

১৯৮৯ সালের শেষের দিকে রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রীত্ব হারান এবং ভিপি সিং তার স্থলাভিষিক্ত হন। পাঞ্জাবে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আকালি দলের একটি শাখা, যার প্রতিনিধিত্ব করেন সিমরানজিৎ সিং মান, অধিকাংশ আসন দখল করে। একই ডিসেম্বরে গভর্নর এস.এস. রায় পদত্যাগ করেন এবং আ.সি.এস.-এর নির্মল মুখার্জী তার স্থলাভিষিক্ত হন। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর প্রধান লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাব। তার পদলাভের কিছুদিন পর তিনি প্রদেশ পরিদর্শন করেন। স্বর্ণমন্দিরে যান এবং সমবেদনা প্রকাশ করে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধ নতুন অধ্যায় রচনা করার আহ্বান জানান। স্বর্ণমন্দির থেকে ফেরার সময় তিনি খোলা জিপে ফেলেন যা ছিল অত্যন্ত দৃঢ় এবং আশা উদ্দেককারী।

নতুন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাথে নতুন গভর্নরও আসেন। নির্মল মুখার্জীর স্থানে ধীরেন্দ্র ভার্মা অধিষ্ঠিত হন। তিনি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত রাজনীতিবিদ এবং রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। জানুয়ারিতে ভি.পি. সিং কুড়িয়ানায় একটি সর্বদলীয় সমাবেশের আয়োজন করেন। তার পাশে ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী, এল. কে. আদভানী, এইচ. এস. সুরজিৎ (সি. পি. আই. এম.) এবং অন্যান্য আকালি নেতারা। প্রধানমন্ত্রী আবারও পাঞ্জাবিদের জন্য ‘শান্তির সুযোগ’-এর কথা ভাবেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা যায়। সিমরানজিৎ সিং প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা ও বিদায় জানাতে বিমানবন্দরে যান। কিন্তু সাধারণ লোকদের এবং সেনাবাহিনীর উপর এটি তেমন কোনো প্রভাব ফেলেনি। তাদের কোন্দলের স্বীকার হন বলবন্ত সিং। তিনি রাজিব গান্ধী-লাংওয়াল সম্মতিচুক্তি স্বাক্ষরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বর্নালার সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন যাতে তিনি পাঞ্জাব সংসদ বন্ধ করে দেন এবং প্রদেশে গণতান্ত্রিক পুনরুত্থান ঘটান। তিনি ১৯৯০ সালের ১০ জুলাই চণ্ডিগড়ে ঘাতকদের হাতে নিহত হন।

নিরীহ মানুষদের হত্যা চলতেই থাকে। জে.এস. খুদিয়ানকে মান লোকসভার নির্বাচনে নির্বাচিত হতে সাহায্য করেন। তিনি পদলাভের পর দিন থেকেই তার গ্রামের বাড়ি থেকে চলে যান। কিছুদিন পর রাজস্থান-এর একটি খালে তার মৃতদেহ

২. ‘কোর্টিয়ার আন্ডার ক্রসফায়ার’, ‘ইন্ডিয়া টুডে’, ৩১ মে ১৯৮৯, পৃ-২৮-৩৪।

আবিষ্কৃত হয়। সেবাদানকারী এবং বিতর্কিত আই.পি.এস. অফিসার গোবিন্দ রামকে তার পুত্রের হত্যার কিছুদিন পর বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়। প্রতি মাসে ১৪৬ জন হারে লোক নিহত হয়। ১৯৮৯ সালে যেখানে ২৭২৯ জনের মৃত্যুধ্বনি বাজে, সেখানে ১৯৯০ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫০৬-এ। এটি নির্ধারিত হয় যে ১৭৮টি ‘হার্ড কোর’ এবং ৪৭৩৩টি অন্যান্য সক্রিয় সন্ত্রাসী প্রদেশে অবস্থান করছিল।^৩ অবিরত ভয়াবহতা চলতে থাকায় আরও ছয়মাস প্রেসিডেন্টের শাসন চলে।

একজন নতুন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর-এর সাথে নতুন গভর্নর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ও.পি. মালহোত্রা আসেন। দ্রুত বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ পাঞ্জাবে তখনও কোনো পরিষ্কার পন্থায় উপনিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের শাসনের সমাপ্তি আশা করেন, নির্বাচন করেন এবং প্রদেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক শাসনের সূচনা করেন। গভর্নর আইনহীনতার প্রতি প্রধানত গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সেনাবাহিনী দিয়ে পাকিস্তানি সীমান্ত আটকে দেন (অপারেশন রক্ষক) যাতে গোলাগুলি বন্ধ হয়। এসময় বিভিন্ন সন্ত্রাসীদল তাদের নিজস্ব আইন অনুসারে গ্রামাঞ্চল শাসন করতে থাকে; সূর্যাস্তের পর রাস্তার আলো বন্ধ থাকলে, গ্রাম্য কুকুরদের বিষ মিশিয়ে অথবা হত্যা করে চুপ করে রাখা হবে। কেউ জাতীয় সংগীত ‘জানা গানা মানা’ গাইতে পারবে না। কেউ হিন্দিতে কথা বলতে পারবে না। শুধু পাঞ্জাবি বলতে পারবে, মেয়েরা জিন্স অথবা শাড়ি পরতে পারবে না। শুধু সালোয়ার-কামিজ এবং তাদের মাথা ওড়না দিয়ে ঢাকতে পারবে। তারা কোনো প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতে পারবে না এবং কোনো ধরনের মেকাপ করতে পারবে না। খারাকু (আক্রমণকারী)দেরকে ভাই (ভাই) অথবা সর্দার বলে সম্বোধন করতে হবে। বড় বড় শহর ছাড়া সন্ত্রাসী নিয়ন্ত্রিত পঞ্চায়েতগুলো গ্রামাঞ্চলের আইন রচনা করবে। তারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মতোই আকালি নেতাদের অবহেলা করে। বিগত দশ বছরে পঁচিশ হাজারেরও বেশি নির্দোষ লোক সন্ত্রাস সম্বন্ধীয় নৃশংসতায় তাদের জীবন হারায়, ১৯৬৫ এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা যে দুর্ভোগ হয়েছিল তা তার চেয়েও বেশি।

১৯৯১ সালে গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী সময় সন্ত্রাসীদের বিপরীতে স্রোত বইতে থাকে। কৃষকেরা বহুদিন ধরে অত্যাচার হত্যা এবং ধর্ষণের শিকার হয়। তারা অপারেশন রক্ষককে স্বাগত জানায় এবং আইন-শৃংখলা পুনরুদ্ধার একান্তভাবে কামনা করে। তারা ব্যাপক আলোচিত নামের মুখোশধারী দলের শাসনে থাকতে অস্বীকৃতি জানায়। শিখ সম্প্রদায়কে খুশি করার চেষ্টায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রতিটি মিটিংয়ে তিনি তাদেরকে ‘ওয়াহ্ গুরু জী কা খালসা’, ‘ওয়াহ্ গুরুজী কা ফাতেহ্’ বলে সম্ভাষণ শুরু করেন। তিনি প্রদেশের গণতান্ত্রিক শাসন পুনরুদ্ধারের ওয়াদা করেন।

তার নির্বাচনী আহ্বান এক অর্থে অপরিণত ছিল। কংগ্রেস তাদেরকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৯১ সালের জুনের প্রথম সপ্তাহে সন্ত্রাসীদের বুলেটে ২০ জন পদপ্রার্থী নিহত হন। ইলেকশন কমিশনার টি.এন. সোসান পাঞ্জাব নির্বাচনকে পিছিয়ে দেন। কেন্দ্রীয় ভোটে চন্দ্রশেখর পরাজিত হন এবং নতুন নির্বাচনে কে.পি.এস. গিল পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান নির্বাচিত হন। জাট অফিসারের মতো তারা জাট কৃষকের উপর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

পাঁচ বছর প্রেসিডেন্ট-এর শাসন, সেনাবাহিনীর নিয়োগ এবং পুলিশ প্রদেশের বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর খুব সামান্য প্রভাব ফেলেছিল। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ১৯৯১ সালের ২১ মে শ্রীপুরামবুদার-এ রাজিব গান্ধী ঘাতকদের হাতে নিহত হন এবং নরসীমারাও প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে প্রশাসনের ক্ষমতা হস্তান্তর করাই উত্তম। নির্বাচন শেষ হবার পর প্রথমেই তিনি পাঞ্জাবের সাথে অর্থনৈতিক সমঝোতা করেন। প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৪২০০ কোটি টাকা ধার করেন। আকালি নেতারা ছিল দৃঢ়চেতা। আগে চুক্তি ঘোষণা তারপর নির্বাচন হবে এটাই ছিল তাদের দাবি। গভর্নর সুরেন্দ্রনাথ তাদের সমর্থন করেন। আবারও হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল চরকায় তেল ঢালেন। যদি পাঞ্জাবকে অর্থনৈতিক সাহায্য দেয়া হয় তাহলে তিনি প্রদেশের হিন্দু সমর্থকদের আস্থা হারাবেন। প্রধানমন্ত্রী চুক্তির বাস্তবায়ন ছাড়াই ১৯৯২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন ঘোষণা করেন।^৪

সন্ত্রাসী দলের নেতারা ঘোষণা দেয় যে, যারা তাদের নাম ঘোষণা করবে সেসব প্রার্থীদের এমনকি যারা নির্বাচন কেন্দ্রে যাবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। আকালিরা যাঁতাকলে পড়ে যায়। তাদের সকল প্রধান দলগুলো সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে এবং কংগ্রেস, বি.জে.পি., বি.এস.পি., দুইটি সমাজতান্ত্রিক দল এবং জনতা দলকে খোলা ময়দানে আহ্বান জানাবে। এতে বি.জে.পি. সমর্থিত শহরে হিন্দুদের ভোট বেশিরভাগ কংগ্রেসের দলেই যাবে। এই বিতরণের ফলাফল ছিল খুবই নিম্ন, কোথাও কোথাও এক শতাংশেরও কম। কংগ্রেস দল ২১.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসে। বিয়াস্ত সিং প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

আকালিরা অকর্মণ্য ঘোষিত হয় এবং প্রাদেশিক ক্ষমতায় দ্বিতীয় আসন যেখানে শুধুমাত্র শিখরাই ছিল, সেই এস.জি.পি.সি.-তেই পুনরায় দলবদ্ধ হয়। এবং আবারও নতুন মোর্চা সূচনা করে প্রশাসনকে অচল করে দেয়ার হুমকি দেয়। তাদের স্লোগান ছিল 'সরকার হটাও', পাঞ্জাব বাঁচাও, মন্ত্রী ঘেরাও (মন্ত্রীদের অচল করে দাও)। নতুন মোর্চা শুরু করার আগেই বিয়াস্ত সিং তাদের নেতাদের আটক করে।

৪. 'রাশিয়ান রওলেট', ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ ফেব্রুয়ারি, পৃ-২৩-৫ এবং 'এক্সিলারেটিং এলিনেশন', ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ মার্চ ১৯৯২, পৃ-২৬।

যখন সন্ত্রাসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখন বিয়াস্ত সিং কে.পি.এস. গিলকে তাদের সাথে সমঝোতার দায়িত্ব দেন। অপারেশন রক্ষক দুই ভাগ হয়ে যায়। সেনাবাহিনী সন্ত্রাসী ও তাদের সমর্থকদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সন্ত্রাসীদের গুলি অথবা গ্রেফতার করার হুকুম দেয়া হয়। গ্রামবাসীদেরই জয় হয়। তাদেরকে নিপীড়নের বদলে সেনাবাহিনী তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। তারা যেখানেই যায় সেখানেই গ্রামবাসীদের খাদ্য এবং চিকিৎসা সহায়তা দেয়। এই টোপ কাজে লাগে। পাঞ্জাব কৃষকদের আইনহীনতার অভাব পূরণ হয় এবং তারা পুলিশকে গ্যাংস্টারদের গ্রেফতার ও নির্মূল করতে সাহায্য করে। কয়েক মাসের জন্য এটিই জঙ্গলের নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আইনী শুভ্রতা উপেক্ষা করা হয়। কিছু নিরীহ মানুষ তাদের জীবন হারায়। কিন্তু ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে প্রদেশে আইন-শৃঙ্খলার পুনরুদ্ধার ঘটে।

১৯৯৩ সালের জানুয়ারিতে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন আয়োজনে বিয়াস্ত সিং দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। তার মন্ত্রীসভার সহকর্মীরা অধিকাংশই তার বিরোধিতা করে—অস্ত্রধারীরা পঞ্চায়েত দখল করে ফেলবে এবং তাদের দাবি হিসেবে খালসা পঞ্চায়েত ঘোষণা করবে। বিয়াস্ত সিং যিনি নিজেই স্বরপাঁচ এবং পরবর্তীতে পঞ্চায়েত স্মৃতির চেয়ারম্যান ছিলেন, তৃণমূল পর্যায়ের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন, তার সরকারের আইন প্রণয়নের জন্য এবং গ্রাম্য পাঞ্জাবকে স্থিতি অবস্থায় রূপান্তরের জন্য। এই নির্বাচনের ফলাফলে দ্বি-শতাংশ বিতাড়িত হয় এবং কংগ্রেস প্রার্থীরা অধিকাংশ আসন জয় করে। এই জনপ্রতিনিধিরা জনগণ এবং স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ অন্তর্ভুক্ত সংযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে প্রমাণ করেন এবং প্রদেশের সন্ত্রাসবাদ দূর করেন।

তরুণ শিখ অফিসার কে.বি.এস. সিধু, আই.এ.এস.এ. আট বছর চাকরি করার পর অবহেলিত গালিয়ারা ১৯৯২ থেকে ১৯৯৩ সালে পুনরুদ্ধার হয়, অমৃতসর-এ তিনি ডেপুটি কমিশনার নির্বাচিত হবার পর। এর ফলে শীর্ষ অস্ত্রধারীদের কাছ থেকে সম্মুখ হুমকির আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি বিয়াস্ত সিংয়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাব সরকার এবং এস.জি.পি.সি-এর মধ্যে একটি গোপন অলিখিত চুক্তি সম্পাদিত হয়। স্বর্ণমন্দিরে দ্বিতীয় প্রকর্মা প্রতিরোধ বেট্টনী স্থাপনের মাধ্যমে গালিয়ারা প্রকল্পের চিন্তাধারায় কিছুটা পরিবর্তন আসে। এস.জি.পি.সি. স্থাপনা নকশায় অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাধা দেয়ার সম্মতি জানায়। কোনো কংগ্রেস মন্ত্রী অথবা সম্মানিত ব্যক্তির এই প্রকল্পের সূচনা করবে না এবং এর পরবর্তী কোনো ধাপে প্রভাব রাখবে না এবং বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের প্রশংসা দাবি করবে। সরকার সম্মত হয় এবং প্রকল্পের সকল দায়িত্ব নেয়। এই প্রকল্পে মনোরম দৃশ্যকল্প এবং জলরাশি ব্যবস্থা করা হয় যাতে পবিত্র উপাসনালয়ের শান্তিময় পরিবেশের আবির্ভাব ঘটে। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত করিডোরের তিন-চতুর্থাংশ কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্মুখভাগ তখনও অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

১৯২৫ সালে প্রকাশ পাওয়া এস.জি.পি.সি. প্রাদেশিক সরকারের বিরোধী আসনে ছিল যতদিন না আকালি শক্তভাবে এর হাল ধরে। এর মাধ্যমে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশের ৩০০-ও বেশি ঐতিহাসিক গুরুদুয়ারা এমনকি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এর অর্থ সংকুলান হয়।^৫ এর বার্ষিক বাজেট ছিল প্রায় ১৪২ কোটি। প্রেসিডেন্ট গ্রন্থি, রাগী, সেবাদার এমনকি প্রধান শিক্ষক, প্রিন্সিপাল এবং হাসপাতালের ডাক্তারদের নিয়োগে প্রচুর প্রভাব খাটাতে পারত। আকালি তাখতে জাটদের নিয়োগেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ২৫ বছর যাবৎ গুরুচরণ সিং তোহরা প্রেসিডেন্ট পদে একটি অবিসংবাদিত স্থান অর্জন করেন। তিনি ছিলেন খালিস্তানদের দাবি এবং সন্তাসীদের ভয়ে ভীত গুলিতে নিহত এবং তাদের দ্বারা আহত হবার ভয়ে ভীত উভয়পক্ষী।

১৮৫ সদস্য বিশিষ্ট এস.জি.পি.সি.-এর নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৮৪ পর্যন্ত কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৯৩ সালের মধ্যে ৪৭ জন সদস্য মারা যায়। বিয়াস্তা সিং চিন্তা করেন সবকিছু সাজানো এবং এস.জি.পি.সি. নির্মূল করার জন্য এটিই উপযুক্ত সময়। ‘সময় বদলে গেছে’ তিনি সাংবাদিকদের বলেন। এখন এস.জি.পি.সি.-এর কি দরকার? অন্যান্য ধর্মীয় দলের মতোই শিখদের স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তাদের উপাসনালয় পরিচালনা করা উচিত^৬

মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বিষয় জেনে রাখা উচিত যে আকালি দলের মধ্যে চিরদ্বন্দ্বের কারণ ছিল এস.জি.পি.সি.-এর অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ। এবং তারা তাই করেছিল। তোহরা, বাদল, মান এবং অন্যান্যদের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। পূর্বের মতোই একটি আন্তরিক দাবি ছিল ‘পাহু খিপদের সম্মুখীন’। এ ধারণা সফল হয় এবং বিয়াস্ত সিং একটি হঠকারী চাল চালেন। তিনি সন্তাসীদের হাত থেকে রক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন। তিনি গভর্নর সুরেন্দ্রনাথ এবং ডি.জি. পুলিশ কে.পি.এস. গিলকে এর দায়িত্ব দেন। গিল কুচক্রের মাধ্যমে এ কাজ সমাধান করেন। তাকে এই বলে রাজি করানো হয় যে, আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের, সেনাবাহিনীর নয়। তিনি পাঞ্জাব পুলিশের সংখ্যা ৩৫ হাজার থেকে ৬০ হাজার-এ উন্নীত করেন এবং মাজিয়ারী (নির্ধারিত গোত্র) শিখদের অন্তর্ভুক্ত করে একে আরও শক্তিশালী করেন। পাশাপাশি প্যারামিলিটারি শক্তির অবনতি ঘটে এবং ৪০০ থেকে ২৬০টি কোম্পানিতে পরিণত হয়। তিনি লেফটেনেন্ট জেনারেল বি.কে.এন. চিক্কার, জলান্দরের কর্পস কমান্ডার এবং পরবর্তীতে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা

৫. এস.জি.পি.সি.-এর সচিব কর্তৃক প্রকাশিত চিত্রে দেখা যায় ৪০টি প্রধান এবং অনেক নাম না জানা গুরুদুয়ারা-এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এছাড়াও ১৭টি কলেজ, ২২টি স্কুল এবং ৪টি হাসপাতাল-এর অধীনে ছিল।

৬. ইন্ডিয়ান টুডে ১৫ মার্চ ১৯৯৫।

এবং প্রদেশের গভর্নরের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। তাকে যে অর্থ দেয়া হয় তা দিয়ে তিনি সন্ত্রাসীদের নির্মূল করেন এবং তথ্যদাতাদের মন জয় করেন। যেহেতু এ দলের লোকজন সূর্যাস্তের পর অধিকাংশ অভিযান পরিচালনা করত তাই তিনি অপারেশন নাইট ডমিনেশ-এর সূচনা করেন। তিনি তারান তারান-এর কাছে বেহলায় একটি রাত্রি অভিযান চালান। শিকারের মধ্যে ছিলেন দু'জন দুর্ধর্ষ দলনেতা জি.এস. মনোচাহাল এবং কাওলি যিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওর এম.এল. মানচন্দ্রের শিরচ্ছেদ-এর দায়ে অভিযুক্ত হন। এই দুই ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রদেশে সন্ত্রাসীদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যায়। এই সময়ের মধ্যে সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এর বিপরীতে তা ছিল লুটেরা (মূল্যহীন হস্তা) যারা সহজে অর্থপ্রাপ্তির আশায় ছিল। অনেকে তার জন্য তার দলে যোগদান করে (সাওকিয়া তাওর পে) কাজের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন বলে গিলের নিজেকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত।

মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বিয়াস্ত সিংকে নির্মূলের জন্য আকালিরা তাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। বছরের প্রথমদিকে 'খালসা মার্চ'র সৌজন্যে একটি আকাল তাখ্ত যা অমৃতসর থেকে আনন্দপুর সাহেব পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করেছিল তা বিপুল প্রশংসামূলক প্রতিক্রিয়া লাভ করে। গ্রামবাসীরা রাস্তার চরপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। এতে উৎসাহিত হয়ে তারা অমৃতসরে থেকে দিল্লিতে আরেকটি পদযাত্রার ব্যবস্থা করে। বিয়াস্ত সিং পুনরায় ১৯ জন শীর্ষ আকালি নেতাকে, তোহরা, বাদল ও তালবন্দি, গ্রেফতার করে আন্দোলন প্রতিহত করেন। উত্থাপিত পদযাত্রা পরে স্তিমিত হয়ে যায়।

* * *

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যখন পাঞ্জাবের অন্যান্য অংশ অশান্তির মধ্যে ছিল তখন সবচেয়ে বড় শহর লুধিয়ানা হঠাৎ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং উদ্যোক্তাদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়। এখানে বাইসাইকেল এবং উলের কাপড় প্রস্তুত হয়। উভয়ক্ষেত্রেই তারা ফলাফলকে দ্বিগুণ করে, এর মাধ্যমে তারা পোশাক শিল্পের যন্ত্র প্রস্তুত কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং অন্যান্য জিনিসও উৎপাদন করে।

১৯৯৪ সালের বসন্তে পাঞ্জাবের গমক্ষেতে একটি সুমন্দ বাতাস বয়ে যায়। কিয়া রাইপুরের অলিম্পিকে একটি অবিস্মরণীয় পরিবর্তন ঘটে, এটি লুধিয়ানা থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। একজন তরুণ শক্তির খেলা দেখানোতে সেখানে তিনদিন যাবত হৈছল্লোড় চলছিল। গ্রামবাসীরা কাবাডি খেলায় মগ্ন ছিল এবং নিজেরা একে-অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিমজ্জিত হয়েছিল। কানাডার ভ্যাকুভার থেকে একটি দল খেলায় অংশগ্রহণ করতে আসে। ষাডের লড়াই, রাম লড়াই এবং প্রবীণদের একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই দেখতে আসে। অনেক বছর

পর মেয়েরাও খেলা এবং আনন্দে অংশগ্রহণ করতে আসে। বিজয়ীদের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জের মেডেল ছিল না। তাদের জন্য ছিল ঘি-এর বয়াম (ঘনীভূত ঘি)। এ ধরনের খেলার উৎসব প্রদেশের সর্বত্র অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কীলা রায়পুরের ঘেওয়ালজাত ১৯৩৩ সালে হকি এবং কাবাডি ম্যাচের আয়োজন করে সবার চাইতে এগিয়ে যায় এবং তাদের বার্ষিক অলিম্পিয়াডে আরও ৫০টি খেলা যোগ করে।

লুধিয়ানার কাছাকাছি শহরগুলোতে নিরাপত্তা অনুভবে প্রমাণ পাওয়া যায় ধনী শিল্পপতিরা দেহরক্ষী ছাড়াই চলাচল করে। রাতের শিফট থেকে কর্মচারীরা নির্ভয়ে ফেরত, মধ্যরাতের শো-গুলোতে সিনেমায় উপচেপড়া ভিড় হয়। রাস্তায় অনেক কনটেস্টা গাড়ি দেখা যায় এবং হোটেল-এর খরচ ৯০ শতাংশের বেশি বেড়ে যায়। দৈনিক স্টক এক্সচেঞ্জ-এ লুধিয়ানার খরচ ৭ থেকে ৮ গুণ বেড়ে ৩০ কোটিতে দাঁড়ায়। পাঞ্জাবের বাইরে অন্যান্য প্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। অমৃতসরের পরই লুধিয়ানা সত্যিকাররূপে দ্বিতীয় বৃহত্তর শহরে পরিণত হয়। সমৃদ্ধির দিক দিয়ে পাঞ্জাব ভারতীয় প্রদেশগুলোর শীর্ষে অবস্থান করে। এর মাথাপিছু আয় ভারতে সবচেয়ে বেশি এবং দেশের ধান ও গম উৎপাদনে শীর্ষে অবস্থান করে।

* * *

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে পাঞ্জাব পুলিশ অনেক নরীহ মানুষের উপর নৃশংসতা চালায়। পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রদেশ পরিদর্শন করে (১৯৯৪-এর ১৮ এপ্রিল) এবং পুলিশের নির্মমতার শিকার বঞ্চিতদের পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করে। সরকার এবং মানবাধিকার কর্মী উভয়েই এর বিরুদ্ধে অবস্থান করে। কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি মিসরা তার বক্তব্যে বলেন, ‘স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার পরও পুলিশের আচরণ এখনও স্বাভাবিক নয়।’^৭

১৯৯৪ সালের ২৯ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট জাইল সিং আনন্দপুর সাহেব থেকে চন্ডিগড় যাবার পথে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। তিনি এর আগে পাঞ্জাবিদের প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তার গাড়ির একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং মারা যান। তিনি ছিলেন একজন কাঠমিস্ত্রির পুত্র। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও উর্দুর পাশাপাশি তিনি ইংরেজীতেও পারদর্শিতা লাভ করেন। তার বাচনভঙ্গি, দ্রুত বিচারশক্তি এবং অসতর্ক জনগণের পাশে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাকে গণপ্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করে। তার মৃত্যু জাতির জন্য একটি শোকাবহ ঘটনা হবার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। যদিও তিনি রাজিব গান্ধীকে ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন তবুও তিনি তার আস্থা অর্জন করতে পারেননি। স্বর্ণমন্দিরে সেনাবাহিনীর প্রলয়ের ঘটনার জন্য শিখরা তাকে

৭. মোর রঙ্গস দ্যান রাইটস, মানবাধিকার সংস্থা পাঞ্জাব পুলিশের নিবৃতি ঘটায়, ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ মে ১৯৯৪, পৃ-৩৬।

কখনো ক্ষমা করেনি। তাকে না জানিয়ে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছিল এমন অজুহাতে বরফ গেলেনি যতদিন পর্যন্ত না তিনি অপারেশনে অংশগ্রহণকারী অফিসার ও লোকদের পুরস্কৃত করেছিলেন।

তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে ব্যর্থ হন যখন মিসেস গান্ধীর গুপ্তহত্যার পর উচ্ছৃঙ্খল জনতা শিখদের জীবন ও সম্পদের উপর হামলা করেছিল। পদত্যাগে গাফিলতি এবং প্রেসিডেন্টের বাসভবনে অবস্থান তাকে মৃত্যু পরবর্তী খ্যাতি থেকে বঞ্চিত করে।

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাঞ্জাব পুলিশ কিভাবে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে সমর্থ হয়েছিল তার পেছনে কিছু গোপন তথ্য পাওয়া যায়। কয়েকমাস আগে গভর্নর সুরেন্দ্রনাথ ও তার পরিবারের সদস্যদের বহনকারী একটি বিমান বিধ্বংস হয় এবং এর যাত্রী ও কর্মীরা সকলেই মারা যায়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে স্যুটকেস ভর্তি মুদ্রা পাওয়া যায়। এটা জানা যায় যে, তথ্যদাতাদেরকে প্রদানের জন্য তাকে বিপুল অর্থ সরবরাহ করা হতো এবং সেসব পুলিশদের পুরস্কৃত করা হতো যারা সন্ত্রাসীদের ধরতে সমর্থ হতো। কিন্তু মিথ্যা গুজব যে, তিনি সেখান থেকে কিছু অর্থ তার জন্য রেখে দিতেন। তার দাপ্তরিক ভবন—পাঞ্জাব ভবন-এ অভিযান চালানো হয়। সেখানে কিছু পরিমাণ (৬৫,০০০ টাকা) ও নগদ অর্থ এবং গহনাদি পাওয়া যায়।^৮

সন্ত্রাস নির্মূল হয়েছে এমন আনন্দের আতিশয্য ছিল অপরিণত। ১৯৯৫ সালের ৩১ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী বিয়াস্ত সিং পাঞ্জাব সরকারের সচিবালয় চণ্ডিগড় থেকে ফিরছিলেন। তখন একজন আত্মঘাতী বোমাবাহক নিজে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রায় ডজনখানেক লোককে বোমায় উড়িয়ে দেয়। নয়জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এদের দু'জন অপরাধী বিয়াস্ত সিংয়ের হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে কিন্তু এই ঘটনার আট বছর পরও মামলার সুরাহা হয়নি। কংগ্রেস দলের এইচ.এম. ব্রার মুখ্যমন্ত্রী হন।

মানবাধিকারের লঙ্ঘনের আরেকটি ঘটনা প্রকাশিত হয় যখন জসওয়ান্ত সিং খালরা পুলিশের হাতে নিহত প্রায় ২০০০ লোকের মৃতদেহ গোপনে সৎকার করতে যায়। ১৯৯৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর অমৃতসরে তার বাসভবন থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুদিন পর তার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। যদিও তার বিধবা স্ত্রীকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তবুও এ কাজটি যারা করেছিল তাদের নাম কখনোই প্রকাশ হয়নি।^৯

৪. www.hr.w.org/reports/1997/wr97/As IA-05.htm.

৯. 'দি কেস অফ দি মিসিং অ্যাকিউভিস্ট' ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-১০৪। এছাড়াও দেখুন 'বিটার হার্ডেস্ট', ইন্ডিয়া টুডে, ১৬ জুন ১৯৯৭, পৃ-৩৫-৬।

* * *

মিসেস গান্ধী হত্যার পরবর্তী শিখ হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের নির্ণয় করার কাজ টিলেঢালাভাবে চলার পর দিল্লির সেশন জজ প্রধান অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার সমন জারি করেন। এদের মধ্যে ছিলেন পূর্বতন ইউনিয়ন মন্ত্রী এইচ.কে.এল. ভগৎ তাকে পুলিশ জিম্মায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এতে তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি। ভগৎ জামিনে মুক্তি পান। কেননা অন্যান্য অভিযুক্তরা অপ্রাতিষ্ঠানিক কমিশনের মাধ্যমে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের নাম সবসময়ের মতো অক্ষুণ্ণ থাকে। হরচরণ সিং ব্রারকে এর মূল্য দিতে হয়। দলাদলি যা পাঞ্জাব কংগ্রেসের পদবি নিয়ে অহরহ চলত এমনকি আকালিদের মধ্যেও তা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। ব্রার ৪৫ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা থেকে বিয়ান্তের অনেক সমর্থকদের বিমুখ করেন যা বাকিদের মনে তার প্রতি ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যেহেতু প্রদেশে নির্বাচন স্থগিত ছিল, কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সীতারাম কেসরী বুঝতে পারেন যে ব্রারের মধ্যে নেতার গুণাবলীর অভাব রয়েছে এবং রাজেন্দর কোর ভাটাল মুখ্যমন্ত্রী নিয়ন্ত্রণ করেন এবং আশা করেন তিনি ক্ষুদ্র অংশগুলোকে একত্র করে আবার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত করবেন।^{১০} তিনিই প্রথম প্রাদেশিক মহিলা মুখ্যমন্ত্রী।

আকালিরা বিরোধীদলীয় হিসেবে সবসময়ই সেরা ছিল। স্বদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন অংশকে জোড়া দিয়ে (মান ছাড়া) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে স্বদেশের প্রস্তুতি নেন। তার পরম বিজয় ছিল এবং তোহারার প্রার্থীদের এস.জি.পি.সি.-এর নির্বাচনে। তোহরা বিগত ২২ বছর যাবত প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন।

* * *

১৯৯৬ সালে ডি.জি. পুলিশ কে.পি.এস. ব্রার-এর ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। কেননা সেন্ট জর্জ সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি নির্মূল করেন। ১৯৮৮ সালের জুলাইতে চণ্ডিগড়ে একটি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে দুর্বলের প্রতি নির্মম অত্যাচারকারী গিল আই.এস.এস.-এর একজন মহিলার পশ্চাৎদেশে ‘চপেটাঘাত’ করেন। কেননা তিনি তার সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বিনয়-এর সাথে আচরণ না করার জন্য তিনি তার বিরুদ্ধে মামলা করেন। ১৯৯৬ সালের ৬ আগস্ট চণ্ডিগড়ের ম্যাজিস্ট্রেট গিলকে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দুই মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৭০০ টাকা জরিমানা করেন। ‘সং চরিত্রের’ প্রতিজ্ঞা করাতে তাকে পরে ছেড়ে দেয়া হয়। পুলিশ অফিসার হিসেবে বিশাল প্রাপ্তি, হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও এই হতাশাজনক ইতিহাস গিল কখনোই মুছে ফেলতে পারেনি।^{১১}

১০. দি ইকোনমিক টাইমস, ২৯ মে ২০০৪।

১১. ইন্ডিয়ান টুডে, ৩১ আগস্ট ১৯৯৮, পৃ. ৫৩।

* * *

প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় নির্ধারণের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী রাজেন্দর কোর ভাট্টাল ৫০টি পয়েন্টের একটি অনুষ্ঠান নির্ধারিত করেন। এর মধ্যে ছিল সাত বা তার কম একর জমিবিশিষ্ট কৃষকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা। আকালির বিরোধী দল বাদল তার অবস্থান আরও উন্নত করেন। তিনি বিনামূল্যে কৃষকদের শক্তি সরবরাহের কথা বলেন। তারা যত জমিরই মালিক হোক না কেন। ভাট্টাল এবং তার দলের বিপরীতে নির্বাচনী চাল ছিল খুবই সমৃদ্ধ। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ.এম. ব্রার ছিলেন এতে অসন্তুষ্ট এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনিচ্ছুক। একইভাবে ইয়ুথ কংগ্রেসের এস.এস. বিত্তা বাদলকে তার আশা করা জয়ের ব্যাপারে সতর্ক করেন।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম.এস. গিল আবারও কংগ্রেস নির্বাচনী নীতিকে অসন্তুষ্ট করেন। কেননা তিনি নির্ধারিত সময়ের একমাস আগে নির্বাচনীপত্র দেয়ার তারিখ ঘোষণা করেন। দলের মধ্যে প্রচণ্ড সাদৃশ্য দেখা যায় এবং জিততে পারে এমন প্রার্থীদের সন্ধান করে। কংগ্রেসপার্টি মিত্র হতে ব্যর্থ হয় এমনকি দুটি সমাজতান্ত্রিক দল বহুযুগের পুরাতন কংগ্রেস দলে যোগ দিতে না পারছিল। নির্ধারিত বর্ণের (প্রায় ২৮ শতাংশ) ভোট যেভাবে যেকোনো দলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ছিল। সেখানে কোনো দলই তা পায়নি। কেননা তাদের নেতা কানশি রাম স্বতন্ত্র নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

যখন প্রার্থী পছন্দের বিষয়টি আসে তখন কংগ্রেস ও আঞ্চলিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সবকিছুর আগে সম্পর্ক ও আন্তরিক বন্ধুত্ব আসে। অথবা পাঞ্জাবিদের মধ্যে প্রথমে ভাই (ভাই) এবং পরে জামাই (বা জামাতা) এবং অন্যান্য সকল সমর্থক। এমনকি বাদলও তার আত্মীয়দের প্রাধান্য দেন। যেমন কংগ্রেসের বলরাম জাখার। তিনি নিপুণভাবে পাতিয়ালা অমরিন্দর সিংকে বাদ দেন কেননা তিনি ধারণা করেছিলেন তিনি হয়ত তার নেতৃত্ব কেড়ে নেবার মতো ক্ষমতা রাখেন।^{১২}

পাঞ্জাবিরা মনে করে শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শান্তি রক্ষায় কংগ্রেস দলের অসাম্প্রদায়িক সনাতন প্রথার চাইতে আকালি বি.জে.পি. বেশি ফলপ্রসূ হবে। নির্বাচনে ৬৯ শতাংশ প্রার্থী জমা পড়ে। আকালি বি.জে.পি. এই নির্বাচনে ১১৭ টির মধ্যে ৯৩টি আসন জয় করে পুরো পক্ষ জয় করেন। কংগ্রেস খুবই কম ভোট পেয়ে (১৪টি) দ্বিতীয় স্থানে, বি.এস.পি. ১, সি.পি.আই. ১, আকালি দল মান ১, স্বতন্ত্র প্রার্থী ৬ ভোট পায়। বাদল মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

প্রদেশের প্রশাসন সামলানোর পাশাপাশি বাদলকে অবশিষ্ট সন্ত্রাসীদের নির্মূল এবং মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হয়। কেননা তারা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে তাদের ভিত্তি নড়বড়ে করে দেয়ার প্রমাণ রেখেছিল। পাঁচটি

অস্ত্রধারী দল তখনও তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল এদের মধ্যে ওয়াধারা সিং পরিচালিত ৫৩ সদস্যের বাব্বার খালসা (পাকিস্তান ভিত্তিক); খালিস্তানে কমান্ডো ফোর্স (পাকিস্তান ভিত্তিক) ৪৮ সদস্যের, পরমজিৎ সিং পাঞ্জওয়ারির নেতৃত্বে, ডি.সি. লাহারার নেতৃত্বে ৩৮ সদস্য বিশিষ্ট খালিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট (ডি.সি. লাহোরা বিদেশ থেকে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে এসেছিলেন এবং কারাগারে ছিলেন)। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক ডব্লিউ.এস. জাক্কারওয়ালের নেতৃত্বে ৪ সদস্যের খালসা কমান্ডো ফোর্স এবং পি.এম. শেখনের নেতৃত্বে ১২ সদস্যবিশিষ্ট খালসা লিবারেশন ফ্রন্ট (পাকিস্তান ভিত্তিক)। তারা তখনও বিশাল ক্ষয়ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন তা আবারও প্রমাণিত হয়। ৮ জুলাই ভাটিয়ান্দার কাছে একটি ট্রেনে আঘাত হানা হয় এবং এতে ৩৮ জন নিহত ও ৬১ জন আহত হয়।

এ সময় মানবাধিকার কর্মীরা 'রিভিউসড অ্যাশেজ' নামক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এতে বলা হয় পুলিশ ঠাণ্ডা মাথায় প্রায় ২০০০ সন্দেহভাজন সন্ত্রাসী ও সমব্যথীকে হত্যা করে এবং অমৃতসরে তাদের দেহ সরিয়ে ফেলে। তারান তারান ও অন্যান্য স্থানে তাদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় ছিলেন জে.এস. খালসা যাকে অমৃতসরে তার বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। এই অভিযোগের কারণে ৯ জন পুলিশ যাদের অনেকে তাদের সাহসিকতার জন্য প্রশংসিত হয়েছিলেন তাদের গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে একজন ছিলেন তারান তারান-এর দুই বার এস.এস.পি. যিনি 'হিমালয়ের কুইন' থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন।^{১৩}

বাদল দিদার সিং বাইনকে হাত করে একটি আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ করেন। তিনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার ধনী পিচ-উৎপাদনকারী যিনি অপারেশন ব্লু স্টারের পর ওয়ার্ল্ড শিখ অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠা করেন। বাদল তাকে আমন্ত্রণ জানান এবং পাঞ্জাব পরিদর্শন করিয়ে প্রদেশের প্রকৃত কার্যক্রম দেখান।^{১৪} এসময় শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গুরুমিত সিং আলাখ পশ্চিমে এই ইস্যু অব্যাহত রাখেন।^{১৫}

স্বাভাবিক অবস্থা পুনরুদ্ধার হয়েছে এমন একটি নিদর্শন ছিল রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং তার স্বামী রাজপুত্র এডিনবার্গের স্বর্ণমন্দির পরিদর্শন। এই জুটিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এসময় অন্যান্য ভারতীয়দের মতোই শিখরা ব্রিটিশদের অধীনে ছিল, বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গোষ্ঠী (প্রায় ৪০০,০০০) ব্রিটিশ নাগরিক এবং তাদের সংসদ সদস্য।

দল পরিবর্তন এবং সহকর্মীদের টেকা দেয়া ছিল ভারতীয় রাজনীতিবিদদের একটি প্রচলিত প্রথা। পাঞ্জাবেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বুটা সিং একজন মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হিসেবে বিজেপি নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ

১৩. টি কেস অফ এ মিসিং অ্যাবিস্টভিস্ট, ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-১০৪। আরও দেখুন বিটার টিয়ারভেস্ট। ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ জুন ১৯৯৭, পৃ-৩৪-৫।

১৪. পাঞ্জাবস প্রেডিগাল সন। ইন্ডিয়া টুডে, ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ-৬।

১৫. ইউ.এস. শিখ লিডার ব্যাকস আকাল তাক্ত এডিট, ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, ২৪ জানুয়ারি ১৯৯৯।

দেন। বাদলের ফাঁদে পড়ে অমরিন্দর সিং কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি পিছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।^{১৬} ব্রিটেনের ন্যাশনাল ট্রাস্টের আদলে শিল্প, আচার প্রথা ও প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য ১৯৮৪ সালে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী 'দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর অ্যান্টিক এন্ড কালচারাল হেরিটেজ (আই.এন.টি.এ.সি.এইচ)' নামে একটি বেসরকারি সংস্থা স্থাপন করেন। রাজিব গান্ধী, পুপুল জয়কার এবং ভাস্কর ঘোষ (অবসরপ্রাপ্ত ডি.জি. এয়ার এবং ডি.ডি. এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব) এতে সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রায় ৫ কোটি টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হয়। এরা প্রাচীন স্থাপনার আত্মসাৎ-এর বিরুদ্ধে প্রায়ই অভিযোগ উত্থাপন করে এবং অফিসধারীদের পুনরায় নির্বাচনের জন্য প্রতি বছর বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। অক্টোবর সম্মেলনে ঘোষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন আশা করেছিলেন। অমরিন্দর সিং আবারও পাঞ্জাবের ১০০ জন মনোনীত প্রার্থী নিয়ে জয়লাভ করেন এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ঘোষ একটি সম্মানজনক পদত্যাগের আগে বক্তব্য দেন, 'যদি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি পাঞ্জাবের আগ্রহ থাকে তবে তা দেশের জন্য খুশির ব্যাপার।'^{১৭}

পাঞ্জাবি একটি ক্ষুদ্র হট্টগোল তৈরি করে যা তেরাই-এ স্থান নেয়। এটি ছিল বন্য জন্তু ও ম্যালেরিয়া জীবাণু সমৃদ্ধ একটি বন। তদানিন্তন ইউ.পি. পণ্ডিতের মুখ্যমন্ত্রী জে.বি. পাণ্ডের আমন্ত্রণে পাঞ্জাবি ও বাঙালি শরণার্থীরা সেখানে আশ্রয় নেয় এবং স্থায়ী হয়। পাঞ্জাবিরা পূর্বেই সুদক্ষ হওয়ায় সেখানে সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং আখ ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের সূচনা করে। ধ্বংসযজ্ঞের উৎস্রেককারী জালিয়ানওয়ালাবাগের ১৯১৯ সালে গুপ্ত হত্যার পর তারা এর প্রধান শহরের নাম দেয় উদ্দাম সিং নগর। ১৯৯৮ সালে যখন উত্তরাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন উদ্দাম সিং নগর প্রদেশের একটি অংশে পরিণত হয়। পাঞ্জাবিরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কেননা তারা স্থানীয় আদিবাসীদের কাছ থেকে জমি কিনে নেয় এবং আইনানুসারে ১৮ একরেরও বেশি জমির মালিক হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনের প্রতি কোনো দৃষ্টি দেননি। উদ্দাম সিং নগর উত্তরাঞ্চলেই থেকে যায় এবং এস.এস. বর্নালা প্রদেশের প্রথম গভর্নর নির্বাচিত হন।

১৬৯৯ সালের ১৩ এপ্রিল গুরু গোবিন্দ সিং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খালসা পন্থের ৩০০ বৎসর পূর্তি অনুষ্ঠান ১৯৯৯ সালে পালিত হয়। ব্যাপক আকালে অনুষ্ঠান উৎযাপন করার যথেষ্ট কারণ ছিল শিখ প্রজন্মকে তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য। বাদল আগেই ইসরাইল ভ্রমণ করেন এবং ইয়াদ ভ্রাসেমের দ্বারা প্রভাবিত হন। যিশুর বিরুদ্ধে নাজিরের অত্যাচারের শিকারে অনুষদের জন্য তিনি ছিলেন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বাদল আনন্দপুর সাহেবে খালসা হেরিটেজ ইমেমোরিয়াল

১৬. বগলচারাল রূপ ইন্ডিয়া টুডে, ২৬ অক্টোবর ১৯৯৮, পৃ-৭৬-৭।

১৭. এই পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে।

কমিটি স্থাপন করেন। অর্থমন্ত্রী ক্যাপ্টেন কানওয়ালজিৎ সিং-এর প্রধান ছিলেন। শিখদের জন্য একটি ইরাদ ভাসেম তৈরি করে দেয়ার জন্য বোস্টন ভিত্তিক জিয়াস স্থাপতি খোশ সাফদীকে আমন্ত্রণ জানান। তাকে সাহায্য করার জন্য ভারতীয় স্থপতি ও শিখ বুদ্ধিজীবী ও ঐতিহাসিক যেমন ডঃ জি.এম. গ্রিওয়াল, খাড়গ সিং, ডঃ শান, ব্রিগ. জেনারেল জি.এম. গ্রিওয়াল এবং আরও অনেকে। তার কাজ ছিল একটি স্মৃতিসৌধ আজুবা (বিস্ময়) তৈরি করা। ভবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল সুসজ্জিত দুধার বিশিষ্ট ছোরা (খাণ্ডা) এবং নিশান-ই-খালসা (শিখদের গর্ব)^{১৮}, এই প্রকল্পের জন্য ৩০০ থেকে ৫০০ কোটি রুপি খরচ হবে বলে ধারণা করা হয়। পাঞ্জাব সরকার ১৬০ কোটি টাকা দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী আরও ১০০ কোটি টাকা দান করেন।^{১৯} দিদার সিং বাইন সাফদীকে ইউ.এস. ডলারে^{২০} মূল্য পরিশোধ করেন। ডি.এস. যশপালসহ আই.এস. কর্মকর্তাদের একটি তরুণ দলের উপর উৎসব আয়োজনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং প্রদেশের সকল কাঁচামাল উৎসবে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছিল। ২০০৩ সালের শরতের মধ্যে জাদুঘর এবং প্রদর্শনী হলের কাজ শেষ হয়েছিল। লেজারসহ কিছু বিশেষ কারিগরি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এন.আই.ডি. আহমেদাবাদের উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।^{২১}

খালসা পন্থের ৩০০ বছর পূর্তি উদযাপন ছিল স্মরণকালের স্মরণীয়। ভারত এবং বাইরের দেশগুলো থেকে হাজার হাজার শিখ আনন্দপুর সাহেব উপাসনালয়ে জড়ো হতে শুরু করে। শিখ মেধাবী, বিচারক, শিল্পী, কবি, চিত্রশিল্পী এবং ক্রীড়াবিদ, প্রভৃতি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিশান-ই-খালসা দ্বারা সম্মানিত হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা যেমন রেসলিং (পাকিস্তান থেকে আগত) তাঁবু খুঁটি গাঁথা, স্কেট সুটিং, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং আরও অনেক খেলা স্থানীয় গুরুদুয়ারায় সম্পন্ন হয়। যদি কোনো সাক্ষ্য প্রয়োজন হয় তবে এটা প্রমাণিত হয় যে, যতদিন খালসাদের দিন ছিল ততদিন তারা সক্রিয় ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী এবং এস.জি.পি.সি'র প্রেসিডেন্টের মধ্যে শীতল সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। দু'জনের মধ্যবর্তী দ্বন্দ্ব একসময় তাখতের জাটদের নিয়োগে, বিশেষত আকাল তাখত, এ অসুবিধার সৃষ্টি করে। ধর্মীয় ব্যাপারে হুকুমনামা জারি করা হয়। এর মর্যাদা ভঙ্গকারী বা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং শাস্তি পায়। খালিস্তান অধ্যুষিত খালিস্তান-এর

১৮. দি ট্রাইবুন, ১১ অক্টোবর ১৯৯৮।

১৯. খালসা পান্থর বাজেট ৮ বিলিয়ন রুপি আকালিরা নির্ধারণ করেছিল। Rediff Com ১৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯।

২০. 'কমপ্রেস্স বিজনেস', ইন্ডিয়া টুডে, ১৬ নভেম্বর ১৯৯৮, পৃ-৪৮-৫০।

২১. এই পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে।

চরমপন্থীরা সবসময় মমতার অধিকারী ছিল। তোহরা তাদের পক্ষে ছিলেন। বাদল পেছন থেকে কাঠি নাড়েন। তিনি জাবেদার রনজিৎ সিংকে স্থানচ্যুত করে স্বর্ণমন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসেবে মোহন সিংকে নিয়োগ দেন। তার অপারগতায় আরেকজন পুরোহিত জ্ঞানী পুরান সিংকে দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি একসময় ভিন্দারওয়ালের সহকর্মী ছিলেন এবং তাকে ভারপ্রাপ্ত জাটের দায়িত্ব দেয়া হয়। বাদল তোহরাকে পরাজিত করে ২৫ বারের মতো এস.জি.পি.সি.-এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৯৯ সালের ১৬ মার্চ তোহরার পদে বিবি জগীর কর'কে স্থলাভিষিক্ত করার কথা চিন্তা করেন। তিনি ছিলেন এস.জি.পি.সি.-এর প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট।

জগীর কর ছিলেন একজন লুবানা শিখ যার এ ব্যাপারে অনেক সমর্থক ছিল। বাদল তাকে প্রাদেশিক সভায় নির্বাচিত করেন এবং তাকে প্রদেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। শিখদের কার্যকলাপের উপর বাদলের দুষ্টনীতিতে তিনি কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। তার নির্বাচনের কিছুদিন পর বিরোধী দলের লোকের সাথে তার মেয়ের বিয়ের পর তার খ্যাতি কমে যায় এবং রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটে।^{২২} তার শবদাহ কোর্টের আইনের মাধ্যমে তার জামাতা সম্পাদন করেন। তার কন্যার মৃত্যুর জন্য তিনি এখনও দায়ী হন।^{২৩} ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো পাঞ্জাব তার নিজের নিয়মেই চলতে থাকে। যদিও এর আয় ছিল ৮৪৫০ কোটি রুপি। এর খরচ ছিল প্রতি বছর ১০,২৮২ কোটি রুপি^{২৪}। আমরা তার করা অর্থের উপর বেঁচে আছি। তখনকার প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী ক্যান্টেন কানওয়ালজিৎ সিং একথা বলেন। বিপুল পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকলেও সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হয়েছিল। যেমন—বিধানসভার সকল সদস্যের জন্য টাটা সুমো, ৫০০ লিটার ডিজেল প্রতি মাসে; প্রত্যেক মন্ত্রীকে প্রচুর প্রেন্টোল সরবরাহ করা হতো।^{২৫}

* * *

একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ১৯৮৫ সালে আইরিশ কোস্টে বিধ্বস্ত এয়ার ইন্ডিয়া প্লেনে কনিষ্কের আঘাত হানার জন্য ষড়যন্ত্রকারীদের কানাডীয় রয়েল পুলিশ আটক করে। এতে ৩২৯ জন যাত্রী নিহত হয়। দু'জন মালবহনকারী কুলি টোকিওর নারিতা বিমানবন্দরে বোমা হামলায় নিহত হবার ঘটনার সাথেও তারা জড়িত ছিল। কানাডীয় পুলিশ রিপুদামান সিং মালিক এবং ভ্যানকুভারের আজিব সিং বোগড়াকে

২২. 'ব্লাড টাইস', ইন্ডিয়া টুডে, ৮ মে ২০০০, পৃ-৫৯।

২৩. এই পুস্তকের অন্য অধ্যায়।

২৪. 'ইউ আর ব্রোক', ইন্ডিয়া টুডে, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ-৩৬-৮।

২৫. এই পুস্তকের অন্য অধ্যায়ে।

আটক করে। আবার সন্দেহভাজনদের মধ্যে তালবিন্দর সিং পার্মার যাকে ষড়যন্ত্রের হোতা হিসেবে ভাবা হয় তিনি ১৯৯২ সালে পাঞ্জাব পুলিশের হাতে নিহত হন। সুরজন সিং পালিয়ে যান। নারিতা বিমান বন্দরে স্থাপনের জন্য ইন্ড্রজিৎ সিংকে দশ বছর কারাদণ্ড দেয়া হয়।

কোর্টে সাক্ষী প্রমাণের পর জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে ষড়যন্ত্র সংঘটিত হয় অমৃতসরে। অপারেশন ব্লু স্টারের একবছর পূর্তি হবার আগেই এর প্রতিশোধ নেবার জন্য বাবর খালসার সদস্যরা এই ষড়যন্ত্র করেন। ১৯৯২ সালে বোম্বেতে লাল সিংকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে কানাডীয় পুলিশ এর সূত্র খুঁজে পায়।^{২৬} প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তারা সিং হায়ার ভ্যানকুভার ভিত্তিক ইন্ডিয়া কানাডিয়ান টাইমসের সম্পাদক এবং খালিস্তানের ঘোর বিরোধী। ১৯৯৮ সালে তাকে হত্যা করা হয়।

বাদল সরকারের চোখ-ধাঁধানো অনুষ্ঠান চলছিল। জাতীয় পর্যায়ে মহারাজা রনজিৎ সিং-এর বর্ষপূর্তি পালন করা হয়। মহারাজার কার্যগুলোকে মুখ্য করে অমৃতসরেও একটি অনুষ্ঠান হয়। দিল্লিতে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী। মন্ত্রিসভার কয়েকজন মন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। মহারাজার সরকারে কর্মরত এক মন্ত্রী এবং গভর্নর লাহোর থেকে আশ্রয়। সম্মেলন চূড়ান্ত সাফল্য ও বিশাল প্রচারণা পায়।

বাদল যখন এই চোখ-ধাঁধানো অনুষ্ঠান এবং সম্মেলন দিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তখন তার প্রতিপক্ষরা পাঞ্জাবে ২০০২-এর নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জনগণের মতো আকালি বিজেপি সরকার পরাজিত হচ্ছিল। কংগ্রেস পার্টি অমরিন্দর সিং এবং রাজেন্দর কৌর ভাট্টাল-এর মাধ্যমে জয়লাভ করবে। কংগ্রেস ১১৭টির মধ্যে ৬২ আসন পায়। বাদল শিরোমণি আকালি দাল পায় ৪১টি। বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকৃত ২৩টি আসনের মধ্যে ২০টিতে হারে। অমরিন্দর সিং পুরাতন মন্ত্রী এইচ.এস. হাস্পালকে নিতে চান। ভাট্টাল অনুমতি দেন।

রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল থাকলেও অমরিন্দর বাদলের পুরাতন ঘটনাগুলো মনে রেখে ঘোষণা করেন তিনি দুর্নীতি দূর করবেন।^{২৭} প্রতিশোধ নেয়ার আগে সরকার ছয় বছর ধরে পাঞ্জাব পাবলিক সার্ভিস কমিশনে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ট্রিবিউন এবং হিন্দুর সাংবাদিক রাভিন্দর পাহু সিং সিধুর উপর করা দুর্নীতির খবর পান। খবর পাওয়া যায় তিনি পিপিএসসি'কে একটি টাকা বানানোর যত্নে পরিণত করে।^{২৮}

বাদল এবং তার পরিবারের কাছে যাওয়া কম লাভজনক ছিল। পুলিশ তাদের ঘরে তল্লাশি চালায়। সম্পদের পরিমাণ জানা হয়। অমরিন্দর সিং দেশে এবং বেনামে সম্পদের এবং বাদলের তার উপর দুর্নীতির অভিযোগ আনার জন্য

২৬. দি ট্রাইবুন, ৮ নভেম্বর ২০০০।

২৭. সুইপ স্টেক। দ্য পলিটিক্স অফ করাপটন, ইন্ডিয়া টুডে, মে ২০০২।

২৮. জব মবস্টার। ইন্ডিয়া টুডে, ৬ মে ২০০২, পৃ-২৪-৬।

বিপক্ষদলকে দায়ী করেন। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর জুড়ে বাদল এবং অমৃন্দর সম্পদ এবং বিদেশী ব্যাংকে টাকার জন্য একে-অপরকে দায়ী করেন।^{২৯} চন্ডিগড়ে জাসপাল ভাট্টির বদৌলতে তারা দুজনেই তাদেরকে জনগণের সামনে হাস্যস্পন্দে পরিণত করেন।^{৩০}

১০২ বছর বয়স্ক মোহান সিংয়ের মৃত্যু হিন্দু শিখ এবং পাঞ্জাবিদের খারাপ সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। একজন ইংরেজ চালিত হোটেলে তিনি একজন কর্মচারী ছিলেন। মোহন সিং হোটেলটি তার কাছে বিক্রি করতে চাপ প্রয়োগ করেন। তিনি এটি ক্রয় করে ভারত এবং বিভিন্ন রাজ্যে শাখা স্থাপন করতে চান। একজন নিঃস্ব শরণার্থী হিসেবে রওনক সিং লাহোরে আসেন। দিল্লির চাঁদনীচকে একটি দোকানে তিনি চুরি করা পাইপ বেচতেন। ভারতের অটোমোবাইলের চাহিদা মেটাতে পরে পাইপ এবং আরও পরে অ্যাপোলো টায়ার উৎপাদন করতেন। সঞ্জয় গান্ধী মারুতী কার প্রজেক্ট শুরু করলে রওনক সিং প্রথম সভাপতি হন। মোহন সিং এবং রওনক সিং অনেক বিলিয়ন রুপি কামান। ভাই মোহন সিং ১৯৬২ সালে রণবক্ষী স্থাপনা করে আরও সমৃদ্ধি অর্জন করেন। এটি বর্তমানে ভারতের সর্বোচ্চ শীর্ষ ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি যা প্রতি বছর সারা বিশ্বে ৭৬৪ মিলিয়ন ডলার আয় করে এবং বর্তমানে এর ম্যানেজার ডি.এস. ব্রার। আরও অনেক শিখ ব্যক্তি শিল্পক্ষেত্রে সমৃদ্ধি সাধন করেন। বোস্টন এবং আওরঙ্গাবাদের সাহলিন, কোকা-কোলার চরণজিৎ সিং, এছাড়াও ক্যান্সার কোলা ও অন্যান্য কোমল পানীয় এবং নয়াদিল্লিতে হোটেল লা মেরিডিয়ান স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর এসবের নিয়ন্ত্রক হন তার স্ত্রী হারজিৎ কর।

২৯. দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩।

৩০. দ্য ট্রিবিউন, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৩।

সারসংক্ষেপ

সমাজতান্ত্রিকদের সাফল্য ও পরাজয়ের সাম্য গত ২৫ বছরে খুব খারাপ ছিল না। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাঞ্জাবের জনসংখ্যা ২.৪৩ কোটি থেকে প্রতি বছর ১.৮২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। ৮০ শতাংশ শিখ পাঞ্জাবে বসবাস করে এবং প্রায় ১৯ শতাংশ লোক ভারতের অন্যান্য স্থানে এবং ১ শতাংশ বিদেশী প্রবাসী। দিল্লি ও গোয়ার পর তৃতীয় সর্বোত্তম শহর হিসেবে পাঞ্জাবের গৌরব হারালের মাথাপিছু আয় ছিল ১৫,২৫৫ রুপি (ইকোনমিক সার্ভে অফ পাঞ্জাবের ৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত) শিখরা বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে পরিচিত। যখন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ২৬.১০ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে তখন পাঞ্জাবে এর সংখ্যা ছিল ৬.১৬ শতাংশ। যেখানে ভিক্ষাবৃত্তি ছিল একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার সেখানে শিখরা কারও কাছে সাহায্যের জন্য হাত পেতেছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

শিখদের বলা হতো যে, তারা যদি কোনোকিছু চাষ করতে পারে তবে তা শুধুমাত্র কৃষিকাজ। এই সত্যের পরিবর্তন ঘটে। কেননা অনেকেই শিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সংগীতজ্ঞ, ছবি নির্মাতা এবং পপ মিউজিসিয়ান হিসেবে নিজাদের প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতের সুনামখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মানজিৎ রাওয়া, অর্পিতা সিং এবং অপর্ণা কর। নভতেজ জোহর ছিলেন ভরত নাট্যম শিল্পী, সিং বাহুস ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীতজ্ঞ, ধর্মেন্দ্র এবং দারা সিং ছিলেন সিনেমার তারকা। ছবির পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন কেনিয়ায় জন্মগ্রহণকারী গুরিন্দর চোবা যার ভাজি অন দি বীচ এবং বেণ্ড ইট লাইক বেকহ্যাম ভারত ও ইংল্যান্ডের বক্স অফিসে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। পাঞ্জাব সংগীত ও নৃত্য (ভাংরা) তাদের জীবনে নতুন মাত্রা যোগ করে। এতে সংগীত শিল্পী গুরুদাস মন, ডালের মেন্দী, মালকিত সিং এবং অন্যান্যদের আগমন ঘটে। দেশে ও বিদেশে যেখানেই তারা পারফর্ম করেছে সেখানেই প্রচুর ভক্ত পেয়েছেন।

সামাজিক দুষ্ট চক্র থেকেই যায়। এর মধ্যে কন্যা শিশু হত্যা ছিল প্রতি ১০০০ পুত্র সন্তানে ৮৭৪টি। তেমনই ছিল কার্ভেদ। যদিও শিখরা দাবি করত যে তারা কাহীন সম্প্রদায় তবুও নিম্ন বর্ণীয় শিখদের গ্রামে নিজস্ব গুরুদুয়ারা ছিল। তিনটি বর্ণ ছিল যাদের নাম জাট, অজাটের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং মাযহাবি। বর্ণের মধ্যে বিয়ে ছিল নিষিদ্ধ।

একটি উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যৎ ভিত্তিক পরিবর্তন ছিল বিহার ও উত্তর প্রদেশে ক্ষেত চাষীদের জন্য অর্থ নির্ধারণ। তারা ফসল হবার সময় কর্মী হিসেবে আসত কিন্তু অধিকাংশ সময়ে পাঞ্জাবে থাকত। তারা বাড়ি তৈরি করেছিল, ভোট দিত এবং রেশন কার্ড পেত। শিখ কৃষকদের পুত্ররা কায়িক শ্রম পরিহার করে এবং ইউরোপ, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে প্রবাসী জীবনযাপন করে যেখানে তারা ভিসা ও কাজ করার অনুমতি পেত। এভাবে চলতে থাকায় প্রদেশে সাম্প্রদায়িকতা আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

অপারেশন ব্লু স্টার এবং ১৯৮৪-এর শিখ বিরোধী হত্যায়জ্ঞের পর শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে সম্পর্ক ধীরে ধীরে কিন্তু খুব কম পরিমাণে শান্ত হতে থাকে। যদিও তাদের মধ্যে সম্পর্ক নাউন নাস (মাংসবিহীন নখ জন্মানোর মতো) হবার কথা ছিল তবুও তারা শান্তিতে কিন্তু পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকে।

* * *

যেসব শিখ বাইরে বসবাস করত তারা গর্ববোধ করত। তারা নলের কক্ষখানায়, ফ্যাক্টরিতে এবং ক্যাব চালকের কাজ করত কানাডায়। এখন তারা কৃষক, পেশাজীবী এবং উদ্যোক্তা এবং দেশের রাজনৈতিক জীবনে ভূমিকা পালন করে। ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় নিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী উজ্জল দোসাঞ্জ হবার পর গুলজার টীমা প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী এবং হার্ব ডিওয়াল ফেডারেল সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। রমেন্দর গিল প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় সহযোগী নিযুক্ত হন। যুক্তরাষ্ট্রে ‘পিচ কিং’ খ্যাত দিদার সিংয়ের পাশাপাশি এইচ.এস. শর্মা ভারতের ওকরা করলো উৎপাদন করেন। ফাইবার অপটিকের পিতা ডঃ এন.এস. কাপালি লন্ডনে, সান ফ্রান্সিসকো ও ওয়াশিংটনে শিখ ধ্বংসাবশেষ প্রদর্শনের আয়োজন করেন। তিনি ছিলেন ফাইবার কাচ তৈরির উদ্ভাবক স্বীকৃতি প্রাপ্ত। সন্ত সিং ছবিওয়াল ছিলেন দেশের প্রচুর হোটেল ও রেস্টুরেন্টের মালিক এবং তিনি বিল ক্লিনটনের নির্বাচনী প্রচারণায় অর্থ প্রদান করেছিলেন। ওয়াশিংটন ডি.সি.-এর ধনবান ব্যবসায়ী নানক কোহলি ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারণের জন্য ২৫ কোটি টাকা অনুদান দেন। হাউস অব কমন্স এবং হাউস ও লর্ডস-এ লন্ডনে অনেক শিখ সংসদ সদস্য রয়েছে। রিওবান সিং সবচেয়ে কনিষ্ঠ মিলিওনিয়ার ছিলেন। ব্যুরোতে শিখ বিচারক ও মেয়র ছিলেন।

পূর্ব আফ্রিকা, সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে সমাজতান্ত্রিকদের সাফল্য গাঁথা আরও সমৃদ্ধ হয়। একথা বলা যায় যে, যদিও শিখরা তার পূর্ব গৌরব হারিয়েছিল কিন্তু সাংগঠনিক এবং উন্নতির স্পৃহা তাদের মধ্যে ছিল। যাদেরকে সে বিষয়টি সবসময় প্রতিনিধিত্ব করে তা হলো তারা কখনও হাল ছাড়ে না এবং তাদের উদ্যমে বলীয়ান থাকে—চাড়দি কলা।

সাধারণ নির্বাচন এতদিন স্থগিত থাকার পর ২০০৪ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং তার সহকারী এল.কে. আদভানী

আশা করেন যে, তারা তাদের ক্ষমতা ফিরে পাবেন। কেননা তাদের শাসনামলে ‘ফিল গুড’ এবং ‘ইন্ডিয়া শাইনিং’ মতবাদ প্রচলিত ছিল। তারা খুব চোট পান। এর ফলে পরের মাসে হিন্দু অধিকার সংস্থা ভারতীয় জনতা দল (বি.জে.পি.) মিসেস সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পার্টির কাছে বিপুলভাবে হেরে যায়। আবারও মিসেস সোনিয়া গান্ধী তাদের মন জয় করতে সক্ষম হন। কেননা তিনি ডঃ মনমোহন সিংয়ের নাম প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়নের জন্য ঘোষণা করেন। বিরোধীরা এতে কোনো বাধা দেয়নি।

এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, যখন মিসেস গান্ধী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী তখন ডঃ মনমোহন সিং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। ডঃ মনমোহন সিং মণ্টেক সিং আহলুওয়ালিয়াকে অর্থ সচিব থেকে অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন এবং পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেন। ২০০৪ সালের মধ্যে দু’জন শিখ জাতীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দায়িত্ব পান। রাজ কারেগা খালসা— খালসারা শাসন করবে।

উৎস :

১. কে.এস. ব্রার। মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) *দি টু স্টোরি* (ইউ.বি.এস ১৯৯৩)।
২. কে.পি.এস. গিল, *দি নাইটস অফ ফ্লাশহুড* (হর আনন্দ ১৯৯৭)।
৩. সারাবজিৎ সিং, অপারেশন ব্ল্যাক থান্ডার, এস.আই. উইটনেস একাউন্ট অফ টেরর ইন পাঞ্জাব (Jage : ২০০২)।
৪. গোপাল সিং, *পাঞ্জাব টুডে* (ইন্টেলেকচুয়াল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭)।
৫. বীরেন্দ্র গ্রান্ডার (e.d.) *দি স্টোরি অফ পাঞ্জাব ইয়েস্টারডে এন্ড টুডে*, ২ ভলিউম (দ্বিফ এন্ড দ্বিফ পাবলিকেশন্স, ১৯৬৫)।
৬. মহীন্দর সিং, *পাঞ্জাব ২০০০ পলিটিকাল এন্ড সোসিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট* (অনামিকা পাবলিকেশন্স : ২০০০)।
৭. রিডিউসড টু অ্যাশেস *দি ইনসারজেন্সি এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন পাঞ্জাব* (সাউথ এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস, ২০০৩)।
৮. গুরুমুখ সিং, *দি রাইজ অব শিখস এব্রোড* (রোলি, ২০০৩)।
৯. সুরজিৎ কর, *এয়ামং দি শিখস* (রোলি, ২০০৩)।
১০. চামান লাল ঝামব, *চিফ মিনিস্টার অফ পাঞ্জাব সিন্স ইন্ডিপেনডেন্স* (অরুণ পাবলিশিং হাউস)।
১১. জুলিও রবেরিও, *বুলেট ফর বুলেট* (ভাইকিং)।
১২. দানেওয়ালিয়া ভগবান সিং, *পুলিশ এন্ড পলিটিকস ইন ২০ইথ সেঞ্চুরী পাঞ্জাব* (অজন্তা)।